
সম্পাদনা
লীলা মজুমদার
এখলাসউদ্দিন আহ্‌মদ

দুই বাংলার
ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প

[দ্বিতীয় খণ্ড]

সম্পাদনা

লীলা মজুমদার □ এখলাস্‌উদ্দিন আহ্‌মদ

নির্বাহী সম্পাদক ঃ বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য



মডেল প্যাবলিশিং হাউস ৩ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলকাতা ঃ ৭০০ ০৭৩

Dui Banglar Chhotoder Shrestha Galpa
A collection of juvenile stories.
Edited by Lila Mazumdar & Ekhlasuddin Ahmad.

Managing Editor: Biswanath Bhattachariya

প্রচ্ছদ ও শিল্প নির্দেশনা ঃ পূর্ণেন্দু পত্রী
স্কেচ ঃ নিতাই ঘোষ

অলংকরণ ঃ রবীন দাস

প্রুফ্ দেখেছেন সত্যদাস মংগল

চিত্রশিল্পী ঃ শৈল চক্রবর্তী সত্যজিৎ রায় চণ্ডী লাহিড়ী নারায়ণ দেবনাথ সুবোধ দাশগুপ্ত পূর্ণেন্দু পত্রী সত্য চক্রবর্তী কাইয়ুম চৌধুরী ধ্রুব রায় নিতাই ঘোষ হাশেম খান প্রণবেশ মাইতি রফিকুন নবী আব্দুর রউফ সরকার আসেন আনসারী আবুল বারেক আলভি সমীর বিশ্বাস দিলীপ দাস তরুণ চক্রবর্তী মামুন কায়সার আফজাল হোসেন নাইমা হক ধীবেন শাসমল সুব্রত চৌধুরী প্রশান্ত মুখার্জী স্বপন দেবনাথ

জয়দেব ঘোষ কর্তৃক ৩ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলকাতা-৭০০০ ৭৩ থেকে প্রকাশিত এবং দি বোস প্রিন্টিং হাউস ৫৫ ধনদেবী খান্না রোড কলকাতা-৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত।

ফটো টাইপ সেটিং ঃ
ইস্ট ইন্ডিয়া ফটো কম্পোজিং সেন্টার
৬৯ শিশির ভাদুড়ী সরণী, কলকাতা-৭০০০০৬

প্রকাশকের নিবেদন

বাংলায় ছোটদের গল্পের রাজ্য বিশাল। দুই বাংলা মিলে এর পরিধি বিশালতর। খণ্ডে খণ্ডে ছোটদের গল্পের সংকলন দু'দেশেই হয়তো অনেক আছে। কিন্তু দুই দেশের এই গল্পগুলোকে একত্রিত করে এক জায়গায়, অর্থাৎ দু'মলাটের মধ্যে পাওয়া—সম্ভবত আগে কখনোই হয়নি।

আমাদের প্রয়াস সেই দুই বাংলাকে এক জায়গায় নিয়ে আসা। দেশের বিভিন্ন বেড়াজাল,নানা প্রথাগত নিয়মকানুন সবকিছু ডিঙিয়ে দু'দেশের লেখকদের নিয়ে এক জায়গায় উপস্থিত হতে পারা—এটাই সবচেয়ে বড় পাওয়া। দুই বাংলার লেখকদের লেখার সঙ্গে ছবিও এঁকেছেন দুই বাংলার শিল্পীরা।

সম্পাদকদ্বয়ের পরামর্শ, গল্প বাছাই, খুঁটিনাটি প্রত্যেকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা—এই সংকলনকে সুসংবদ্ধ করতে পেরেছে। তাঁদের সাহায্য ছাড়া আশা করি এই গ্রন্থ প্রকাশনার কথা ভাবা অসম্ভব। প্রত্যেকেই তাঁদের ব্যস্ততার মধ্যে থেকে এ কাজের সুষ্ঠু রূপ দিয়েছেন।

এ বই প্রকাশনায় প্রেস বাইণ্ডার, শিল্পী, প্রুফ রীডার প্রত্যেকেরই অবদান যথেষ্ট। সবাইকে জানাই আমার কৃতজ্ঞতা।

বিনীত

জয়দেব ঘোষ

ভূমিকা

মানুষের চিন্তার বিকাশেব সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যেরও স্ফুরণ হতে থাকে। এ ক্ষেত্রে এক যুগের শেষ হয়ে গেল, অন্য এক নতুন যুগ এল, এ কথা বলা শোভা পায় না। কারণ সাহিত্য হল যা সঙ্গে সঙ্গে যায়। তার মধ্যে যেটুকু অদরকারি হয়ে পড়ে, কিম্বা কালের অনুপযোগী মনে হয়, তাকে সরিয়ে রেখে সাহিত্য ক্রমেই এগিয়ে যেতে থাকে। কিছু বাতিল হয় না। তবে অযত্নে লোকে তাকে ভুলে যাবার ভয় থাকে। আবার কোনো দিন কোনো সাহিত্যপ্রেমিক তাকে আবিষ্কার করেন। এই সব কারণে মনে হয়, ৫/১০ বছর পর পর সেই সময়টুকুর শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করলে সে যুগের গুণী লেখকদের কথা সাহিত্য প্রেমিকরা ভুলতে পারেন না। এ-কথা বিশেষ করে ছোট গল্প, কবিতা আর রম্যরচনার বেলা খাটে। আরেকটি অব্যর্থ কথা আছে যা বিশেষ করে ছোটদের গল্পেব বেলা খাটে। তাদের কি ভালো লাগে সেটি বুঝবার বিধিদত্ত ক্ষমতা থাকলেও তাদের কি কি পড়া উচিত সেটা বুঝবার বুদ্ধি তাদের থাকে না। কি করে থাকবে? তারা কি কি খাওয়া উচিত, তা বোঝে? কি পরা উচিত, তাও বোঝে? না কি-ভাবে দিন কাটানো উচিত, তা-ই বোঝে? তবে সুখের বিষয় ভালো জিনিস ধরে দিলে, তাদের ভালো লাগে। সাহিত্যের বেলাও তাই। বেছে বেছে ভালো জিনিসটি হাতে ধরিয়ে দিতে পারলে, আপনা থেকেই তাদের রুচি গড়ে ওঠে; তখন ভালো জিনিসটি নিজেরাই চিনতে পারে। তাহলে ছোটদের কেমনধারা জিনিস দেওয়া হবে? না, যা পড়লে ওদের ভালো হবে, আবার পড়তেও ওদের ভালো লাগবে। নইলে সব পণ্ড হবে। প্রসাদগুণ না থাকলে ছোটদের বই অচল। সব পাঠ্য পুস্তককে আমি সাহিত্য বলি না, যদিও সাহিত্যও পাঠ্য পুস্তক হতে পারে।

এই বইখানিতে গত ৭০/৮০ বছরের মধ্যে লেখা কিশোর সাহিত্য থেকে ৫০ জন লেখকের রচনা নির্বাচন করা হয়েছে পশ্চিমবাংলা থেকে আর ৫০ জন বাংলাদেশের লেখা। এখানে একটা মজার কথা মনে রাখতে হবে। ঐ ৫০ জন পশ্চিমবাংলার লেখকের মধ্যে অনেকেরি আদি বাস পূর্ব-বাংলায়। তাদের মধ্যে আমিও একজন বলে স্বচ্ছন্দে বলতে পারি। লেখকের পা-দুখানি কোথায় রইল, সেটা সব চাইতে বড় কথা নয়। মনটি কোন দিকে উড়ল তাই নিয়েই কথা। কত সময় ভিক্টোরীয় যুগের কোনো হয়তো অখ্যাত লেখকের দু-ছত্র লেখা পড়ে মনটা আনন্দে নেচে ওঠে, এ রহস্য কেই বা জানে।

তবে দেশের মাটির একটা প্রভাবও থাকে বই কি। কিছু নিয়মকানুনও এক দেশে যেমন চলে, অন্য দেশের লোকেরা হয়তো তা ভেবেও দেখেনি। কিন্তু মানুষের তৈরি নিয়মকানুনের উপরে মানবিকতা বলে যে একটা জিনিস কাজ করে, সেটার আবেদন মেনে না চললেই নয়। ছোটদের জন্য লেখাতে কোনো বিকট, নিষ্ঠুর, হিংস্র, অপরিষ্কার উপাদান থাকলে চলবে না, এ কথা জগতের সব মা-বাবারাই নিশ্চয় মানেন। অথচ বিদেশে কমিক্স্ নামে যা চলেছে, তার বেশির ভাগই ঐ সব বস্তুগুলোকেই মূলধন রূপে ব্যবহার করছে এবং বাংলাতেও তার অবিকল অনুকরণ দেখে মর্মাহত হয়েছি। কমিক্স্কে মন্দ বলছি না; রসের কবিতার মতো কমিক্স্ও জলের মতো নির্মল হতে পারে। তা হলেও তাকে আমি সাহিত্য বলি না।

ছবির ঠেকো না পেলে যা দাঁড়ায় না, তাকে আমি সাহিত্য বলি না ; অতিশয় উপাদেয় হলেও নয়। সাহিত্যের অবলম্বন ভাব আর ভাষা,লিখিত অক্ষর পর্যন্ত দরকার নেই। মুখে মুখেই সে সব ছড়া গল্প অমর হয়ে থাকে। আদি রচয়িতা যে কে তাও লোকে ভুলে যায়। ক্রমে বোঝা যায় ভাষার ভূমিকাটিও ভাবের চাইতে ছোট। ঐ সব অমর রচনা, যে ভাষাতেই অনুবাদ হক না কেন, সে দেশের লোকে লুফে নেয়। কোথায় যে তার আদি মূল তাও শেষটা বোঝা যায় না। এই সব লোক কথা, রূপ কথা, ছড়ার গান হল গিয়ে ছোটদের সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ধন। এবং আমাদের এই গ্রন্থের ক্ষেত্রে তার ভূমিকা ছোট। কিন্তু বাদ যায়নি।

পশ্চিমবাংলার ৫০টি গল্পের শুরু রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে এবং শেষ আজকের তরুণ লেখকদের দিয়ে। তাও বহু সম্ভাবনাময় গুণীকে বাদ দিতে হল।

এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয় ; সেটি হচ্ছে গল্পের বিষয় বৈচিত্র। এই বৈচিত্রই হল বাংলা কিশোর সাহিত্যের প্রধান বিশেষত্ব। সব কিছুর নমুনা দেওয়া যায়নি। দুঃখের বিষয়, আজকাল অধিকাংশ গুণী লেখকরা কিশোরদের জন্য লেখেন, অর্থাৎ যাদের বয়স অন্ততঃ বড় ১০/১২। প্রথম যুগের বিদ্যাসাগর, শিবনাথ শাস্ত্রী, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী শিশুদের জন্যেই প্রধানত লিখতেন। তাঁদের পরেই উপেন্দ্রকিশোর, যোগীন্দ্রনাথ ইত্যাদির জ্ঞানবিজ্ঞানের কথা, ভ্রমণকাহিনী, জীবনী মনে হয় আরেকটু বড়দের জন্য। উপেন্দ্রকিশোরের রামায়ণ মহাভারত ছোটদের ভালো লাগলেও, 'মহাভারতের গল্প' বইটির রস গ্রহণ করতে হলে আরেকটু বড় হওয়া দরকার। রবীন্দ্রনাথের শিশু ভোলানাথ, সে, খাপছাড়া—এ সবের রসগ্রহণ করতে বোধ হয় শিখতে হয়।'আসলে রবীন্দ্রনাথের বঞ্চিত শৈশব এর জন্য দায়ী। সারা জীবন তিনি ছোটদের জন্য ভেবেছেন, যার মূলমন্ত্র হল ছোটদের প্রকৃতির বুকে ছেড়ে দেওয়া যাক ; প্রকৃতির মতো মাস্টার-মশাই আর কেউ নেই। নিজে যা যা পান নি, তার সব কিছুই তিনি ছাত্রদের দিতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু গুরুর আসন ছাড়তে পারেন নি। ছোটদের ভালোবেসেছেন, ওদের জন্য চিন্তা করেছেন, কিন্তু ওদের দলে ভিড়তে পারেননি। যে ছেলে কখনো গাছে চড়ে আম পাড়েনি, মার্বেল খেলার সাথী পায়নি, কারো সঙ্গে মারামারিও করেনি, সে যে কত বঞ্চিত, বিশ্বকবিকে দেখে তা বোঝা যায়। তিনি নিজেও সেটা জানতেন বলে মনে হয়। ছোটদের জানতেন, বুঝতেন, কিন্তু নিজে ছোট হয়ে যেতে পারতেন না। তাই ওঁর ছোটদের বিষয়ে গল্প কবিতা এত মর্মস্পর্শী, কিন্তু ছোট হবার মন্ত্রটি কবে তাঁর হারিয়ে গেছিল।

এই বইতে শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, বনফুল, দুই বিভূতিভূষণ ও কল্লোল যুগের লেখকদের থেকে আরম্ভ করে এখনকার সেরা লেখকরা আর কমবয়সী, স্বীকৃতি পাওয়া এবং সমান গুণী কিন্তু স্বীকৃতি না পাওয়া বেশ কিছু গল্পকার স্থান পেয়েছেন। দুঃখের বিষয় তার চাইতেও অনেক বেশি স্থানাভাবে বাদ পড়েছেন। আমার মতে যিনি একটিমাত্র প্রথম শ্রেণীর অনন্যসাধারণ গল্প দেশের কিশোরদের উপহার দিয়েছেন, তাঁর স্থান যাঁরা শতাধিক দ্বিতীয় শ্রেণীর গল্প লিখেছেন, তার উপরে। লেখক বাছাই করার চাইতে লেখা বাছাই করা ভালো। মানের চাইতে গুণ বড়।

এই ধরনের সংগ্রহ প্রকাশ করে মডেল পাবলিশিং দেশসেবার মহৎ দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন। ৫ বছর অন্তর ঐ ৫ বছরের লেখা থেকে বাছাই করা একটি গ্রন্থ প্রকাশ করলে দুই বাংলা কৃতার্থ হবে। ইতি—

মুসলিম লেখক কবিদের রচনাকে নিজেদের উত্তরাধিকার মনে করতেন, আর প্রগতিশীল উদারপন্থীরা সমগ্র বাংলা সাহিত্যকেই তাঁদেব উত্তরাধিকার হিসেবে বিশ্বাস করতেন। ক্ষুদ্র পরিসর শিশু সাহিত্যেও ঐ দু'টি ধারা লক্ষ্য করা যায়। একদিকে পাকিস্তানের গুণগান আর ধর্মভিত্তিক নীতিশিক্ষা বিষয়ক রচনা এবং অন্যদিকে শিশু-কিশোব মানসের উপযোগী সৃষ্টিশীল সাহিত্য রচনাব প্রয়াস এসময় লক্ষ্য করা যায়। ঐ সময কলকাতা থেকে আগত ও প্রত্যাগত মোহাম্মদ মোদাব্বের, হোসনে আবা, আবুল কাসেম, হাবীবুব রহমান, গোলাম বহমান, মোহাম্মদ নাসির আলী, সাজেদুল করিম, রোকনুজ্জামান খান প্রমুখ শিশু সাহিত্যিকেবা তো লিখতেনই, সেই সঙ্গে লিখতেন শওকত ওসমান, ফবরুখ আহমদ, আহসান হাবীব প্রমুখ বিখ্যাত লেখক ও কবিরা। বিজ্ঞান বিষয়ক লেখক আবদুল্লাহ আলমুতী ও প্রখ্যাত ছডাকার ফয়েজ আহমদের আবির্ভাব ঐ সময়ে। ঐ সময় 'মুকুল', 'ঝংকার' এবং 'মিনার' নামক তিনটি স্বল্পজীবী পত্রিকা বের হলেও ছোটদের সাহিত্য চর্চার প্রধান জাযগা ছিলো দৈনিক পত্রিকার সাপ্তাহিক পৃষ্ঠাগুলি। শিশু-কিশোরদের সাহিত্য-মনস্ক করার প্রাথমিক দায়িত্ব যে দৈনিক পত্রিকাগুলিই পালন করেছে—এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। কিন্তু তবু উল্লেখ করার বিষয় এই যে, ঐ সময়ে ছোটদের সাহিত্যে সামগ্রিক ও সমন্বিত পরিকল্পনার অভাব ছিলো। শিশু মনস্তত্ত্বের দিকটা গুরুত্ব সহকারে দেখা হতো কমই, আর মুদ্রণ ও প্রকাশনার দিকটাও ছিলো একান্ত অবহেলিত। ১৯৫০-এ শিশু-কিশোরদের মনে 'সাহিত্যরস' সৃষ্টির দায়িত্ব নিয়ে ফয়েজ আহমদের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মাসিক "হুল্লোড়" এবং তা বেশ সাড়া জাগায়। কিন্তু 'হুল্লোড়ের' আয়ুষ্কাল বেশিদিন ছিলো না। তবে যথার্থভাবে ছোটদের পত্রিকা প্রকাশনার প্রয়াস ঐ 'হুল্লোড়ে'ই দেখা যায়। পঞ্চাশের দশকে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘজীবী পত্রিকা "আলাপনী" এবং "খেলাঘর"। একই সময়ে সরদার জয়েনউদ্দীনের সম্পাদনায় শিশু পাক্ষিক "সিতারা" ও শিশু মাসিক "শাহিন"-ও প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই পত্রিকাগুলি ছোটদের সাহিত্যে নতুন কোনো অবদান রাখতে পারেনি। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, ১৯৫২ সালের যুগান্তকারী ঘটনা যে ভাষা আন্দোলন এবং এই আন্দোলন থেকেই সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে সৃষ্টিশীলতার উজ্জীবন, ঐ দশকের ছোটদের সাহিত্যে সেই ভাষা আন্দোলনের প্রভাব প্রায় দুর্লক্ষ্য বলা চলে। কারণ সম্ভবতঃ এই যে, প্রতিষ্ঠিত লেখকেরা ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে ঐ সময় নিজেদের একাত্ম করেননি এবং যে তরুণ লেখকরা একাত্ম হয়েছিলেন তাঁরা তখনও ছোটদের জন্যে লেখা আরম্ভ করেননি। তবে ব্যতিক্রম অবশ্যই ছিলো—আর ছিলো বলেই বাঁচোয়া। না হলে ষাটের দশকের সৃষ্টিশীলতার উৎসারণ সম্ভব হতোনা। ৬০ এর দশক যেমন রাজনৈতিক আন্দোলনে উত্তাল তেমনই সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সৃষ্টিশীলতায় মুখর। ছোটদের সাহিত্যে পুরোনোরা তো লিখছিলেনই, এবার এসে যোগ দিলেন নতুন প্রজন্মের লেখকরা। যাঁরা আগে ছোটদের জন্যে লেখেননি তাঁরাও এ সময় লিখতে শুরু করলেন। এসময় দেখা যায়, লেখক শিল্পী, প্রকাশক, সম্পাদক বলতে গেলে সংশ্লিষ্ট সকলেই ছোটদের জন্যে লেখার ব্যাপারটা বেশ গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করছেন। শিশু-কিশোর পাঠ্য একখানি বই নিয়ে জনপ্রিয় ইংরাজী দৈনিকে সম্পাদকীয় লেখার মতো ঘটনা এই সময়েই ঘটে। ১৩৭১-এ প্রকাশিত হয় রোকনুজ্জামান খান সম্পাদিত "কচি ও কাঁচা" এবং তার দুবছর পর প্রকাশিত হয় এখ্লাসউদ্দিন আহ্মদ সম্পাদিত "টাপুর টুপুর"। বাংলাদেশের শিশু-কিশোর সাহিত্যে এই দু'খানি পত্রিকা অসামান্য অবদান রাখতে সমর্থ হয়। 'কচি ও কাঁচা' এবং "টাপুর টুপুর" বাংলাদেশের শিশু সাহিত্যকে একটি সুনির্দিষ্ট পথে নিয়ে যাবার ও চেষ্টা নেয়

এবং সফলও হয়। দেশের প্রায় সকল সৃষ্টিশীল কবি ও লেখকদের দিয়ে লেখা প্রস্তুত করিয়ে এ দুখানি কাগজে যত্নসহকারে নিয়মিত ছাপানোর ব্যবস্থা হয়। এই দুটি কাগজের উৎসাহে লেখকদের মধ্যে ছোটদের মনোজগতে প্রবেশ করার একটি সযত্ন প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। মনোরঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হয় কল্পনা ও জিজ্ঞাসাকে জাগিয়ে তোলার আন্তরিক প্রয়াস। ছড়ায় যেমন দেখা যায় একই সঙ্গে ছন্দের যাদু এবং বক্তব্যেব শানানো ধার, তেমনি গদ্য রচনাতেও লক্ষ্য করা যায় একইসঙ্গে কৌতুক ও জীবনোপলব্ধির মেশামেশি অবস্থান। এই দুই কাগজে বিচিত্র ধরনের লেখা লিখেছেন এ সময়ের লেখকেরা। হাসির গল্প, ইতিহাস, প্রসঙ্গের গল্প, পশুপাখির গল্প, উদ্ভট বিষয় ও চরিত্রের গল্প, রূপকথার গল্প—মোট কথা, সংখ্যা ও গুণেব দিক থেকে বিচার করে বলা যায় যে ৬০-এর দশকে ছোটদেব জন্যে যে প্রচুর গল্প লেখা হয়েছে-তার মূলে রয়েছে ঐ দুই কাগজের উপস্থিতি। ঐ সময় "টাপুর টুপুব" এ ৩/৪ খানি কিশোর উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে শাহরিয়ার কবির, মুনতাসীর মামুন এবং আলী ইমামের মতো লেখকদের আবির্ভাব হয় এই দু'খানি পত্রিকার মাধ্যমে। নবীন প্রবীণ প্রায় সব লেখকই ৬০ দশকে ছোটদের জন্যে লিখেছেন। শামসুর বাহমান, সৈয়দ শামসুল হক, শওকত আলী, হাসান আজিজুল হক, বশীব আল হেলাল, রাহাত খান প্রমুখরা তো লিখতেনই, বয়োজ্যেষ্ঠ যাঁরা, যেমন শওকত ওসমান, আহসান হাবীব, সৈযদ আলী আহসান—এঁরাও নিয়মিত লিখতেন। সমসাময়িক ক্ষুদে লেখকেরাতো লিখতোই।

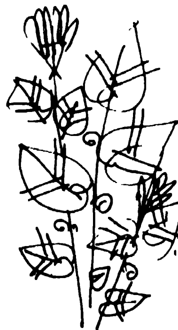
বাংলাদেশের শিশু কিশোর সাহিত্যে প্রধান যে বৈশিষ্ট্যটি লক্ষ্য কবা যায়, তা হলো জীবন-বাস্তবতার সঙ্গে এর গভীর সম্পর্ক। রূপ কথা যে লেখা হযনি তা নয়, কিন্তু তা যেন রূপকথার জীবন সম্পর্কিত ইতিবাচক দিকটি সামনে তুলে ধরার জন্যেই। ভূত-প্রেত সম্পর্কিত গল্পের সংখ্যা নেই বললেই চলে। এতে ছোটদের সাহিত্যে অপূর্ণতা থেকে গেছে কিনা তা নিয়ে তর্ক হতে পারে, তবে যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে, ঐ সময় কি পাঠক কি লেখক, দুপক্ষই জীবনের প্রত্যক্ষ বাস্তবতার সঙ্গে এমনভাবে মুখোমুখি অবস্থান করছিলেন যে, তখন অবাস্তব কল্পনা কিংবা ভাবনা বা কেবলমাত্র রহস্য রোমাঞ্চকে গল্পের উপাদান হিসেবে গ্রহণ করার কথা কেউ ভাবতেও পারেননি। এছাড়া প্রগতিশীল চিন্তার লেখকরা তো আগাগোড়া তাঁদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সজাগ ছিলেনই।

স্বাধীনতা পরবর্তী দুই দশক প্রায় অতিক্রান্ত হতে চলেছে। মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা যেমন বড়োদের সাহিত্যে, তেমনি শিশু সাহিত্যেও এখন পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারেনি। অপরদিকে শিশু সাহিত্যের আসরে ৬০-এর দশকের শেষার্ধের যে সমন্বিত প্রস্তুতি ও উদ্যোগের চেষ্টা ছিল তাও বলতে গেলে অনুপস্থিত আছে এ পর্যন্ত। "কচি ও কাঁচা" "টাপুর টুপুর" এর মতো পত্রিকার অনুপস্থিতি এবং উদ্যোগী সম্পাদক প্রকাশকের অভাব ইত্যাদিকে এর জন্যে প্রধানত দায়ী করলেও এর পেছনের আরো অনেক কারণ হয়তো অনুক্ত থেকে যায়। একদিকে যেমন বিজয় অর্জনের উচ্ছ্বাস স্বাভাবিক নিয়মে থিতিয়ে আসার আগেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় পট পরিবর্তন, রাষ্ট্রিক আদর্শ ও জাতীয়তা সম্পর্কে প্রশাসন ও এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর দোলাচলবৃত্তি এবং সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অস্থিতিশীলতা, অপরদিকে তেমনি প্রকাশনা ব্যয় অকল্পনীয় বৃদ্ধি কোন ব্যক্তি বিশেষ কিংবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে শিশু কিশোর সাহিত্য নিয়ে জোরে-সোরে মাঠে নামতে সাহসী করেনা। যদিও এসময় সরকারী উদ্যোগে "শিশু" "ধান-শালিকের দেশ", "নবারুণ", 'কিশোর বাংলা'র মতো শিশু-কিশোর পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তবু এসকল

পত্রিকা থেকে নবপ্রজন্মের লেখকরা নতুন কোন বৈশিষ্ট্য-তিলক নিয়ে বেরিয়ে আসার অপেক্ষায় আছে এখনো। তার মানে অবশ্য এই নয় যে, ছোটদের সাহিত্য এক জায়গায় থেমে আছে। তবে ৬০-এর দশকে আমরা যে ফসল ঘরে তুলেছি সেই তুলনায় প্রত্যাশিত ফসল আমরা ৭০ ও ৮০-এর দশকে ঘরে তুলতে পারিনি বলে ক্ষোভ জাগে, এই যা।

উভয় বঙ্গের শিশু-কিশোর সাহিত্যের এই সংকলনে বাংলাদেশ পর্বের সম্পাদনার যোগ্যব্যক্তি আমি কখনোই নই। মডেল পাবলিশিং হাউসের সুযোগ্য স্বত্বাধিকারী শ্রীজয়দেব ঘোষ মহাশয়ের অনুরোধ আমি এড়াতে পারিনি। শ্রীঘোষের ঐকান্তিকতা আমাকে এই কাজে উৎসাহিত করেছে। তাঁকে এই সুযোগে ধন্যবাদ জানাই। বাংলাদেশ পর্বের রচনাগুলিকে মোটামুটি অগ্রজ থেকে অনুজ লেখক—এইভাবে সাজানোর চেষ্টা করা হয়েছে। লেখা নির্বাচনের ক্ষেত্রে লেখকদের সেই সব রচনাগুলিকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে যে সব রচনা লেখকদের নিজ নিজ প্রবণতা ও ঝোঁকগুলিকে মোটামুটিভাবে চিহ্নিত করে। আমাদের লক্ষ্য ছিল ১৯৪৭ সাল থেকে আজ পর্যন্ত শিশু সাহিত্যে ধাবাবাহিকতার পরিচয় রাখা। আর একাজটি করা হয়েছে মোটামুটি উদারভাবে। রচনায় সহযোগী অঙ্কন চিত্রগুলি ৬০-এর দশক ও সমকালের নন্দিত অঙ্কন শিল্পীদের দিয়ে কবানো হয়েছে বলে এতে এপার বাংলার শিশু-সাহিত্যের অলংকরণের যে বৈশিষ্ট্য তা চমৎকারভাবে ধরা পড়বে বলে আশা করা যায়।

সূচীপত্র





ফাটল

মুর্তজা বশীর

মাথার পেছনে ডান হাত রেখে, চিৎ হয়ে শুয়েছিল পিন্টু।

ঘুম তার ভেঙ্গেছিল ছোট বোন রাবেয়ার বাঁশীর মত সরু গলার আওয়াজ শুনে। রোজ ভোরে এমনি বাঁশীর সুর তুলে কোরান পড়ে তার বোন। মাঝে মাঝে তার বিরক্তিও ধরে। সকালে, কানের কাছে কোনরকম শব্দ সে বরদাস্ত করতে পারে না। শীতের আমেজ এখনো লেপের ভেতর থেকে পালিয়ে যায়নি, বরং এক উষ্ণতা এখনো ঘিরে। সারা শরীরে উইয়ের ঢিপির মত বাসা বেঁধেছে।

রাবেয়া বসেছিল দোর গোড়ায়। বারান্দায় রোদ এক চিলতে পড়েছে। সেখানে ছেঁড়া মাদুর বিছিয়ে দুলে দুলে পড়ছিল রাবেয়া। সবদিনের - ত ভোরের রোদ লালটালির ছাদ বেয়ে এখানে এসে জমে থাকে। সদর রাস্তা থেকে কিছু ভেতরের দিকে বাসা। দুপাশে উঁচু দোতলা, তার মাঝে এই একতলায় রোদ আসতে বেলা বেশ হয়ে যায়।

তা নাহলে আবো সকালে তাকে কোরান নিয়ে বসতে হয়। আব্বা ফযরের নামাজ পড়েই পাটিতে বসে অপেক্ষা করেন তার জন্য। সে এলে তাকে কোরানের সুরা পড়ান, ভুলচুক সংশোধন করে দেন।

কপালের ভুরু পর্যন্ত ঘোমটা টেনে রাবেয়া পড়েছিল। এই শীতে মাথায় কাপড় তেমন খারাপ লাগেনা তার, তবে গরমে বেশ অস্বস্তি মনে হলেও উপায় থাকেনা। শরীফ সাহেব কিছুতেই তাকে ফ্রক পরা দেখতে পারেন না। বারো পেরিয়ে তেরোতে পা দিয়েছে, অমনি তিনি মেয়েকে শাড়ি পরতে বলেছেন। নইলে, চেঁচামেচির শেষ নেই। মুসলমান ঘরের মেয়ে শাড়ি ছাড়া কেমন বেআব্রু লাগে, নিজের চোখে কেমন লজ্জা এসে ভিড় করে।

রাবেয়াকে হঠাৎ পড়ার মাঝে থামতে দেখে তিনি প্রশ্ন করেন, কি হলোরে থামলি যে ? চোখ বুজে রাবেয়ার মিহি সুরের আয়াত শুনছিলেন তিনি, হঠাৎ চোখ মেললেন।

আব্বার মুখের দিকে তাকিয়ে হুট করে জবাব দিতে পারল না রাবেয়া। শরীফ সাহেব ঝুঁকে রাবেয়ার ডান হাতের তর্জনী লক্ষ্য করে বললেন, পড়। ইন্নাল্লাহা বি কুল্লি শাইয়ি আলিমু। আইন জবর লাম যের .....

ঠিক এমনি করে তিনি ইস্কুলে ইতিহাস পড়ান। ছাত্রদের সন তারিখ দিয়ে মুখস্থ করান। সেকেন্দার শাহ্, তৈমুরলঙ্গের আক্রমণ, সব।

হাই পাওয়ারের পুরু লেন্সের চশমা নাকের ডগা থেকে সরিয়ে ফেললেও নিষ্প্রভ চোখ দিয়ে গড়গড় করে বলতে পারেন কোন লাইনের পর কি, কোন ঘটনার পর কোন ঘটনা। প্রথম যৌবনে তিনি সখ করে ইতিহাসের শিক্ষক হয়েছিলেন। মনে ছিল অফুরন্ত আশা, ছেলেদের ইতিহাস পড়াবেন নিজের দেশকে ভালভাবে ভালবাসতে শেখাবেন, দেশের জন্য যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের মহান কাহিনী শুনিয়ে ছেলেদের দেশপ্রেম জাগাবেন। আগে হৃদয়ে পেতেন উষ্ণতা। তারপর সেই উদ্দামতা এক সময় কখন যে হারিয়ে গেছে টেরই পাননি। এখন সবকিছু মনে হয় অর্থহীন, বিবর্ণ মৃতদেহ। আপসোস হয় তাঁর এই বার্ধক্যের দোরগোড়ায় এসে নিজের এমন নির্বুদ্ধিতার জন্য। এখন মনে হয় সবকিছু ভুল করেছেন, জীবনে আগাগোড়াই তাঁর মিথ্যে দিয়ে ভরা। অতীতের ইতিহাস ঘাঁটতে গিয়ে তিনি অতীতেই রয়ে গেছেন, ভবিষৎও অতীত হয়ে গেছে।

আব্বার জন্য তাই মায়া হয় পিন্টুর। ছোটবেলায় যে আব্বাকে সে দেখেছিল, এখন এই কৈশোরে তাঁকে মনে হয় অন্য কেউ। সেই প্রাণস্ফূর্তি শুকিয়ে গেছে, তার চিহ্ন কোথাও নেই। আব্বাকে দেখলে তার মনে হয় একটা শুকনো নদীর মত। দিক পাল্টিয়ে যে নদী চলে গেছে, শুধু রেখেছে তার বালির খাদ। তা না হলে আব্বা রাবেয়াকে আরো পড়াতেন, এবং তাকেও ছবি আঁকার ইস্কুলে ভর্তি করতেন।

রাবেয়ার বড় ইচ্ছে ছিল ডাক্তারী পড়ার।

অবশ্য এরও এক কারণ ছিল। পাশের বাড়ীর সেই যে কালো মত পাতলা মেয়েটা হেনা, যার সঙ্গে গলায় গলায় ভাব ছিল, ও মারা যাওয়াতে রাবেয়া ঠিক করল ডাক্তারী পড়ার। কতটুকুন তখন রাবেয়া, এই এগারা বারো হবে। একরকম বিনি চিকিৎসায় মরে গেল হেনা। দুটাকা ভিজিটের ডাক্তার একমাস ধরে চিকিৎসা করেও কিছু করতে পারেনি। পাঁচ টাকা ভিজিটের ডাক্তার সপ্তাহে তিনবার এসে, এক রাশ ফলমূল দুধ মাখন দিলে হয়ত বাঁচত!

কিন্তু তা হয়নি।

কেরাণী বাপের চোখের সামনে মেয়েটা শুকিয়ে মরে গেল। রাবেয়া কেঁদেছিল বান্ধবীর মৃত্যুতে। পিন্টু তাকে কিছুতেই থামাতে পারেনি।

ডুকরে ডুকরে কেঁদে বুক ব্যথা করে ফেলেছিল সে। একসময় যখন বুকের ব্যথায় আর কাঁদতে পারলনা চোখ তুলে দেখল ভাইকে। বলল, ভাইয়া এমনি করে মরে গেল কেন সে?

এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারেনি পিন্টু। শুধু চোখের কোণে অশ্রু এসে জমে উঠছিল। সেদিকে তাকিয়ে হয়ত জবাব খুঁজে পেয়েছিল রাবেয়া। তাই মাথায় কোঁকড়ানো চুল ঝাঁকিয়ে বলেছিল, গরীব বলে ভাল ডাক্তার আনতে পারেনি, না ভাইয়া?

কিছুক্ষণ ইতস্তত করে জবাব রাবেয়া নিজেই দিল, আমি ডাক্তার হবো। দেখো ভাইয়া, আমি ডাক্তারী পড়বো।

শুনে হেসেছিল পিন্টু, দুর তা কি তুই পারবি ? মুরগীর জবাই দেখলে কেমন ভয় পাস তুই।

ডাক্তারী অবশ্য আর পড়া হয়নি তার। তার পরের বছরে এইটে ওঠার পর আব্বা নাম কাটিয়ে দিলেন। চাকরীর সময় ফুরানতে আর দেরী নেই। মেয়েকে পড়ানো যেন পানিতে টাকা ফেলা মনে হলো শরীফ সাহেবের। বিয়ে হলে চলে যাবে, তাকে পড়িয়ে কি লাভ ? বরং পিন্টু পড়ুক, ওকে পড়ালে আবার পয়সা ঘরে আসবে। ছেলে তাঁর চাকরী করে টাকা আনবে। যে টাকা তিনি খরচ করবেন তা পাই পয়সায় ফেরৎ আসবে ঘরে।



রাবেয়া অবশ্য খুব কেঁদেছিল। হেনা মারা যাওয়াতে যেমন করে কেঁদেছিল তেমনি। কিন্তু তার কান্নাকে কিছুতেই আমল দেননি তিনি। বরং ধমক দিয়েছেন, শাসিয়েছেন।

কান্না কিসের শুনি ? পড়ে তুই জজ ব্যারিস্টার হবি ?

ডাক্তার হবো।

ছাই হবি।

মেয়ের সেই অপলক চাহনী কিছুতেই সহ্য করতে পারেননি তিনি। সেই বোবা চাহনীতেও যেন ভাষা ফুটে রয়েছে। সে ভাষায় জ্বালা ধরে মনে। নিজের অক্ষমতায় সে জ্বালা আরো তীব্রতর হয়ে উঠে। মেয়ের সামনে থেকে পালিয়ে তবে যেন শান্তি পান।

সেই রাবেয়াকে অবশ্য তিনি নিজেই কোরান পড়া শেখালেন। যাতে কোরানের সুমধুর বাণীতে সব গ্লানি আপসোস ভরাট হয়ে যায়। মেয়েটার গলায় মাধুর্য আছে, মেয়ে না হলে তাকে মৌলানা করতেন।

পিন্টু কিন্তু আব্বাকে সেজন্য ক্ষমা করতে আজও পারেনি। তার মনে হয়েছে এ অন্যায়, অবিচার। বোন তার ছাত্রী ভালই ছিল, ক্লাশে ফাস্ট সেকেণ্ড হতো। তার এই পরিণাম দেখে বুক বারবার কেঁপে উঠল। শেষে কি তারও এই অবস্থা হবে?

ম্যাট্রিক পাশ করার পর সে আব্বাকে আভাষে ইঙ্গিতে জানিয়েছে ছবি আঁকা সে শিখবে। কিন্তু সেকথা তিনি কানে নেননি।

শরীরটাকে ধনুকের মত বেঁকিয়ে আড়মোড়া ভাঙ্গল পিন্টু। বিছানার ময়লা চাদরে উবু হয়ে শুয়ে আধভেজান দরোজার ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকাল।

উঠোনের একধারে, কলপারের পাশ ঘেঁষে ওঠা নারকেল গাছের পাতায় রোদের রেখা। দুটো শালিক। একটা বুঝি মা, তাই অন্যটা তার খয়েরী রঙের ডানা মৃদু কাঁপিয়ে হা করছিল বারবার। চিকন সরু পাতার ফাঁক গলিয়ে রোদের আদর শালিকটার বুকে পিঠে। হঠাৎ দেখলে মনে হয় খয়েরী রঙের ওপর সোনালী জরির কাজ। পিন্টুর দেখতে ভাল লাগছিল সেই পালকগুলোর ওপর উজ্জ্বল ছটা। কেমন মসৃণ আর মোলায়েম ও জায়গাগুলো। রীতিমত নিজের সত্বা দিয়ে অনুভব করা যায়।

চোখভরে চেয়ে তবুও তৃপ্তি মেলেনা। কিন্তু এমনি করেই বা কতক্ষণ শুয়ে থাকবে। আব্বা ডেকেছিলেন ভোরে নামাজ পড়তে, ইচ্ছে করে জবাব দেয়নি। উঠতে কেমন আলসেমী লেগেছে। এখন উঠতে বড্ড ভয় লাগল। দরোজা দিয়ে কলপারে যাবে তারও উপায় নেই। রাবেয়াকে নিয়ে আব্বা তার বসে।

দোরের চৌকাঠে বাঁ পা রেখেছে শরীফ সাহেব তাকালেন। হাতের তসবীটা মাথার কাছে রেখে জিগগেস করলেন, তাহলে কি ঠিক করলে?

চুপ করে রইল পিন্টু। কিছুক্ষণ পর ইতস্তত করে জবাব দিল, বলেছি'ত।

কি? ঘন আধপাকা ভুরুর নিচে, চশমার নিকেলের গোল ফ্রেমের পুরুকাচের ভেতর চোখ জোড়া কুঁচকে থাকে। মিনিট দুয়েক গুম ধরে থাকার পর বিস্ফোরণের মত ফেটে পড়লেন তিনি, ছবি আঁকবেন না কচু করবেন। ছবি এঁকে কি হবে?

শরীফ সাহেব বুঝে উঠতে পারলেন না ছবি এঁকে লাভ কি। ছোটবেলায় পিন্টু যখন কাগজে কিংবা দেয়ালে ছবি আঁকতো ভালই লাগত তাঁর। মনে মনে ভাবতেন প্রতিভা আছে তাঁব ছেলের। তা না হলে নিজের থেকে এমন সুন্দর করে ছবি আঁকতে সে পারত না। আনন্দে তাঁর বুক ভরে উঠত। নিজের সহকর্মীদের বলতেন ছেলের কথা, বলতে গর্বে তাঁর মন উঁচু হয়ে যেত। সবাইকে বলতেন ম্যাট্রিকের পর তাকে আর্ট ইস্কুলে পড়াবেন। রং কাগজ এনে দিয়েছিলেন ছবি আঁকার জন্য। মাঝে মাঝে তার কাজ নিজে যেচে দেখেছেন। স্ত্রীকেও ডেকে দেখিয়েছেন। দেখিয়ে তৃপ্তি পেয়েছেন।

কিন্তু, আজ তাঁর মনে হয় তিনি ফের ভুল করেছেন। নিজেও ভুল করেছিলেন, পিন্টুর জীবনও ভুলে ভরে দিয়েছেন। ছবি আঁকবে যাদের ঘরে বাড়তি পয়সা রয়েছে তাদের ছেলেরা। সামান্য কটা টাকা সারা মাস ঘাম ঝরিয়ে মুখে ফেনা তুলে যা উপার্জন করেন তা এই খেয়ালের

পিছনে উড়িয়ে দেবার কোন যুক্তি খুঁজে পাননা তিনি। এটা গরীবের ঘরে ঘোড়া রোগ। হ্যাঁ ঘোড়া রোগ ছাড়া এ আবার কী!

মুহূর্ত কয়েক ইতস্তত করল পিন্টু। রাবেয়ার দিকে তাকাল। মাথা নিচু করে রাবেয়া কি যে পড়ছে শোনা যায় না স্পষ্ট করে। আব্বার দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে বলল, এতে এমন কি ক্ষতি.......

পিন্টুর কথা শেষ করতে দিলেন না শরীফ সাহেব। চেঁচিয়ে ওঠেন, ক্ষতি কি ? হ্যাঁ বলে কি! বলি তুই আগে পয়দা হয়েছিস, না আমি ?

বারান্দার একপাশে লোহার রড ওপরের টালির ছাদের সঙ্গে মিশেছে। সেখানে হেলান দিয়ে দাঁড়াল পিন্টু। আব্বার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে কলপারে তাকাল।

রোদে ভরে গেছে সামনের দোতলা বাসার দেয়াল। নারকেল গাছের পাতা রোদে বালুকণার মত জ্বলছে। শালিক পাখী দুটো নেই। কলের মুখে কাপড় জড়ানো, তা বেয়ে টিপ টিপ করে পানি পড়ছে নিচে রাখা গত রাতের হাড়িপাতিলের ওপর। এ্যালমিনিয়ামের ঢাকনীটার ওপর পানির চিন চিন শব্দ ওর মনে হলো নিজের মাথার ভেতরে যেন। অমনি করে ভেঙ্গে চৌচির হয়ে পড়বে মগজের পানিগুলো। কত আশা আকাঙ্ক্ষা বুকে অজান্তে বাসা বেঁধেছিল। তা যেন আজ ছিটে ফোঁটা হয়ে ছড়িয়ে যাবে।

ছোটবেলা থেকে ছবি আঁকার ঝোঁক। কাঠ কয়লা কিংবা ছোট ছোট লাল ইটের টুকরো দিয়ে দেয়ালে কত কি নাই আঁকতো। গাছপালা নদী মানুষ ঘরবাড়ী তার কি ছাই ঠিক আছে। নাওয়া নেই খাওয়া নেই, এঁকেছে শুধু। হালকা মেঘের মত লঘু পায়ে মনের আকাশে ঘুরে বেরিয়েছে জানা অজানায়। সন্ধ্যেবেলায় বারান্দায় পড়তে বসে আকাশের নানারঙের খেলা দেখে ভাবত অমনি রং ছড়াবে সেও তার কাগজে। বাবার টেবিল থেকে লাল কালো কালির দোয়াত দিয়ে নিজের খাতায় রং ভরিয়েছে।

কিন্তু কে জানত এই তার শেষ হবে, এমনি করে তার সমস্ত রংয়ের পরিণতি ঘটবে!

আব্বার নিষ্পন্দ চাহনীর সুমুখে উদ্ধতভাবে বেশীক্ষণ তাকাতে পারেনা সে। সব সাহস এক নিমেষে কর্পূরের মত উবে যায়। সমস্ত অনুভূতি, চিন্তা, কথা ভূমিকম্পের মত ওলটপালট হয়ে যায়।

চেঁচামেচি শুনে ইতিমধ্যে মা তাঁর রান্নাঘর থেকে উঠোনে এসে দাঁড়ালেন।

জিগগেস করলেন, কি হয়েছে ? এত সকালে ওকে বকছ কেন ?

পিন্টুকে একবার দেখে স্ত্রীকে উদ্দেশ করে চেঁচিয়ে বললেন, কি আর হবে ? তোমার ছেলের মাথায় ভীমরতি ধরেছে। ছবি আঁকবে, কচু করবে।

বলে তিনি আর দাঁড়ালেন না। তসবীটা হাতে নিয়ে ঘরে চলে গেলেন।

উঠোন থেকে আমিনা বিবি এসে দাঁড়ালেন বারান্দায়। পিন্টুর কাছে এসে বললেন, ছবি আঁকবি, হ্যাঁ বাবা একি কথা তোর ?

এধরনের প্রশ্নে বিরক্ত ও রাগ হলো পিন্টুর। তাঁর এধরনের না জানার ভান মেজাজকে বিগড়িয়ে দিল ওর। ভূরু কুঁচকে পাল্টা জিগগেস করল, বাহ্‌ আকাশ থেকে পড়লে যেন। আব্বা বলেননি আমাকে আর্ট ইস্কুলে পড়াবেন ?

পিন্টুর কথা শুনে নির্বাক হয়ে গেলেন আমিনা বিবি। খানিকখন একেবারে চুপ মেরে

গেলেন। রাবেয়ার মিনমিনে একটানা গলার আওয়াজ হঠাৎ ভয়ে থেমে গেল। হঠাৎ ঘরের ভেতব থেকে ছুটে বেরিয়ে এলেন শরীফ সাহেব।

বললেন, কিরে, কি শূয়োর ?

পিন্টুর গালে দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে চড় মারলেন। বললেন, হারামজাদা মাথা কিনে নিয়েছ না ? বলেছিলাম 'ত বলেছিলাম।

চড় খেয়ে কাঁদল না পিন্টু। আচমকা শুধু রডের সঙ্গে মাথায় একটা আঘাত পেল। হাত দিয়ে সে জায়গাটা ছুঁয়ে আব্বার দিকে তাকাল। সারা মুখ কেমন বিকৃত হয়ে গেছে তাঁর। কপালে বলির দাগগুলো আরো খাঁজ বেঁধে গেছে। মনে হয় আরো দশ বছর যেন এরি মধ্যে বেড়ে গেছে। অবাক হয়ে গেল পিন্টু।

শরীফ সাহেব আড়চোখে দেখলেন ছেলেকে। কি দেখছে এমন করে পিন্টু ? ইচ্ছে হলো আরেকটা চড় মারেন তিনি। যাতে সে চাহনী ভেঙ্গে খান খান করে দিতে পারেন। কিছুতেই সইতে পারছিলেন না।

পিন্টুর দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে ঘরের ভেতর চলে গেলেন শরীফ সাহেব।

মা ছেলের মাথায় হাত বুলালেন। বললেন, খামোকা দিলে'ত আব্বাকে চটিয়ে।

পিন্টু কথার জবাব দিল না। মাথা নিচু করে রইল।

আমিনা বিবি ফের বললেন, আমাদের ছবি আঁকতে নেই বাবা।

না নেই। কেন নেই ?

আল্লা বেজার হন। তাছাড়া বেহেশতে যায়গা হবে না।

হুঁ যতসব বাজে কথা। বেজার হন না ছাই হন।

পিন্টুর জবাব শুনে কথা খুঁজে পেলেন না তিনি। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। মুখটা বিশ্রীভাবে হা হয়ে পানখাওয়া কালো দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ল।

আজকালকার ছেলেদের কি ব্যারাম হয়েছে বুঝে উঠতে পারেন না তিনি। মুরুব্বী মানে না, মুখে মুখে কথা কয়। নির্বাক হয়ে যান তিনি। এসব কথা বলা গুনাহ্,শোনাও সর্বনাশ। মাথাটা বার কয়েক ডাইনে বাঁয়ে হেলিয়ে নিজের দুগালে গোটা তিনচার চড় মেরে বলেন, তৌবা, তৌবা। তৌবা কর বাবা। এসব কথা বলতে নেই।

তিনি ভাবতেই পারেন না মুসলমান ঘরের ছেলে কি করে মানুষের ছবি আঁকবে ? অবিকল চেহারা মিলিয়ে চেহারা। এ যেন খোদার সমকক্ষ হওয়া। ভাবতেই অজানা ভয়ে শিউরিয়ে ওঠেন তিনি। চোখজোড়া আপসেই বুঁজে আসে।

আমিনা বিবি কাঁদেন আর আঁচলে চোখ মুছেন।

বাবা তুই এত বুদ্ধিমান, তোর মুখে একি কথা ? এমন বেশরিয়তী কাফেরী কাজ করবি ? আর তাছাড়া আল্লা না চান ওনার কিছু হয় তাহলে'ত তোকেই তোর ছোট ভাইবোনদের মানুষ করতে হবে, বল ?

হ্যাঁ এটাই বলো এতোখন। আসল কথা এটাই। তৌমরা'ত শুধু টাকা চেন, আর কি বোঝ ?

তাছাড়া চিনবে কি শুনি দিকিন ? শুধু তর্কটাই'ত শিখেছিস। মুহূর্তকয়েক চুপ করে পিন্টুকে দেখেন। কেমন চোয়াড়ে চেহারা করে রয়েছে। তাঁরও ইচ্ছে হয় ওকে মারার। হোক না কেন ছেলে তাঁর বড় হয়েছে। মার কাছে ছেলে সবসময় ছেলেই। বড় হলেও কিছু যায় আসে না।

ধীর গলায় বলেন, টাকা না থাকলে বাবুর তেজ এতখন কোন চুলোয় যেত, তার ইয়ত্তা আছে ? চাকরী কর, তবে বুঝবি কত ধানে কত চাল। বাপের ওপর খাসত, বুঝিস না।

তবুও গজগজ করল পিন্টু, রাবুর'ত বারোটা বাজিয়েছ, এখন আমি।

শুনে রাগে থ মেরে গেলেন আমিনা বিবি। নিজেকে আর সামলাতে পারলেন না। পিন্টুর গালে সজোরে চড় কষিয়ে দিলেন।

চিৎকার করলেন, বেয়াদব, নালায়েক। এতখন তবে দেয়ালের সাথে কথা বলছিলাম, না? এমন ছেলের সাথে কথা বলতেও জাতমান থাকে না। ঘেন্না হয়।

হ্যাঁ বেয়াদপইত'। ঘেন্নাত' হবেই। কথা না বললেও পারো। কথা আছে না, সত্যি কথা বললে বাপেও বেজার।

ঘর থেকে তাড়া খাওয়া মোষের মত ছুটে এলেন শরীফ সাহেব।

কি, কি, বললি?

পিন্টু আর দাঁড়াল না। বারান্দা থেকে নেবে সোজা বাইরে বেরিয়ে গেল। সদর দরোজায় চটের তালি দেয়া দোদুল্যমান পর্দার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন শরীফ সাহেব। যেন কোন শত্রুকে চ্যালেঞ্জ করছেন, শূয়োরের বাচ্চা, আর যদি এ বাড়ীতে ঢুকিস তবে ঠাং ভেঙ্গে দেব।

নিজের স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলেন, এ আমার ছেলে না, কক্ষনো না।

আমিনা বিবি রাগে ক্ষোভে কেঁদে ফেললেন। রাবেয়া মাথা নিচু করে পাটির বুনুনীতে নখ খুঁটতে লাগল। চোখ জোড়ায় পানিতে ভেসে যায়। কোরানের অক্ষর ঝাপসা হয়ে ওঠে।

সারাটা দিন ঘুরল পিন্টু। শহরের রাস্তায়, নদীর ধারে পার্কে—সব জায়গায় ঘুরেও বিরাম পেলনা। এক অস্থিরতা তাকে চঞ্চল করে তুলল। ঘর থেকে, রাগ হয়ে যখন বেরুল তখন আব্বা আম্মার প্রতি হয়েছিল ভীষণ অভিমান। তার সব আশা যে এমনি করে বাতাসে মিলিয়ে যাবে আদৌ কল্পনা করতে পারেনি। এখন ভাবতে গেলেই সব ভাবনা কান্না হয়ে চোখের মাঝে জড়ো হতে চায়। আব্বার হঠাৎ করে মত পাল্টানো সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারেনা। চেষ্টা করেও কোন সুরাহা পায়না। শুধু এটুকু জানে, আব্বা তার কথার নড়চড় করবেন না। ভাবতেই বুকটা ভেঙ্গে যেতে চায়। তার চেয়ে এই ভাল, আর সে মাথা ঘামাবে না। দরকার নেই। থাক। না পড়িয়ে যদি আব্বা শান্তি পান, তবে পাক।

ঘরে যখন ফিরে এল তখন সামনের দোতলার কার্নিশে রোদ শুয়ে আছে। সূর্য ঢেকে গেছে অন্য পাশের উঁচু ছাদের আড়ালে। বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে রইল পিন্টু। হাতটা পেছনে টান করার সঙ্গে সঙ্গেই কাঁধের কাছে ফেঁসে যাবার শব্দ পেল। একবার দেখার চেষ্টা করে ফের কাত হয়ে রইল। চোখের পাতায় যেন মাকড়সা জাল বুনেছে। ক্লান্তি জড়ো হয়ে বাসা বাঁধছে। ঘুমের ঘোরে শুনল রাবেয়া ডাকল। জবাব দিতে তার মোটেই ইচ্ছে করলনা।

রাবেয়া হাত দিয়ে মৃদু ঠেলে বলল, ভাইয়া ভাত খাবে?

না। জোরে একটা শ্বাস টেনে জবাব দিল পিন্টু।

মুহূর্ত কয়েক দাঁড়িয়ে চলে যাচ্ছিল রাবেয়া। পিন্টু তার পায়ের শব্দ শুনে বলল, রাবু চা দিতে পারবি? মাথাটা ভেঙ্গে যাচ্ছে।

টিপে দেই ভাইয়া?

ঘাড় কাত করে দরোজার সুমুখে দাঁড়ান রাবেয়াকে দেখল পিন্টু। বলল, দিবি? না' থাক।

আবার পাশ ফিরে শুয়ে রইল সে।

শুয়ে শুয়ে মনে হলো পিন্টুর, ওর কপালে মাকড়সা হেঁটে বেড়াচ্ছে। চোখ মেলতেই দেখল

রাবেয়া দাঁড়িয়ে।

হাসল পিন্টু, কিরে ?

চা এনেছি, খাবে না ?

উঠে বসে সবে চায়ের কাপটা হাত বাড়িয়ে নিতে শরীফ সাহেব ঘরে ঢুকলেন। আব্বাকে দেখে চমকে উঠল রাবেয়া। কাপ থেকে চা ছলকে নিজের গায়ে পড়ল। পিন্টু বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াতে যাবে শরীফ সাহেব কান ধরলেন।

কিরে হারামজাদা খুব যে তেজ দেখিয়ে বেরিয়ে গেলি ? জানি তেজ কমলেই কুকুরের মত আসতে হবে।

নিস্পন্দ চোখ জোড়া আব্বার দিকে মেলে ধরল পিন্টু। বারকয়েক ঢোক গিলে বলল, আব্বা আমি ছবি আঁকা শিখবো না।

কানটা ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন তিনি। কপাল কুঁচকে পিন্টুকে বারকয়েক নিরীক্ষণ করে বললেন, মানে ?

আপনি যা বলবেন তাই পড়বো। বলতে গিয়ে গলা ভিজে এল পিন্টুর। শরীফ সাহেব চমকে উঠলেন। কেমন ভয় পেয়ে গেলেন তিনি। আবার তাঁর মনে হলো জীবনে এবারও তিনি হেরে গেছেন। ফতুর হয়ে গেছেন একেবারে।

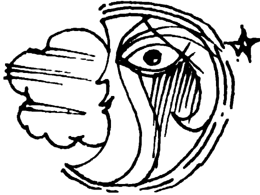
শরীফ সাহেবের কান্না বুক ঠেলে উপরে কেবলি আসতে চায়। প্রাণপণে তা তিনি দমিয়ে রাখতে গিয়ে মুখটা বিকৃত করে ফেললেন।

আব্বার মুখের দিকে নির্নিমেষ ভাবে চেয়ে থাকে পিন্টু। তারপর মাথা ঘুরিয়ে দেয়ালের দিকে তাকাল। কি বিশ্রী ফাটল ধরছে কোণের দিকটায়। বেশ কিছু চুণসুরকী খসে গেছে তার পাশ দিয়ে। কয়েকটা বিবর্ণ ইট বেরিয়ে সেই ফাঁক দিয়ে।

শরীফ সাহেবের মুখের দিকে তাকাল পিন্টু। কিন্তু কিছুতেই আব্বার চেহারা সে দেখতে পেলনা। বারবার চেষ্টা করেও পারলনা। মনে হলো সে দেয়াল দেখছে।

সেই বিবর্ণ দেয়ালে ফাটল ধরেছে।





মাইথর

হালিমা খাতুন

সেদিন সন্ধ্যার কিছু আগে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলাম। সামনে তাকিয়ে দেখি পাঁচিলের ধারে একটা বেড়াল বসে আছে। ভাবলাম বেড়ালটা কাদের। 'ইয়েতি' নয়তো। ইয়েতি পাশের বাড়ীতে থাকে। বেশ আরামেই থাকে। কারণ, ওর বাবার ঐ একটা বেড়াল ছাড়া আর কিছু নেই। অনেক কাল আগে নাকি তাঁর একটা কুকুর ছিল। সেটা হারিয়ে যাবার পর তিনি নাকি আর কুকুর পোষেননি। একটা নাকি ময়না পাখি পুষেছিলেন, সে উড়ে পালিয়ে গিয়েছিল ইয়েতিকে আনার অনেকদিন আগে।

থাকগে, সে সব কথা। তবে আমি ভাবলাম ইয়েতি যদি হয়, ওকে ডেকে ঘরে পাঠিয়ে দিই। আমি ডাকলে বোধ হয় ও আসবে। কারণ ও আমাকে চেনে। যুদ্ধের সময় ওর বাবা যখন অন্যখানে চলে যান, ও আমাদের কাছে থাকতো। ডাক দিলাম—ঃ ইয়েতি—ইয়েতি।

ডাক শুনেও নড়েনা দেখে কাছে গেলাম। ওমা, দেখি কি বেড়াল না। খানিকটা সাদা কাগজ আর অন্ধকার। ভাবলাম বেশ মজাতো! আমি এখন পড়ার টেবিল থেকে একটা সাদা কাগজ নিলাম আর আলমারী পিছন থেকে কিছুটা অন্ধকার—এদিয়ে বেড়াল হবে কিনা ভাবতে ভাবতেই একটা সুন্দর বেড়ালছানা হয়ে, মিউ মিউ করে ডাকতে লাগল।

বিড়াল ছানাটার একটা নাম রাখা দরকার। ভেবে মনে মনে নাম খুঁজতে লাগলাম। বেড়ালদের নামের খুব অভাব। সবখানে 'মিনি' নয়ত 'পুষি'। এ সব নাম আমার ভাল লাগেনা। অনেকে কুকুরের নাম রাখে 'টাইগার'। বিড়াল যদিও বাঘের মাসী। তাকে কেউ কখনও টাইগার নামে ডাকেনা। অন্য কি নাম রাখা যায়। ফুল বা পাখির নাম বিড়ালকে মানাবেনা। তা হলে কি ওকে 'হিপো' বলে ডাকবো। না 'গণ্ডার'! শেষ পর্যন্ত 'মাইথর' বলে ডাকব ঠিক করলাম। নামটা ওর পছন্দ হল কিনা দেখবার জন্য ডেকে বললাম ঃ মাইথর, মাইথর, নাম পছন্দ হয়েছে?

মিউ মিউ করে সাড়া দিল মাইথর। কিন্তু তাকিয়ে দেখি বিড়াল নয়, সামনে একটা খরগোস দাঁড়িয়ে ভয়ে কাঁপছে। লাল চোখ দুটো পানিতে চিক চিক করছে। ভাবলাম মাইথরকে দেখে ভয় পেয়েছে খরগোসটা। আর ওটা বোধ হয় নীলিমদের। কারণ 'পিটার র‍্যাবিট' এর গল্প পড়ার পর থেকেই নীলিম আর মিতি খরগোস কিনে দেবার বায়না ধরেছিল। আমার যদিও খরগোসের

গল্প ভাল লাগে, সত্যি খরগোস ভাল লাগেনা। কারণ ওরা সব গাছ খেয়ে ফেলে আর ঘরে বন্ধ করে রাখলে ঘর নোংরা করে।

এসব ভাবছি, এমন সময় খরগোসটা বলল ঃ আপনি আমাকে 'মাইথর' বলে ডাকছেন কেন ? আমার নামতো 'পিটার'।

ঃ পিটার, তা বেশ। তুমি কি 'পামকিন ইটার' না 'ইলেকট্রিক গীটার' ?

ঃ ওসব আমি কিছুই না। আমি শুধু এক খরগোস।

ঃ তুমি যদি খরগোস হও, আমার বেড়াল কোথায় গেল ?

ঃ বেড়াল তো ছিলনা। তা যাবে কোথায় ?

ঃ বেড়াল না থাকলে, মিউ মিউ করে ডাকল যে !

ঃ মিউ মিউ করে যে কেউ ডাকতে পারে। আপনিও পারেন।

ঃ তার মানে তুমি কি বলতে চাও, আমি একটা বেড়াল ?

ঃ কখনও না। আর তা হলে আমি এখানে থাকতেই পারতাম না। ওরা যা হিংসুটে। খরগোস দেখলেই ওরা কামড়াতে আসে।

ঃ বেড়ালদের সম্পর্কে তোমার ধারণাটা খুব খারাপ।

ঃ তা হতে পারে।

ঃ বেশতো কথা শিখেছ। তা তোমাকে নিয়ে আমি কি করব ?

ঃ কিছু করতে হবেনা। দরজাটা খুলে দেন, আমি চলে যাই।

ঃ তা না হয় দিলাম, কিন্তু আমার বেড়াল ?

ঃ ঐ আসছে।

বলতে বলতে খরগোস উধাও হল খোলা দরজা দিয়ে।

একটু পরেই একটা সিগারেটের প্যাকেট চিবোতে চিবোতে ঘরে ঢুকলো কালো-সাদায় মেশানো হাওয়াই সার্ট গায়ে এক ছাগল। ভাল করে শিং গজায়নি ছাগলটার। দেখতে বেশ হরিণ হরিণ চেহারা। ছাগলদের আমি বেশ পছন্দ করি। ছোটবেলায় আমার একটা আদুরে ছাগলছানা ছিল। ওর মার অসুখের সময় আমি ওকে শিশিতে করে দুধ খাওয়াতাম। তারপর থেকে ও আমার কাছে কাছে ঘুরতো।

আমি ওকে অনেক খেলা শিখিয়েছিলাম। এমনকি মুখ দিয়ে পেন্সিল ধরে ও শ্লেটে দাগ দিতে শিখেছিল। আর একটু বড় হলে ওকে আমার অংক শেখাবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু তা আর হয়নি, আমাকেই অংক আর ইংরেজী শেখাবার জন্য শহরে চালান করে দেওয়া হয়েছিল। অংকের শিংয়ের গুঁতো খেতে খেতে আমি আমার ছাগল ছানার কথা ভুলে গিয়েছিলাম।

ছাগলটা দেখি আমার কাছে ঘেঁসে এসে দাঁড়াল। তারপর সালাম করে বলল

ঃ আমাকে চিনতে পারছেন ?

ঃ চেনা চেনা ঠেকছে। ভাল করে চিনতে পারছিনা। নামটা বলতো ?

ঃ আমার নাম লম্বকর্ণ। পরশুরাম আমাকে মানুষ করেছেন। ছোটবেলায় আমার মা মারা যায়। আমাকে শিশিতে করে দুধ খাওয়াতেন পরশুরাম।

ঃ সে তো আমি।

ঃ আমি ওতো তাই বলছি।

ঃ তা আমার নাম তো পরশুরাম নয় !

ঃ তাহলে আপনার নাম কালশ্যাম।

ঃ তুমি যে কি বলছ তার মাথা মুণ্ডু নেই। আমি ওসব হতে যাব কেন ? আমি তো আমি।

ঃ আমিও তাই বলছি। আপনি আপনিই। আর আমার ছোট বেলার মনিব।

ঃ তা বেশ। এখন থেকে তোমার নাম মাইথর। তোমাকে দিয়ে আমি একটা চিড়িয়াখানা শুরু করব।



ঃ আমার ইচ্ছে ছিল সার্কাসের দলে যাওয়ার। তা আপনি যখন বলেছেন, আমি চিড়িয়াখানায় চাকরী করতে পারি। তবে বাঘ, ভালুক-টালুক আনবেন না। ওরা মানে ওদের আমার বড় ভয় করে। যত পড়ালেখা শিখুকনা কেন ওরা পশুই থেকে যায়।

ঃ লেখাপড়া তুমিও বেশ শিখেছ দেখছি। তা ঐ সিগারেটের প্যাকেট খাওয়া তোমার ছাড়তে

হবে।

ঃ তা আমি ছেড়ে দিতে পারি। ওটা ছেড়ে পান ধরব।

ঃ না, তা চলবেনা।

ঃ তাহলে চীনাবাদাম খাবো।

ঃ সে মাঝে মাঝে খাবে বৈকি।

ঃ না রোজ আমার পাঁচ সের করে খোসা ছাড়ানো চীনাবাদাম লাগবে।

ঃ নিজে পাইনা চীনাবাদাম খেতে আর তোমাকে পাঁচ সের করে চীনাবাদাম আমি কোথা থেকে দেব ?

ঃ তা হলে আমি চললাম।

ঃ কোথায় চললে ?

ঃ পিকিং।

ঃ সে কোথায় ?

ঃ চীন দেশে।

ঃ কেন যাবে সেখানে ?

ঃ চীনা বাদাম খেতে।

ঃ যেতে চাইলেই যাওয়া যাবে ? পাসপোর্ট লাগবেনা ?

ঃ লাগবে। দোকান থেকে একটা কিনে নেব।

ঃ দোকান থেকে নেবে ? জিনিষটা কি জানো তুমি ?

ঃ নিশ্চয়ই জানি। ফটো লাগানো থাকে। আমি আগে ফটোর দোকানে কাজ করেছি। অনেক ফটো তুলেছি তখন। আর নেগেটিভ যা খেয়েছি তখন। খুব মজা লাগে। চিবোতে ঘুম এসে যায়। আর ঘুমোলেই নেগেটিভগুলো সব ছবি হয়ে যায়।

ঃ তা হোক। তুমি যেওনা।

ঃ আমার যে টিকিট কাটা হয়ে গেছে।

ঃ কাটা টিকিট দিয়ে কেমন করে যাবে ?

ঃ যেমন করে হোক যাবই। এ দেশে থেকে কি লাভ ! ঐ যে তোমার মাইথর আসছে, দেখ সামনে তাকিয়ে।

সত্যিই সামনে তাকিয়ে দেখি মাইথর মিটিমিটি হাসছে। কাঁধে তার একটা ক্যামেরা, বললাম ঃ কোথায় গিছিলি ?

ঃকোথাও না।

ঃ মানে ?

ঃ এখানেই ছিলাম।

ঃ তাহলে পিটার র‍্যাবিট লম্বকর্ণ ওসব কে ?

ঃ আমার তোলা ছবি।

ঃ তোর তোলা ছবি। আর তুই কে ?

ঃ আমি কে তাতো জানিনা।

ঃ তা হলে তুই ব্লাকশিপ। মানে কালো ভেড়া। ব্যা ব্যা ব্ল্যাকশিপ। বেড়াল, কুকুর, ছাগল কাউকে আমার দরকার নেই। তোর গায়ে উল হবে। সেই উল দিয়ে আমি কম্বল আর সোয়েটার বানিয়ে বিক্রী করব। তারপর বড়লোক হবো।

ঃ তুমি তো বড়লোক। তুমি তো আমার চেয়ে অনেক বড়।

ঃ বড়লোক কি, তা তুই জানিস ?

ঃ খুব জানি। বড়লোকরা খালি রোগা হতে চায়, কিন্তু হয়ে যায় মোটা গোলগাল ফুটবল। ওদের পেটের মধ্যেই কাপড় চোপড় রাখা যায়।

ঃ তুই বড় বেশী কথা বলছিস।

ঃ তাহলে তুমি বল বেশী কথা। আমি শুনি।

এই কথা বলে মাইথর একটা গাধা হয়ে গেল। ছবিতে ছাড়া আমি আর কোথাও গাধা দেখিনি। লোকে ওদের কেন বড় বোকা বলে, তাও জানিনা। ওরা ত শুনেছি সারাক্ষণ বোঝা বয়ে বেড়ায়। বোকামী কখন করে জানিনা। যাকগে সত্যি একটা গাধা যখন পাওয়া গেল, ওকে দিয়ে কিছু কাজ করিয়ে নেওয়া যাবে। ওকে আমি রমনা পার্কে নিয়ে যাব রোজ বিকেলে। ওর পিঠে চড়বার জন্য একটা টিকিট ছাপিয়ে নেব, চার আনা করে। ঢাকায় কেউতো গাধা দেখেনি। কাজেই সবাই গাধায় চড়তে চাইবে। তখন আমার অনেক টাকা হবে। অনেক টাকা হলে আমি একটা সার্কাস কোম্পানী খুলব। তানাহলে একটা ছোট ন্যাশনাল পার্ক বানাবো।

গাধারা কি খায়, দাঁড়িয়ে ঘুমায় না শুয়ে ঘুমায়। এসব কিছুই আমি জানিনা। কিন্তু এসব তো ওকে বলা যায় না।

একদিন বাজারের থলের মধ্যে আমি একটা জ্যান্ত কাঁকড়া পেয়েছিলাম। সেটাকে আমি হাত ধোয়ার বেসিনের মধ্যে পানিতে রেখেছিলাম। ভেবেছিলাম কাঁকড়াকে পুষবো। তখন সমস্যা হয়েছিল কাঁকড়ার খাবার নিয়ে। কাঁকড়া কি খায় তা আমি জানতাম না। অভিধানে দেখেও কিছু পেলামনা। বিশ্বকোষ খুঁজতে খুঁজতে এক দিন লেগে গেল। কাঁকড়াটা শেষকালে মরেই গেল।

কয়েকজনের কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলাম তারা হেসেছিল। পরে জেনেছি, কাঁকড়া মাটি খায়।

এখন গাধাকে নিয়ে কি করা যায়, সেটাই ভাবছিলাম। আমাকে ভাবতে দেখে গাধা বলল—

ঃ তা ভাবছেন কি ? আমি সব খাই। ভাত ডাল শাক-শব্জী সবই খাই। মিষ্টিও খাই। আখরোট, আঙ্গুর, পেস্তা, বাদাম, আপেল আম, লেবু, কমলা, আতা, বেল, ক্যাবেল, ফুলকপি, বাতাবী ...

ঃ বাপরে বাপ, থামো থামো। তোমার লিষ্ট দেখি পাগল করে দেবে। এখন বল তোমাকে রাখব কোথায় ?

ঃ কেন আপনার গ্যারাজ নেই ?

ঃ আছে, তবে পানি পড়ে।

ঃ পানি আমি খেয়ে ফেলব। সেজন্য ভাববেন না। শুধু আমার একটা ঘুমের ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

ঃ কি রকম ?

ঃ গান না শুনলে আমার ঘুম আসে না। তাই রোজ ঘুমাবার আগে আমাকে কিছু পপ গান শোনাতে হবে।

ঃ কে শোনাবে ?

ঃ কেন আপনি ?

ঃ আমি তোমাকে পপগান শোনাব ! জানো গানের জন্য আমাকে কত বাড়ীওয়ালা নোটিশ দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে।

ঃ তাহলে তো ভাল হবে। ওরকম গান শুনলেই আমার ঘুম এসে যায়।

ঃ তোমার ঘুমতো আসবে ঠিকই, কিন্তু আমাকে যে বাসা ছেড়ে দিতে হবে।

ঃ দেবেন।

ঃ তা হলে আমি যাব কোথায় ?

ঃ কেন আমার পিঠে বসে থাকবেন। তারপর যেখানে বাড়ী খালি পাওয়া যায়, আমি আপনাকে নিয়ে যাবো।

ঃ তারপর তোমার ঘুম আর আমার গানের কি হবে ?

ঃ হবে।

ঃ কি হবে ?

ঃ রেকর্ড হবে।

ঃ রেকর্ড হবে !

ঃ হ্যাঁ।

ঃ কে করবে ?

ঃ গ্রামোফোন কোম্পানী।

ঃ তাহলে তো ভাল হবে।

ঃ বেশ তাহলে উঠে পড়ুন।

ঃ এখন ?

ঃ এখন।

ঃ আমার যে অনেক হোম টাস্ক্ বাকী, কাল স্কুল।

ঃ হোম টাস্ক করে কি হয় ! স্যার তো না দেখেই সই করে দেন।

ঃ কে বলেছে তোমাকে ?

ঃ আমার মা।

ঃ তোমার মা ?

ঃ হ্যাঁ আমার মাকে স্যার বলেছেন, অত খাতা দেখার সময় হয়না তার।

ঃ তাহলে কাজ দেন কেন ?

ঃ দিতে হয়, তাই দেন।

ঃ তুমি তো অনেক কিছু জানো।

ঃ আরও নাচতে জানি। ছবি আঁকতে জানি। ভলিবল খেলতে পারি। ক্রিকেট, ব্যাডমিণ্টন সব পারি।

ঃ আমি ও তো পারি। কিন্তু কারু তো খেলার সময় নেই। সবাই ব্যস্ত।

ঃ আমিও !

ঃ কিসের জন্য ব্যস্ত ?

ঃ রেডিও প্রোগ্রাম। টিভি প্রোগ্রাম। এই সব।

ঃ আমি ভেবেছিলাম অন্য কিছু। তা তোমার তো ওখানে চেনাশোনা আছে, যদি আমাকে সাথে করে নিয়ে একটু বলে দিতে তাহলে আমাকেও প্রোগ্রাম দিত ওরা। প্রোগ্রাম পেলে আমিও শিল্পী হয়ে যেতাম। তখন আর বাড়ীওয়ালারা আমাকে বের করে দিতনা বাড়ী থেকে। বরং সমীহ করে চলতো।

ঃ তোমার তো বেশ বুদ্ধি দেখছি।

ঃ বুদ্ধি তো ছিল, কেবল কাজে লাগাতে পারছিনা।

ঃ লাগালেই হয়। দেখনা আমি কেমন দুটো কান লাগিয়ে নিয়েছি।

ঃ তার মানে ?

ঃ তার মানে আমি একটা ঘোড়া। এদেশে একটু লোকের চোখে পড়ার জন্য দুটো কান লাগিয়ে নিয়েছিলাম বুদ্ধি করে। ইচ্ছে করলে, কান দুটোকে আমি ঘোড়ার কানের মত ছোট করে ফেলতে পারি। চেহারাটাও ঘোড়ার মত করতে পারি।

ঃ কর দেখি।

ঃ তা হলে এতটুকু জায়গায় হবেনা। বাইরে যেতে হবে।

'চল' বলে ওকে নিয়ে মাঠে গেলাম।

তাকিয়ে দেখি সাদা একটা ঘোড়া। এক কালে স্বাস্থ্য তার ভালই ছিল মনে হয়। এখন একেবারে হাড় জির জিরে পক্ষীরাজ।

তারপর বলল সে

ঃ দেখছো তো আমার আসল চেহারা!

ঃ তাই গাধা হয়ে থাকি। তা এখন আমার যেতে হবে।

ঃ কোথায় ?

ঃ একটা মিটিং আছে।

ঃ মিটিংয়ে কি যাবে, থাকো এখানে!

ঃ না গেলে হবেনা, আমি যে সভাপতি—

এই বলে গাধা আবার গাধা হয়ে চলে গেল। তার গায়ে তখন লম্বা হাতাওয়ালা পাঞ্জাবী জামা আর পরনে ফুল প্যান্ট। চোখে তার ইংরেজী চশমা। আস্তে আস্তে সে মিলিয়ে গেল।

'সরে দাঁড়ান' 'সরে দাঁড়ান' 'সাবধান' 'সাবধান' শব্দগুলো শুনে আমি তাড়াতাড়ি পাঁচিলের পা ঘেষে দাঁড়ালাম। ডোরাকাটা ছিটের জামা পরে ঢুকলো এক জেব্রা। একদম ছবির মত দেখতে। এত কাছে এতবড় জেব্রা কখনো দেখিনি। ভয় ভয় লাগলো একটু। কামড়ে দেয় অথবা লাথি কিংবা গুঁতো যদি দেয়। পাঁচিল বেয়ে উঠবো নাকি।

ঃ ভয় পাবেন না, আমি আপনাকে চিনি।

ঃ কেমন করে ?

ঃ ইংরেজী বইয়ে জেড্ এর জায়গায় আমার ছবি আছে। তার উপরে পাতলা কাগজ রেখে আপনি যখন আমাকে এঁকেছিলেন, তখন থেকে আমি আপনাকে চিনি। তারপর একবার দেখা হয়েছিল মীরপুর চিড়িয়াখানায়।

ঃ তা বেশ এখন কোথা থেকে এলে ? কেমন করে এলে ? আর যাবেই বা কোথায় ?

ঃ এলাম অন্ধকার থেকে যাব আলোতে।

ঃ বেশ সুন্দর কথাতো। দাঁড়াও, আমার নোটবুকে লিখে নেব।

ঃ আরো অনেক সুন্দর কথা আমি জানি। সে সব লিখতে গেলে আপনার খাতা ফুরিয়ে যাবে। তার চেয়ে বরং মনের খাতায় লিখে নিন। সেখানে কাগজের অভাব নেই।

ঃ আরে, এটাও তো একটা সুন্দর কথা!

ঃ দেখেন না, আমার গায়ে আরো কত সুন্দর কথা লেখা আছে।

ঃ তার মানে তুমি আমাকে পড়তে বলছো ?

ঃ না পড়লে, জানবেন কেমন করে ?

ঃ টেলিভিশন দেখে জানব।

ঃ সেটা আবার কি জিনিস ?

ঃ একটা বাক্স। যার গায়ের ছবিতে সব দেখা যায়।

ঃ বুঝেছি। চকলেটের বাক্স। আমি দেখেছি চিড়িয়াখানায় অনেক বাচ্চারা চকলেটের বাক্স নিয়ে যেত। চকলেট ফুরিয়ে গেলে সেই বাক্সের মধ্যে তারা অনেক কিছু রাখে।

ঃ কিছু বোঝনি তুমি। টেলিভিশন মোটেই চকলেটের বাক্স নয়।

ঃ বারে, আপনিই তো বল্লেন, যে বাক্সের গায়ে ছবি থাকে, তাকেই টেলিভিশন বলে।

ঃ বলেছি তাই। কিন্তু তুমি বুঝতে পারোনি। আসলে তোমরা বনে থাকো এসব শহুরে জিনিস দেখবে কোত্থেকে ?

ঃ তা হোকগে। আপনি আমাকে বুঝিয়ে দেবেন না আর আমাকে বুনো বলছেন।

ঃ না, না, তুমি বুনো হবে কেন ? তুমি কত সুন্দর সুন্দর কথা বলো। আমি বরং তোমার গায়ের কথাগুলোর একটা ছবি তুলে নেই। দেখি মাইথর কোথায়, তার কাছে তো একটা ক্যামেরা ছিল।

'মাইথর' 'মাইথর' বলে ডাক দিলাম। 'ইয়েচ্ চার' বলে মাইথর সামনে এসে দাঁড়ালো। বললাম ঃ লেখাপড়া কদ্দুর শিখেছ ?

ঃ চার, বি এচ · চি পাশ করেছি।

ঃ বেশ তোমার ক্যামেরাটা কোথায় ?

ঃ ক্যামেরাটা দিয়ে কি করবেন চার ?

ঃ জেব্রার গায়ের লেখাগুলোর ছবি তুলতে হবে।

ঃ 'তুলা' হয়ে গেছে, ওয়াস করতে দিয়েছি।

ঃ ছবি আগেই কেন তুলেছ বলতো ?

ঃ আমি তো এম · এচ · চি পড়ব। তখন লাগবে যে।

ঃ বেশ করেছ, তোমার বেশ বুদ্ধি আছে। এখন জেব্রার একটা থাকার ব্যবস্থা কর দেখি।

ঃ ব্যবস্থা তো হয়ে গেছে. ওকে তো ওয়াস করতে দেওয়া হয়েছে।

ঃ এই মাত্র যে এখানে ছিল।

ঃ ছিল। এখন নেই।

ঃ তা কেমন করে হয়। আমি তো মীরপুর পাঠিয়ে দেব ভেবেছি। ওর ঘরের সামনে আমার নাম লেখা থাকবে তা আর হোলনা।

মনটা খারাপ হয়ে গেল। বললাম

ঃ মাইথর, একটা গান কর।

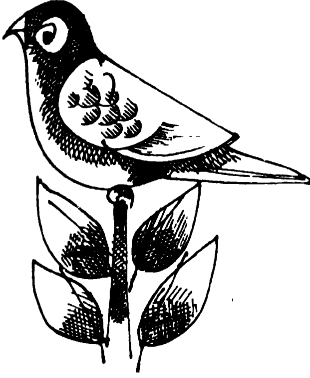
দেখলাম মাইথর কোথাও নেই। সামনে একটা সাদা কাগজ পড়ে আছে।

ওদিকে নীলিম গান করছে।

"মানুষও বানাইয়া
খেলছো যারে লইয়া
সে মানুষ ও কেমনে গোনাগার।"

আমি যেন শুনতে পেলাম

"বিড়াল ও বানাইয়া
খেলছো যারে লইয়া
সে বিড়াল কেমনে অন্ধকার।"



রুরুর স্বপ্নওয়ালা

সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

লোকটার আসার শব্দ অনেকক্ষণ আগে থেকে পাওয়া যায়। ছড়ের টানে শব্দ ওঠে ওর ছোট্ট দুতারের বাজনাটা থেকে। মাথায় একটা ঝাঁকায় অনেক গুলো বাজনা। আর হাতে একটা। হাতেবটা দিয়ে ও সুর তোলে। ভারি মিষ্টি সুর। মিষ্টি হলে কি হবে সুবটায় একটা কান্না মেশানো থাকে। ঠিক কান্না পায় না, কিন্তু! কষ্ট হয়।

রুরু একলা জানলার ধারে বসে থাকে। ওর বাবা মা দুজনেই কাজে বেরিয়ে যান। বাবা মারা কেন কাজে যান, কী কবেন রুরু কিচ্ছু বুঝতে পারে না। বাবা বাড়িতে থাকলে কত মজা হয়। বাবা ওকে কাঁধে চড়িয়ে নিয়ে গান গাইতে গাইতে দুলতে থাকেন। রুরু কাঁধের ওপরে দোলে। ওর হাতের কাছে কত কি জিনিস এসে যায়। আলমারির ওপর বনসাই করা গাছটা। হাজার রকমের হাতি, ফুলদানির ফুল সব। কিন্তু রুরু ওসব কিছুতেই হাত দেয় না। ওর তো একটু ভয়ও করে তাই বাবার চুল আঁকড়ে ধরে বসে থাকে। যাতে কোনওক্রমেই ও পড়ে না যায়। আর খুব ভাল লাগে। তোমরাই বল, বাবার কাঁধে চড়তে কার না ভাল লাগে? বাবা গল্প পড়ে শোনান, গল্প বানিয়ে শোনান, কবিতা আবৃত্তি করে শোনান। বাবা মানেই হইচই বাবা মানেই আনন্দ।

কিন্তু মার কথাই বোধহয় আগে বলা উচিত ছিল। মাকে দেখলেই রুরু একদম খুশি হয়ে যায়। ওর কোন দুঃখের কথা মনে পড়ে না। সারা দুপুরটা একলা থাকার কষ্ট কোথায় উধাও হয়ে যায়। তখন শুধুই খুশির হাওয়া। তোমাদের মার কথা তো রুরু জানে না, কিন্তু রুরুর মা কখনও একদিনে রুরুকে এক নামে দুবার ডাকেন না। রুরুর কত নাম রুরু, রুরাই, রুরুসোনা, সোনামনি, ধনমনি, রুরুমনি, খোকনসোনা থেকে শুরু করে হাবলু, গুবলু, টুবলু! নামের কোন সীমা সংখ্যা নেই। আর কখনও কোন কারণ নেই, মা কোলে তুলে নিয়ে অ্যাতো অ্যাতো আদর করেন। সে সময় রুরুর খুব ভাল লাগে।

কিন্তু সেসব তো শুধুই ছুটির দিনে। অন্যদিনে রুরু ভোরবেলা ইস্কুল যায়। বাবা পৌঁছে দিয়ে আসেন। ওর স্কুল যখন ছুটি হয় তখন বেরিয়ে দেখে বকুলদি দাঁড়িয়ে আছে। বকুলদি খুব সাঙ্ঘাতিক লোক। বাবাকে ছোট দেখেছে। বাবাও তাঁর বকুলপিসির মুখের চোটে কাবু হয়ে যান। আর ছোট্ট রুরু—সে কী করে বকুলদিকে সামলাবে। বাড়িতে ফিরে আসে বকুলদির সঙ্গে! বকুলদি শক্ত করে হাত ধরে থাকে। এ ছাড়াও বকুলদিকে নিয়ে একটা অসুবিধে আছে। ইস্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে সারা রাস্তা বকুলদি রাজ্যের মানুষকে বকতে বকতে আসে।



বকুলদির ধারণা সবাই রুরুর পা মাড়িয়ে দিতে চায়, রুরুকে ধাক্কা দিতে চায়। সুতরাং বকুলদি সারা রাস্তা বলতে বলতে আসে—'হ্যাগা ও ভালমানুষের ছেলে, ভগবান তো দুটি চক্ষু দিয়েছেন, সেগুলি দিয়ে একটু দেখলে কোন ক্ষতিটা হয় শুনি? দেখছ একটা দুধের বাচ্ছাকে নিয়ে চলেছি। বুড়োমানুষকে না হয় নাই রেয়াত করলে, দুধের বাচ্ছাটাকে একটু বাঁচিয়ে চল। এখুনি তো বাছার আমার পা মাড়াচ্ছিলে।' রুরুর লজ্জা করে। বলে, বকুলদি, তুমি কেন অমনি করে বলছ?

ব্যস, বকুলদি বলবে, চোপ। কোন কথা বলবি না। জানিস, তোর বাবাকে আমি ইস্কুল থেকে আনতাম। তোর বাপের ঠাকুর্দা আমি তাঁকে বাবা বলতাম, তখন বেঁচে। আমায় বলে দিয়েছিলেন সাবধানে আনবি আমার নাতিকে। তুই তোর বাবার চেয়ে সেয়ানা। সে না হয় এখন পণ্ডিত হয়েছে, তবু আমাকে কিছু বলে দেখুক না?

বাড়ি এসে বকুলদি ওকে প্রথমে দুধ খেতে বাধ্য করে। একদিন সামান্য একটু দুধ একটা

বিড়ালকে খাইয়েছিল রুরু। বকুলদি জোর করে দু-গ্লাস দুধ খাইয়েছিল সেজন্য। তারপর স্নান, তারপর খাওয়া। প্রায় বেত হাতে নিয়ে বসে থাকে বকুলদি। 'খাও' ফেল না। বলি বাবা মা তো কত খরচা করে তোমার জন্যে, তার বদলে তো শরীরটা একটু ভাল করতে পার। এই প্যাকাটি শরীর আমার দেখতে ভাল লাগে না।

খাবার পর বকুলদি নিজে খায়। খায় তো ছাই। খাবার নিয়ে বসে মাত্র। তারপব বলে, দাদু ভাই, এবার ঘুমিয়ে পড়। বলে, নিজে শুয়ে পড়ে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই একদম ঘুমিয়ে কানা হয়ে যায়। সেই সময় রুরু গিয়ে জানলায় বসে। জানলায় বসে রুরু কত কী দেখে। পাড়ায় বোধহয় এগার বারটা কুকুর আছে। কখনও তাদের দেখা পাওয়া যায়, কখনও দেখাই যায় না। রুরু জানলা ছেড়ে বারান্দায় চলে যায়। বারান্দা থেকে অনেকটা রাস্তা দেখা যায়। বারান্দাটা লোহার নকশা কাটা জালে ঢাকা, কেউ ভেতরে আসতে পারে না, কিন্তু বাইরেটা দেখা যায়। ওখানে বসেই রুরুর সঙ্গে ওই বাজনাওয়ালার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

রুরু একটা বাজনা কিনেছিল, কিন্তু তার থেকে কোনও সুর বার করতে পারছিল না। সে কথা বলতেই বাজনাওয়ালা বলল, 'দাদা, এত সহজেই কি সুর বেরোবে? তোমাকে কসরৎ করতে হবে। সুরের কান ঠিক করতে হবে। তবে তো হবে।'

রুরু একগাল হেসে ফেলল। বলল, তুমি কি পাগল? সুর কি বাঘ না ভাল্লুক না মানুষ যে তার কান থাকবে?

বাজনাওয়ালা বলল, এটা ঠিক বলছ। এ কথাটা আমার আগে মনে হয় নি। তবে কানেই তো সুর বাজে?

রুরু আবার বলল, তা তো বাজেই। তুমি যে দূর থেকে তোমার বাজনা বাজাতে বাজাতে আস তখন তো আমি ঠিক বুঝতে পারি।

এবারও বাজনাওয়ালা জব্দ। সে বলল, ঠিক কথা। আমি ভুল করেছি। কী করলে আমার মাফ হবে? রুরু বলল, বাজনা শিখিয়ে দাও। বাজনাওয়ালা তখন একটা অদ্ভুত কথা বলল। বলল, আমি বাজনা শেখাতে পারি না। তবে আমার ঝুলিতে অনেক স্বপ্ন আছে, তোমাকে স্বপ্ন দেখাতে পারি।

রুরু অবাক হয়ে গেল। বলল, তুমি স্বপ্ন দেখাতে পার? কিসের স্বপ্ন?

সে উত্তর দিল, তুমি ঠিক কর। ফুলের দেশের স্বপ্ন দেখবে, না বরফের দেশের স্বপ্ন দেখবে, না যেখানে পাহাড়ে চূড়োয় মেঘ আটকে থাকে সেখানকার স্বপ্ন দেখবে।

রুরু একটু ভেবে বলল, আমি বাবার ছোটবেলার স্বপ্ন দেখব।

বাজনাওয়ালা বলল, হবে হবে সব হবে। আজকে রাতে তুমি এই পাতাটা হাতে নিয়ে ঘুমোতে যেও। তারপরে দেখো কী হয়। রুরু সেদিন খুব তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ল। আর অন্যদিনের চেয়ে একটু আগেই যেন ঘুমিয়ে পড়ল। এক সময় শুনতে পেল বাজনাওয়ালার সেই সুরটা ভেসে আসছে। দেখল ও একটা বিশাল জলপ্রপাতের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। একটা মস্ত নদী হুহু করে আছড়ে পড়ছে পাহাড়ের ওপর থেকে মাটিতে। কী সাঙ্ঘাতিক সেই জলের তোড়। আর জল পড়ে পড়ে কত ফেনা তৈরি করছে, আর সেই জলকণার মধ্যে সূর্যরশ্মি পড়ে রামধনুতে ভরে দিয়েছে জায়গাটা। খুব শীত করছিল। হঠাৎ একজন ওর গায়ে একটা কম্বল জড়িয়ে দিল। রুরু ফিরে দেখল সেই বাজনাওয়ালা। ওঃ মুখে কিরকম একটা হাসি। বলল, কেমন দেখছ? রুরু বলল, খুব সুন্দর। এ জায়গাটার নাম কী? এ নদীটার নাম কী? বাজনাওয়ালা বলল, নদীটার নাম নায়েগ্রা। তুমি নাম শুনেছ? রুরু বলল, মনে পড়ে না। স্বপ্নটা

শেষ হয়ে গেল। তখন সকাল হয়ে গেছে।

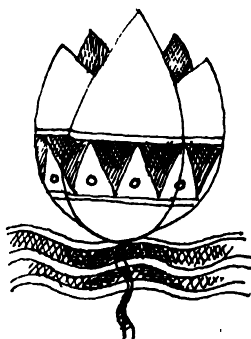
তারপর থেকে রুরু বসে থাকে কখন আসবে সেই বাজনাওয়ালা। কতদিন বাদে সে আসে। রুরু খুব খুশি হয়। বলে বাবাকে বলেছি আমি নায়েগ্রার কথা। বাবা বিশ্বাস করেন নি যে আমি সত্যিই দেখেছি। বাবা দেখেছেন নায়েগ্রা। খুব অবাক হয়ে গেলেন আমি এত খুঁটিনাটি খবর জানি দেখে। বাজনাওয়ালা হাসল। বলল, আজ তুমি ফুলের রাজ্যে যাবে। সেদিন সারাটা রাত ও একটা পাহাড়ের উপত্যকায় কাটাল। এত ফুল ও কখনও দেখে নি। এত প্রজাপতি ও কোনদিন দেখে নি। রুরু তার ছোট্ট ছোট্ট পা ফেলে দৌড়তে লাগল ফুলের বনের মধ্যে। বাজনাওয়ালা দাঁড়িয়ে রইল আর রুরুর মজা দেখতে দেখতে খুব হাসছিল। বলছিল, কী, বলেছিলাম না, এ জায়গাটা সুন্দর?

তারপর আরও কত স্বপ্ন দেখল রুরু। বাজনাওয়ালার কথা আর তার মনেই পড়ে না। মনে হয় স্বপ্নওয়ালা। ও স্বপ্ন বিলিয়ে বেড়ায়। কোথায় না নিয়ে গেল রুরুকে। সেই যে নদীটা দেখেছিল,—ছোট্ট নদী কিন্তু ভীষণ তার স্রোত। একটা বড় পাথরের চাঁইকে হেলা ভরে ঠেলে নিয়ে চলেছে সেই ছোট্ট নদীটা। একদল হাতি দাঁড়িয়ে আছে নদীর ওপারে। এপারে দাঁড়িয়ে স্বপ্নওয়ালা বলল, নদীতে জল বেশিক্ষণ থাকবে না। পাহাড়ী নদীর স্বভাবই ওইরকম।

একদিন ওরা একটা মেলায় গেল। কি বিরাট মেলা। এমন মেলা রুরু কখনও দেখেনি। কত পাঁপড় ভাজা হচ্ছে। একটা জিনিস দেখেও বুঝতেই পারল না জিনিসটা কী। স্বপ্নওয়ালা বলল, এ হল গোলাপী রেউড়ি। বিরাট বিরাট ঘূর্ণিতে চড়ছে লোকে। কত দোকান তার ঠিক ঠিকানা নেই। এক জায়গায় মেয়েরা খুব ভিড় করে আছে, সেখানে আদিবাসী গ্রাম থেকে গয়না নিয়ে এসেছে। আর-এক জায়গায় চিড়িয়াখানা আছে, কথাবলা পুতুল আছে, কী নেই? হঠাৎ রুরু দেখল এক জায়গায় একটা ছোট্ট ছেলে কাঁদছে। চোখ মুছছে মাঝে মাঝে, আবার কাঁদছে। সবাই জিজ্ঞেস করছে, তোমার নাম কী খোকা? কোথায় থাক? ছেলেটা উত্তর দিচ্ছে না। এমন সময় বকুলদি ঢুকল। বকুলদির গায়ে লালপাড় শাড়ি, এক মাথা চুল। বকুলদিকে দেখে সেই ছোট্ট ছেলেটা বলল, বকুলপিসি তুমি কোথায় ছিলে? আমি তোমায় খুঁজে পাচ্ছিলাম না। বকুলদি জোরসে সেই ছোট্ট ছেলেকে জড়িয়ে ধরে বলল, সোনা মনি, আমিও তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছি। রুরু ডাকল, বকুলদি! বকুলদি ওর দিকে তাকাল কিন্তু চিনতে পারল না রুরুকে।

স্বপ্নওয়ালা বলল, তোমার বাবার ছোটবেলা দেখলে। রুরু অবাক। ওই ছোট্ট ছেলেটা ওর বাবা? তাই কখনও হয়। স্বপ্নওয়ালা হাসল। রুরুর সঙ্গে স্বপ্নওয়ালার সেই শেষ দেখা। রুরু বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিল, বাবা, তুমি ছোটবেলায় মেলায় হারিয়ে গিয়েছিলে? বাবা বললেন, কই না তো? বকুলদি ঝিমোচ্ছিল হঠাৎ টান টান হয়ে উঠল। বলল, দাদুভাই, যে কথা আমি কাউকে বলি নি, এই এতবছর বাদে তুমি তা জানলে কি করে? রুরু হেসে বলল, কেন বলব? বকুলদি যে কেন ওকে শক্ত করে ধরে রাখে ইস্কুল থেকে আসার সময় সেটা বুঝতে পারল রুরু।

যেটা বুঝতে পারে নি সেটা হল কেন স্বপ্নওয়ালা চলে গেল। এখনও দুপুরে রুরু কান খাড়া করে শোনবার চেষ্টা করে স্বপ্নওয়ালার বাজনা। শুনতে পায় না।



রবীন্দ্র জন্মোৎসব ও কুমড়োর চাটনি

পূর্ণেন্দু পত্রী

সেবারে সত্যি সত্যি বিন্ধ্যপর্বতের মত অটল ছিলাম প্রতিজ্ঞায়। কিন্তু ডোবালো ঐ হাঁদারাম হাবুলটা। ও এমন করে বোঝালে যে জল হয়ে গেলাম। হাবুলটা হাঁদা হোক আর যাই হোক, কথা বলে বেশ গুছিয়ে। বেশ যুক্তিটুক্তি জুড়ে দিতে পারে কথার মধ্যে। ঐ আমাকে বোঝালে—

শোন্, তুই যা ভাবছিস এবারে তা হবে না। এবার আমরা যেটা করছি সেটা অন্য জিনিস। একটা কথা তো সত্যি, নেণ্টুকাকা গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে শিক্ষিত মানুষ। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের নাম শুনলে, অন্যবারের মত করবে না। তা ছাড়া ধর, ফাংশানে বক্তৃতা দেবার জন্যেও তো নেণ্টুকাকাকে দরকার। এমন কি, ভগবান না করুন, আমরা যাঁকে সভাপতি করার কথা ভাবছি, তিনি কোন কারণে পৌছতে না পারলে নেণ্টুকাকাকেই তো সভাপতির চেয়ারে বসাতে হবে।

তখনও আমার পুরো রাগটা জল হয়নি। আমি বললাম—

কিন্তু গত বছরের সরস্বতী পুজোর ব্যাপারটা মনে করে দ্যাখ্। আমাদের আকাশে উঠিয়ে দিয়ে কী রকম মইটা কেড়ে নিলেন। বার বার ভাল লাগে এসব? মুখেই শুধু বড় বড় বাৎ। আসল জিনিসের বেলায় লবডঙ্কা।

আবার হাবলু আমাকে বোঝালে— তুই যা বলছিস সব সত্যি। সব মেনে নিলাম। কিন্তু সব যদি মানি তাহলে তো এই গ্রামে বাস করে কোনদিন কিছু করা যাবে না। নেণ্টুকাকার মুখে বড় বড় বুলি, চাঁদার বেলায় পাঁচ সিকে পয়সা, তার কাছে যাব না। হরি জ্যাঠার সেবারে একটা তক্তাপোষ আর রান্নার বাসন-কোষণ দেবার কথা ছিল, দিলেন না। তাহলে তাঁর কাছেও চাঁদা চাওয়া বারণ। মুখুজ্যে বাড়ির বিমলবাবু, আমরা তাঁর গাছের ডাব চুরি করেছি বলে ইস্কুলে গিয়ে হেডস্যারের কাছে নালিশ করেছিলেন, তাঁর কাছেও তাহলে যাওয়া চলে না। এইভাবে যদি আমরা কেবল ভাল লোক বাছতে শুরু করি তাহলে দেখবি কিস্যু হবে না। দুচারটে ভাল মানুষ যদি বা মেলে, তখন বলবি ওঁর কানে বড় পুঁজের গন্ধ, তাঁর পায়ে দাদ, অমুকবাবু তাঁর বৌকে ঠেঙায়, তমুকবাবু ঘুষখোর, তখন চাঁদার খাতায় জমার ঘরে জিরো

ছাড়া আর কি জমবে বল্?

হাবলুটার যুক্তি ঠিক যেন ছাক্‌নি জালের মত, ঘন ঘন গিঁট দিয়ে বোনা। পালাবার ফাঁক নেই। পরে ভেবেচিন্তে দেখলাম, হাবলু মন্দ বলে নি কথাগুলো। আমাদের এবারের চাঁদা চাইবার উদ্দেশ্যটা সত্যিই ভিন্ন। শুধু ভিন্ন বললে কম বলা হয়। আমরা প্রায় একটা রেভলিউশনারী কাণ্ড করতে চলেছি খড়গাছির মত একটা অখ্যাত অজ্ঞাত গ্রামে। রবীন্দ্রজন্মোৎসব। তাক্ লাগিয়ে দেবো এবার সবাইকে। হৈ চৈ পড়ে যাবে আশপাশের সাত গাঁয়ে। এখানকার লোক উৎসব বলতে তো বোঝে শুধু দুর্গাপুজো, সরস্বতী পুজো আর কার্তিক পুজো। আর ঐ চত্তির মাসের কটা দিন শিবঠাকুরের গাজনকে নিয়ে চ্যাটাং চ্যাটাং ঢাকের বাদ্যি। কিন্তু ওসবের মধ্যে তো কালচারাল ব্যাপার স্যাপার নেই। এবারে সেটাতেই হাত দিয়েছি আমরা। পরীক্ষায় ফেল করি বলে সবাই আমাদের ভাবে ফ্যালনা। এবার আমরা ঐ ফ্যালনা কজন ছেলেই দেখিয়ে দেবো, বিশ্বের সাংস্কৃতিক অগ্রগতি, মানে চেতনার যে অভ্যুদয় চলেছে আজ পৃথিবী জুড়ে অর্থাৎ বিশ্বকবিকে হৃদয়ে বরণ করার মধ্যে দিয়ে, ক্লাবের কালচারাল সেক্রেটারী হিসেবে আমি যে স্পীচটা দেবো সেটা এখনো লেখা হয়ে ওঠে নি। তবে মেজদাব ঘরের তাকে একটা ধুমসো রচনার বই আছে। তার মধ্যে 'বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ' নামে পাঁচ পাতার একটা প্রবন্ধ, পেজ নাম্বার ১৪২, মনে করে রেখেছি।

নেণ্টুকাকা অন্যদের মত ডেলি প্যাসেঞ্জারি করেন না। বাড়ি আসেন শনিবার শনিবার। ঠিক হল সামনের রবিবারই যাওয়া হবে নেণ্টুকাকার কাছে।

রবিবার। তখনও মাটির রোদ গাছপালার মাথায় ওঠেনি। আমরা বেরিয়ে পড়লাম। আমি, হাবলু, সুঁটে, ঝণ্টু আর বাঁটুল। অধিক সন্নেসীতে গাজন নষ্ট হতে পারে এই ভয়ে আমাদের জাগরণী সংঘের অন্যান্য সদস্যদের ডাকা হল না। তাদের অন্য কাজে অন্য জায়গায় যেতে বলা হ'ল।

মল্লিকদের বাঁশঝাড়ের কাছটা দিনের বেলাতেও অন্ধকার। আমরা খানিকটা এগিয়েছি। সকলের আগে আগে যাচ্ছিল ঝণ্টু। হঠাৎ হেঁই হেঁই করে চেঁচিয়ে উঠল সে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম আমরা। ঝণ্টু আমাদের আঙুল দিয়ে দেখাল, একটা ইয়া বড় সাপ আমাদের ডানদিকে শুকনো বাঁশপাতার ওপর মৃদু খিস খিস শব্দ তুলে যেন সাঁতার কাটতে কাটতে চলে যাচ্ছে। সাপটা দূরের ঝোপের আড়ালে চলে যাবার পর হাবলু হালুম করে চেঁচিয়ে উঠল আনন্দে।

দেখলি? দেখলি?

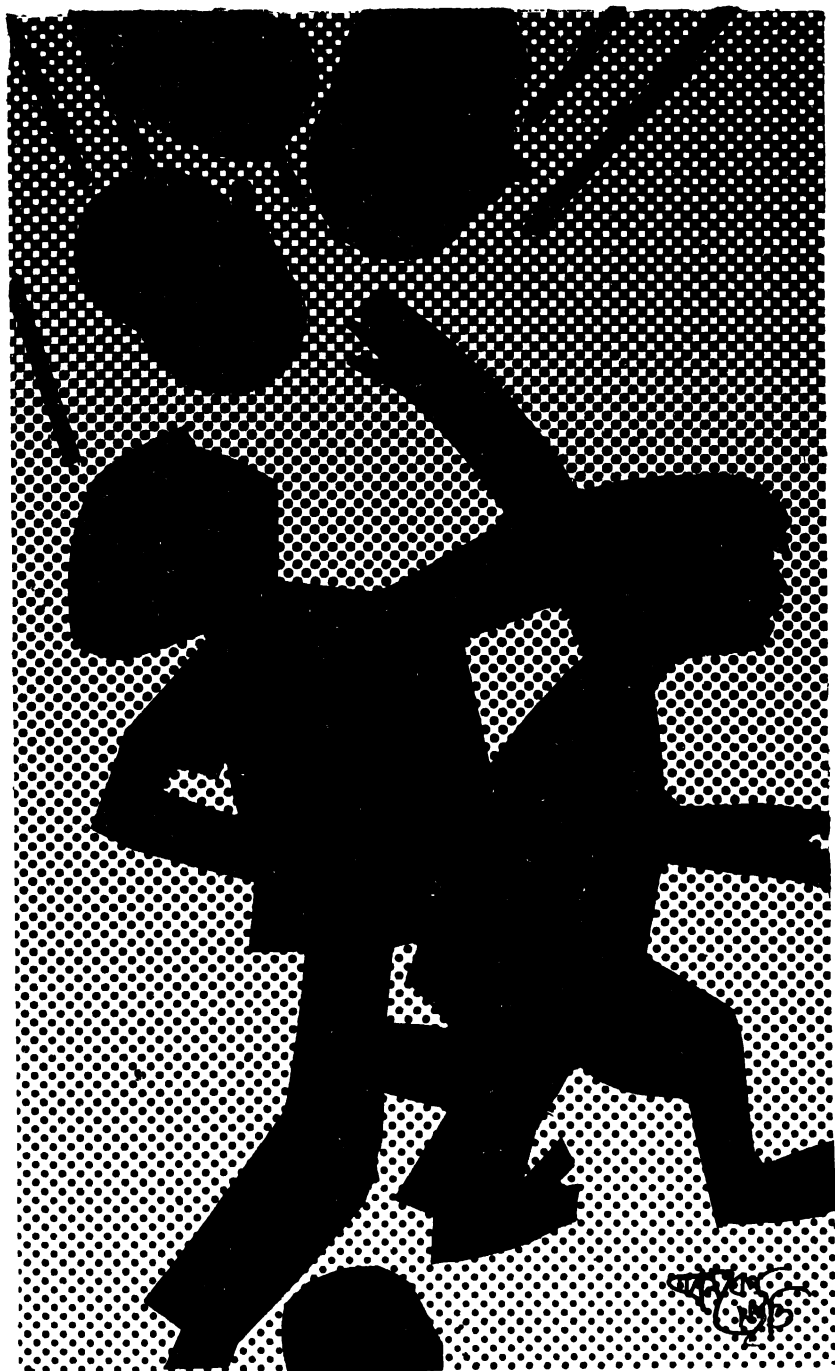
কি? সাপ তো?

না হে বন্ধু, সাপের কথা বলছি না। বলছি সাথ-এর কথা। ডান দিক দিয়ে সাপ গেল। দক্ষিণেতে ভূজঙ্গম। খুব শুভ লক্ষণ। নেণ্টুকাকা আজ বধ হবেই হবে।

হাবলুর উৎসাহে আমাদের গালও গোল হয়ে উঠল টেনিস বলের মত।

নেণ্টুকাকা তাঁর পুকুরপাড়ে ছাইগাদার কাছে কঞ্চির বেড়া দিয়ে ঘেরা বাগানের মধ্যে বসে খুরপী দিয়ে ঘাস তুলছিলেন। নেণ্টুকাকার খুব বাগানেব সখ। ফুলের নয়, শাকসব্জীর। লাউ, কুমড়ো, বেগুন, ঢেঁড়শ, এসবের। বাড়িতে এলে সকাল সন্ধ্যে ঐ বাগানেই। নেণ্টুকাকা ঘাস তুলছিলেন আর দূরে তাঁর প্রিয় চাকর সন্নেসী মাটি কোপাচ্ছিল কোদালে। আমাদের দলবলকে দেখে এক পলকের জন্যে একটু অবাক হবার মত ভঙ্গী ফুটেছিল নেণ্টুকাকার মুখে। পরক্ষণেই সেটা ঢাকা পড়ে গেল দরাজ হাসিতে।

এস, এস। এত সকাল সকাল তোমাদের আবার কি ব্যাপার?



আমরা সবাই হাবলুর দিকে তাকালাম। আগে থেকে কথা হয়ে আছে, হাবলুই যা বলার বলবে। কেননা নেণ্টুকাকার বাইরেটা যেমনই আটপৌরে হোক, ভেতরটা তো বেশ মাজাঘষা। তাঁর বিদ্যেবুদ্ধির ঝুলি থেকে কখন কী বেরিয়ে পড়বে কে জানে! বিদ্বান লোকেরা সাপুড়ের চুপড়ির সাপের মত। এমনিতে ঠাণ্ডা। ফণা তুললেই সর্বনাশ। ভেবে চিন্তে তাই হাবলুকেই সামনে রাখা। হাবলু অঙ্কে আর ভূগোলে আর সংস্কৃতে ফেল করে বটে, কিন্তু বাংলা আর ইতিহাসে চৌকস। ৬০—৬২ তো বাঁধা।

হাবলু নিজের থতমত ভাবটা কাটিয়ে ওঠার জন্যে খচ্‌খচ্‌ করে নিজের মাথা খানিকটা চুলকে নিয়ে খুব বিনীত ভঙ্গীতে শুরু করলে—

নেণ্টুকাকা-আ-আ ...

বল, বল।

আমরা এবারে আপনার কাছে অনেক বড় দাবী নিয়ে এসেছি।

পায়ের কাছে এক গোছা তোলা ঘাস জমেছিল, সেগুলোকে ছুঁড়ে দূরে সরিয়ে দিতে দিতে নেণ্টুকাকা বললেন—

সে তো আসবেই। তোমাদের মত যারা সবুজ, তারাই তো চিরকাল বড় বড় দাবী নিয়ে এগিয়ে আসে সকলের আগে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়েছো? আয়রে সবুজ, আয়রে আমার কাঁচা। পড়েছো?

হাবলু এবং তার দেখাদেখি আমরা সকলেই এমনভাবে হাসলাম, যেন পড়েছি। নেণ্টুকাকার মুখে রবীন্দ্রনাথের নামটা শোনামাত্রই আমাদের মনে যেন জগঝম্পের বাজনা বেজে উঠল। হাবলুর কথাই ঠিক। রবীন্দ্রনাথ-টাথের ব্যাপারে নেণ্টুকাকা আমাদের আগের মত বিট্রে করবেন না। হাবলু আমাদের দিকে এমন একটা মিষ্টি হাসি ছুঁড়ে দিলে, যেন তার আধখানা যুদ্ধ জেতা হয়ে গেছে অলরেডি।

হাবলুর গলায় আবার সেই আগের মত বিনীত স্বর—

নেণ্টুকাকা, আপনি যা বললেন মানে যাঁর নাম বললেন, আমরা এবার আমাদের গ্রামে সেই জগৎ-বরেণ্য কবিরই জন্মোৎসব পালন করতে উদ্যোগী হয়েছি। আপনাকে মানে আমরা আপনার কাছে এসেছি অনেকগুলো দাবী নিয়ে।

তোমরা রবীন্দ্রজন্মোৎসব করছো?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

বাঃ, বাঃ। তোমাদের বেশ উন্নতি হয়েছে তো। রাত জেগে ইয়ার্কি মেরে, ধেই ধেই করে নেচে, আর কতকগুলো ভাঙা রেকর্ড বাজিয়ে আজকালকার ছেলেরা ঐ যে কেবল দুর্গাপুজো আর সরস্বতী পুজো নিয়ে মাতামাতি করে, ওটা দেখলেই আমার রাগ হয়। এই যে রবীন্দ্রজন্মোৎসব করছো, খুব ভাল জিনিস। এতে নিজেদেরও অনেক কিছু শেখা হয়, লোককেও শেখানো যায়। খুব ভাল। তা আমাকে, আমার কাছে তোমাদের কি দাবী আছে, বলে ফেল।

হাবলুর হাত আবার মাথায় উঠে এসে চুল ঘাঁটতে লাগল। আমাদের হাতের মুঠোও শক্ত হয়ে উঠল উত্তেজনায়।

হাবলু বললে—আমাদের একটা হাতের লেখা কাগজ আছে। আমরা তার রবীন্দ্রসংখ্যা বার করবো। তার জন্যে আপনাকে একটা লেখা দিতে হবে। আর জন্মোৎসবের দিন আমরা ঠিক করেছি, আপনিই হবেন আমাদের প্রধান অতিথি। আর ...

এইবার চাঁদার কথা। আসল ব্যাপার। বলে ফ্যাল্ হাবলু, সাহস করে বলে ফ্যাল্। দশ টাকা। দেরী করিস নে। হাবলুর ঠোঁটের ডগার কাছে আটকে আছে আমাদের জোড়া জোড়া চোখ।

আর, কাঁকনকে যদি উদ্বোধন সঙ্গীতটা গাইবার পারমিশন দেন…তাহলে খুব ভাল হয়—কেননা আমাদের এখানে তো আর কোন গান জানা মেয়ে নেই…

কাঁকন নেণ্টুকাকার বড় মেয়ে। বছর এগার বারো বয়েস। বাড়িতে মাষ্টার এসে গান শিখিয়ে যায়। হাবলুর বুদ্ধি আছে বটে। এটা আমাদের কারো মাথায় আগে আসেনি। বুঝেছি, নেণ্টুকাকার মনটাকে ও ভিজিয়ে ফেলতে চাইছে। তা বেশ,কিন্তু চাঁদার কথাটা বল্ এবার!

হাবলু থামতেই নেণ্টুকাকা সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর সন্নেসীর দিকে তাকিয়ে হাঁক দিলেন—

সন্নেসী, একটু তামাক সেজে নিয়ে আয় তো, বাবা।

সন্নেসী মাটি কোপানো থামিয়ে চলে গেল। নেণ্টুকাকা পিঠটাকে সোজা করে নিয়ে আবার অন্য একটা জায়গায় গিয়ে বসলেন, ঘাস তুলতে। বসতে বসতেই প্রশ্ন করলেন—তোমাদের প্রোগ্রামটা কি সেদিন?

প্রোগ্রাম? প্রোগ্রাম একটা মোটামুটি ভেবেছি। এই, প্রথমে উদ্বোধন সঙ্গীত। তারপর সভাপতি আর প্রধান অতিথি বরণ, তারপর দুটো একটা গান আর বক্তৃতা। ঝণ্টু আর বাঁটুল ওরা দুজনে মিলে একটা কমিক করবে। এর পর ক্লাবের সেক্রেটারী কিছু বলবে। তারপর নাটক।

কি নাটক?

কবিগুরুর মুকুট।

সন্নেসী তামাক সেজে নিয়ে এল হুঁকোয়। নেণ্টুকাকা হুঁকোয় পর পর কয়েকটা টান দিয়ে গলগল করে কিছু ধোঁয়া উড়িয়ে আমাদের দিকে তাকালেন—

তোমাদের বেশ উৎসাহ আছে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু এ্যমবিশন নেই। যাঁর জন্মদিন পালন করছো, তাঁর লেখাটেখা একেবারেই পড়ে দেখনি মনে হচ্ছে। 'দুর্ভাগা দেশ' কবিতাটা পড়েছো রবীন্দ্রনাথের? পড়েছো?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

কি আছে লেখা কবিতায়? 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান, ভাগ করে খেতে হবে তাহাদের সাথে অন্নপান।' এই যে এত বড় একটা কথা, এটাকে বাদ দিয়ে রবীন্দ্রজয়ন্তী করার কোন মানেই হয় না। শুধু খানিকটা নাচ গান আর বক্তৃতা করলেই কি শ্রদ্ধা জানানো হয়ে যাবে অতবড় একটা ওয়ার্ল্ড ফেমাস পোয়েটকে? তোমরা যদি আমার সাজেশান শুনতে চাও তাহলে বলি।

আমরা প্রায় সকলেই একসঙ্গে বলে উঠলুম—কেন শুনবো না কাকু? নিশ্চয়ই শুনবো।

নেণ্টুকাকা কি যেন বলতে যাওয়ার মুখেই থেমে গেলেন। 'মেজবাবু' বলে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল ও পাড়ার জগদীশ। নেণ্টুকাকার চাষবাস সব ঐ জগদীশই দেখাশোনা করে।

কে? জগদীশ এসে গেছো? একটু দাঁড়াও।

নেণ্টুকাকা এবার হাবলুর দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন—উৎসবটা শুরু হবে সকাল থেকে। সকাল বেলায় শুধু প্রভাত ফেরী। রবীন্দ্রনাথেরই একটা গান গেয়ে তোমরা গ্রামটা ঘুরলে। তারপর দুপুর বেলায় কাঙালী ভোজন। খুব বেশী আইটেম করার দরকার নেই। খিচুড়ী হবে। তার সঙ্গে আলু ভাজা, বেগুন ভাজা, কুমড়োর চাটনী আর যদি পারো একটু করে পাঁপর ভাজা। কত আর লোক হবে! পাঁচ-ছ'শোর বেশী তো হবে না। এমন কিছু নয়। আসলে খাওয়াটা এখানে বড় কথা নয়। ঐ যে কাঙালী ভোজন, তাতে কোন জাত বেজাতের বিচার

থাকবে না। বামুন-কায়েত, শূদ্র ভদ্র, হিন্দু মুসলমান সবাইকে একসঙ্গে এক পংক্তিতে বসিয়ে খাওয়ানোটাই হল আসল কথা। এইটেই রবীন্দ্রনাথের সারা জীবনের সাধনা ছিল, জানতো?

হাবলু আমতা আমতা করে বললে,—ওতো অনেক টাকার ব্যাপার। আমরা অত টাকা ...

টাকা? শোনো টাকার জন্যে কখনো কোন বড় উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় নি।

হুঁকোর আগুনটা নিভে এসেছিল। নেণ্টুকাকা জোরে কয়েকটা টান দিয়ে সেটাকে বাগানের বেড়ার গায়ে ঠেকিয়ে রেখে আবার সন্নেসীকে ডাক দিলেন। সন্নেসী মাটি কাটা থামিয়ে নেণ্টুকাকার সামনে এসে দাঁড়াল।

সন্নেসী! তোমার মাকে গিয়ে বল, ২০টা টাকা দিতে।

২০ টাকা! হাবলু চকিতে ঘুরে তাকাল আমাদের দিকে। তার মুখে দিগ্বিজয়ের হাসি। ঝণ্টুর গাল লাল হয়ে উঠেছে আনন্দে। সুঁটে পটপট করে হাতের আঙুলগুলোকে মটকে নিলে। বাঁটুল এক চক্কর ঘুরিয়ে নিলে নিজেকে। আমারও গালের হাসি গাল ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছিল।

হ্যাট্‌স অফ, হাবলু। তুই যাদু জানিস। নেণ্টুকাকার কাছ থেকে ২০ টাকা চাঁদা আদায়! যা কিনা শিবের বাপেরও অসাধ্যি আজ তুই তাই করলি। ১ টাকা আদায় করতে আমাদের পেটের অন্নপ্রাশনের ভাত হজম হয়ে গেছে। হাবলু, এখান থেকে বেরিয়ে তোর পায়ের ধুলো নেব, মাইরী!

তোমরা, আজকালকার ছেলেরা—সামান্য কাঙালী ভোজন করাতে ভয় পাচ্ছ? টাকার ভয়ে, তাইতো? আচ্ছা, এবার ঐ রবীন্দ্রনাথের কথাই ভেবে দ্যাখ তো। পকেট ফাঁকা, সিকি পয়সাও ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স নেই। তা সত্ত্বেও ফাঁকা মাঠের মধ্যে অতবড় একটা বিশ্বভারতী গড়ে তুললেন শান্তিনিকেতনে। টাকার জন্যে কাজটা আটকালো কি? আটকায় না। উদ্দেশ্য যদি বড়ো হয়, আটকায় না। পাঁচশো লোকের কি ধর ছশো লোকের জন্যে খিচুড়ী করতে কত খরচ? হিসেব করে বলতে পারবে এক্ষুনি?

আমরা সকলেই খানিকটা থতোমতো। পাঁচশো ছশো লোকের খিচুড়ী রাঁধতে কত চাল, কত ডাল ওসব কি আমাদের জানার কথা!

হাবলু বললে—এখুনি তো বলতে পারব না। আমরা তো আগে কোনদিন কাঙালী ভোজন করাই নি। তবে মুখুজ্যে পাড়ার বঙ্কু মেশোমশাইকে জিজ্ঞেস করলেই জেনে যাবো। ওঁর বাবার শ্রাদ্ধে কাঙালী ভোজন হয়েছিল, চার পাঁচ মাস আগে।

অঙ্কে বোধ হয় তোমরা কেউই ভাল নাও। এ বছর কত পেয়েছ অঙ্কে?

নেণ্টুকাকা একদম সোজাসুজি আমার দিকেই তাকিয়ে। আমার বুক ধক্‌ধক্ করে উঠল।

আমি! আমাকে বলছেন? আমি সত্যি সত্যি অঙ্কে খুব কাঁচা।

কত পেয়েছো, কত, নম্বরটা বল না।

আমি, আমি ১৭ পেয়েছিলাম।

তা এত ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে যাওয়ার কি আছে? অঙ্কে কম নম্বর পাওয়াটা এমন কিচ্ছু অপরাধ নয়। মন দিয়ে অঙ্ক কষলেই শেখা হয়ে যাবে। এই যে রবীন্দ্রনাথের কথাই ধর না। লেখাপড়ায় কি ভাল ছেলে ছিলেন? ছিলেন না। কতটুকুই বা পড়েছিলেন? বেশী পড়েন নি। তাহলে এত বড় হলেন কি করে? জানো? কারণটা কি? রবীন্দ্রনাথ তোমাদের মত ভেতো বাঙালী ছিলেন না। বাঙালীদের উপর হাড়ে চটা ছিলেন 'সাতকোটী সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালী করে মানুষ তো করো নি' এই কথা কবি অনেক দুঃখ করেই লিখে গেছেন। কেন বলতো? কারণ বাঙালীরা বড্ড বাক্যবাগীশ জাত। কাজে কুঁড়ে। তোমরা রবীন্দ্রজন্মোৎসব করতে চাইছো, অথচ তোমাদের কতকগুলো সাধারণ জ্ঞান নেই। তোমরা যদি ভেবে থাকো, চাল ডাল তেল নুন

এসব জিনিষের কি দরদাম, এসব রবীন্দ্রনাথ জানতেন না, তাহলে ভুল করবে। রবীন্দ্রনাথ কবিতাও লিখতেন। আবার জমিদারিও চালাতেন। তোমার নাম কি ?

নেন্টুকাকা প্রশ্নটা করলেন ঝন্টুর দিকে তাকিয়ে।

আমার নাম ? ঝন্টু।

ঝন্টুতো ডাক নাম। ভাল নাম কি ?

সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

কার ছেলে বলতো তুমি ?

আমার বাবা হলেন ক্ষীরোদপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ওঃ, তুমি ক্ষীরোদকাকার ছেলে ? বাঃ। বাড়িতে অম্বল খাও ?

অম্বল ? অম্বল তো খাই।

কিসের অম্বল ? পেঁপের, না কুমড়োর, না ঢেঁড়শের। না কুঁচো চিংড়ীর ?

সব রকমই হয়।

বেশী হয় কোনটা ?

বেশী হয় কুমড়োর।

কুমড়োর কত করে সের, জানো ?

আজ্ঞে না।

তাহলেই দ্যাখ কুমড়োর অম্বল রোজ খাচ্ছ, অথচ জিনিসটা বাজারে কত দামে বিক্রি হচ্ছে, খবর রাখো না। রবীন্দ্রনাথের মত অত বড় একটা বিশ্ব প্রতিভার কতটুকু খবর রাখো তোমরা বুঝতেই পারছি। তোমরা তো এখনো যোগ্যই হয়ে ওঠোনি। ...

আমাদের যে গালগুলো হাসি খুশীতে পাকা আমের মত লাল টুস টুসে হয়ে উঠেছিলো একটু আগে, চুপসে আমসত্ত্বের মত কালো হয়ে যেতে লাগলো। কুমড়োর দামটা জানিনা বলেই বোধ হয় চাঁদার করকরে কুড়িটা টাকা আর পাওয়া গেল না। কুমড়ো জিনিসটা গোল জানতাম। তার ভিতরে যে এত গণ্ডগোল জানতাম কি ছাই! তীরে এসে সব কিছু ভরাডুবি হয়ে যেতে বসেছে দেখে মনের মধ্যেটা হায় হায় করে উঠলো।

আর ঠিক সেই সময়েই হাবলু যেন থিয়েটারে পার্ট বলছে, এমনি নাটকীয় ভঙ্গীতে সজোরে বলে উঠল—নেন্টুকাকা, ৩০৫ টাকা লাগবে।

৩০৫ টাকা ? কি করে হিসেবটা কষলে ?

আজ্ঞে, আমাদের পাড়ার দাশু হালদারের হোটেল আছে বাগনান স্টেশনে। সেখানে শুধু ডাল ভাত আর তরকারি খেতে ১২ আনা পড়ে। দাশুকাকা বলেছিলেন এই ১২ আনায় তাঁর ৪ আনা লাভ থাকে। তাহলে পার হেড ৮ আনা করেই পড়ে এক একজনের। আমরা যদি ৬০০ জন লোককে খাওয়াই খরচ পড়বে, ৩০০ টাকা। আর যে হালুইকর রাঁধবে, তাকে ৫ টাকা মজুরী দিতে হবে।

বাঃ। এই তো। দেখ, তোমরা সবাই ভয় পেয়ে গেলে। হাবলু ভয় না পেয়ে চেষ্টা করল বলেই উত্তরটা পেয়ে গেল। কোন কিছুতে চট্ করে ভয় পেতে নেই। রবীন্দ্রনাথ লিখে গেছেন, 'বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা, বিপদে আমি না যেন করি ভয়'। সব সময় মনে রাখবে কথাটা। এই তো হয়ে গেল। মোটামুটি কত খরচ হবে তার একটা হিসেব তোমরা পেয়ে গেলে। এবার কাজে নেমে পড়, কথা না বলে।

আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু ....

কিন্তু কি বল ?

কাঙালী ভোজনের তো অনেক খরচা। সবাই যদি একটু বেশী বেশী করে চাঁদা না দেন ···

তা তো বটেই। এ তো আর ১টাকা ২ টাকার ব্যাপার নয়। গ্রামে তোমরা একটা ভাল জিনিস করছো। সবাইকে সাহায্য করতে হবে বৈকি। তোমরা ছেলেমানুষ, কি করে করবে নইলে !

এই সময় সন্নেসীকে দেখা গেল আসতে। দুটো দশ টাকার নোট হাতে। হাবুলকে আমি ইসারা করলাম হাতের তিনটে আঙুল দেখিয়ে। অর্থাৎ এ সময় আরেকবার কথাটা তুলে ২০ কে ৩০ করে নে।

হাবলু পকেট থেকে চাঁদার বই আর ফাউন্টেন পেনটা বের করে ফেললে।

তাহলে নেণ্টুকাকা, আপনার নামে আমরা ···

দাঁড়াও বলছি।

সন্নেসী এসে ১০ টাকার নোট দুটো নেণ্টুকাকার হাতে দিতেই, তিনি জগদীশকে ডাকলেন। জগদীশ কঞ্চির বেড়ার উপর দিয়ে তার লম্বা হাতটা বাড়িয়ে দিলে।

আজ ২০ টাকা দিচ্ছি। বাকী টাকাটা সামনের সপ্তাহে এসে নিয়ে যেও, কেমন ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, বলে জগদীশ ১০ টাকার নোট দুটো নিয়ে চলে গেল। নেণ্টুকাকা আমাদের দিকে ঘুরে তাকালেন।

হ্যাঁ, কি বলছিলে ?

আজ্ঞে, চাঁদা ···

চাঁদা ? চাঁদা আমি দেবো না। বুঝলে ? ১ টাকা ২ টাকা চাঁদা দিলে অত বড় ব্যাপার তোমরা সামলাতে পারবে না। তোমরা বরং একটা কাজ কর।

হাবলুর গলার স্বর তখন ১৮ দিনের জ্বরের রুগীর মত চিনচিনে। মুখখানাও লম্বা হয়ে ঝুলে এসেছে নীচের দিকে। দাঁতে দাঁত চেপে নিজের অপমান নিজে সামলাবার চেষ্টা করছে সে প্রাণপণে। তবুও গলায় আগের মতই বিনীত ভঙ্গী ফুটিয়ে বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, বলুন।

কাঙালী ভোজনের জন্যে কুমড়োর চাটনীটা তো হচ্ছে। তোমাদের আর বাজার থেকে কুমড়ো কেনার দরকার নেই। যে কটা কুমড়ো লাগবে, আমার বাড়ি থেকে নিয়ে যেও। আর ম্যাগাজীনের জন্যে যে লেখাটা চেয়েছ, সেটা সামনের রবিবারে এসে নিয়ে যেও। কবি রবীন্দ্রনাথকে সবাই চেনে। কর্মযোগী রবীন্দ্রনাথকে অনেকেই চেনে না। ঐ বিষয়েই তোমাদের একটা বড় প্রবন্ধ লিখে দেবো।

বাইরে বেরিয়ে এসে আমার ইচ্ছে করছিল, বশিষ্ঠ কিংবা বিশ্বামিত্র মুনির মত অভিশাপ দিয়ে হাবলুকে শেষ করে দি। ওর জন্যেই সকালটা নষ্ট। আর গাল বাড়িয়ে চড় খাওয়া।

ঝণ্টু বললে—আমি জানতাম।

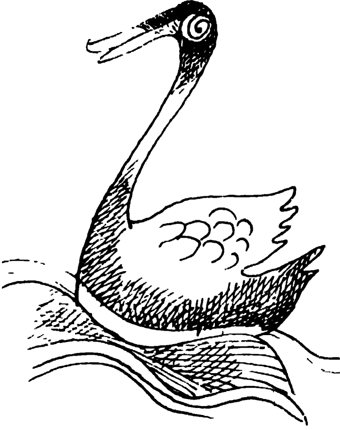
কি ?

হাবলু তখন বললে না যে, ডান দিকে সাপ পড়া খুব ভাল। আসলে তো সাপটা ছিল বাঁদিকে। বাঁদিক থেকে ডানদিকে চলে গিছল।

তখনই বললি না কেন রে রাসকেল ? দিনটা মাটি হোত না।

আহা, তখন বললে তো তোরা আর যেতিস না। আর না গেলে নেণ্টুকাকার রবীন্দ্র-প্রতিভা কি জানা হোত কোনদিন ?

সে বছর আর রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালন করিনি আমরা কুমড়োর চাটনীর ভয়ে।



তিমুর গল্প

কাইয়ুম চৌধুরী

তিমু হাঁফিয়ে উঠল শেষ পর্যন্ত।

কি যে ছাই বৃষ্টি নেমেছে। পড়ছে তো পড়ছেই। কালো ঘোড়ার মত লাফাতে লাফাতে মেঘগুলো ছুটে যাচ্ছে। মেঘের যেন শেষ নেই। মনে হচ্ছে একপাল বুনো ঘোড়া চারদিক আঁধার করে বনের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে।

তিমু একটা ছবি দেখেছিল। বুনো ঘোড়ার ওপর। নানান রঙের ঘোড়া। কালো, মিশকালো, ছাই, গাঢ় ছাই, সাদা, ফিকে সাদা সব রং এর ঘোড়া নাচতে নাচতে যাচ্ছে। ঘাড় বেঁকিয়ে, সোজা হয়ে, কেশর দুলিয়ে, বাতাসে সিল্কের রুমালের মত পতাকা উড়িয়ে মিষ্টি সুরের মত ভেসে যাচ্ছে। আজকে মেঘের ঘনঘটা দেখে তিমুর আবার ছবিটার কথা মনে হলো। ঠিক সে রকম। অবাক হয়ে ছবি দেখেছিল। দেখেছিল কি করে বুনো ঘোড়াকে পোষ মানাতে হয়। তিন চারটে পোষা ঘোড়াকে বুনোদের দলে ভিড়িয়ে দিয়ে বুনোদেরকে দলে টানার চেষ্টা।

অবাক হয়ে দেখেছিল তিমু। মোটেও বিরক্ত হয়নি।

আজকের বুনো মেঘগুলোকে তো বশ মানাবার উপায় নেই।

কোত্থেকে যে এত মেঘ উড়ে আসছে। কি চেপে বৃষ্টি। কলোনীর দালানগুলো সাদাটে হয়ে এসেছে। মনে হচ্ছে ঘসা কাগজের চশমা চোখে এঁটে দেখছি। মাঝে মাঝে বাতাস যেন কাগজটাকে ঢেউ খেলিয়ে যাচ্ছে।

শিমু আপার কাছে মেলা ঘসা কাগজ আছে। শিমু আপা ঘসা কাগজ দিয়ে কাপড়ে নক্‌শা তোলে। একটু কাগজ চেয়েছিল বলে একদিন শিমু আপার কি রাগ! ঘর থেকে প্রায় বার করে দিয়েছিল।

তিমু বাবাকে নালিশ করেছিল।

খববের কাগজ থেকে মুখ তুলে বাবা বলেছিলেন, বকে দেব আপাকে। তুমি কিস্‌সু নিয়োনা আপার কাছ থেকে। আমি এনে দেব।

শিমু আপার দেয়া চকলেট সে নেয়নি।

বাদামঅলা চকলেট। যা তিমু খুব পছন্দ করে।

ঃ কেন নিবিনে ?

শিমু আপা অবাক হয়ে যায়।

ঃ কেন ? আমিতো ছবির বই-এর ঘোড়াটা বাংলা খাতার মলাটে তুলতে চেয়েছিলাম।

ঃ না খেলি। বয়ে গেল।

শিমু আপা চকলেট চিবুতে চিবুতে চলে যায়।

অবাক হয়ে গেল তিমু।

এতক্ষণ খেয়াল করেনি। বিষ্টিটা বাইরে কমে এসেছে। কলোনীর একটা জানালাও খোলা নেই। এরকমটি তিমু কোনদিন দেখেনি। অদ্ভুত লাগছে। মনে হচ্ছে বিরাট বিরাট দৈত্যগুলো চোখ বুজে ঘুমুচ্ছে। হাত, পা ছড়িয়ে। দালানগুলোর অবশ্যি হাত, পা নেই। তবুও তিমু যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে।

জানালা থেকে একটু সরে বসলো তিমু। বসেই অবাক হলো। হঠাৎ সে জানালা থেকে সরে এলো কেন ? হেসে ফেললো তিমু।

দৈত্যগুলোর যদি ঘুম ভেঙ্গে যায় মানুষ দেখে ? রাস্তাঘাটে জনপ্রাণী নেই। ঘুমপুরীতে জেগে আছে একমাত্র সেইই। যেন জিয়নকাঠি তাকে খুঁজে বার করতে হবে। তারপরে রাজকন্যে।

না, ভুল হলো। প্রথম ঘুমন্ত রাজকন্যে। তারপর জিয়নকাঠি।

আবার হাসলো তিমু।

রাজকন্যে কেমন দেখতে ? ভাবতে পারেনা তিমু। যতবারই চেষ্টা করে রাজকন্যে সোনার পালঙ্কে গভীর ঘুমে অচেতন ততোবারই তিমু দেখে শিমু আপা ঘুমিয়ে।

ছবিতে দেখা বাজকন্যের চেহারাটা মনে নেই। সেটাও নাকি আঁকা ছিল, বাবা বলেছিলেন। আঁকা ছবি মানুষের মতো হাঁটে, কথা কয়। তিমুর খুব ভালো লাগছিল। যেমনটি বই পড়ে মনে হয় ঠিক তেমনটি।

ছবিটি যে বানিয়েছিল বাবা তার নামও বলেছিলেন। ওয়াণ্ট ডিজ্‌নী। সে যেখানে ছবি বানায় সে জায়গাটার নাম ডিজ্‌নীল্যাণ্ড। হ্যাঁ, তিমুর এখনো মনে আছে। শিমু আপা বোধহয় ভুলে গেছে। তিমু ভোলেনি।

আঁকা লোকগুলোকে কেন জানি খুব আদর করতে ইচ্ছে করছিলো তিমুর। এরা এতো ভালো, এতো সুন্দর। এরা সত্যি হয়না কেন ?

তিমু ভেবে পায়না।

মানুষের আঁকা মানুষ যদি এতো ভালো এতো সুন্দর হতে পারে, সতিকারেরটা হয়না কেন ?

কলোনীর বিদঘুটে দালানগুলো ছাই আর [illegible] করেনা। অথচ দেখ মানুষের আঁকা শহর কত্তো সুন্দর। নিজের শহর মানুষ এভাবে বানাতে পারেনা ?

বাবাকে একথা তিমু শুধিয়েছিল।

বাবা বলেছিলেন, ও ছবি যারা এঁকেছে তাদের দেশটা আঁকা ছবির চাইতেও সুন্দর।

ঃ আমাদেরটা নয় কেন বাবা ?

ঃ আমাদের দেশ সুন্দর নয়? বাবা হেসে ফেলেছিলেন। পরে গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন, আর একটু বড়ো হও তখন বুঝবে।

তিমু ভাবে। হাতে এঁকে ওরা মিথ্যের দেশ বানালো। আহা! সেই মিথ্যেগুলোও যদি আমাদের এখানে সত্যি হতো। কি মজাই না হতো!

আচ্ছা কাণ্ড।



সেতো জানালা খুলে বিষ্টি দেখছে, মেঘ দেখছে। কলোনীর জানালাগুলো বন্ধ কেন এরকম? ওরা মেঘ দেখেনা? বিষ্টি?

ঃ এই তিমু খাবি? কাঁঠাল বিচি?

শিমু আপা কোঁচড় থেকে বার করে দেয় একমুঠো। শিমু আপাটা বিষ্টি হলেই কাঁঠাল বিচি খাবে, টুক্ টুক্ করে। ভাজা কাঁঠাল বিচি পট্‌পট্ করে ভাঙবে আর খাবে।

বিষ্টি হলে আরেকজন একটা জিনিস খেতে খু-উ-ব ভালোবাসে।

শিমুকে বলে, আপা ? আজ রাতে আমরা খিচুড়ী খাবো, তাই না ?

কাঁঠাল বিচি চিবুতে চিবুতে শিমু আপা জবাব দেয়। তুই টের পেলি কি করে ?

তিমু হেসে বলে। বা—রে। বিষ্টি হলে আগে বাবাইতো, হাঁকডাক সুরু করে। কোন কথা নেই। বিষ্টি হয়েছেতো। বাবার জন্যে খিচুড়ী।

শিমু আপা হঠাৎ খিল্‌খিলয়ে হেসে ওঠে।

ঃ তোর মনে নেই তিমু ? একবার খুব জোর বিষ্টি। বাবাতো হাঁকডাক। খিচুড়ী চাই। বাজার হলো। রান্না হলো। সবাই একসঙ্গে খেতে বসলাম। মা শুদ্ধ। খেতে বসে দেখি খট্‌খটে রোদ। ভ্যাপসা গরম। বাবার মন খারাপ।

ঃ বাবা আরেকটা জিনিস খুব পছন্দ করেন, শিমু আপা বলে, রবীন্দ্রনাথের গান। বাবা বলেন, বর্ষা দিনের গান হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের গান।

তিমু কাঁঠাল বিচি চিবোয়। তার লজ্জা করল বলতে—রবীন্দ্রনাথের গান সেও তো খুব পছন্দ করে। বিশেষ করে বাবার গলায় সেই গানটা—

'সঘন গহন রাত্রি
ঝরিছে শ্রাবণ ধারা—'

ঃ আমিও গান শিখব, তিমু হঠাৎ বলে।

ঃ তবেই সেরেছে ; একটা গাধাও এ তল্লাটে থাকবেনা আর।

ঃ তুমি যে থাকবেনা এ আমি হলপ করে বলতে পারি। তিমু গম্ভীর গলায় জবাব দেয়।

ঃ তবে রে। পাজী। শিমু আপা কান টেনে ধরে। কথাতো বেশ শিখেছো—বাবাতো আমাদের দুজনাকেই গান শেখাবেন বলেছিলেন।

তিমু হঠাৎ বলে,—আচ্ছা বাবাটা এখনো আসছেনা কেন ? কটা বাজেরে আপা ? আপিস ছুটি হয়নি ?

বাইরেটা আরো আঁধার হয়ে এসেছে।

অন্যদিন কিন্তু এসময় সুন্দর বিকেল। রাস্তায়, মাঠে লোকজন, চলাফেরা। কলোনীর ছেলেদের হুটোপুটি। তিমুও যায় খেলতে। চার দালানের মাঝের মাঠটায়। ওরা পাঁচ-ছ বন্ধু মিলে বল খেলে। হ্যাঁ, ফুটবল। বলটা দীপুর।

বাবাকে একবার তিমু বলেছিল বল কিনে দিতে। বল কিনতে গিয়ে তিমু শেষ পর্যন্ত কেনেনি। তার বদলে কিনেছে সুন্দর ছবির বই। প্রায়ই সে পাতা উল্টে উল্টে ছবি দেখে। একই ছবি বার বার। অনেকবার। এখন ছবিগুলো প্রায় মুখস্ত।

একটা জিনিস তিমু ভালো করেই বুঝেছে—একবারে সবকিছু ভালো করে দেখা যায়না। নজরেই আসেনা অনেক কিছু। বার বার দেখতে দেখতে হঠাৎ মনে হয় ছবির এ জিনিসগুলো আগে দেখিনি। এক এক সময় হঠাৎ আশ্চর্য রকম নতুন হয়ে দেখা দেয় ছবিটি। তিমু হঠাৎ লক্ষ্য করে বিষ্টি দিনে জানালার পাশে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মেঘ দেখার মতো আনন্দ সে বই দেখেও পায়।

ছবির সে বইটা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সুন্দর সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যে ভরা ছিল। একটা ছবির কথা এখনো তার মনে আছে। ছবিটা শ্যাম দেশের। পাতলা কুয়াশার মতো বিষ্টির মাঝে দু'টো ঘোড়া মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। ছাই ছাই সবুজ ছবিটা, কেন যে তার ভালো লেগেছিল তিমু জানে না।

বিষ্টি অনেক কমেছে এখন। সামনের পীচের রাস্তা সন্ধ্যার মৃদু আলোয় অদ্ভুত চকচকে দেখাচ্ছে। রাস্তার পাশে সবুজ মাঠ এখন থৈ থৈ। কলোনীর দালানগুলো পানিতেই যেন ভাসছে।

তিমু দেখে সেই পানিতে ছপ্ ছপ্ শব্দ তুলে একটা ঘোড়া নিচু মাথা করে আস্তে আস্তে তাদের বাড়ির সামনে দাঁড়াল।

সারা গা বেয়ে পানি ঝরছে। টপ্ টপ্ করে। এই অল্প আলোতেও তিমু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে একটা প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ঘোড়াটাকে কাঁপিয়ে যাচ্ছে।

ঘোড়াটা ঢুলছে চার পা এক করে। মনে হচ্ছে এখুনি বুঝি পা ছড়িয়ে মাটিতে পড়ে যাবে।

কষ্ট হল তিমুর। হঠাৎ ঘোড়াটা এখানে এলো কেন?

তিমু ঘোড়া দেখে আনন্দ পায়। সে ঘোড়াতো টগবগানো। কেশর ফুলানো। যার চামড়া মখমলের মতো মিহি।

এতো নিজের শরীরই টানতে পারে না। তাই বোধ হয় এখন এর কোন মালিক নেই। কে এখন শুধু শুধু বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াবে?

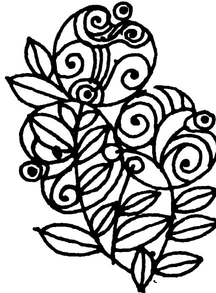
মালিক নেই এরকম ঘোড়ার ছবি তিমু দেখেছিল পত্রিকায়। আঁকা ছবি। সেটা কেটে তার ছবির এলবামে রেখেছে। জোছ্না রাতে দুটো ঘোড়া আপন মনে ঘাস খেয়ে বেড়াচ্ছে। বাবাকে সে ছবিটা দেখিয়েছিল। বাবা হেসে বলেছিলেন, তোর ভালো লাগে এ সব ছবি?

যিনি এঁকেছিলেন বাবা তাঁর নামও বলেছিলেন। মনে নেই এখন। আমাদের দেশের কার যেন আঁকা। বাবা সেই সঙ্গে আরেকটা ছবি দেখিয়েছিলেন। ছবিটা ছাপা ছিল ডাকটিকেটের ওপর। কালো কালিতে আঁকা। জাপানের একজন নামকরা ছবি আঁকিয়ের। ডাকটিকেটটা বাবা তাকে দিয়ে দিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে আরো রঙীন রঙীন ছোট্ট ছোট্ট টিকেট। সব জমা করে রেখেছে তিমু।

তিমু ভাবে বড় হলে আরো ছবি দেখবে। ছবির বই কিনবে। ঘোড়ার ছবি। নানান দেশের।

একটা খালি ঠেলাগাড়ি আস্তে আস্তে বাড়ির সামনে আসে। তিমুর মনে হল ভিজে ক্লান্ত ঠেলা গাড়িটার কোথাও যাবার যেন ইচ্ছে নেই। শব্দ শুনে ঘোড়াটা চকিতে মুখ তোলে। এগুতে থাকে একপা একপা করে। তারপর মিশে যায় দূর দালানের কাল অন্ধকারে।

তিমুর হঠাৎ মনে হলো ভিজে জবুথবু ঠেলাওয়ালাটার সঙ্গে ওই বুড়ো ঘোড়াটার কো[illegible] তফাৎ নেই।





ছোটমাসির মেয়েরা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা শহরে বাঘ, ভাল্লুক কিংবা গণ্ডার নেই বটে, তবে কিনা চোর ডাকাত আর ছেলেধরা সবসময় গিসগিস করছে। আমার ছোটমাসির কাছে তাই এই শহরটাও গভীর জঙ্গলের মতন। সব সময় সাবধানে থাকতে হবে।

ছোটমাসির দুই মেয়ে, রুমু আর ঝুমু। ওদের আরও দুটো বেশ ভাল-ভাল নাম আছে বটে, কিন্তু সে-দুটো বেশ শক্ত, রুমু ঝুমু নামেই সবাই চেনে। ছোটমাসি তাদের এক মিনিটের জন্যও চোখের আড়াল করেন না। নেহাত ইস্কুলের সময়টুকু ছাড়া। তাও ছোটমাসি ওদের ইস্কুলে পৌঁছে দেন, দুপুরে টিফিনের সময় যান, আবার বিকেলে যান নিয়ে আসতে। রুমু আর ঝুমু পড়ে ক্লাস এইট আর নাইনে। ওরা বেশ বড় হয়ে গেছে, নিজেরাই স্কুলে যাওয়া-আসা করতে পারে, কিন্তু তার কোনো উপায় নেই, ছোটমাসি সবসময় ওদের পাহারা দিয়ে রাখতে চান যে!

আমি একদিন বলেছিলাম, "এই তো বাড়ির কাছেই স্কুল, ওরা তো হেঁটেই চলে আসতে পারে, কত ছেলেমেয়ে আসে।"

ছোটমাসি চোখ গোল-গোল করে বললেন, "আর যদি ছেলেধরা ওদের ধরে নিয়ে যায়? ও পাশের পার্কটায় কয়েকটা বিচ্ছিরি চেহারার লোক বসে থাকে, দেখলেই আমার কী রকম যেন সন্দেহ হয়!"

আমি বললাম, "ছেলেধরা ওদের ধরবে কেন? ওরা তো ছেলে নয়!"

ছোটমাসি তখন এক ধমক দিলেন, "তুই চুপ কর। তুই কিছু বুঝিস না!"

টিফিনের সময় গিয়ে ছোটমাসি কড়া নজর রাখেন ওরা যাতে কোনোরকমে ফুচকা বা ঝালমুড়ি না খেয়ে ফেলে! রুমু-ঝুমুর ক্লাসের বন্ধুরা মনের সুখে আলুকাবলি আর ঘুগনি-চটপটি খায়, কিন্তু ওদের সেদিকে যাবারই উপায় নেই। ছোটমাসির চোখের সামনে বসে ওদের বাড়িতে-তৈরি খাবার খেতে হয়।

আমি অবশ্য মাঝে-মাঝে লুকিয়ে-চুরিয়ে ওদের ডালমুট, চানাচুর আর হজমি গুলি খাওয়াই। যদিও জানি, ধরা পড়ে গেলে ছোটমাসির হাতে আমাকেও বোধহয় মার খেতে হবে!

ছোটমাসির ধারণা চোরডাকাতের মতন অসুখের জীবাণুরাও সব সময় আমাদের চারপাশে ওত পেতে আছে। কখন যে তারা মুখ দিয়ে নাকদিয়ে ঢুকে পড়ে তার ঠিক নেই। সেইজন্য বাইরের কোনো জিনিস খাওয়া ওঁর মেয়েদের একদম বারণ।

একদিন আমি ছোটমাসির বাড়ির রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠেছিলাম। দেখি কী, সেখানে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে, তার মুখটা একটা কাপড় দিয়ে শক্ত করে বাঁধা।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "ছোটমাসি, ও কে?"

ছোটমাসি বললেন, "ও-ই তো আমাদের রান্নার ঠাকুর!"

"ওর মুখ বাঁধা কেন?"

"বাঃ মুখ বাঁধা থাকবে না? আমার রান্নাঘরে মুখ-খোলা কারুকে ঢুকতে দিই না। মনে কর. দুধ জ্বাল দিচ্ছে কিংবা ঝোল রাঁধছে, এমন সময় আপন মনে কথা বলে ফেলল! আর কথা বললেই একটু থুতু ছিটকে বেরিয়ে আসতে পারে। তাহলে ওদের সেই থুতুমাখা জিনিস আমরা খাব?"

"রান্না করতে করতে আপন মনে কথা বলবে কেন?"

"যদি বলে? হঠাৎ বলে ফেলতেও তো পারে!"

আমি হাসতে-হাসতে বললাম, "আমরা কথা বলার সময় তো থুতু বেরোয় না!"

ছোটমাসিও হাসতে-হাসতে বললেন, "একটু-একটু বেরোয়, চোখে দেখা যায় না! স্বাস্থ্য-বইতে লেখা আছে!"

আর একদিন দেখেছিলাম ও বাড়ির বাজার করা। সব বাড়ির লোকেরা বাজারে যায় থলি নিয়ে। আর ছোটমাসির চাকর যায় একটা বড় প্লাস্টিকের বালতি নিয়ে, সেটায় আবার জল ভরা থাকে। সেই বালতিতে করে আনা হয় জ্যান্ত মাছ। ছোটমাসি তখন দাঁড়িয়ে থাকেন দোতলার বারান্দায়। চাকর বালতি থেকে মাছটা তুলে ছুঁড়ে দেয় উঠোনে। তখন মাছটা যদি দু' তিনবার লাফায় তাহলে ছোটমাসি খুশি। আর যদি বেচারা মাছটা লাফাতে না পারে অমনি ছোটমাসি বলবেন, যা, এক্ষুনি ফেরত দিয়ে আয়!

ছোটমাসিদের দুধ নেওয়া হয় বাড়ির সামনেরই একজন গোয়ালার কাছ থেকে। দুধ দোয়াবার সময় ছোটমাসি রোজ সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন যাতে একফোঁটাও জল মেশানো না হয়। এ-ব্যাপারে তিনি ঠাকুর-চাকরদেরও বিশ্বাস করেন না। শুধু তাই নয়, তিনি আর-একটা কাণ্ডও করেন। সেটা অবশ্য আমি নিজে দেখিনি, তবে শুনেছি। দুধ দোয়াবার আগে নাকি ছোটমাসি রোজ সেই গরুকে দশখানা জেলুসিল ট্যাবলেট গুঁড়ো করে খাইয়ে দেন। গরুর যদি অম্বল হয়, তাহলে সেই দুধ খেয়ে ওঁর মেয়েদেরও অম্বল হবে সেইজন্য এই ব্যবস্থা।

এই তো গেল খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার। কিন্তু কলকাতার রাস্তাঘাটে তো অনেক নোংরা থাকে, আর নিশ্বাসের সঙ্গে তার গন্ধও নাকে ঢুকে যায়। রাস্তায় বেরুলে নিশ্বাস তো নিতেই হবে! সেইজন্য ছোটমাসি মেয়েদের নাকেরও ব্যায়াম করান।

প্রত্যেক শনি-রবিবার ছোটমাসি দুই মেয়েকে নিয়ে চলে যান ঠাকুরপুকুর। সেখানে ওঁদের আর-একটা চমৎকার বাড়ি আছে। সাদারঙের তিনতলা বাড়ি, মস্তবড় বাগান, সবটাই উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা, একদিকের দেয়ালের পাশে একটা ছোট্ট পুকুর। এখানে থাকেন রুমু-ঝুমুর দাদু আর দিদিমা।

এখানে ছোটমাসি মেয়েদের নিয়ে আসেন টাটকা হাওয়া খাওয়াতে। এখানে ধুলোবালি নেই, কাছাকাছি কোনো কলকারখানা নেই বলে বাতাসে ধোঁয়া নেই, খুবই স্বাস্থ্যকর জায়গা।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই ছোটমাসি রুমু-ঝুমুকে নিয়ে চলে আসেন সেই বাড়ির ছাদে। তারপর তাদের পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে বলেন, "নিশ্বাস নে! ভাল করে নিশ্বাস নে!"

ঠিক ড্রিল মাস্টারের মতন ছোটমাসি সামনে দাঁড়িয়ে থেকে বলেন, "নিশ্বাস নে, এবার ছাড়, ছাড়। আবার নে!"



খানিকক্ষণ এরকম করার পর ছোটমাসি বলেন "এবার হাঁ করে খানিকটা হাওয়া খেয়ে ফ্যাল! এরকম টাটকা হাওয়া তো কলকাতায় পাবি না!"

রুমু-ঝুমু মায়ের সব কথা শুনে যায় লক্ষ্মী মেয়ের মতন। ওরা বুঝে গেছে, প্রতিবাদ করে কোনো লাভ নেই। ছোটমাসির মনটা বড্ড নরম, কেউ ওর কথায় কোনদিন প্রতিবাদ করলেই উনি অমনি কেঁদে ফেলেন!

এত সব করেও রুমু-ঝুমুর চেহারা বেশ সুন্দর হয়েছে, পড়াশুনোতেও ওরা ভাল। ছোটমাসির এরকম বাড়াবাড়ি দেখে আমরা মাঝে-মাঝে হাসাহাসি করি বটে, তাতে কিন্তু ছোটমাসি চটে যান না। নিজেও হেসে ফেলে বলেন, "তবুও দ্যাখ না, এত সাবধানে থেকেও কি সবসময় ভাল জিনিস পাওয়ার উপায় আছে? সেদিন ওদের খাওয়ার জন্য খুব বেছে বেছে

ছোলা ভিজিয়ে দিলুম, তারপর ম্যাগনিফায়িং গ্লাস দিয়ে দেখি কী, একটা ছোলা পোকায় ফুটো করা!"

একদিন আমি ছোটমাসিদের বাড়িতে দুপুরে বেড়াতে গেছি। ছোটমাসি তখন স্নান করছিলেন। বাথরুম থেকে যখন বেরিয়ে এলেন তখন তাঁর চোখ দুটি কপালে উঠে গেছে, মুখে দারুণ ভয়ের চিহ্ন!

আমিও ভয় পেয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কী হল ?"

ছোটমাসি বললেন, "হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল, আর তারপরেই যা বুকটা কাঁপতে লাগল ··· "

"কী কথা ?"

"তুই জানিস, পৃথিবীর তিনভাগ জল আর এক ভাগ স্থল ?"

আমি আকাশ থেকে পড়লাম। এটা আবার একটা নতুন কথা নাকি ? এতে ভয় পাবারই বা কী আছে ?

আমি বললাম, "তা তে কী হয়েছে ?"

ছোটমাসি বললেন, "পৃথিবীর তিনভাগ জল এটা আগে খেয়াল করিনি। তার মানে আমার মেয়েরা তো কখনো-না-কখনো জলের ধারে যাবেই। এদিকে আমি ওদের সাঁতার শেখাইনি। ওরা ডুবে যাবে যে। কালই যদি ডুবে যায় ?"

আমি হাসতে লাগলাম।

ছোটমাসি বললেন, "ধর, ওরা লেখাপড়ায় খুব ভাল হল। তারপর বিলেত-আমেরিকায় গেল ···· "

আমি বললাম, "তাতো যেতেই পারে।"

"তখন সমুদ্র পেরিয়ে যেতে হবে ··· মনে কর, সমুদ্রের ওপর দিয়ে প্লেন যাচ্ছে হঠাৎ প্লেনটা ভেঙে গেল আর ওরা সমুদ্রে গিয়ে পড়বে ··· তখন যদি সাঁতার না জানে, উরিব্বাবাঃ, কী সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার হবে!"

"বালাই ষাট, ওদের প্লেন কেন ভাঙবে! তবে যদি প্লেন ভেঙেই যায়, তখন অত উঁচু থেকে সমুদ্রে পড়লে ··· "

"প্যারাসুট থাকবে তো! প্লেনে প্যারাসুট থাকে না ? প্যারাসুটে করে জলে নামবে, তারপর তো সাঁতার জানতে হবে।"

আমি কল্পনা করতে লাগলুম প্লেন থেকে প্যারাসুট নিয়ে আমাদের রুমু আর ঝুমু নামছে আটলান্টিক মহাসাগরে, তারপর জলপরীদের মতন সাঁতার কাটতে লাগল।

"যদি জাহাজে করে যায়, জাহাজও তো ফুটো হয়ে যেতে পারে ?"

"তা তো বটেই!"

"পরশু থেকে ওদের গরমের ছুটি। পরশু থেকেই আমি ওদের সাঁতার শেখাব!"

"ঠিক আছে আমিই সাঁতার শিখিয়ে দেব ওদের।"

"তুই সাঁতার শেখাবি ? কোথায় ?"

"কেন, গঙ্গায়।"

"গঙ্গায় ? সাঁতার না শিখেই কেউ গঙ্গায় নামে? রোজ কত লোক ডুবে যায়।"

"তা হলে বালিগঞ্জের লেকে ?"

"ধুত্ ওখানে একগাদা লোক সাঁতার কাটে। কত রকম নোংরা থাকে জলে··· ।"

ছোটমাসি উঠে পড়ে লেগে গেলেন তাঁর দুই মেয়ের সাঁতার শেখাবার ব্যবস্থা করতে। যে-কোনো জায়গায় তো ছোটমাসি মেয়েদের সাঁতার শেখাতে রাজি হতে পারেন না। একদম পরিষ্কার জল চাই, সেই জলে আবার ওষুধ ফেলতে হবে। তার আগে মেয়েদেরও নিতে হবে নানারকম ইঞ্জেকশান।

ছোটমাসির নানান জায়গায় চেনাশুনো। শেষ পর্যন্ত তিনি ব্যবস্থা করে ফেললেন কলকাতার খুব বড় একটা ক্লাবের সুইমিং পুলে। তাও অন্য সকলের সঙ্গে নয়। খুব ভোরবেলা যখন কেউ যায় না, সেই সময় আগের দিনের জল বদলে নতুন জল ভরা হবে, তাতে মেশাবেন ছোটমাসি তাঁর নিজস্ব ওষুধ। এবং সাঁতার শেখাবার জন্য ছোটমাসি ঠিক করলেন একজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েকে। ছোটমাসির ধারণা, যারা ইংরিজি বলে তারা খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, রুমু-ঝুমু এর আগে কখনো মায়ের কথার অবাধ্য না হলেও সাঁতার শিখতে রাজি হল না। দুজনেই বলল, জলে নামতে ওদের ভয় করে।

এদিকে ছোটমাসি একটা জিনিস ধরলে কিছুতেই সেটা মাঝপথে ছাড়েন না। ওদের কত করে বোঝালেন। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "এত ভয় কিসের ? দেখবি একদিন-দুদিন নামলেই ভয় কেটে যাবে। ভাল ট্রেনার থাকবে। দরকার হলে আমি জলে ঝাঁপিয়ে পড়ব !"

মেয়েরা তবু শুনতে চায় না। কাচুমাচু মুখ করে বলতে লাগল, "এ বছর না, পরের বছর !"

সব ব্যবস্থা ঠিকঠাক, এখন মেয়েরা রাজি না হলে কি চলে ? কত কষ্ট করে ছোটমাসি সেই ক্লাবের লোকদের রাজি করিয়েছেন আলাদা ব্যবস্থা করবার জন্য। সুতরাং ছোটমাসি কাঁদতে শুরু করলেন।

কাঁদতে-কাঁদতে বলতে লাগলেন, "আমি তোদের ভালর জন্য এত সব করি। আর তোরা আমার কথা শুনবি না ? সাঁতার না শিখলে কবে হঠাৎ ডুবে যাবি, পৃথিবীর তিনভাগ জল, এক ভাগ স্থল !"

সুতরাং শেষ পর্যন্ত রুমু-ঝুমুকে রাজি হতেই হল।

যেদিন প্রথম সাঁতার শিখতে যাওয়া হবে সেদিন আমিও ভোরবেলা গিয়ে হাজির হলাম। ওদের উৎসাহ দিতে হবে তো! রুমু-ঝুমুর মুখচোখে খুব ভয়-ভয় ভাব। তখনও বলছে, "মা, আজ না গেলে হয় না ? বড্ড ভয় করছে !"

ছোটমাসি খুব নরম গলায় বললেন, "দেখিস কোনো ভয় নেই। আমি তো পাশেই থাকব।"

সেই ক্লাবে গিয়ে সুইমিং পুলের কাছে দাঁড়িয়ে রুমু আর ঝুমু এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ হি হি করে হেসে উঠল। ওদের ট্রেনার মেয়েটি জলে নেমে দাঁড়িয়ে আছে। সে অবাক। আমরা আরও বেশি অবাক। ভয়ের চোটে রুমু-ঝুমুর মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি ?

ছোটমাসি বললেন, "ওমা, তোরা ওরকম করছিস কেন ? ভয় নেই ! ভয় নেই।"

ওরা আরও জোরে হেসে উঠল।

ছোটমাসি বললেন, "থাক, থাক, ভয় পাচ্ছে। ওদের নামতে হবে না !"

রুমু আর ঝুমু অমনি লাফিয়ে পড়ল জলে। ছোটমাসি আঁতকে উঠলেন যেন।

তারপরই দেখলাম একটা মজার দৃশ্য। ট্রেনার মেয়েটি ওদের দু'জনকে ধরতে আসতেই ওরা পাশ কাটিয়ে ঝপাস ঝপাস করে সাঁতার কেটে দূরে চলে গেল। খুব পাকা সাঁতারুর মতন।

অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েটিও হেসে উঠল। ছোটমাসি প্রথমটায় ঠিক বুঝতে পারেননি। তিনি

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী হল ? মেয়েটি হাসছে কেন ?"

আমি বললাম, "ওর বোধহয় খুব হাসিখুশি স্বভাব !"

তারপর ছোটমাসি বললেন, "ওরা অতদূর চলে গেল কী করে ? সাঁতার না জেনেও সাঁতার কাটছে ?"

আমি বললাম, "তোমারই মেয়ে তো। তুমি খুব ভাল সাঁতার জান, তাই ওদের আর শেখার দরকার হয়নি !"

রুমু-ঝুমু এই সময় টুপ করে ডুবে গেল। আর ওঠেই না, ওঠেই না। তখন ছোটমাসি খুব ভয় পেয়ে নিজেই শাড়ি-টাড়ি পরা অবস্থায় জলে লাফিয়ে পড়তে যাচ্ছিলেন, আমি ওঁর হাত টেনে ধরলাম। রুমু-ঝুমু ডুবসাঁতার কেটে অনেক দূরে গিয়ে ভুশ করে আবার মাথা তুলল।

এবার ছোটমাসি বুঝলেন। গালে হাত দিয়ে বললেন, "ওমা ওরা সাঁতাব জানে ? এই, তোরা কোথায় সাঁতার শিখলি ? কবে শিখলি ?"

রুমু-ঝুমু চিত-সাঁতার কাটতে-কাটতে উত্তর দিল "ঠাকুরপুকুরে।"

ছোটমাসি আরও অবাক হয়ে বললেন, "ঠাকুরপুকুরে ওরা কোথায় সাঁতার শিখল ?"

আমি বললাম, "ঠাকুরপুকুব নাম যখন, নিশ্চয়ই সেখানে অনেক পুকুর আছে।"

ছোটমাসি বললেন, "পুকুর কোথায় ? আমাদের ঠাকুরপুকুরের বাড়িতে একটা নোংরা ডোবা আছে। সেটা তো পানায় ভরা, কেউ নামে না !"

রুমু-ঝুমু বলল, "আমরা সেটাতেই সাঁতার শিখেছি।"

"কে শেখাল ?"

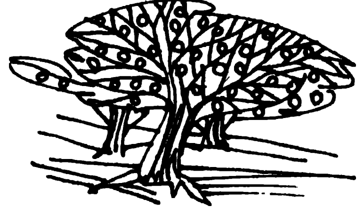
"কেউ শেখায়নি ! নিজে-নিজে !"

ছোটমাসি ধপাস করে একটা বেঞ্চির ওপর বসে পড়ে বললেন, "হায়, হায়, কী হবে ? একা-একা সাঁতার শেখা কী সাঙ্ঘাতিক কথা ! আর ঐ বিচ্ছিরি নোংরা পুকুর, কতকাল ওর জল পরিষ্কার করা হয় না সেটাতে নেমেছে আমার মেয়েরা ! ওরা বেঁচে আছে, কী করে ? হ্যাঁরে নিলু, কী হল বল তো !"

আমি বললাম, "সত্যিই তো, ওরা বেঁচে আছে কী করে ! খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার !"

রুমু-ঝুমু তখন মনের আনন্দে জল তোলপাড় করে সাঁতার কাটছে !





রাজার খেলা

প্রফুল্ল রায়

ধর্মতলায় নিধু জ্যাঠার সঙ্গে ট্রাম থেকে নেমে কার্জন পার্কের ভেতর দিয়ে ইডেন গার্ডেনের দিকে যেতে যেতে একেবারে হাঁ হয়ে গেল রাজা। চারপাশ থেকে যত বাস মিনিবাস ট্রাম ট্যাক্সি আর প্রাইভেট কার আসছে, সব মানুষে ঠাসা। গাড়িগুলো এসে থামছে কার্জন পার্কে, রাজভবনের গায়ে এবং ওধারের ময়দানে। সেগুলো থেকে গল গল করে মানুষ বেরিয়ে এসে সোজা চলেছে ইডেন গার্ডেনের দিকে। আজ গোটা কলকাতা যাচ্ছে রঞ্জি স্টেডিয়ামে ইণ্ডিয়া ভার্সাস ইংল্যাণ্ডের টেস্ট ম্যাচ দেখতে।

কার্জন পার্ক থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় এসে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হলো। অগুনতি গাড়ি সামনে দিয়ে দারুণ স্পীডে রেড রোডের দিকে ছুটে যাচ্ছে। ট্রাফিক কনট্রোলে লাল আলো জ্বলতেই ছুটন্ত গাড়িগুলো থেমে গেল। আর নিধু জ্যাঠার হাত ধরে, রাস্তা পেরিয়ে রাজভবনের ফুটপাথে চলে এল রাজা। তারপর মানুষের স্রোতে ভাসতে ভাসতে এগিয়ে চলল।

নিধু জ্যাঠার বয়স সত্তরের কাছাকাছি। সাধারণ বাঙালিদের তুলনায় সে অনেক লম্বা, প্রায় ছ ফুটের মতো। টান টান চেহারা, শরীরে এক গ্রাম বাজে চর্বি নেই। মাথার প্রায় সব চুল সাদা হয়ে গেছে, তবু নিধু জ্যাঠা খুব স্মার্ট। তার হাঁটার ভঙ্গি যুবকদের মতো।

এই মুহূর্তে নিধু জ্যাঠার পরনে মালকোচা দিয়ে পরা ধুতি আর ফুল শার্ট, তার ওপর রোঁয়াওলা উলের সোয়েটার। পায়ে কেডস। কাঁধ থেকে একটা কাপড়ের ব্যাগ ঝুলছে।

তার পাশে রাজাকে বেশ ছোট দেখাচ্ছে। রাজার পরনে এখন ফুল প্যান্ট আর বুশ শার্ট, তার ওপর লাল পুল-ওভার। পায়ে নীল মোজা আর বুট।

রাজভবনের ফুটপাথটা সেমি সার্কেলে ঘুরে গেছে। সেটা ধরে খানিকটা যেতেই চোখে পড়ল, ওধারের ময়দানে কয়েক হাজার প্রাইভেট কার পার্ক করা রয়েছে। তার মানে গাড়িওলারা ওখানে গাড়ি রেখে স্টেডিয়ামে ঢুকেছে। খেলা ভাঙলে ফিরে এসে যে যার গাড়িতে উঠে চলে যাবে।

নিধু জ্যাঠার পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে দারুণ ভাল লাগছিল রাজার, ভীষণ উত্তেজনাও হচ্ছিল। তার কারণ, এই প্রথম সে ইডেন গার্ডেনে টেস্ট ম্যাচ দেখতে যাচ্ছে।

রাজারা থাকে উত্তর কলকাতায়—বাগবাজারের কাছে একটা সরু গলিতে। সে পড়ে মডেল স্কুলে, ক্লাস সিক্সে। আজ একত্রিশে ডিসেম্বর। এ বছরেরই অক্টোবরে সে এগার পেরিয়ে বারোয় পা দিয়েছে।

পড়াশোনায় রাজা বেশ ভাল। প্রতি বছর ক্লাসে ফার্স্ট হয়ে আসছে। লেখাপড়ার মতো খেলাধুলোতেও তার খুব ঝোঁক। কিন্তু নর্থ ক্যালকাটায় খেলার মাঠ নেই। কখনও সখনও কোনো পার্কে একটু জায়গা পেলে পাড়ার ছেলেদের জুটিয়ে টেনিস বল দিয়ে ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবল কি ইণ্ডিয়া-অস্ট্রেলিয়া টেস্ট ম্যাচের আসর বসিয়ে দ্যায়। নইলে খবরের কাগজের খেলার পাতা আর ঝকমকানো রঙিন সব স্পোর্টস ম্যাগাজিন পড়ে কখনও সে স্বপ্ন দ্যাখে পেলের মতো ফুটবল খেলোয়াড় হবে, কখনও বা ভাবে ভিভ রিচার্ডসের মতো ব্যাটসম্যান না হলে চলবে না।

এই খেলাধুলোর ব্যাপারটায় সারাক্ষণ রাজাকে তাতিয়ে রাখে নিধু জ্যাঠা। এই যে আজ জীবনে প্রথম ইডেনে টেস্ট ম্যাচ দেখতে যাচ্ছে সেটাও নিধু জ্যাঠার জন্যই।

রাজার বাবারও খেলাটেলায় যথেষ্ট আগ্রহ। তিনি মোটামুটি একটা চাকরি করেন। এদিকে ফ্যামিলিতে লোকজন অনেক। রাজারা চার ভাইবোন, বাবা, মা, ঠাকুমা আর এক বিধবা পিসিমা। মোট আটজন। এত বড় সংসার চালাতে অফিস ছুটির পরও বাবা আরো কী সব করেন। বাড়ি ফিরতে ফিরতে রোজই তাঁর রাত হয়। অনেক কষ্টে টায়টোয় কোনোরকমে রাজাদের চলে যায়।

বাবার পক্ষে পঁচাত্তর টাকা দিয়ে টেস্ট ম্যাচের টিকিট কেটে দেওয়া সম্ভব না। দামী দামী খেলার ম্যাগাজিনও তিনি কিনে দিতে পারেন না। বাড়িতে একটাই মোটে বাংলা খবরের কাগজ আসে। নিধু জ্যাঠাই এর ওর কাছ থেকে অন্য সব খবরের কাগজ আর ম্যাগাজিন চেয়ে এনে রাজাকে দেয়। পড়া হয়ে গেলে সেগুলো ফেরত দিয়ে আসে।

টেস্ট খেলা তো আজ বললে কাল হয় না। ছ'মাস কি তারও আগে ঠিক করা থাকে। এবার ইডেনে ইণ্ডিয়া ইংল্যাণ্ডের টেস্ট দেখার জন্য রাজা আর নিধু জ্যাঠা সবাইকে লুকিয়ে পয়সা জমাতে শুরু করেছিল। দু'জনের টিকিটের দাম দেড়'শ টাকা। টেস্টের তারিখটা জানার পর থেকেই টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে একটা ফাঁকা পাউডারের কৌটোয় রাখছিল রাজা। এইভাবে পঁচিশ টাকা জমানো গেছে। বাকি একশ পঁচিশ টাকা দিয়ে দু'খানা টিকিট কিনে আনে নিধু জ্যাঠা।

নিধু জ্যাঠা রাজার আপন জ্যাঠা নয়। এমন কি তার সঙ্গে কোনোরকম সম্পর্কই নেই। না থাক, তবু আপনজনের চেয়ে সে অনেক বেশি।

রাজা শুনেছে, দেশভাগের আগে ঢাকা শহরে বাবারা যে পাড়ায় থাকতেন নিধু জ্যাঠাও সেখানেই থাকত। বাবার থেকে কয়েক বছরের বড়; সেই হিসেবে সে বাবার দাদা, রাজাদের জ্যাঠা।

নিধু জ্যাঠার পোশাকী নাম প্রিয়নাথ নাগ, ডাকনাম নিধু। ভাল নামটা লোকে ভুলেই গেছে। নিধুটাই সবার মুখে মুখে চালু রয়েছে।

নিধু জ্যাঠার তিন কুলে কেউ নেই, বিয়েও করেনি। রাজা শুনেছে, দেশভাগের কয়েক বছর বাদে ঢাকা থেকে বাবাদের সঙ্গে সে-ও কলকাতায় চলে আসে। তার জন্মের ঢের আগে থেকেই নিধু জ্যাঠা তাদের বাড়িতে আছে। তবে তার খরচ সে নিজেই চালায়। কলেজ স্ট্রীটে একটা বড়

বইয়ের দোকানে কী একটা কাজ করে। তাতে যে মাইনে পায় তার প্রায় সবটাই মাসের শেষে বাবার হাতে তুলে দেয়। তাতে রাজাদের যথেষ্ট উপকার হয়। দিনে সাত-আট কাপ চা ছাড়া আর কোনো নেশা নেই। সবাই তাকে ভালবাসে। ছোটদের যত আবদার তার কাছে।

রাজা আরো শুনেছে ঢাকায় থাকতে দুর্দান্ত স্পোর্টসম্যান ছিল নিধু জ্যাঠা। বিখ্যাত উয়াড়ি ক্লাবের সে ছিল বাঘা রাইট আউট। তখন ঢাকায় ক্রিকেট খেলাটা তেমন একটা হত না। তবু উৎসাহ কম ছিল না। ওরই মধ্যে ব্যাট-ট্যাট কিনে প্র্যাকটিশ করত।





পৃথিবীতে যত বড় বড় ফুটবল আর ক্রিকেট খেলা হয়েছে তার সমস্ত রেকর্ড নিধু জ্যাঠার মুখস্থ। তার কাছেই রাজা শুনেছে টেস্ট ম্যাচে কে সবচেয়ে বেশি ছক্কা মেরেছে, কে বেশি ক্যাচ ধরেছে, কোন দেশে সবচেয়ে বেশি অল রাউণ্ডার পাওয়া গেছে, ইত্যাদি। ফুটবলের গল্প শুরু

হলে তো রাতের পর রাত কাবার করে দিতে পারে নিধু জ্যাঠা। পেলে, লেভ ইয়াসিন, গ্যারিঞ্চা বা জার্ড মূলার থেকে পাওলো রোসি পর্যন্ত কে কীভাবে গোল করে, কার খেলার স্টাইল কী রকম—বলতে বলতে তার চোখ জ্বলজ্বল করতে থাকে।

এতক্ষণে বাঁ দিকে রেড রোড, নেতাজীর স্ট্যাচু, দেশবন্ধুর মূর্তি রেখে আকাশবাণী ভবনের সামনে এসে পড়ল রাজারা। এখানে বাঁশের খুঁটি পুঁতে নানা গেটের দিকে যাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চারদিকে প্রচুর পুলিশ। একজন পুলিশ অফিসারকে জিজ্ঞেস করে সাত নম্বর গেটের হদিসটা জেনে নিল নিধু জ্যাঠা।

মিনিট পনেরর ভেতর দেখা গেল, ক্লাব হাউসের ডান দিকে সিমেন্টের গ্যালারিতে তারা সীট খুঁজে বসে পড়েছে। বাড়ি থেকে আসার সময় দুপুরে খাবার জন্য মা লুচি আলুভাজা ডিমসেদ্ধ আর কমলালেবু দিয়েছিল। খাবারগুলো একটা কাপড়ের সাইড-ব্যাগে পুরে নিয়ে এসেছে নিধু জ্যাঠা। ব্যাগটা এখন তার কোলে।

এখনও খেলা শুরু হয়নি। সবে সাড়ে ন'টা। আরো আধ ঘণ্টা বাদে ঠিক দশটায় টস হবে, তারপর তো খেলা।

রাজা মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিক দেখতে লাগল। তাদের বাঁ পাশে ক্লাব হাউস। তারপর থেকে গোল মাঠটাকে ঘিরে স্টেডিয়ামের অনেকগুলো ব্লক। ব্লকগুলোতে এখন শুধু মানুষ আর মানুষ। অসংখ্য গেট দিয়ে আরো অনেকে আসছে। কোথাও এক ইঞ্চি জায়গা ফাঁকা থাকবে না, খেলা শুরু হবার আগে স্টেডিয়াম বোঝাই হয়ে যাবে।

পশ্চিম দিকের ব্লকগুলোর পেছনে ইডেন গ্যার্ডেনের উঁচু উঁচু গাছ, আরো দূরে হাইকোর্টের চুড়ো দেখা যাচ্ছে।

এতদিন রাজা তার বন্ধু বুবুনদের টিভিতেই রঞ্জি স্টেডিয়াম দেখেছে।

এখন নিজের চোখে সব দেখতে পাচ্ছে। এত মানুষ, তাদের নানা রঙের পোশাক, মাথার টুপি, ক্লাব হাউস, ইডেনের গাছপালা—সমস্ত মিলিয়ে স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে।

এ বছর শীতটা বেশ জাঁকিয়েই পড়েছে। কনকনে হাওয়া ইডেন গার্ডেনের ওপর দিয়ে সাঁই সাঁই ছুটে যাচ্ছে। হাওয়াটা এত ঠাণ্ডা, মনে হয় হিমালয়ের বরফ গায়ে মেখে নেমে এসেছে। অবশ্য রোদও উঠেছে চমৎকার। উষ্ণ সোনালি রোদ আর ঠাণ্ডা বাতাসে শীতের সকালটি দারুণ লাগছে।

চারপাশের মানুষেরা আজকের খেলাটার ব্যাপারে নানা রকম মন্তব্য করে যাচ্ছে।

একজন বলল, 'গাভাসকার টপ ফর্মে আছে। ইডেনে ডাবল সেঞ্চুরি করবে।'

আরেক জন বলল, 'কচু করবে। কাওয়ানস আর এডমণ্ডসকে ঠেকিয়ে কুড়িটা রান আগে করুক। তারপর বলবেন—'

তৃতীয় লোকটি বলল, 'এই নতুন ছেলেটা, মানে আজাহারউদ্দিন সম্পর্কে কী মনে হয়?'

চতুর্থ লোকটি বলল, 'আমার ধারণা, খুব ভাল খেলবে। ওকে পাওয়াতে ইণ্ডিয়ার মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যানদের সমস্যা অনেকটাই মিটে যাবে।'

পঞ্চম লোকটি বলল, 'ইংল্যাণ্ডের ল্যাম্ব আর গ্যাটিং দুর্দান্ত খেলছে এই সীজনটা। এখানকার টেস্টের রেজাল্ট কী হবে কে জানে।'

রাজারা যেখানে বসে আছে সেখান থেকে পাঁচ রো নিচের সীট থেকে একটা লোক অনবরত চেঁচিয়ে যাচ্ছে, 'এই আইসক্রিম, এই পটেটো চীপস, এই চিউয়িং গাম, এই পপ কর্ন, ইধর আও—' অর্থাৎ সামনে দিয়ে যে ফেরিওলা যা-ই নিয়ে যাক তাকেই ডাকছে লোকটা।

রাজার বাঁ পাশের সীটে এক মহিলা স্টেডিয়ামে ঢুকেই ব্যাগ থেকে উলের গোলা বার করে সোয়েটার বুনে চলেছেন। তাঁর ডান ধারে এক বেজায় মোটা মারোয়াড়ি আরেক জনের কাঁধে মাথা রেখে ঘুমোতে শুরু করেছে। খুব সম্ভব উল বোনা আর ঘুমোবার মতো জরুরি কাজের জন্যই তাদের এখানে আসা।

রাজা কিন্তু এসব কিছুই শুনছিল না, বা লক্ষ্যও করছিল না। সে শুধু স্বপ্নের ঘোরে পুরো স্টেডিয়ামটা বার বার দেখছে।

হঠাৎ পাশ থেকে নিধু জ্যাঠা ডাকল, 'রাজা—'

অন্যমনস্কর মতো সাড়া দিল রাজা, 'উঁ—'

'নোট বইটা এনেছিস ?'

একটা তিন ইঞ্চি বাই দু ইঞ্চি মাপের ছোট-সবুজ মলাটের নোট বই রাজাকে দিয়েছে নিধু জ্যাঠা। ওটাতে পেলে গ্যারিঞ্চা বেকেন বাউয়ার থেকে শুরু করে মারাদোনা ফ্রান্সিস কোলি ইউসোবিও পর্যন্ত ফুটবলের বাঘা বাঘা খেলোয়াড়দের গোল করার কায়দা যেমন লেখা আছে তেমনি ভিভ রিচার্ডস, ব্রাডম্যান, উইকস, গাভাসকার ইত্যাদি ক্রিকেটের বড় বড় স্টাররা কে কীভাবে স্ট্রোক করেন তার নিখুঁত বর্ণনাও নোট বইটিতে পাওয়া যাবে। ক্রিকেট এবং ফুটবলের দারুণ কিছু ঘটলেই রাজার সবুজ নোট বুকে তা উঠে যায়।

রাজা ঘাড় হেলিয়ে বলল, 'এনেছি।'

'ভেরি গুড। যখনই কারো ভালো স্ট্রোক কি বোলিং দেখবি তক্ষুণি টুকে রাখবি।'

মুখে কিছু না বলে আবার ঘাড় কাত করে রাজা।

কাঁটায় কাঁটায় দশটায় পেঙ্গুইন পাখির মতো ঢলঢলে কালো কোট-পরা দুই আম্পায়ার এবং দু'দলের ক্যাপ্টেন সুনীল গাভাসকার আর ডেভিড গাওয়ার মাঠের মাঝখানে টস করতে এলেন। টসে জিতে ইণ্ডিয়া ব্যাটিং নিল। গাওয়ার এবং গাভাসকার ক্লাব হাউসে ফিরে গেলেন। আম্পায়াররা মাঠেই থেকে গেলেন।

একটু পরেই গাওয়ার তাঁর টীম নিয়ে ফিল্ডিং করতে এলেন। গাভাসকার তাঁর পার্টনার গাইকোয়াড়কে নিয়ে এলেন ব্যাটিং করতে।

সবুজ কার্পেটের মতো গোল মাঠে ধপধপে সাদা ট্রাউজার্স শার্ট পরা এগার জন ফিল্ডার, দু'জন ব্যাটসম্যান আর কালো কোট পরা দু'জন আম্পায়ার ছাড়া আর কেউ নেই।

এতদিন টিভিতে আর স্বপ্নে রাজা যাদের দেখেছে, এখন তারা একেবারে চোখের সামনে। উত্তেজনায় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এসেছে তার, চোখের পলক পড়ছে না।

গাভাসকার আর গাইকোয়াড় কিন্তু বেশিক্ষণ ব্যাট করতে পারলেন না, অল্প রান করেই এডমণ্ডস এবং কাওয়ানসের বলে কট আউট হয়ে গেলেন।

কাওয়ানস দুর্দান্ত 'বল' করছিলেন। নিধু জ্যাঠা পাশ থেকে ফিসফিস করে বলল, 'কাওয়ানসের বল করার কায়দাটা টুকে নে।'

রাজা নোট বই আর ডট পেন বার করেই রেখেছিল। তক্ষুণি লিখে ফেলল।

গাভাসকার এবং গাইকোয়াড়ের পর এলেন বেঙ্গসরকার আর অমরনাথ। বেঙ্গসরকার এবং অমরনাথের দুটো স্ট্রেট ড্রাইভ, একটা স্কোয়ার কাট আর একটা সুইপের বর্ণনা লিখে নিল রাজা।

বেঙ্গসরকার এবং অমরনাথ জুটি আউট হলে এলেন রবি শাস্ত্রী আর আজাহারউদ্দিন। তাঁদের কত লেট কাট, অন ড্রাইভ, পুল আর কভার ড্রাইভের বিবরণ যে রাজার নোট বুকে

টোকা হতে লাগল তার ঠিক নেই।

একসময় প্রথম দিনের খেলা শেষ হলো।

এরপর আরো চার দিন নিধু জ্যাঠার সঙ্গে ইডেনে এল রাজা। ইণ্ডিয়ার প্রথম ইনিংস সাত উইকেটে চারশ সাঁইত্রিশ রানে ডিক্লেয়ার করে দেওয়া হলো। ইংল্যাণ্ড আউট হলো দুশো ছিয়াত্তর রানে। শেষ পর্যন্ত ম্যাচ ড্র হয়ে গেল।

এর মধ্যে মাইক গ্যাটিং আর অ্যালান ল্যাম্বের হাঁটু মুড়ে পুল, সুইপ, ড্রাইভ, চেতন শর্মা, শিবরামকৃষ্ণণ ও শিবলাল যাদবের বোলিং-এর স্টাইল, ডেলিভারি, সব টুকে নিয়েছে রাজা।

১৯৫৫-এর পাঁচই জানুয়ারি খেলা শেষ হবার ঘণ্টাখানেক আগে পাশ থেকে নিধু জ্যাঠা হঠাৎ বলল, 'আচ্ছা রাজা—'

পাঁচ দিন ধরে রাজার চোখ মাঠের মাঝখানেই আটকে আছে। মুখ না ফিরিয়ে সে বলল, 'কী বলছ?'

'স্টেডিয়ামে সবসুদ্ধু কত লোক আছে বল্ তো—'

'খবরের কাগজে লিখেছে আশী হাজার।'

'এর মধ্যে কত বাঙালী আছে, মনে হয়?'

'বলতে পারব না।'

একটু ভেবে নিধু জ্যাঠা বলল, 'ধর মিনিমাম সত্তর হাজার।'

রাজা উত্তর দিল না।

নিধু জ্যাঠা এবার বলল, 'সত্তর হাজার লোকের হাত কতগুলো?'

রাজা হতভম্বের মতো বলল, 'তুমি কি খেলা দেখতে এসে গুণ অঙ্কের ক্লাস বসাতে চাইছ?'

'বল্ না—'

'একজন মানুষের দুটো করে হাত হলে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার।'

'রাইট। ভেবে দ্যাখ, কেউ ভাল ব্যাট, বল বা ফিল্ডিং করলে সত্তর হাজার বাঙালী একলাখ চল্লিশ হাজার হাতে হাততালি দিচ্ছে। দিচ্ছে কিনা?'

মাঠের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে এনে বিমূঢ়ের মতো তাকালো রাজা। বলল, 'হ্যাঁ দিচ্ছে।'

'এবার বল্ মাঠে কত জন প্লেয়ার খেলছে?'

'দু দলের বাইশ জন।'

'তাদের ভেতর ক'জন বাঙালী?'

'একজনও না।'

অনেকক্ষণ চুপচাপ।

তারপর খুব আস্তে আস্তে, অথচ বেশ জোর দিয়ে নিধু জ্যাঠা বলল, 'আর কেউ পারুক, আর না-ই পারুক, তোকে অন্তত মাঠের মাঝখানে ওই বাইশ জনের একজন হতে হবে।'

রাজা চমকে উঠল, 'কীভাবে?'

'লেখাপড়ার সঙ্গে ক্রিকেট প্র্যাকটিশ করে করে, ভাল খেলা শিখে।'

'শিখব কী করে? আমার কি প্যাড আছে? ব্যাট, উইকেট, গ্লাভস, ডিউস বল আছে?'

'ঠিক বলেছিস।' খানিকক্ষণ চিন্তা করে নিধু জ্যাঠা বলল, 'দেখি কী করা যায়।'

টেস্ট ম্যাচ শেষ হবার মাসখানেক বাদে একদিন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে ভীষণ অবাক হয়ে গেল রাজা। যতটা অবাক, ততটাই খুশি। নিধু জ্যাঠা নতুন ব্যাট, লাল টুকটুকে ডিউস বল,

প্যাড, উইকেট আর গ্লাভস কিনে এনে তারজন্য অপেক্ষা করছে।

রাজার বাবাও হঠাৎ শরীর খারাপ হওয়ায় আজ তাড়াতাড়ি অফিস থেকে বাড়ি ফিরে এসেছেন। তিনি বললেন, 'নিধুদা, এত টাকা খরচ করে এসব কিনতে গেলে কেন?'

নিধু জ্যাঠা বাবাকে বলল, 'এ নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না ভজন।' রাজার বাবার ডাকনাম ভজন।

'কিন্তু টাকাগুলো পেলে কোথায়? নিশ্চয়ই ধার-টার করেছ?'

'যা ভাল বুঝেছি, করেছি। তোর শরীর ভাল না, শুয়ে থাক গিয়ে।'

বাবা তাঁর এই একরোখা জেদী দাদাটিকে ভাল করেই চেনেন। আর একটি কথাও না বলে তিনি অন্য ঘরে চলে গেলেন।

নিধু জ্যাঠা বলল, 'তাহলে কাল থেকেই প্র্যাকটিশ শুরু করা যাক। ভাবছি তোর সঙ্গে আমিও নতুন করে আরম্ভ করব। ভোরবেলা উঠে আড়াই ঘণ্টা পড়ে নিবি, তারপর এক ঘণ্টা প্র্যাকটিশ। মাঠ থেকে ফিরে আধঘণ্টা রেস্ট। রেস্টের পর স্নান করে খেয়ে স্কুলে। আর আমি চলে যাব কলেজ স্ট্রীটে। কাল থেকে এই হবে আমাদের রোজকার রুটিন। ঠিক আছে?'

রাজা মাথা হেলিয়ে জানালো, 'ঠিক আছে।'

'মনে রাখবি, ইডেন গার্ডেনে মাঠের ভেতর যে বাইশ জনকে দেখেছিস তার একজন তোকে হতেই হবে।'

রাজা বলল, মনে রাখবে।

পরদিন সকালে ব্যাট প্যাড-ট্যাড নিয়ে ঠিক আটটায় রাজা আর নিধু জ্যাঠা চলে গেল কাছাকাছি একটা পার্কে। সেখানে ঘাস-টাস বলতে কিছু নেই। চারদিক গর্তে বোঝাই। এখানে ক্রিকেট প্র্যাকটিশ অসম্ভব।

নিধু জ্যাঠা বলল, 'চল, অন্য জায়গায় যাই।'

খানিকটা দূরে আরেকটা পার্কে এসেও কাজের কাজ কিছুই হলো না। সি· এম· ডি· এ'র কী সব কাজকর্ম হচ্ছে এদিকে, যার জন্য পার্কটায় অগুনতি গুদাম বানিয়ে মালপত্র রাখা হয়েছে। দশ ইঞ্চি জায়গাও এখানে ফাঁকা পড়ে নেই।

এবার রাজারা গেল আরো দূরের একটা পার্কে। সেটা পাতাল রেল দখল করে রেখেছে। এখানেও বিরাট বিরাট গোডাউন। সেগুলো সিমেন্ট বালি লোহার রড এবং নানারকম ভারী ভারী যন্ত্রপাতিতে বোঝাই।

রাজার স্কুল আর নিধু জ্যাঠার কাজে যাবার সময় হয়ে আসছিল। ওরা বাড়ি ফিরে এল। ঠিক হলো, পরের দিন আবার মাঠের খোঁজে বেরুবে।

কিন্তু পরের দিনও খেলার মাঠ পাওয়া গেল না। সব পার্কই হয় সি· এম· ডি· এ· নয় পাতাল রেল কিংবা হকার আর ভিখিরিরা দখল করে রেখেছে।

চারদিন ঘোরাঘুরির পর একটা পার্ক পাওয়া গেল কিন্তু সেখানে বদমাশ বাজে ছোকরাদের আড্ডা। রাজাদের উইকেট পুঁততে দেখে তারা তেড়ে এল, 'এখানে খেলা-ফেলা চলবে না। ভাগ—'

রাজা হতাশ হয়ে পড়ল। কিন্তু নিধু জ্যাঠা ভেঙে পড়ার মানুষ না। খবর নিয়ে সে জানতে পারল, ওই ছোকরাগুলো সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত পার্কে বসে থাকে। সারাক্ষণ নেশাটেশা করে। ওরা পারে না, এমন নোংরা কাজ নেই। ওদের জন্য সন্ধে পর্যন্ত কেউ পার্কে ঢুকতে পারে

না। তবে সন্ধের পর ঠাণ্ডাটা যখন আরো কয়েক গুণ বেড়ে যায় তখন ওরা পার্ক থেকে চলে যায়।

এই পার্কটার ভেতরে এবং চারদিকের রাস্তায় কর্পোরেশন প্রচুর তেজী আলো লাগিয়ে দিয়েছে। এত আলো যে একটা আলপিন পড়লে খুঁজে নেওয়া যায়।

নিধু জ্যাঠা আর রাজা ঠিক করে ফেলল, রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়ার পর আলোয় ঝলমলে ফাঁকা পার্কে তারা প্র্যাকটিশ করতে আসবে। ঠাণ্ডাটা তখন একটু বেশিই থাকবে কিন্তু কী আর করা যাবে! ক্রিকেট তো শীতেরই খেলা। তা ছাড়া ইংল্যাণ্ডে গেলে তো এর থেকে অনেক বেশি ঠাণ্ডায় খেলতে হবে।

পরদিন রাত থেকেই আলোকিত ফাঁকা মাঠে সত্তর বছরের একজন বোলার বারো বছরের এক ব্যাটসম্যানকে বল করতে থাকে। চারদিক নিঝুম, মাথার ওপর জানুয়ারির হিম পড়ে যাচ্ছে অবিরাম। কিন্তু দুই ক্রিকেটারের সে ব্যাপারে হুঁশ নেই। সারা পৃথিবীকে ভুলে গিয়ে তারা প্র্যাকটিশ করে চলেছে।

নিধু জ্যাঠা বল করতে করতে বলে, 'এই একটা লেগ স্পিন দিলাম। সুইপ কর—'

রাজা ব্যাট চালায়।

নিধু জ্যাঠা হাঁ হাঁ করে ওঠে, 'হলো না, হলো না। ল্যাম্ব শিবরামকৃষ্ণণের বলে হাঁটু মুড়ে কীভাবে সুইপ করেছিল, ভেবে নে—' বল কুড়িয়ে এনে আবার ডেলিভারি দিতে গিয়ে বলল, 'আবার লেগ স্পিন দিচ্ছি। ট্রাই এগেন—'

এইভাবে রাতের পর রাত দু'জনে প্র্যাকটিশ করে যায়। ইডেন গার্ডেনে বাইশ জন টেস্ট খেলোয়াড়ের মধ্যে একজন হতে পারবে কিনা, রাজা জানে না। কিন্তু চেষ্টা তো করে যেতে হবে।





ডবল পশুপতি

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

পশুপতিবাবু নিতান্তই ভালমানুষ। তবে দোষের মধ্যে তাঁর মুখটা বড় ভুলো। তিনি সর্বদা এতই আনমনা যে, আচমকা যদি কেউ তাঁকে তাঁর নামটা জিজ্ঞেস করে, তা হলেও তিনি চট করে সেটা মনে করতে পারবেন না। একটু ভেবে বলতে হয়।

পশুপতিবাবুদের অবস্থা একসময়ে বেশ ভালই ছিল। তাঁর ঠাকুর্দা পুরনো জিনিস কেনাবেচার কারবার করে খুব পয়সা করেছিলেন। বিশাল দো-মহলা বাড়ি, গাড়ি, জমিজমা. দাসদাসীর অভাব ছিল না। তবে এখন আর তার বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নেই। বাড়িটা আছে, তবে সংস্কার আর মেরামতির অভাবে সেটার অবস্থা বেশ করুণ। বিশাল বাগানটা এখন আগাছায় ভরা। বহু লোক বাড়িটা ভাড়া নিতে চায়, কিনতে চায়।

এই বিশাল বাড়িতে পশুপতিবাবু একা থাকেন। সকালে উঠে তিনি ডনবৈঠক দেন, কল-ওঠা ভেজা ছোলা আর আদা খান, নিজেই রান্না করেন। একা মানুষ বলে তাঁর বিশেষ টাকা-পয়সার দরকার হয় না। তাঁর একটা ছোট লোহালক্কড়ের দোকান আছে। সামান্য আয় হয়, তবে পশুপতিবাবুর চলে যায়।

দেখতে গেলে পশুপতিবাবুর ভালই আছেন। তবে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, "এই যে পশুপতিবাবু, নমস্কার। কেমন আছেন?" তখন পশুপতিবাবুর ভারী সমস্যা হয়। আসলে কেমন আছেন তা পশুপতিবাবু আকাশ-পাতাল ভেবেও ঠাহর করতে পারেন না। তাই অনেকক্ষণ ভেবেচিন্তে বলেন, "বোধহয় ভালই।" কিংবা, "মন্দ নয়। খারাপও হতে পারে।" অবশ্য এই জবাব দিতে পশুপতিবাবুর এত দেরি হয় যে, প্রশ্নকর্তা হয় ততক্ষণে স্থানত্যাগ করেছেন, নয়তো জবাব শোনার ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছেন।

একদিন সকালবেলা পশুপতিবাবু যখন ডনবৈঠক করছেন, ঠিক সেই সময় একটা লোক

বাইরে থেকে হেঁড়ে গলায় বোধহয় ডাকতে লাগল, "পশুবাবু আছেন নাকি? পশুবাবু?"

ব্যায়ামের সময় কেউ বাধা দিলে পশুপতিবাবু ভয়ানক চটে যান। আজও গেলেন। মাঝপথে ব্যায়াম বন্ধ করা যায় না, আবার জবাব না দিলেও অস্বস্তি। তাই প্রাণপণে বুকডন দিতে দিতে, পশুপতিবাবু শুধু "হুম্, হুম্, হুম্" শব্দ করতে লাগলেন।

লোকটা বুদ্ধিমান। দরজার বাইরে থেকে শব্দটা অনুধাবন করে সন্তর্পণে ভিতরে ঢুকল। তারপর ব্যায়ামরত পশুপতিকে দেখে একগাল হেসে বলল, "ব্যায়াম করছেন? খুব ভাল। ব্যায়ামের মতো জিনিস হয় না। হজম হয়, খিদে পায়, জোর বাড়ে, গুণ্ডা-বদমাশদের ভয় খেতে হয় না। ব্যায়ামের যে কত উপকার।"

পশুপতিবাবু ব্যায়াম করতে করতে লোকটাকে একটু দেখে নিলেন। বেশ সেয়ানা চেহারার মাঝবয়সী রোগা একটা লোক। চেনা নয়।

পশুপতিবাবু বুকডন শেষ করে মুগুর ভাঁজতে লাগলেন। লোকটা সভয়ে একটু কোণের দিকে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর আপনমনেই বলতে লাগল, "লোকে বলে বটে, পশুপতিবাবু লোকটা সুবিধের নয়, মহাকেপ্পন, হাড়বজ্জাত, অহঙ্কারী, দাম্ভিক। আমি বলি, তা সবাই যে সমান হবে এমন কোনও কথা নেই। আর পশুপতিবাবুর খারাপটাই তো শুধু দেখলে হবে না। তার ভাল দিকটাও দেখতে হবে। লোকটা স্বাস্থ্যবান, সাহসী, উদার।"

পশুপতিবাবু রাগবেন কি খুশি হবেন তা বুঝতে পারলেন না। তবে হাতের মুগুরদুটো খুব বাঁই-বাঁই করে ঘুরতে লাগল। ব্যায়ামের সময় কথা বলতে নেই।

লোকটা ঘুরন্ত মুগুরদুটোর দিকে সভয়ে চেয়ে থেকে বলল, "তা মহেন্দ্র তবু, বলে বসল, 'ওহে নিতাই, তোমার পুরনো স্বভাবটা আর বদলাল না। তুমি কেবল লোকের ভালটাই দেখে গেলে। কিন্তু দুনিয়াটা যে খারাপ লোকে ভরে গেছে, সেটা আর তোমার চোখে পড়ল না। পশুপতির আবার গুণটা কিসের? বাপ-পিতেমোর অত বড় বাড়িটা ভূতের বাড়ি করে ফেলে রেখেছে। অথচ কত লোক বাড়ি না পেয়ে কত কষ্টে এখানে-সেখানে মাথা গোঁজার ঠাঁই খুঁজে বেড়াচ্ছে।'"

পশুপতিবাবু মুগুর নামিয়ে রাখলেন। হাপরের মতো হাঁফাচ্ছিলেন তিনি। লোকটার দিকে একবার গম্ভীর চোখে তাকানোর চেষ্টা করলেন। কী বলবেন ভেবে পেলেন না। আরও ভাবতে হবে। অনেক ভেবে তবেই তিনি কথা বলতে পারেন।

পশুপতিবাবু মাথাটাকে চাঙ্গা করার জন্য বিছানার ওপর শীর্ষাসন করতে লাগলেন।

লোকটা বলল, "আমিও ছেড়ে কথা কইনি। মহেন্দ্রকে আমিও দু'কথা বেশ করে শুনিয়ে দিয়েছি। 'ওরে মহেন্দ্র, পশুপতিবাবুর বাইরেটাই দেখলি, ভিতরটা দেখলি না। পশুপতিবাবুর কাছে গিয়ে ধানাই-পানাই করলে তো চলবে না। তিনি স্বল্প কথার মানুষ। দিনরাত লোক গিয়ে তাঁর কাছে ঘ্যানর-ঘ্যানর করে মাথা ধরিয়ে দেয়। কাকে ছেড়ে কাকে দেবেন ঠিক করতে পারেন না। তবে এই আমি যদি যাই, তা হলে আমার মুখের দিকে চেয়েই পশুপতিবাবু বুঝতে পেরে যাবেন, এই হচ্ছে খাঁটি লোক। বাড়িতে যদি ভাড়াটে বসাতেই হয় তো একে। কী জানিস মহেন্দ্র, পশুপতিবাবু কথা কম বলেন বটে, কিন্তু মানুষ চেনেন।'"

পশুপতি ধনুরাসন শেষ করলেন। ময়ূরাসন করতে লাগলেন। এবং লোকটাকে কী বলবেন ভাবতে লাগলেন। ভাবতে ভাবতে ভূজঙ্গাসনে এসে তিনি ফের উৎকর্ণ হলেন।

লোকটা আপনমনেই হেসে বলছিল, "আমি বলি কি, পশুপতিবাবু কি আর আমার প্রস্তাব

ফেলতে পারবেন। তিনি তেমন লোকই নন। লোকে তাঁর বাড়িটা কিনতে চায়, ভাড়া নিতে চায়। পশুপতিবাবু তাদের সবাইকে বলেন, ভেবে দেখি। তা ভাবতে পশুপতিবাবুর একটু সময় লাগে বইকী। ভগবান তো আর সবাইকে একরকম মগজ দেননি। তাই মহেন্দ্র যখন বলে বসল, 'তুমি পারবে না হে নিতাই,' তখন আমিও বললুম, 'ওরে মহেন্দ্র, পশুপতিবাবুর ভাবনাগুলো যদি তোরা ভেবে দিতিস তবে কাজটা কত সহজ হত। পশুপতি ছেলেমানুষ, বুদ্ধিটাও ঘোলাটে, মগজেও কিছু খাটো, ও আর কত ভাববে। আসল কথা হল, পশুপতিকে ভাববার সময় দিতে



নেই।' তাই আমি আর দেরি করিনি। একেবারে ঠেলাগাড়ি বোঝাই করে মালপত্র আর তিনটে টানা-রিকশায় পুরো ফ্যামিলিকে চাপিয়ে এনে হাজির করেছি। জানি, পশুপতি ফেলতে পারবেন না। আমিও ফিরে যাবার নই, আর ভাড়া? পশুপতিবাবু টাকার কাঙাল নন জানি, তবু আমিই বা অধর্ম করতে যাব কোন দুঃখে? গুনে-গুনে পঞ্চাশটা করে টাকা ফেলে দেব মাসে। আর পুরো

বাড়িটাও তো নিচ্ছি না। শুধু দোতলার পুব-দক্ষিণ কোণের চারখানা ঘর আর দরদালানটুকু।"

পশুপতির ব্যায়াম যখন শেষ হল, তখনও ভাবা শেষ হয়নি। তিনি লোকটার দিকে করুণ নয়নে চেয়ে রইলেন।

লোকটা তাড়াতাড়ি বলল, "না, না, আপনাকে ভাবতে হবে না। মালপত্র ঠেলাওলারই নামিয়ে ঘরে তুলে দিয়ে যাবে। শুধু চাবিটা কোথায় সেটা কষ্ট করে বললেই হবে। আমার বাচ্চারা বড্ড ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছে। গিন্নিও আবার রগচটা মানুষ।"

পশুপতি বুঝতে পারলেন, দুনিয়াতে ভালমানুষ হওয়াটা কোনও কাজের কথা নয়। এ-লোকটা তাঁকে কোনও প্রশ্ন করেনি, মতামতও চায়নি। বরং তাঁর হয়ে নিজেই সব সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। পশুপতিবাবু এখন করেন কী?

বাইরে এসে তিনি দেখলেন, বাস্তবিকই তিন-চারটে ঠেলার ওপর থেকে পাহাড়প্রমাণ মালপত্র কুলিরা ধীরেসুস্থে নামাচ্ছে। গোটাপাঁচেক নানা বয়সের বাচ্চা বাগানে নিরুদ্বেগ হুটোহুটি করছে। একজন মোটাসোটা বদরাগী চেহারার ভদ্রমহিলা কুলিদের ধমকাচ্ছেন, তিনি পশুপতিকে দেখে চোখ পাকিয়ে বললেন, "ঘরদোর সব পরিষ্কার আছে তো! আর জল-টল তুলে রেখেছেন তো কলঘরে?"

এর কী জবাব দেওয়া যায় পশুপতিবাবু তা ভাবতে শুরু করলেন।

ভাবতে ভাবতেই দেখলেন, তাঁর চোখের সামনে দিয়ে মালপত্র ওপরে উঠতে লাগল। দুমদাম শব্দ, চেঁচামেচি, হইহট্টগোল।

পশুপতি সভয়ে নিজের ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে দিলেন। রান্নাবান্না মাথায় উঠল। তিনি তাড়াতাড়ি পোশাক পরে দোকানে রওনা হয়ে গেলেন। ঘটনার আকস্মিকতায় এত হতবুদ্ধি হয়ে গেছেন যে, মাথাটা আর ভাবতেও পারছে না কিছু।

সন্ধেবেলা যখন পশুপতি বাড়ি ফিরে এলেন, তখন গোটা বাড়িটাই প্রায় নিতাইয়ের দখলে। একতলার বারান্দায় শতরঞ্চি পেতে বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে সে তাসের আসর বসিয়েছে। দোতলায় কে যেন গলা সাধছে। গোটাপাঁচেক বাচ্চা চেঁচিয়ে পড়া করছে।

পশুপতিবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, দিন-সাতেক আগেও একজন বাড়িটা দশ লাখ টাকায় কিনতে চেয়েছিল। আর দুজন লোক ভাড়া নিতে চেয়েছিল মাসে দু'হাজার টাকায়। পশুপতিবাবু ভাববার জন্য সময় চেয়েছিলেন।

তাঁকে দেখে নিতাই তাসের আসর থেকেই একেবারে আপনজনের মতো চেঁচিয়ে উঠল, "পশুপতি, এসে গেছ! বাঃ, আমি তো তোমার জন্য ভেবে মরছিলুম। পশুপতি তো ফিরতে এত রাত করে না। তা হয়েছিল কী জানো, চায়ের চিনি আর দুধ ছিল না। তা আমি গিন্নিকে বললুম, সে কী কথা, দুধ চিনি নেই তো কী হয়েছে? আমার পশুপতিভায়ার ঘরেই তো রয়েছে। সে তো আর আমার পর নয়। তাই দরজাটা খুলতে হয়েছিল ভায়া, কিন্তু কিছু মনে কোরো না।"

পশুপতি ঘরে তালা দিয়ে গিয়েছিলেন। দেখলেন, তালা ভাঙা। ঘর হাঁহাঁ করছে, খোলা। এর জন্য কী বলা যায় তা পশুপতি শক্ত ভেবেও ঠিক করতে পারলেন না। অন্ধকার ঘরে বসে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলেন। ওপরে ধুপধাপ শব্দ, কান্না, চিৎকার, ঝগড়া, বাসন ফেলার আওয়াজ, সবই তাঁর কানে গরম সিসে ঢেলে দিচ্ছিল। ভারী শান্তিতে ছিলেন এতদিন। এবার না নিজের ভিটে থেকে বাস তুলতে হয়।

একটু বাদেই নিতাইয়ের বড় মেয়ে হলুদ আর নুন চাইতে এল। তারপর মেজো ছেলে এসে

দেশলাই ধার নিয়ে গেল। রাত দশটা নাগাদ নিতাই এসে দশটা টাকা ধার চাইল, মাসের শেষেই দেবে।

পশুপতিবাবু কষে ভাবতে লাগলেন। ভাবতে. ভাবতে ক্লান্ত হয়ে না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়লেন।

মাঝরাতে দরজায় ঘা পড়ল। পশুপতি উঠে দরজা খুলে দেখল, ভারী অভিমানী মুখ করে নিতাই দাঁড়িয়ে।

"কাজটা কি ঠিক করলে পশুপতি-ভায়া?"

পশুপতি আবাক হয়ে ভাবতে লাগল, কোন কাজের কথা হচ্ছে। নিতাই মাথা নেড়ে বলল, "ভাড়া না হয় আরও দশ টাকা বাড়িয়েই দিচ্ছি। তা কথাটা তো মুখে বললেই পারতে। বাথরুমের দরজার আড়ালে ঘাপটি মেরে থেকে লাথি মারার কোনও দরকার ছিল কি? কাজটা কি ঠিক হল হে পশুপতি?"

পশুপতি খুব ভাবছিলেন, কিন্তু কিছু বুঝে উঠতে পারছিলেন না।

নিতাই দুঃখের সঙ্গে বলল, "আর খুব আস্তেও মারোনি। আমার কাঁকালে বেশ লেগেছে। যা হোক, ওই ষাটই দেব, মনে রাগ পুষে রেখো না ভাই।"

পশুপতিবাবু কী বলা উচিত ভাবতে লাগলেন। নিতাই চলে গেল।

পশুপতিবাবু যখন ডনবৈঠক করছিলেন, এই সময়ে হঠাৎ নিতাইয়ের বউ একটা খুন্তি হাতে দরজায় এসে দাঁড়াল।

"বলি পশুপতিবাবু, আপনার আক্কেলখানা কী বলুন তো! ঢের-ঢের বাড়িওয়ালা দেখেছি বাপু, আপনার মতো তো দেখিনি? কোন্ আক্কেলে আপনি আমগাছে উঠে রান্নাঘরে ঢিল ছুঁড়ছিলেন? তাও ছোটখাটো ঢিল নয়, অ্যাত বড় বড় পাথর। তার দু'খানা আমার ভাতের হাঁড়িতে পড়ে গরম ফ্যান চলকে আমার হাতে ফোসকা ধরিয়েছে। চারখানা কাচের গেলাস ভেঙেছে। একটা ঢেলা পড়েছে ডালের বাটিতে। বলি এসব কী হচ্ছে? আপনি কি পাগল না পাজি?"

পশুপতি একবারও সদুত্তর দিতে পারলেন না, তবে ভাবতে লাগলেন।

নিতাইয়ের বউ চোখ পাকিয়ে বলল, "আমিও দুর্গা-দারোগার মেয়ে। এই বলে দিলুম, ফে ঢিল মারলে আমিও দেখে নেব।"

পশুপতি শুকনো মুখে কাজে বেরোলেন। রান্নাবান্না আর করলেন না। হোটেলেই খে নেবেন দুপুরবেলাটায়।

সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফিরতেই দেখেন, নিতাইয়ের তাসের আড্ডা নেই। নিতাই একা শুকনে মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

পশুপতি কাছে যেতেই নিতাই কাঁদো-কাঁদো মুখে বলল, "গায়ের জোর থাকলেই কি গুণ্ডা করতে হবে ভাই?"

পশুপতি ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন।

নিতাই বলল, "না হয় তাসের আড্ডায় একটু গোলমাল হয়েই ছিল। তাস নিয়ে বস ওরকম হয়, তা বলে লাঠিসোঁটা নিয়ে ভদ্দরলোকের ছেলেদের ওপর চড়াও হওয়াটা কি ঠিক তাস খেলা তুমি যে পছন্দ করো না, এটা আমাকে বলে দিলেই তো হত।"

পশুপতি মাথা চুলকোতে লাগলেন।

নিতাই ধরা গলায় বলল, "আমি অফিস থেকে এসে শুনি, তাসুড়েরা সব বসে ছিল আসর জমিয়ে আর হঠাৎ নাকি তুমি একেবারে প্রলয় নাচন লাগিয়ে দেওয়ায় তারা সব পিঠ বাঁচাতে সরে পড়ে। আর তা ছাড়া শিবুর কান ওভাবে মলাও তোমার ঠিক হয়নি। আমার সেজো ছেলে দুষ্টু ঠিকই, কিন্তু সেও তোমার ছেলের সঙ্গেই ভাই কানটা শুধু ছিঁড়ে নিতে বাকি রেখেছে, ক্যানেস্তারা বাজানো তুমি যে পছন্দ করো না তা তো আর বেচারা জানত না।"

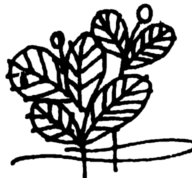
পশুপতি খুবই অবাক হলেন এবং ভাবতে লাগলেন।

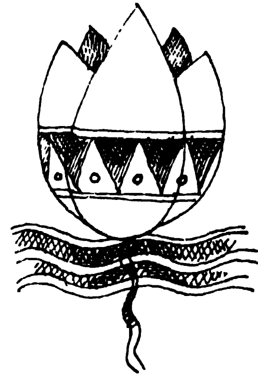
একটু রাতের দিকে পশুপতি রান্না করতে বসে হঠাৎ শুনতে পেলেন, ওপরে একটা তুমুল চেঁচামেচি আর দৌড়ঝাঁপ হচ্ছে। কে একজন চেঁচাল, "বাবা রে, মেরে ফেললে।" আর একজন বলে উঠল, "এসব ঠিক কাজ হচ্ছে?" আর একজন, "ও কী, পড়ে যাব যে খাট থেকে!" আর একজন, "আমার বিনুনিটা যে কেটে দিল, ও মা!" সিঁড়ি দিয়ে কে যেন দৌড়ে নামতে নামতে বলল, "ছেড়ে দাও ভাই, মাপ করে দাও ভাই, ঘাট হয়েছে। কালই সকালবেলায় তোমার বাড়ি ছেড়ে চলে যাব আর জীবনে এমুখো হব না।"

পশুপতি ভাবতে-ভাবতেই খেলেন, ঘুমোলেন।

সকালবেলা উঠে দেখলেন, বাড়ি ফাঁকা, নিতাই কাকভোরেই বাড়ি ছেড়ে সপরিবারে চলে গেছে।

পশুপতি অনেকক্ষণ ভাবলেন। ভেবে যদিও তিনি কোনও কূলকিনারা করতে পারছিলেন না, তবু ব্যায়াম করতে করতে তিনি মাঝে-মাঝে ফিক ফিক করে হেসে ফেলছিলেন।





সেই বইটা

অজেয় রায়

বইটা প্রথমে দেখে ফেলেন পিন্টুর মাস্টারমশাই। পিন্টুকে গোটা-বারো অঙ্ক কষতে দিয়ে মাস্টারমশাই দেওয়ালে ঠেস দিয়ে একটু চোখ বুজে ঝিমিয়ে নিচ্ছিলেন। হঠাৎ খেয়াল হল, ছাত্রটি যেন বড় বেশী চুপচাপ। অনেক কষ্টে চোখের পাতা দুটো আধখোলা কবে চেয়ে দেখলেন, পিন্টু চোখ গোল গোল করে অঙ্কের বইযেব ওপর উপুড় হয়ে কী যেন পড়ছে।

অ্যাঁ, অঙ্ক পড়ছে! মাস্টারমশাইয়েব সন্দেহ হল।

হাঁক ছাড়লেন, "পিন্টু, বইটা দেখি।"

পিন্টু চমকে উঠল। তার হাত থেকে পেনসিলটা ছিটকে পড়ল মেঝেয়। তারপর সে তাড়াহুড়োয় অঙ্কের বইয়ের বদলে মাস্টারমশাইয়ের সামনে এগিয়ে দিল 'সেই বইটা'।

বইটা হাতে পাওয়া মাত্র ঝট্ করে মাস্টারমশাইযেব ঘুম কেটে গেল। চটি একখানা বই। মলাটের ওপর ছোবা হাতে মুখোশ পরা একটা বিদঘুটে লোকেব ছবি। বড় বড অক্ষরে নাম লেখা—'জীবন্ত মৃত্যু'।

ধাঁ করে বাঁ হাত বাড়িয়ে, পিন্টুর কান পাকড়ে কাছে টেনে এনে, ডান হাতে গোটা চারেক জ্বালাময়ী গাঁট্টা লাগিয়ে, মাস্টারমশাই চোখ রাঙিযে বললেন, "বটে, এই বুঝি অঙ্ক হচ্ছে? গতবারের রেজাল্ট কি ভুলে গেছ? কাল রোববারে একটা বাংলা রচনা, পঁচিশটা অঙ্ক আর একপাতা ইংরিজী ট্রানস্লেশন যদি না-করে রাখ তা সোমবার তোমার কপালে দুঃখু আছে বলে রাখছি।"

এই বলে তখনকার মতো অঙ্কগুলো শেষ করার আদেশ দিয়ে তিনি বইটা খুলে উল্টোতে লাগলেন।

"ইস্, এই রকম যাচ্ছেতাই বই আজকালকার ছেলেরা কেন যে পড়ে!" বলতে বলতে,

মাস্টারমশাই বইয়ের প্রথম পাতাটা পড়তে শুরু করলেন। ক্রমশ তিনি খাড়া হয়ে বসলেন, তারপর ঝুঁকে পড়ে পড়তে লাগলেন। পিণ্টু বার দুই অঙ্ক জিজ্ঞেস করে কড়া ধমক খেয়ে চুপ মেরে গেল। ঝাড়া পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে বই শেষ করে তবে তিনি উঠলেন। যাবার সময় পিণ্টুর মায়ের হাতে বইখানা দিয়ে বললেন, "স্টুডেন্ট লাইফে এই সব আজেবাজে ডিটেকটিভ বই পড়া মোটেই উচিত নয়।" অতঃপর পিণ্টুকে তার হোমটাস্কের কথা আরেক দফা মনে করিয়ে দিয়ে তিনি বিদায় নিলেন।

পিণ্টুর মা তো বিরাট হই-চই জুড়ে দিলেন বই নিয়ে। "কোথা থেকে আনা হয়েছে এ বই? বল্ শিগগিরি।"

পিণ্টু জবাব দেয়, "খুকু এনেছে।"

"অ্যাঁ, খুকু! এই সব বই আনছে! কোথায় খুকু?"

খুকু কাছেই ছিল। মাত্র কয়েক পাতা পড়ার পর ছোড়দা জোর করে বইটা কেড়ে নেওয়ায় বেচারা খুবই চটে ছিল। কিন্তু নালিশের উপায় ছিল না। তাই আপাতত পিণ্টুর বেকায়দা অবস্থা দরজার আড়াল থেকে দেখে বেজায় মজা পাচ্ছিল। মায়ের ডাকে ভয়ে-ভয়ে বেরিয়ে এসে জানাল, "ওপরের গুদোমঘরে পেয়েছি। আমি কিন্তু পড়িনি। ছোড়দা নিয়ে নিল।"

মা বললেন, "হুঁ, নিশ্চয় বাবলু এনেছিল।"

বাবলু পিণ্টুর মাসতুতো দাদা। স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে এ-বাড়িতে এসে মাস খানেক ছিল। সে যত রাজ্যের গল্পের বই এনে গিলত। পিণ্টু এবং খুকুরও সেই সব বই পড়ার ঝোঁক চাপায় দুই ভাইবোন খুব বকুনি খায়। বাবলু তারপর থেকে বই লুকিয়ে রাখত। গুদামঘরে আছে গাদা গাদা পুরনো পত্রিকা, খালি টিনের কৌটো, শিশি বোতল ইত্যাদি জিনিস। খুকু তার পুতুলের কাপড় রাখার জন্যে একটা পছন্দসই বাক্সের সন্ধানে ওই ঘরে ঢুকে বইখানা আবিষ্কার করে।

"রোস, উনি আজ আপিস থেকে আসুন। তোমাদের একচোট হবে। লুকিয়ে-লুকিয়ে ! পড়া হচ্ছে!" মা তর্জন করতে থাকেন।

পিণ্টুর বড়দা কলেজ থেকে ফিরে, খেয়ে দেয়ে ক্লাবে ব্যাডমিন্টন খেলতে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিল। বইয়ের ব্যাপার কানে যেতে এসে বলল, "দেখি কী বই? ইস, এইসব রাবিশ পড়ার জন্যেই তোদের জেনারেল নলেজ এত পুওর।" এই বলে সে বইটা মায়ের কাছ থেকে নিয়ে আবার ঘরে ঢুকে পড়ল।

পিণ্টু মনে মনে গজরায়। ওঃ, উনি আবার জেনারেল নলেজ শেখাচ্ছেন। ইদিকে তো নিজে সেদিন, কোন এক দেশের রাজধানীর নাম বলতে না-পেরে, বাবার কাছে জেনারেল নলেজ নেই বলে বকুনি খেলে। আমি সব শুনেছি। দাঁড়াও না, তোমার ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেটের তার কাল সকালে দেখবে ইঁদুরে কেটে দিয়েছে।

পিণ্টুর বড়দার সেদিন আর ক্লাবে খেলতে যাওয়া হল না। আগাপাশতলা চুটিয়ে পড়ে খাবার আগে মায়ের হাতে বইখানা সমর্পণ করল। সেই সঙ্গে বইটার এক প্রস্থ শ্রাদ্ধ করতেও কসুর করল না।

পরের দিন রবিবার সকালটা পিণ্টুর যে কী-রকম বিশ্রী কাটল তা পিণ্টুই জানে, আর জানে তার প্রিয় বন্ধু ভজা। "ছাত্রজীবনের কর্তব্য" রচনাটা লিখতে গিয়ে পিণ্টু ইচ্ছে করেই ওই গুরুজনের প্রতি ভক্তি-টক্তির কথাগুলো স্রেফ বাদ দিয়ে দিল। উঃ, আর মাত্র দশ-বারো পাতা

বাকী ছিল। ডিটেকটিভ পঞ্চু তরফদারের সঙ্গে দস্যু "সবুজ শার্দূল"-এর শেষ সংগ্রাম ঘনিয়ে এসেছে। কী হবে কে জানে! পঞ্চু তরফদার কি পারবে জিততে? ক্ষোভে পিণ্টুর নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করে। দেওয়াল-আলমারির ভিতরে রাখা বইটাকে সে বারবার অসহায় চোখে দেখে।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর মা পান চিবুতে-চিবুতে বইটা বের করলেন। একটার ওপর



আর-একটা বালিশ চাপিয়ে জুত করে শুয়ে খুকুকে এক ধমক দিলেন, "খবরদার বেরুবি না। দুপুরে ঘুমুতে হবে বলে রাখছি। দিনভোর টই-টই করে মেয়ের কী ছিরিই না হচ্চে।" তারপর তিনি বইখানা খুললেন।

খুকু বইটার দিকে একবার করুণ চোখে চেয়ে মটকা মেরে পড়ে রইল। প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে বই শেষ করে, "ধ্যুৎ, যত্ত সব আজগুবি কাণ্ড" বলে, মা বইটা খুকুর উল্টো দিকে রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন।

খুকু সাবধানে উঠে বসল। হ্যাঁ, মা ঘুমিয়েছে। সে আ—স্তে হাত বাড়িয়ে বইখানা নিল এবং একটুও শব্দ না-করে পাতা উল্টিয়ে পড়তে লাগল।

প্রায় অর্ধেকটা পড়েছে, এমন সময় মা হঠাৎ পাশ ফিরলেন। ভয় পেয়ে খুকু টপ্ করে বই ঠিক জায়গায় রেখে চোখ বুজে শুয়ে পড়ল। মা বারকতক এ-পাশ ও-পাশ করলেন। আড়মোড়া ভাঙলেন। তারপর খুকুকে ঠেলা দিয়ে বললেন, "এই, ওঠ। আর ঘুমায় না। দেখ তো পাঁচুর মা উনুনে আঁচ দিয়েছে কি না।"

খুকু দেখে এসে বলল, "হ্যাঁ, দিয়েছে।"

বইটা আলমারিতে তুলে রেখে মা চা বানাতে গেলেন।

রাত্তিরে সবাই খেতে বসেছে। সবাই চুপচাপ। হুস্‌হাস্ কচমচ শব্দ হচ্ছে। পিণ্টুর মন তো আজ সারা দিনই খিচড়ে আছে। আর খুকু? সে যে কোন্‌টার পর কী খাচ্ছে তা ঠাওরই করতে পারছে না। সারা বিকেল তার মন 'মৃত্যু গুহা'র মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। সেই যেখানে পঞ্চু

তরফদার নির্জন পাহাড়ে গুহার মধ্যে খুঁটির সঙ্গে বাঁধা রয়েছে। বাইরে একটা যমদূতের মতো দস্যু পাহারা দিচ্ছে। সবুজ শার্দূল গেছে বিখ্যাত রক্ত-হীরা চুরি করতে। যাবার সময় সে হুঙ্কার দিয়ে শাসিয়ে গেছে, ফিরে এসে তার বিচার করবে। সবুজ শার্দূলের পিছনে লাগার ফল টিকটিকি পঞ্চু তরফদারকে এবার হাতে-নাতে ভোগ করতে হবে। নিষ্ঠুর দস্যু-সর্দার সবুজ শার্দূলের বিচার মানে তো ভয়ঙ্কর মৃত্যুদণ্ড। আর থাকতে না পেরে খুকু পিণ্টুর কানের কাছে ফিসফিসিয়ে বলল, "আচ্ছা ছোড়দা, পঞ্চু তরফদার কি মৃত্যু-গুহা থেকে রক্ষা পাবে?"

কথাটায় পিণ্টুর কাটা ঘায়ে যেন নুন পড়ল। খুকুকে এক কনুইয়ের গুঁতো মেরে বলে উঠল একটু জোরেই "জানি না।"

বাবা চশমার ওপর দিয়ে তাকালেন। মায়ের কানেও কথাগুলো গিয়েছিল। ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন, "ফের সেই বই নিয়ে আরম্ভ করেছ। দেখ, কোত্থেকে এক রদ্দি ডিটেকটিভ বই জুটিয়েছে, তাই নিয়ে দুই ভাই-বোনের আর নাওয়া খাওয়া নেই। আহা, কী আমার বই রে। কেবল পাতায়-পাতায় খুন আর ঘুঁষোঘুঁষি। আর নামের কী ঘটা—জীবন্ত মৃত্যু।"

বাবা কড়া গলায় বললেন, "পিণ্টু, তোমার আগের বারের অঙ্কের রেজাল্ট মনে আছে তো? বেশ, বই পড়তে হলে ভাল বই পড়। জীবনী, জাতকের গল্প, ভ্রমণকাহিনী। না, কেবল বাজে বই পড়ে সময় নষ্ট! কোথায় রেখেছ বইটা?"

মা বললেন, "আলমারিতে তুলে রেখেছি। ওদের বারণ করে দিয়েছি, খবরদার, কেউ ছোঁবে না।"

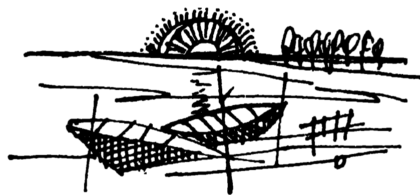
"হুম্।" বাবা গম্ভীর মুখে খেতে লাগলেন।

রাত্তিরে অন্ধকার ঘরে শুয়ে খুকুর আর ঘুম আসছে না। তার ভীষণ কান্না পাচ্ছে। বাড়ির সবাই তার শত্রু। মা এখনও শুতে আসেনি। একা-একা শুয়ে তার মন অভিমানে গুমরে গুমরে উঠতে লাগল।

হঠাৎ ঘরের মধ্যে খসখস আওয়াজ। একটা ছায়ামূর্তি মশারির পাশ দিয়ে আলমারির কাছে এগিয়ে গেল। কে? মা? কিন্তু মা তো এত লম্বা নয়। তক্ষুনি খুকুর মনে পড়ে গেল দস্যু 'সবুজ শার্দূল'-এর বর্ণনা। দীর্ঘদেহী, ছায়ামূর্তি, নিঃশব্দচরণ। নিশ্চয় এ কোনো দস্যু। একবার খুকু চেঁচিয়ে ডাকতে চেষ্টা করল বাবাকে। কিন্তু গলা কাঠ, আওয়াজ বেরুল না। এদিকে সে বুঝতে পারল, ছায়ামূর্তি আলমারি খুলল। কী সব খুটখাট শব্দ। নির্ঘাত ও মায়ের নতুন সোনার হারটা নিচ্ছে। মা বিকেলে ওই হার পরে পাশের বাড়িতে বিনি-মাসীর কাছে বেড়াতে গেছিল। ফিরে এসে আলমারিতে রেখেছে। লোকটা এবার দরজার দিকে ফিরে চলল। ও দরজার বাইরে গেলেই খুকু চেঁচাবে ঠিক করেছে। দরজার পরদার বাইরে বারান্দার আলো দেখা যাচ্ছে। ছায়ামূর্তি পর্দা সরিয়ে বারান্দায় পা দিল। এক ঝলক আলো পড়ল তার গায়ে।

একী! এ যে বাবা! আর তাঁর হাতে সেই বইটা!!

খুকুর আর চিৎকার করা হল না।



বাবার সাথে যাওয়া

সৈয়দ শামসুল হক

এত সুন্দর দোতলা বাড়ি তার চাচার, আনুর বিশ্বাসই হতে চায় না। আর কি চওড়া তকতকে সিঁড়ি! সারাদিন দৌড়ে দৌড়ে উঠেও ক্লান্তি হয় না আনুর। চাচাতো ভাই মনির তার বয়সী, তার সঙ্গে ভাব হয়ে যায় এক মিনিটে। মনিরের সঙ্গে ছাদে উঠে সে ঘুরে ঘুরে শহর দেখে।

বাবার সঙ্গে আনু বেড়াতে এসেছে তার চাচার বাড়িতে, সিরাজগঞ্জ। তার আপন চাচা নয় বাবার চাচাতো ভাই। বাবা নাকি ছোটবেলায় মানুষ হয়েছে এই চাচার মায়ের কাছে।

এসব কিছুই জানত না আনু। জলেশ্বরী থেকে রওনা দেবার কদিন আগে শুনেছে। কদিন থেকেই মা বাবাকে বারবার বলছিলেন এখানে আসতে। বলছিলেন, যাও না একবার ছোট মিয়ার কাছে। হাজার হোক নিজের মানুষ, তার কাছে শরম কিসের ?

বাবা প্রতিবাদ করেন, শরমের কথা না। সে বড়লোক মানুষ, আমি কোনদিনই তার সাথে বেশি ওঠ-বোস রাখিনি। পছন্দই করিনি এসব। আজ কোন্ মুখে যাই। আর গেলেই বা কি ভাববে বল ?

সন্ধ্যায় বাতি জ্বেলে আনু পড়ছিল। বারান্দায় বসে গলা নিচু করে আলাপ করছিলেন বাবা আর মা। বাবা নামাজ পড়ে জলচৌকি থেকে আর ওঠেননি। মা তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। আনু উৎকর্ণ হয়ে ওঠে তাঁদের চাপা গলায় আলোচনা শুনে।

ভাবাভাবি আর কি ? মেয়েগুলো কত বড় হল একেকজন ? তুমি তো বাসায় থাক না, থাকি আমি। জ্বালা হয়েছে আমার।

মার গলা বুঝি ধরে এসেছিল। বাবা বিব্রত হয়ে বললেন, আহা, সে তো বুঝলাম।

অনেকক্ষণ পরে মা বলেন, আনুকে নিয়ে তুমি একবার সিরাজগঞ্জে যাও। ভিক্ষে তো আর আমরা চাই না। আস্তে আস্তে শোধ করে দেব, বলবে।

আচ্ছা, দেখি।

বাবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস শোনা যায়। অস্পষ্ট একটা গুঞ্জন ধ্বনি ওঠে। আনু বুঝতে পারে বাবা দরুদ পড়তে সুরু করেছেন।

পড়ায় আর মন বসে না আনুর। জোর করে সে তাকিয়ে থাকে বইয়ের পাতার দিকে। অক্ষরগুলো যেন তার চোখ পোড়াতে থাকে। চোখে পানি এসে যায় তার। সে সচকিত হয়ে এদিক-ওদিক তাকায়। থানার বড় দারোগা তার বাবা। একটু পরে থানায় চলে যান তিনি।

ছোট দারোগার বউয়ের কথা মনে পড়ে যায় আনুর। সেদিন বেড়াতে এসেছিলেন। সারা গা গয়নায় মোড়া, মুখে পাউডার, ঠোঁটে পানের পাতলা লাল রং, পায়ে হিলতোলা সোনালী স্যান্ডেল। আনু উঠোনে গাঁদা ফুলের গাছগুলো বাঁশের চিকন বাতা দিয়ে ঘিরে দিচ্ছিল তখন।

বারান্দায় বসে মার সঙ্গে গাল ঠেসে ঠেসে পান খেলেন ছোট দারোগার বউ। বললেন, বুবু, একটা কথা কই। মেয়েদের বিয়ে দেন নাই যে, শেষে মুখে না কালি দেয়।

শুনে অপ্রতিভ হয়ে যান মা। আম্‌তা আম্‌তা করেন। কিছুই বলতে পারেন না। আনু তখন ভারী অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। কি একটা ছুতো খুঁজে সে বেরিয়ে যায়। সে বুঝতে পারে, এ কথা শোনা তার ঠিক হচ্ছে না। ভীষণ রাগ হয় ছোট দারোগার বউয়ের ওপর। তার এত মাথা ব্যথা কেন? সে বুঝতে পারে না বড় আপা মেজ আপা এদের বিয়ে দেবার জন্য সবাই এত ভাবনা করে কেন? এমন কি তার বাবা-মাও বাদ যান না। তবু তাদেব কথা শুনে খারাপ লাগে না আনুর, যতটা খারাপ লাগল ছোট দারোগার বউয়ের কথা শুনে।

মনটা কালো হয়ে যায় আনুর। সে রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাতের বাতাটা দিয়ে ঝোপঝাড়গুলো পেটাতে থাকে। কচি কচি বুনো গাছগুলো ভেঙে গিয়ে ঝাঁঝালো একটা গন্ধ উঠতে থাকে। গন্ধটা ভারী ভাল লাগে আনুর। সে আরো পেটাতে থাকে। নেশার মতো তাকে পেয়ে বসে গন্ধটা।

থানার সিপাই ইয়াসিন কোথা থেকে এসে বলে, খোকাবাবু, হুঁশিয়ার থাকবেন, এই সব জঙ্গলে সাপ ভি থাকতে পারে।

আরে বাপ্‌।

সঙ্গে সঙ্গে থেমে যায় আনুর খ্যাপা হাতটা। মুখে বলে, যাঃ।

কিন্তু চোখ তার সন্ধানী আলোর মতো দ্রুত ঘুরতে থাকে, কি জানি, সত্যি সত্যি যদি সাপ-টাপ বেরিয়ে পড়ে।

একটু পরেই আনু দেখতে পায় ছোট দারোগার বউ বেরিয়ে গেলেন তাদের বাসা থেকে। তার মুখটা গম্ভীর, আঁধার। অবাক হয়ে যায় আনু। একটু আগেই তো কি ডগমগে দেখাচ্ছিল বউটার মুখ।

ইয়াসিন বলে, কি খোকাবাবু। কুস্তি শিখলেন নাই?

ভুলেই গিয়েছিল আনু। সোৎসাহে সে বলে ওঠে, হ্যাঁ, শিখব। কালকে। কাল তুমি ভোরে আমাকে ডেকে নিয়ে যেও ইয়াসিন।

রাতে রান্নার ছিল দেরী। আপাদের বিছানায় ঘুমিয়ে পড়েছিল আনু। ঘুম নয়, জাগরণ আর তন্দ্রা মেশানো একটা কুয়াশার মধ্যে দাঁড়িয়েছিল আনু। এমন সময় ভারী মিষ্টি একটা ঘ্রাণ আর নরম একটা স্পর্শে সে আবিষ্ট হয়ে যায়। চোখ খুলে দেখে, বড়আপা তার পাশে কাত হয়ে শুয়ে পড়েছেন। তার পায়ের কাছে সেজআপা বালিশে ওয়াড় পরাচ্ছেন। চোখ বুঁজে পড়ে থাকে আনু। তার এত ভাল লাগে, মনে হয় শূন্যে মেঘের ভেতরে ভেসে আছে সে। ভেসে ভেসে কোথায় কোন্ অজানা দেশে চলে যাচ্ছে। তার কান্না পায়। বড়আপা, মেজআপা কত ভালো।

কিন্তু সবাই মুখ আঁধার করে থাকে, ফিসফিস করে কথা বলে। আনু ছাড়া কেউ ভালবাসে না তাদের। আনু সারা জীবন এ ভাবে শুয়ে থাকতে পারে। কোথাও যাবে না সে, কিচ্ছু করবে না।

মেজআপা তার পায়ে সুড়সুড়ি দিয়ে বলেন, ভাত খাবি না ?

উ। না। খাব না।

মেজআপা তখন তাকে আদর করতে থাকেন খুব।



ওঠ না মনি, তোকে আজ একটা সুন্দর গল্প বলব। ওঠ ভাত খেতে খেতে বলব।

আদরটা এত মিষ্টি লাগছিল। আনু ইচ্ছে করেই জেদ করে, অনেকক্ষণ ধরে করে। বড়আপা তাকে কাঁধ ধরে উঠিয়ে দেন। বলেন, বাব্বাঃ কি ভার হয়েছিস তুই আনু। আমি তুলতেই পারি না।

সে রাতে মেজআপা ভাত মেখে দিল, ডিমের মতো মুঠো পাকিয়ে দিল, মুখে তুলে দিল, তবে খেল আনু।

রাতে শুয়ে শুয়ে আনু ভাবে তার চাচার কথা যাকে সে কখনো দেখেনি। সন্ধ্যের সময় বাবা

আর মা-র কথাগুলো, মা তাকে নিয়ে বেড়াতে যেতে বলছিলেন, সেই সব ঘুরে ঘুরে ধূসর প্রজাপতির মতো মাথার মধ্যে ঘুরতে থাকে। ও পাশের চৌকিতে বাবা শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। বাবার জন্যে ভারী মায়া করে আনুর। বালিশে মুখ গুঁজে সে পড়ে থাকে।

অন্যদিন হলে কোথাও যাবার নাম শুনে লাফিয়ে উঠত আনু। আজ তার কি হয়েছে, বুকের মধ্যে কেমন টিপ্‌ টিপ্‌ করছে, এখান থেকে, এ বাসা থেকে, কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না তার। বড় আপার ফর্সা চেহারাটা ভেসে ওঠে চোখের সামনে। মাথায় একটা ছোট্ট টিপ। চিবুকের কাছে একটুখানি ভাঁজ। আনু আয়নায় দেখেছে তার চিবুকেও ওরকম ভাঁজ আছে। তার মায়েরও আছে। বড় আপা যখন হাসেন ভাঁজটা ছড়িয়ে যায়, কি সুন্দর লাগে! ইয়াসিনের কাছে কাল থেকে সে কুস্তি শিখবে। পিন্টু যদি তাকে মারতে আসে, এবার এমন একটা পট্‌কান দেবে তাকে যে মাথা ঘুরে পড়ে যাবে শয়তানটা।

বাবার যদি অনেক টাকা থাকত, তাহলে ভাবনা ছিল না। আনু স্পষ্ট বুঝতে পারে, তার বাবার টাকা নেই, মা তাই চাচার কাছে যেতে বলছেন। চাচার কাছ থেকে টাকা আনবে বাবা? চাচা বোধ হয় খুব রাগী। নইলে বাবা যেতে চাইলেন না কেন? মা অনেক করে বলতে তবে রাজী হলেন তিনি। আনু যেন বাবার সঙ্গে মিশে যায়। আনু বুঝতে পারে, বাবার খুব কষ্ট হচ্ছে। বাবার যেতে ইচ্ছে করছে না। আনু যদি একলাফে বড় হয়ে যেতে পারত, তো অনেক টাকা রোজগার করে ফেলত সে। তাহলে আর কোন ভাবনা থাকত না। আনু বারবার পাশ বদলাতে থাকে বিছানায়, কুণ্ডল পাকিয়ে শোয়, আবার পরক্ষণেই সোজা হয়।

বাবা ডাকেন, আনু, ও আনু।

তখন ঘোরটা কেটে যায় আনুর। বাবা পাশে এসে দাঁড়ান। মা ও ঘর থেকে বলেন, কি হল?

কিছু না, ছেলেটা কেমন কাতরাচ্ছে।

কপালে হাত দিয়ে দেখেন বাবা। না, জ্বর আসেনি। বাবা আবার ডাকেন, আনু, আনু রে।

আনু ঘুমজড়িত গলায় বলে, কি?

ও রকম করছিস কেন?

চুপ করে থাকে আনু।

আয় আমার সঙ্গে শুবি।

আনুকে প্রায় কোলে করে বাবা তার নিজের বিছানায় নিয়ে শুইয়ে দেন। বলেন,

খারাপ স্বপ্ন দেখেছিস? ভয় কিরে, এই তো আমি এ ঘরেই আছি।

একটু একটু হাসেন বাবা। আনুর তখন ভীষণ ঘুম পায়। বাবার হাতটা ধরে সে কখন ঘুমিয়ে পড়ে। একেবারে সেই ভোরবেলায় ঘুম ভাঙ্গে তার। সালুআপা বলে, আনু আজ তোকে নিয়ে বাবা সিরাজগঞ্জে যাবে, চাচার কাছে।

আজ?

আনুর যেন বিশ্বাসই হতে চায় না। বিছানা ছেড়ে ওঠে না। সালুআপা তার হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টান দিয়ে বলে, আমি মিথ্যে বলছি? যা মাকে জিজ্ঞেস কর। আমার বয়েই গেছে।

গট্‌ গট্‌ করে বেরিয়ে যায় সালুআপা। তখন যেন বিশ্বাস হয় আনুর।

সেই আসা। আসবার উত্তেজনায় আনু ভুলেই গিয়েছিল বাবা কেন চাচার ওখানে যাচ্ছেন, বাবা যেতে চাননি, তার যেতে ইচ্ছে করেনি।

সিরাজগঞ্জ বাজারে এসে ট্রেন থামল। নামল ওরা। মা এক বোয়ম মোরব্বা বানিয়ে দিয়েছিলেন চাচাদের জন্যে, আনুর হাতে সেটা। বাবা বললেন, সাবধানে আনু। বাড়ির কাছে

এসে দেখিস ভাঙ্গে না যেন।

আত্মীয়-স্বজন বলতে কাউকে চেনে না আনু। বাবা কোনদিন কারো কথা বলেন না। এ চাচা যে এতদিন কোথায় ছিলেন কে জানে! এই সেদিন আনু প্রথম শুনল, তার এক চাচা আছেন, বাবার চাচাতো ভাই। বাবার কোন আপন ভাই নেই। একজন ছিল, বসন্তে মারা গেছে সেই ছোটবেলায়। বাবা তাকে নিয়ে যখন ছেলেবেলায় স্কুলে যেতেন, বাবা একবার গল্প করেছিলেন, একটা খাল পড়ত, সেই খালটা ভাইকে কাঁধে করে পার হতেন। বাবা বলতেন, আমি দুঃখ কষ্ট করে একাই মানুষ হয়েছি। কেউ তো আর আমাকে দেখেনি। এখন আমার কি দরকার সেধে সেধে তাদের সাথে আত্মীয়তা করবার ?

চাচার কাছেও আসতে চাননি বাবা। মা বারবার করে বলাতে এসেছেন। তাদের রিক্সাটা দু'পাশে লাইব্রেরী, স্টেশনারী, ওষুধের দোকান, ছাপাখানা, চায়ের স্টল পেরিয়ে চলেছে। সকালবেলা বড় বড় মাছ উঠেছে বাজারে। বাজারের কাছে এসে রিক্সা থামাতে বলল বাবা। আনুকে বললেন, বস আমি আসছি।

পাঁচ মিনিট পরে বাবা একটা প্রকাণ্ড রুই মাছ নিয়ে ফিরলেন। দড়ি দিয়ে তার কান্‌কোর ভেতরে ফোঁড় করে বাঁধা। কান্‌কো দেখাচ্ছে লাল টকটকে। আনু অবাক হয়ে যায়। বাবা বলেন, কারো বাড়িতে খালি হাতে যেতে নেই। মাছটা বেশ বড় না ?

হ্যাঁ।

রিক্সা আবার চলতে লাগল। বাবাকে কেমন অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে। আনু চুপ করে দুধারের অচেনা বাড়িঘর দেখতে থাকে। একটা উঁচু ব্রীজের নিচে এসে পৌছুল ওরা। ব্রীজটার ওপরে রিক্সা টেনে টেনে পার করতে হবে। বাবা নেমে গেলেন। আনু রইল রিকসায়। বাবা পাশে পাশে হেঁটে এলেন। তারপর ও মাথায় গিয়ে আবার রিকসায় উঠে বসলেন তিনি। এই ব্রীজটার নাম এলিয়ট ব্রীজ। এইটুকু হেঁটেই যেন হাঁফিয়ে গেছেন বাবা। মুখ ঘামে ভিজে গেছে। চকচক করছে তাঁর সুন্দর করে ছাঁটা দাড়ি। বাবা দু হাতে মুখ মুছলেন অনেকক্ষণ ধরে।

বাসায় এসে চাচাকে পাওয়া গেল না। চাচা ঢাকায় গেছেন কাজে, কাল ফিরবেন। চাচী বিরাট ঘোমটা টেনে বাবার সামনে এসে সালাম করতে গেলেন, বাবা বললেন, থাক, থাক।

মনির এক লাফে কোথা থেকে এসে মোরব্বার বোয়মটা কেড়ে নিয়ে গেল আনুর হাত থেকে। বাবা হেসে বললেন, ও তোর ভাই। মনির।

সিঁড়ির পাশে ছোট্ট ঘরটায় থাকবার ব্যবস্থা হল তাদের। আনুর ভারী ইচ্ছে করছিল, দোতলায় যদি থাকতে পারত! দোতলায় কোনদিন থাকেনি সে। না জানি, কেমন ভাল লাগে দোতলায় ঘুমোতে। মনির থাকে দোতলায়।

ভারী ভাব হয়ে গেল মনিরের সঙ্গে। আনু তার সব বই উল্‌টে পাল্‌টে দেখল, সেও তার মতো ক্লাস ফোরে পড়ে। তার খেলার বন্দুকটা নিয়ে শিখে নিল কেমন করে ছুঁড়তে হয়। বলল, আমার বাবার সত্যিকার রাইফেল আছে, পিস্তল আছে। আমাকে গুলি মারতে শেখাবে বলেছে।

তারপর মনিরের সঙ্গে বেরিয়ে গেল টাউন দেখতে। এলিয়ট ব্রীজের ওপর হেঁটে হেঁটে পার হতে ভারী মজা লাগল আনুর।

বিকেলে ফুটবল খেলতে নিয়ে গেল মনির। সেনবাবুদের মাঠে ছেলেরা ফুটবল খেলে। চরদিঘির রাজা নাকি সেনবাবু। এখন কলকাতায় চলে গেছে। বিরাট বাড়িটা, মাঠটা, পুকুরটা পড়ে আছে।

কেমন ফাঁকা ফাঁকা, ভুতুড়ে বাড়ির মতো। ছেলেরা তাকে দেখে ঘিরে দাঁড়াল।সেতো নতুন,

তার কেমন লজ্জা করতে লাগল তখন। ফুটবলের মাঠে একটা বলও সে কিক করতে পারল না। বল তার সামনে দিয়ে চলে যায়, ভাবে ওরাই কেউ কিক্ করুক, আনুর সংকোচ আর কাটে না। মনির দমাদম দুটো গোল করে। তারপর খেলা শেষে সবাই একসঙ্গে চিৎ হয়ে শুয়ে গল্প করতে থাকে। আনু পাশে বসে ঘাস ছেঁড়ে একটা একটা করে। ওদের একটা কথাও সে বুঝতে পারে না। কাকে যেন জব্দ করবে সেই বুদ্ধি আঁটছে ওরা। কাল স্কুলে গেলে যে ছেলেটা জব্দ হবে তার কথা ভেবে আনুর বড় মায়া করে। রাতে বাবার পাশে শুয়ে আর ঘুম আসে না। অচেনা সব শব্দ উঠতে থাকে দূর দূরান্তর থেকে, অন্ধকারের ভেতর শেয়াল ডাকে, ঝি ঝি পা ঘষে ঘষে কান অবশ করে ফেলে, কোথায় কে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গায়, সিঁড়ি দিয়ে পায়ের শব্দ নামে ওঠে, আবার নামে; মা-বড়আপা-মেজআপা-সালুআপা-ছোটআপা-মিনুআপা কি করছে এখন! এখন ওরা ঘুমিয়ে পড়েছে। না, গল্প করছে। আনুর কথা বলছে। কদিন আগে বাবা একটা কলেজ-পড়া ছেলেকে জায়গীর রেখেছেন—সেই মাস্টার সাহেব বোধহয় ল্যাম্প জ্বেলে মোটা মোটা বই পড়ছেন। মাস্টার সাহেবের জন্য ভাত-ঢাকা দেয়া থাকে, অনেক রাতে খান। আনুকে একটা ছবির বই এনে দিয়েছিলেন মাস্টার সাহেব। আবার একসঙ্গে অনেকগুলো শেয়াল ডেকে ওঠে। তন্দ্রার ভেতর থেকে চমকে ওঠে আনু। এক মুহূর্তের জন্যে। তারপর তলিয়ে যায় ঘুমে।

চাচা ভোরবেলায় এসে পৌঁছুলেন। বাবাকে দেখে ভারী খুশি হলেন তিনি। না, আনু যেমন ভেবেছিল, খুব রাগী হবেন চাচা, তেমন একটুও না। গোলগাল মুখ, ফর্সা, ফিনফিনে পাঞ্জাবী পরনে আর লাল পাম্পশু পায়ে, হাতে মস্ত বড় একটা আংটি। ট্রেন থেকে নেমে এসে আর কাপড় বদলালেন না, হাত-মুখ ধুলেন না, বাবার সঙ্গে হাত নেড়ে নেড়ে গল্প করতে লেগে গেলেন। এই কি আনু? শোন বাবা, দেখি, দেখি।

আনু এসে সামনে দাঁড়াল। বাবা বললেন, সালাম কর।

করল সে। চাচা তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, ভারী সুন্দর হয়েছে। বাপের মতো বড় হওয়া চাই, বুঝলে আনু? খালি সুন্দর চেহারায় কিছু হয় না।

লাল হয়ে যায় আনু। বাবা বলেন, আমি আর কি? আমার চেয়েও বড় হোক সেই দোয়াই করি। পুলিশের চাকুরী আবার চাকুরী? লোকে মনে করে পয়সাই পয়সা। দারোগারা লাল হয়ে গেল। এদিকে খবর নিয়ে দেখ, আমার একদিক দেখতে আরেকদিক কানা হয়ে যায়।

এইরকম আক্ষেপ করে চলেন বাবা। একা একা। চাচা চুপ করে শোনেন। পরে বলেন, কি যে বলেন মিয়াভাই। আপনাদের অভাব? এইতো সেদিন সিরাজগঞ্জে এক বাচ্চা দারোগা এল, তার—।

তাঁকে শেষ করতে দিলেন না বাবা। বাধা দিয়ে বললেন, সবাই কি আর একরকম? ধর্ম যদি পানিতে ফেলা যায়, তাহলে আলাদা কথা।

রাখেন আপনার ধর্ম! আপনি সেই পুরানো কালের ধ্যান নিয়ে আছেন। যুগ এখন অন্য রকম। এখন ও-সব চলে না।

প্রায় তর্ক লেগে যায় বাবা আর চাচার। ভয়ে ভয়ে সেখান থেকে সরে আসে আনু বাবার মুখটা কেমন কঠিন হয়ে উঠেছে একমুহূর্তে, চেনাই যাচ্ছে না আর। আর চাচার ফর্সা চেহারা লাল হয়ে গেছে উত্তেজনায়। আনু চুপ করে সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকে। নামলে রান্নাঘর দেখা যায়। দু'জন কাজের মেয়ে রান্নার জোগাড় করছে। চাচী একটা মোড়ায় বসে পাখা হাতে তদারক করছেন। আনুকে দেখে ডাকলেন তিনি। বললেন, এই ছেলে, শোন।

কাছে এল আনু। আনুর খুব খারাপ লাগল তখন। তার মা আর বড়আপা রোজ নিজহাতে রান্না করেন। গরমে, কালিতে, ধোঁয়ায় কি বিচ্ছিরি দেখায় তাদের। এরকম কাজের মেয়ে যদি থাকত, তাহলে আর কষ্ট হত না। চাচীকে কি সুন্দর ছিমছাম দেখাচ্ছে। সে মাকে বলবে।

চাচী তাকে কাছে ডেকে তার মায়ের তার বোনদের গল্প শুনতে লাগলেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করলেন কত কথা। সে দেখতে কেমন, সে কত বড়, কোথা থেকে বিয়ের কথা আসছে। আনু তার অত কি জানে! সে ভাল করে কিছুই বলতে পারল না। বলতে ইচ্ছে করল না। আনু খুব বিব্রত বোধ করল, লজ্জা করল তার। সে তো জানে বাবা তার আপার বিয়ে দেবেন বলে টাকা চাইতে এসেছেন চাচার কাছে।

সে রাতে অনেকক্ষণ ধরে আবার আলাপ করলেন বাবা আর চাচা। ভাত খাবার পর। আনু দোতলায় মনিরের পড়ার টেবিলের পাশে বসে রইল। মনিরকে একটা ফুলের তোড়া এঁকে দিল আনু। মনির অবাক হয়ে আঁকাটা দেখল, তারপর আরও এঁকে দেবার জন্য বায়না ধরল। তখন পাতা, লাটিম, কলম এঁকে দিল আনু। সবশেষে একটা ছবি আঁকল সে—একটা বাড়ি, পাশে নদী বয়ে যাচ্ছে, তালগাছ কাৎ হয়ে পড়েছে, আকাশে মেঘ, মেঘের মধ্যে সূর্য। বলল, রং নেই তোর?

না।

রং থাকলে কি সুন্দর রং করে দিতাম।

না হোক। এমনিই ভাল।

মনিরের একটা মজার খেলা ছিল। চোঙ্-এর মধ্যে ভাঙা চুড়ির অনেকগুলো টুকরো আর ঘষা কাঁচ বসানো। একদিকে চোখ রেখে রেখে আস্তে আস্তে চোঙটা ঘোরালে নতুন নতুন নক্‌শা তৈরি হয়। এমন অদ্ভুত খেলা জীবনে দেখে নাই আনু। সেইটে অবলীলাক্রমে মনির দিয়ে দিল তাকে।

ঠক ঠক করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলেন চাচা। তাকে ভারী গম্ভীর দেখাচ্ছে। আনু ভয় পেয়ে খেলাটা মনিরকে ফিরিয়ে দিল, বলল, কাল নেব ভাই।

তারপর নেমে এল নিচে। এসে দেখে বাবা এশার নামাজ পড়তে বসেছেন। চোখ বোজা ঘরে আলোটা ছোট করে রাখা। নিবিড় একটা ছায়ার মতো মনে হচ্ছে বাবাকে। নিঃশব্দে আনু গিয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়।

পরদিন সকালে ফিরে যেতে চাইলেন বাবা। চাচা বললেন আরও একদিন থেকে যেতে। আরও একদিন থেকে গেলেন ওরা। তারপর দুপুর এগারটার গাড়িতে উঠল।

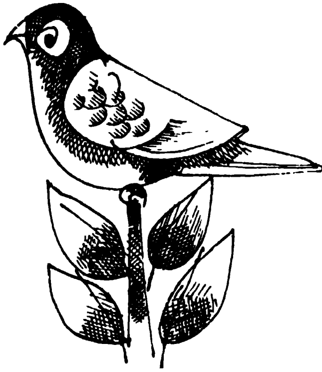
গাড়িতে উঠে আনু জিজ্ঞেস করল, টাকা দেয়নি বাবা?

বাবা অবাক হয়ে তার দিকে তাকালেন।

তুই শুনলি কোত্থেকে?

আনু চোখ নামিয়ে নিল। থতমত খেয়ে গেল সে। তার জিজ্ঞেস করাই উচিত হয়নি। বাবা টের পেয়ে গেলেন, সন্ধ্যেয় মা-র সঙ্গে বাবার কথাগুলো সব সে শুনেছে।

বাবা কিছু বললেন না আর। তার দিকে কেমন চোখে তাকিয়ে রইলেন তিনি। আনুর মনে হল, সে মাটিতে মিশে যায়। বাবাকে ক্লান্ত, বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। আনুর মনে হল, আনু বুঝতে পারল, টাকা দেয়নি চাচা। বাবার মুখের দিকে আর তাকাতে সাহস পেল না সে। ট্রেন ছুটে চলেছে চাকায় চাকায় ছড়া কাটতে কাটতে। আনু সেইটে কান পেতে শুনতে লাগল—ঢাকা যাব, টাকা পাব—ঢাকা যাব, টাকা পাব।



ময়ূর মুখীর নিশান

রাবেয়া খাতুন

পিপুল পাতা তুলতে এসেছে নিশান। সকাল থেকে গাঙ্গে আজ নলা মাছ গাবিয়েছে। ঘরের কাজ, মাঠের কাজ ফেলে, কমিয়ে যে যতোটা পেরেছে মাছ ধরেছে।

নিশান এক কোচরের বেশী ধরতে পারেনি। বাবা গেছে ধলাখালীর হাটে। নইলে চান্দারী ভরে যেতো। তে-কোন জাল আর কোচ দিয়ে বাবা এতো অতো মাছ ধরতে পারে। মা বাসন ভর্তি করে ভাজে। গুনা তারে গেঁথে সুটকি দেয়।

আজ শুধু চড়চড়ি। পিপুল পাতা দিয়ে। ঝাল ঝাল করে। বাবার খুব পছন্দ।

হাটবার বলে অন্য ভিটের চাচীদের সংগে সকাল সকাল গাংগ থেকে গোশল করে এসেছে মা। রোদে একটু রং ধরলো কি নদীতে ঢল নামলো ভিন গাঁয়ের নৌকার ধলাখালী হাট বারে এমনি হয়। বেজায় বড়ো হাট। সাত গ্রামের লোক ছোটে সকাল থেকে। যে যে দিক থেকেই আসুক যেতে আসতে ময়ূর মুখীর মোড় পেরুতেই হবে।

মা মাছ কুটতে বসেই নিশানকে বল্লো পিপুল পাতার কথা।

রতনদের ছাই গাদার পাশে লতানো জংগল। কাল্‌চে সবুজ, পান পাতা গড়নের পাতা তুলতে তুলতে নিশান তাকাচ্ছে আকাশের দিকে। ইস্ সূর্য যেনো মাথার ওপর থেকে গড়াবেনা আজ। সারা দিনের বেচা কেনা সেরে বাবার ফিরতে ফিরতে সন্ধে। কখন যে বেলা পড়বে?

এবারে আখের ফলন খুব ভালো হয়েছে। কোষা বোঝাই করে আখ নিয়ে গেছে বাবা। বলে গেছে, সামনে শীত, ছিট কাপড়ের রংগিন সার্ট নিয়ে আসবে ফেরার সময়। সেই সার্ট পরে এবার মাঘ মাসে সে যাবে নানীর বাড়ী ভেজানো রসের পিঠা খেতে।

কথাটা মাকে বলতে মা মিষ্টি হেসেছে। রোদ উঠেছে নারকেল গাছের মাথায়। দাওয়ায় একটি দিক এরই মধ্যে ভরে গেছে ধোঁয়া ধোঁয়া আঁধারে। পা ছড়িয়ে বসে মা পলতে পাকাচ্ছে বাতির জন্য। ঘরের পেছনে বাতাবী লেবুর ঝোঁপের তলায় দাদার কবর। মগরেবের আজানের

আগে আগে মা দুটো প্রদীপ জ্বালে। একটা থাকে ঘরে। আর একটা দাদার ওখানে।

তার আগে নিশানকে আর একটি কাজ করতে হয়। উত্তর ভিটের চাচীর দো-আখা থেকে পাট খড়িতে করে আগুন আনতে হয়। সে সময় চাচীও দু একটি কাজ দেয়। যেমন ছোটো খুকী বড়ো বিরক্ত করছে, ওকে একটু নিয়ে যা। কিংবা দুটো পেঁয়াজ দিয়ে যা তোর মার কাছ থেকে।

শেষ বেলায় খেয়ে রাতে খাবার গরজ সাধারণত থাকে না। এশার নামাজের পর পরই নীরব হয়ে আসে পাড়া। হাটের দিন একটু অন্য রকম। বাবা চাচারা না ফেরা অব্দি নিশানের বয়সী ছেলেমেয়েরা উঠোনে ছুটোছুটি করে। মা চাচীরা গোল হয়ে বসে। পুঁথি পড়া শোনে চাচী চাচার কাছে। বাচ্চারা ঘুমায়। ছাড়াবাড়ীর জংলা ভিটে থেকে ভেসে আসে শেয়ালের ডাক।

এরই কোনও সময় ঘাটে কোষা লাগার শব্দ শোনা যায়। মা লণ্ঠন হাতে পথ দেখাতে যায়। পিছু পিছু আসে নিশানরা। হাটুরে বাবা চাচাদের পকেটে থাকে ঢাকা শহরের লবেনচুশ। সুবাসী বিস্কুট বা পাতলা কাগজে পেঁচানো, চাক চাক করে কাটা পাউরুটি।

আজ সন্ধের পর সময় যেনো থেমে রইলো। নবী দাদা তারা দেখে রাতের প্রহর বলতে পারেন। ঝড় তুফানের দিন বাতাস শুকে বলতে পারেন মওসুমী হাল। উঠোনে হাটাহাটি করছিলেন তিনি। এতো দেরী তো হবার কথা নয় হাঁটুরেদের।

নালার এক বাঁশের সাঁকো পার হয়ে এ সময় এলো জমির চাচা। বেচা কেনার কিছু ছিলোনা বলে হাটে যায়নি। নিশানকে সামনে পেয়ে বল্লো, কিরে তর বাজানও ফিরে নাই। নিশান বললো, না। আইজ হাটে কি হইচে চাচা।

জমির চাচা বললো, কিছু বুঝবার পারতাছি না।

তিন ভিটের চাচীরা, মা, নবী দাদা ঘিরে দাঁড়ালো জমির চাচাকে।

সন্ধে থেকে জমির চাচা নদীর ধারে। একটি নৌকাও ফিরতে না দেখে অবাক হয়েছিলো। গত কিছু দিন থেকে তো হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছিলো নানা রকম খারাপ খবর। মুক্তিযুদ্ধের হাট বাজারে গণ্ডোগোলের। মানুষ মারার।

ময়ূর মুখীর বাঁক ঘুরে ফিরতি নৌকো যাও কিছু গেছে, সেগুলো এতো জোরে চলে গেছে, মনে হয়েছে পেছনে বাঘ ভালুক তাড়া করছে। একজন হাঁটুরে শুধু পাড় ঘেঁষে যাবার সময় চেঁচিয়ে বলে গেছিলো, ভাইরা সাবধান। বাতাস বড়ো গরম। ধলাখালীর হাটে দুষমুনগো জাহাজ লাগছে। মাইনষের খুনে ভাইসা গেছে জামিন। নাওগুলা ডুবছে উথাল পাথাল পদ্মার ঢেউয়ে। হেরা ডুবাইছে ইচ্ছা কইরা। আপনেরা জান মালনিয়া সাবধান হনগো মিয়া ভাইওরা।

জমির চাচারা খবরটা পাড়ায় ঢুকতে দেয়নি। গাংগের পাড়ে থেকে আরও ফিরতি নৌকোর অপেক্ষা করেছে। অপেক্ষা করেছে আরও খবরের জন্য।

রাজধানী ঢাকা থেকে লঞ্চের লোকের মুখে মুখে কতো রকম খবরই তো আসছিলো। খবরগুলো মিথ্যে নয় গ্রামের মানুষ একবার তার প্রমাণ পেয়েছিলো। সেই চৈত্র মাসে পিলপিল করে শহরের লোক ফিরছিলো গ্রামে। তাদের সংগে জিনিষপত্র ছিল না। ছিল শুধু ভয়।

শহুরে মানুষের পায়ে কাদা, এলোমেলো পোশাক, চোখ ভরা ক্লান্তি, এ যেনো ভাবাই যায় না। নিশান বরাবরই দেখেছে তারা যখনই গ্রামে আসে, কাপড় চোপর থাকে ঝকঝকে। ঘোরা ফেরায় আমীর আমীর ভাব। সেই তাদের একি চেহারা। কেতো জনম যেনো খায়নি। ঘুমোয়নি।

নিশানদের মতো কিশোররাই তখন ওদের দেখাশোনা করেছে। শুনেছে ভয়ংকর, অবিশ্বাস্য সব ঘটনা। দেশে যুদ্ধ লেগেছে। অবাঙালীরা এক রাতে কামান দেগে, বন্দুক ছুঁড়ে ঢাকা শহরকে রক্তে ভাসিয়ে দিয়েছে, বাংলাদেশে ওরা ছিল বাঙালীদের পড়শী সেজে। চেষ্টা করেছিল দেশী

মানুষের ভাষা, সাহস, সংস্কৃতি সব একসংগে কেড়ে নিতে। না পেরে ধ্বংস করে দিতে চাইছে পুরো জাতটাকে।

রাজধানী থেকে, জেলা শহর থেকে সব লোক পালাচ্ছে গ্রামের দিকে। ওরা নাকি নদীকে খুব ভয় করে। পাগড়ীর প্যাচের মতো নদী নালা পেরিয়ে গাও গঞ্জে কখনো আসবেনা।

নিশান ভেবেছিলো হবেও বা। বুড়ীগংগা সে কখনো দেখেনি। বাবার সংগে আরুল বিলের ওপারের হাটে গিয়ে ইছামতী ধলেশ্বরী দেখেছে। জমির চাচার সংগে ইল্‌শে মাছ ধরতে গিয়ে দেখেছে পদ্মা। বর্ষায় ওরা নাকি ভয়ংকর রূপ ধরে। এপারে ওপারে নজর চলে না। শুধু পানি



আর পানি। চার চারটা বড়ো নদীর পরও আছে খাল, বিল, নালা। উড়ে না এলে শয়তানেরও সাধ্য নেই চট করে গ্রামে চলে আসা।

শহর থেকে পালানো সেই মানুষেরা থাকেনি [illegible] বেশী দিন। ফিরে গেছিলো কিংবা সরে গেছিলো আর কোথাও।

ময়ূর মুখী গ্রামের লোক ভেবেছিলো তারা নিরাপদ। যুদ্ধের কোনও ধাক্কা তাদের জন্য আসবেনা। যুদ্ধের তারা কি জানে। বাপ দাদার আমল থেকে চাষ আবাদ নিয়ে আছে। লড়াই করার জন্য মানুষের মধ্যেই আলাদা একটি শ্রেণী আছে। দেশের জন্য, দশের জন্য, স্বাধীনতার জন্য তারা যুদ্ধ করে, প্রাণ দেয়, জয়ী হয়।

ধারনা ভাঙলো শহরের মানুষের ফিরে যাবার মাস কয়েকের মধ্যে। গ্রামের উঠতি বয়সের যে ছেলেরা হাইস্কুলে পড়তো, বাজারে দোকানদারী করতো, কিংবা কাজ করতো ক্ষেত খামারে,

রাতারাতি তারা যেন কোথায় চলে গেল। নবী দাদার পুঁথির সেই রূপনগরীর মতো ছেলেরা সব বনে চলে গেছে চারমুখো দেওএর জন্য। ফিরে যখন এলো তখন তাদের ঘাড়ে তীর ধনুক। মুখে শপথ। দেওকে তারা বধ করবে।

ময়ূর মুখী থেকে যারা গেলো তারা যদিও ফিরলো না, কিন্তু রাতের ছায়ায় আপন শরীর মিশিয়ে গ্রামে এলো আর একদল ছেলে। বনের গভীরে তারা শিবির তৈরী করেছে।

মাঝেমাঝে তারা আসতো। গাঁয়ের মাতব্বর মেম্বরদের সংগে কথাবার্তা বলতো। চলে যেতো। একদিন তাদের একজনের সংগে দেখা হয়েছিলো। খালি গা। লুংগি পরা। কোমরে বাঁধা গামছা। নিশান বলেছিলো, আমারে লইবেন আপনেগো লগে।

সে হেসে বলেছিলো, তুমি কি করো খোকা।

নিশান বলেছিলো, আগে ইস্কুলে পড়তাম। অখন বাজানের লগে আউখ ক্ষ্যাতে কাম করি।

সে বলেছিলো, তাই করো।

নিশান অবাক গলায় প্রশ্ন করেছিলো, ক্যান ?

সে জবাব দিয়েছিলো, সবাই একসংগে যুদ্ধে এলে চলবে কি করে। আমরা ক্যাম্পে আটা রুটি আর আখের গুড় খাই। তুমি আমাদের জন্য গুড় তৈরী করো।

গাজী বাড়ির তালাগ ধরে, বাঁশ ঝাড়ের তলা দিয়ে চলে গেছিলো সে। কথাটা পছন্দ হয়নি নিশানের। সে ক্লাশ ফাইভে পড়ে। মুক্তি যুদ্ধে তার মতো কতো ছেলেই নাকি গেছে। সরাসরি বাবাকেই এক বিকেলে সে বললো মনের কথা। শুনে বাবা প্রথম দিকে জবাব দেয়নি। আবার বলতে একটা লম্বা নিঃশ্বাস টেনে জবাব দিয়েছিলো, যুদ্ধে যাইবার চাও যাইবা। দরকার মনে করলে বাপ ব্যাটায় একলগে যামু। অখন একটু তামুক সাজো দেখিন বাজান।

সেই বাবা জান দিলো ধলাখালীর হাটে। লাশ এলো তিন দিন পর। শরীর ফুলে ঢোল হয়ে গেছে। শুধু বাবা নয়, দক্ষিণ-ভিটির মামু, পূর্ব পাড়ার নুরুর ফুপা, দুনির বাবা, সবার এক অবস্থা। একসংগে অনেক লোক ছেড়ে গেলো গ্রামের মায়া।

লাশ এসেছিলো শেষ বেলায়। ঘরে ঘরে কান্না। উঠোনে উঠোনে কাফন দাফনের ব্যস্ততা। গ্রামের সব চেয়ে বুড়ো মানুষটিও একসংগে এতো লোকের মাতন দেখেনি। বোবা গাছপালার ডাল চুইয়ে চুইয়েও যেনো ঝরছিলো চোখের পানি।

পুরো গ্রাম বলতে গেলে জেগে রইলো সারা রাত। সকালে পিলে চমকানো এক খবর। কান্নাটান্না বন্ধ করো। এসব এখন বিলাপ। শিগগীর তৈরী হও অথবা পালাও। দুস্মনদের সৈন্য ঘোরা ফেরা করছে আশপাশের গ্রামের কাছাকাছি।

গ্রামের সবাই যেনো কথা বলতে ভুলে গেলো। পালাবে কোথায় ? ধলাখালীর হাট হয়েছে গোরস্তান। বিলের ওপারের গাঁ-গুলোতে গেলো রাতে দেখা গেছে আগুন আর ধোঁয়া। তবু দিশেহারা হয়ে পালিয়ে গেলো কেউ কেউ। কেউ পিতল কাসার বাসন কোসন পুঁতে ফেললো মাটির তলায়। কেউ ধার দিতে লেগে গেলো দা, বটি, সাবল, সরকি।

নিশান তাকিয়ে আছে বেড়ার খাঁজে গোঁজা বাবার বড়ো গুলতিটার দিকে। বাবার সখ ছিলো শীতের সময় পাখী শিকারে যাওয়া। মাটির গুলির ঝোলা নিয়ে সে যেতো পিছু পিছু। মাথায় নতুন গামছা বেঁধে, কাছা মেরে লুংগি পরে বাবা বিলে নামতো। হাতের সই ছিলো দারুন। নিশানের কাঁধের ছালা ভরে যেতো বক, ঘুঘু, ডাহুক, বন পায়রায়। বাড়ী ফিরে সেগুলোর ছেড়া ছেলার কাজ বাবাই করতো। পরদিন সেসবের একটি বড়ো ভাগ নতুন মাটির হাঁড়িতে করে নিশান দিয়ে আসতো বুজীর বাড়ী। দুলাভাই শিকারের মাংস খেতে খুব ভালো বাসতেন।

নিশানের বুক থেকে উঠে আসে গরম নিঃশ্বাস। কি যে হলো দিনের হাল। দুলাভাইয়েরও কোন খবর নেই। ওদের গ্রাম সীমান্ত ঘেঁষে। ওরা নাকি ওপার চলে গেছে।

মা এলো কাঁসার বাটিতে করে মুড়ি নিয়ে। নিশান বললো, মাও আমি যুদ্ধে যামু।

বাটি নামিয়ে দিয়ে মা চোখ মুছছিলো। কাল থেকে কেঁদে কেঁদে মার চোখ লাল। টকটকে চোখ নিয়ে মা শুধু তাকিয়ে রইলো। নিশান ডান হাতের মুঠিতে বুকে চাপড় মেরে, গলায় আর একটু জোর দিয়ে বললো, যুদ্ধে যামু। এই তুফান আলীর পোলা নিশান আলী যুদ্ধে যাইবো। বাপের পক্ষী শিকারের গুলাই দিয়া দুষমুন শিকার করবো।

মা দুপা সরে এসে ওকে বুকের কাছে নিয়ে বললো, তুই বাজান যুদ্ধে গেলে আমি বাঁচুম কারে লইয়া ? একে একে হগগলেই তো ছাইড়া গেলো আমারে।

নিশান জবাব দিলো, আমি ছাইড়া যামু না। এই যুদ্ধে যাওন মাইনে মাঠে ময়দানে গিয়া লড়াই দেওন নারে মা। ঘর থনই যুদ্ধ করুম। খালি আমি না। তুমিও।

মা যেনো নিশ্চিন্ত হলো। দাওয়া থেকে নেমেই আবার কেঁদে উঠলো নতুন করে। নিশান চমকালো, আবার কোন মুসিবত এলো ? না কিছুনা। অবসর সময় বাবা দাওয়ার একদিকে ছোটো কেবিন ঘর তৈরী করছিলো। তার পড়ার সুবিধার জন্য। বাবার খুব আশা ছিলো সে লেখা পড়া জানা জ্ঞানী মানুষ হবে। গোলমালে ঘরের কাজ আর এগোয়নি। কতো শেষ না করা কাজই না যাবার আগে ফেলে যেতে হয় মানুষকে।

নিশানের মনে হলো গত চারদিনে সে যেনো অনেক বড়ো হয়ে গেছে। অনেক বেশী বুঝতে পারছে।

মুড়ির কিছু খেয়ে, বাকিটা মুরগীর খোঁয়াড়ের কাছে ফেলে দিয়ে সে এলো পঞ্চবটির জঙ্গলে। ক্যাম্প করা ভাইরা এবার দলে নিলো। কাজ-শেখালো। কাজ দিলো। কালো কাসুন্দির ঝোপের আড়ালে থেকে খালের দিকে চোখ রাখতে হবে। ওখান থেকে বড়ো নদীর বাঁক দেখা যায়। দৃষ্টির সবটুকু আলো জ্বালিয়ে দিয়ে, সে পথ পাহাবা দেয় নিশান। ভুলে যায় বাবার কথা। চাচাদের কথা। মনকে জাগিয়ে রাখে একটা ধাতব রাক্ষসের জন্য। কবে সেটা খালে ঢুকবে।

বিকেল হলেই বাতাসে ভাসে বন তুলসীর সুবাস। খুব সামান্য সময়ের জন্য আনমনা হয়ে যায় সে। এমনি ছায়া ছায়া বিকেলে নদীর ধারে কপাটি খেলতো স্কুল থেকে ফিরে। একবার দম দেবার মুখে রতন বললো, ঐ নিশান তর বুজীর নাও যায়রে।

বুজীকে নিয়ে খালের পানিতে সত্যি যাচ্ছিলো এক মালাই নৌকো। দুলাভাই দাঁড়িয়ে বাইরে। বুজীর ঝকঝকে চোখ দেখা যাচ্ছিলো গলুই-এর কাছে, খাটো ঘোমটার ভেতর।

খেলা মাথায় উঠলো। পাড় ধরে নৌকোর সংগে দৌড়াতে সুরু করলো সে। দুলাভাই চেঁচিয়ে বললো; নাও ভিড়ামু। উঠবা নায়ে।

ছুটতে ছুটতেই নিশান জবাব দিলো, না না। আপনেগো মায়ের আগে আমি বাড়ীতে পৌছা মাওরে খবর দিমু।

যে গাংগ বর্ষায় বুজীকে নিয়ে আসতো, শুকনোর সময় সেই যোগাতো রসালো ফল। নামে গাংগ আসলে শাখা নদী। ভূগোলের স্যার বলেছিলেন গোটা বিক্রমপুরের সবচেয়ে বড়ো নদী ছিলো ইছামতী। রাজা বাদশাহদের বড়ো বড়ো নৌকোর বহর ভাসতো তার বুকে। সে নদী মরে গিয়ে জন্ম হয়েছে ধলেশ্বরীর। আর এই ক্ষীণ শরীর মধুমতীর। শীতে এ নদী একেবারে শুকিয়ে যায়। পুরা বালির ওপর কারা যেনো বুনে দিয়ে যায় বাংগি, তরমুজ। সবুজ সতেজ লতাগুলোয় কতো যে ফল ধরে। কি সোয়াদ সেগুলো খেতে।

বন্ধুর মতো, আপন জনের মতো সেই নদী আজ সে পাহারা দিচ্ছে। কখনো নিজেকে মনে হয় পুঁথির সেই শাহজাদার মতো। রাজ্যের শেষ সীমায় সে অপেক্ষা করে থাকতো রোজ মানুষ খেকো এক সমুদ্র দানবের জন্য। পানির রাক্ষসটাকে সে হত্যা করেছিলো। কেটে দিয়েছিলো লাল চোখ শয়তানের হাতীর শুঁড়ের মতো আটটি শুঁড়কে।

ঝিকঝিক, থিকথিক শব্দ বাতাসে। সজাগ হলো নিশান। রতন ছিলো পাঁকুড় গাছের মগডালে। চেঁচিয়ে বললো, ঐ আয়া পড়ছে। বাইসুত কি আলীসান জাহাজের। শিগগীর ক্যাম্পে খবর দে। আনু ভাইরে। গোবিন্দ দাদারে।

সন্ধের দিকে দোতলা লঞ্চ ঢুকে গেলো গাংগে। পাড়েব দিকে এলোনা। থমকে রইলো মাঝ নদীতে। খোল ভর্তি খাকী পোষাকের মানুষ। ছাদের উপর সাজানো হলো কামান। গ্রামের দিকে তাক করা। সবার মাঝে জ্বলছে একটা লাল আলো। পুঁথির সেই সমুদ্র দানবের চোখের মতো। এটা আরও সাংঘাতিক। ঘুরে ঘুরে আলো ফেলছে চারদিকে।

গোপন বৈঠকে ঠিক হলো রাতের অন্ধকারে ডুবিয়ে দেওয়া হবে এটাকে। সবার আগে একজনকে গ্রেনেড ছুঁড়ে অন্ধ করে দিতে হবে সার্চ লাইটের আগুনে চোখ। কে যাবে। নিশান এগিয়ে এলো।

কমাণ্ডার ভাই ঘাড় নেড়ে বললেন, আমিও তোর কথাই ভাবছিলাম। সব রকম সাঁতার তুই খুব ভাল জানিস। তুই আলোটা নষ্ট করে দিলেই, দুপার থেকে আমরা আক্রমণ চালাতে পারবো।

সন্ধে রাতে নিশান এলো ভাত খেতে। মা বললো, বাজান শরীরটা আইজ জুইত লাগতাছেনা। পাহারাদারী থন আইজ একটু জলদি ঘরে ফিরিস।

নিশান ঘাড় দুলিয়ে ছোট্ট জবাব দিলো. আইচ্ছা।

রাত নিঝুম হলে, থমথমে হলে নিশান বেরুলো। রেকি করা জায়গা থেকে খুব সাবধানে নামলো খালের পানিতে। গ্রেনেড ধরা হাতটাকে মাথার ওপর দিকে রেখে লঞ্চের দিকে এগুলো আরও সাবধানে।

সার্চ লাইটটা যেনো ইবলিশের জ্যান্ত চোখ। ক্লান্তি নেই। ভুল নেই। ব্যর্থতা নেই। তা হোক। নিশান মনে মনে ভাবলো, দরকার হলে সারা রাত, সারা জীবন সে সুযোগের অপেক্ষা করবে। তবু ওটাকে শেষ করা চাই। নইলে পাশের গাঁয়ের মতো তাদের গ্রামটাও পুড়ে ছারখার হবে। দলেদলে মানুষ মরবে বেয়োনেটের খোঁচায়। শিশুদের শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে চলবে বন্দুকের কিরিচে গেঁথে ফেলার প্রতিযোগিতা। যেনো হাসি ঠাট্টার খেলা একটা। এমনি করে বাচ্চাদের জীবন নিয়ে খেলে পাকিস্তানী বর্বর সৈন্যগুলো। আর মেয়েদের নাকি জোর করে ধরে নিয়ে যায় জাহাজে।

নিশান মাথা ঝাকানি দিলো। তাদের গ্রামেও তেমনি ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। হেলমেট পরা লোকগুলো জাহাজের ছাদে ঘোরাফেরা করছে। কমাণ্ডার আন্দাজ করছেন রাতে নামার প্ল্যান ওদের নেই। ভোর ভোরে ঘিরে ফেলবে গোটা গ্রাম। রাতের আঁধারে গ্রামবাসীরা যাতে পালাতে না পারে তার জন্য নদীর বাঁকে পাহারা দিয়ে আছে, আরও পাঁচ ছটা লঞ্চ। হয়তো সেগুলোও যোগ দেবে সকালের তাণ্ডব কাণ্ড-কারখানায়। তার আগে এটার ব্যবস্থা করতে হবে। শয়তানের চোখের মতো, দানবের চোখের মতো দগদগে লাল আলোটার খতম তারাবী পড়াতে হবে। শূন্যে তোলা হাতের মুঠিতে গ্রেনেডের গোলা। অন্য হাতে সাবধানে সাতার কাটা।

শয়তানের জাহাজ দাঁড় করানো মাঝ নদীতে সার্চ লাইট খোয়ার বিরাম নেই। সেই সংগে

পিলে চমকানো ফাঁকা গুলির আওয়াজ। জাহান্নামের বাসিন্দাগুলোর চোখে কি নিশি রাতেও ঘুম থাকে না। না থাক। নিশানের চোখের উপর এখন কোনও সার্চ লাইট নাই। আছে বাবার আধখোলা লাল একটা চোখ, বাকী চোখটি উড়ে গেছিলো গোলার ঘায়ে। জমির চাচা খোলা চোখের পাতা বন্ধ করে দিয়েছিলো। মুর্দার চোখ নাকি খোলা অবস্থায় কবরে যেতে নেই। কিন্তু নিশান স্পষ্ট দেখছে বাবা তাকিয়ে আছে। সাদা জমিনের ওপর ছোপ ছোপ রক্তের ফোঁটা। নানা ছোপ ছোপ নয়, জমাট বাধা রক্তের চাপ। টকটকে লাল।

মাঝরাতে সমস্ত গ্রাম কেঁপে উঠলো ভয়ঙ্কর বিকট আওয়াজে। দানোর ঘুরন্ত চোখ আচমকা নিভলো। কয়েক মুহূর্তে আকাশ মাটি নদী মিশে গেলো একদম অন্ধকারে। তারপর দশ দিক ভরে এলো গর্জন আর গর্জনে।

ঝোপঝাড়ের অন্ধকারে জোনাকীর আলোর শব্দে জ্বললো আর এক ধরনের তেজী নীল আলো। ঝাঁকে ঝাঁকে অবিরাম। লঞ্চ ডুবলো। সকাল হলো। বড় নদীর বাঁকে অপেক্ষা করছিলো যে দুটো সাজোয়া লঞ্চ, রাতের গোলাগুলির শব্দে তারা আর সাহস পেলো না গ্রামে ঢোকার। ঘুরিয়ে নিলো গতিমুখ।

একটু বেলা করে গাঁয়ের ছেলেরা, ক্যাম্পের যুবকরা ফিরে এলো। এলো না শুধু নিশান। গাংগের কোথাও সে ঘুমিয়ে আছে। ঘুমিয়ে থাক।





ঘরে ফেরা

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর

বাবা আর আমি হেঁটে বেড়াচ্ছি, বিকেলে নদীর পাড়ে। নদীটা অনেকদূর চলে গেছে একটানা, নৌকোগুলি শাদা লাল বাদামী কোড়ার মতন বাতাসে কেশর ফোলছে।

সেদিকে তাকিয়ে জিগগেস করলাম, সেই ঘটনাটা ফের বলো না বাবা, কি করে বেঁচে এলে?

বাবা বললেন, আমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিলো। রোজই একজন দুজন করে গুলী করে মারে। লম্বা একটা বাড়ি, জানালা দিয়ে দেখা যায়। আমার বাঁ পাশের লোকটিকে আগের দিন মেরে ফেলেছে। ভাবলাম এবার আমার পালা, সে-রাতে কিন্তু কেউ এলো না। সকাল বেলা দেখলাম ডানদিকের দুজনকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, ওদের মেরে ফেলবে। একজন বয়স্ক, চল্লিশের মতন বয়েস; অন্যজনের বয়েস কম; কত হবে, পনেরো, ছেলেটি কাঁদছে। হয় তো ওরা দুজন বাবা-ছেলে, কিংবা দু ভাই, কিংবা কেউ কারো কিছু নয়। তারা ছেলেটির দু চোখ পটি দিয়ে বেঁধেছে, কিন্তু বয়স্ক লোকটি কিছুতেই চোখ বাঁধবে না। সঙ্গের অফিসার খেকিয়ে উঠেছে, ছেলেটি ঠিক হয়ে দাঁড়িয়ে, কিন্তু ঐ লোকটি ঢিলেঢালা, পকেটে দুহাত দিয়ে দাঁড়িয়ে, কোন ভাবান্তর নেই।

অফিসারটি ফের খেকিয়ে উঠেছে, পকেট থেকে হাত বের করো। লোকটি মাথা নেড়েছে, আস্তে আস্তে বলেছে, আজ বেলা হয়ে গেছে, আজ বাদ দিলে হয় না।

আমরা জানলায় মুখ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে, আমরা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি।

অফিসারটি তখন গুলী করার হুকুম দিয়েছে। রাইফেল তাগ করার আগেই ছেলেটি সার্ট ছিঁড়ে বুকের ওপর জড়ো করেছে, ভাবটা গুলী ঠেকে যাবে। সার্ট ফুটো ফুটো হয়ে আকাশে উড়েছে আর ছেলেটি মুখ থুবড়ে পড়েছে।

ঐ লোকটি আলগোছে পিছে পড়ে গেছে, খুব সম্ভব পকেটে ওর হাত থাকার দরুন।

অফিসারটি ছেলেটির মুখে রিভলবার থেকে একবার গুলী ছুঁড়েছে। কিন্তু লোকটির গায়ে গেঁথেছে ছ'টি গুলী, কে জানে বেয়াদবী করার জন্য কি না।

নদীতে বাতাসের পাগলামো বেড়েছে। ঐ ছেলেটির ফুটো ফুটো সার্টের মতন ঢেউ গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে। আমি ঐ দিকে তাকিয়ে ফের জিগগেস করেছি, তারপর তোমাদের কিছু হয় নি।

বাবা অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলেন। ঐ ফাঁকে আকাশে গুটিকয় তারা জেগে গেলো। বাবা আস্তে আস্তে বললেন, না কিছু হয়নি। শুধু সে রাত্রে স্বপ্ন দেখেছি। ওরা একটানা গুলী করছে। বুকটা ঝাঝড়া হয়ে গেছে। সকালে উঠে দেখি বুকটা ভারি, ব্যথা, টনটন করছে। আর ঐ কথা মনে হলে একটা একটা গুলী যেন লাগে বুকের মধ্যে।

বাবা চুপচাপ নদীর দিকে তাকিয়ে থাকলেন, আমিও। তখন মনে মনে বললাম, তুমি যখন ছিলে না বাবা তখন খুব খারাপ লাগত। মা মন ভার করে বসে থাকতেন। আত্মীয় স্বজনেরা দূরে দূরে থাকতেন। তখন একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছিলো। একটা মেয়েকে ভালো লেগে গিয়েছিলো আমার। তখন তো লোকজন হামেশাই এ-পাড়া ও-পাড়া করত, নিরাপদ এলাকার খোঁজে। আমাদের বাড়ির পাশে ওরা এসে ওঠেছিলোঃ শুধু মা, মেয়ে, দুটি চাকর। ওর বাবা আগেই মারা গেছেন। আমার খুব আলাপ করতে ইচ্ছে করত, কথা বলতে ইচ্ছে করত সীমার সঙ্গে। বয়েস কত হবে? ধরো চৌদ্দ পনেরো। সুন্দর করে শাড়ী পরত আর বিকেলে চুপচাপ জানালার কাছে বসে থাকত। আমি লুকিয়ে দেখতাম, বিশ্বাস করো বাবা, আমার মনের মধ্যেকার জমা দুঃখ কমে যেত, সুখী হত চোখ, মনে হত একটা দুঃস্বপ্নের মধ্যে আছি, ফের সব ঠিক হয়ে যাবে, তুমি ফিরে আসবে, মা ফের খুশী হয়ে উঠবেন, সীমারা আমাদের কাছাকাছি থাকবে চিরকাল, বিশ্বাস করো বাবা ওর দিকে লুকিয়ে তাকালেই সুখটা সামনে এসে দাঁড়াত। মা ওদের বাসায় গেছেন, আমাকে বলেছেন যেতে, কিন্তু আমি যাইনি। একদিন বিকেল, আমি ফিরছি বাজার থেকে, দেখি সীমার রিকশা থামিয়েছে, এক সৈন্য রিকশাওয়ালার গদি ওলট পালট করছে। আমি কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, সীমার মুখ ফ্যাকাশে, আমাকে দেখেই রিকশা থেকে নেমে এসেছে, রিকশাওয়ালার হাতে একটা টাকা গুঁজে আমার সঙ্গে হাঁটা শুরু করেছে পাশাপাশি। সৈন্যটা ত থ, রিকশাওয়ালা ছাড়া পেয়ে ছুট। আমি জিগগেস করেছিলাম, খুব ভয় পেয়েছিলে, না? সীমা জবাবে বলেছিল, হ্যাঁ, তুমি পাওনি? আমি জিগগেস করেছিলাম, কোথায় গিয়েছিলে? সীমা বলেছিল, মার অসুখ, ওষুধ আনতে। আমি জিগগেস করেছিলাম, তোমার বাবা? সীমা বলেছিল, নেই, মারা গেছেন। ফের জিগগেস করেছিল, তোমার বাবা? আমি বলেছিলাম, ধরে নিয়ে গেছে। তারপর অনেকক্ষণ চুপচাপ, হঠাৎ দেখি বাসা সামনে। সীমা আস্তে করে বলেছিল, আসি। তুমি আসবে তো? আমি জবাব দিইনি, শুধু তাকিয়ে থেকেছি, সীমা হেঁটে হেঁটে বারান্দায় উঠেছে, একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে ভেতরে চলে গেছে। পরের সন্ধ্যায় মা আমাকে বললেন, সীমারা অন্য পাড়ায় চলে যাবে রে। ওর মা খুব ভয় পেয়েছে। কোন কথা না বলে আমি রাস্তায় নেমে এসেছি, সন্ধ্যার বাতাস ঠাণ্ডা, আমার মুখ আর কান ধুয়ে দিচ্ছিল। আমি অনেকক্ষণ হেঁটেছি, ইচ্ছে হচ্ছিল সীমাদের বাসায় যেতে, যেন ওখানে গেলে আমি শান্তি পাব। আমি কিন্তু ওদের বাসার দিকে গেলাম না, অন্যদিকে হেঁটে বেড়ালাম, মধ্যে মধ্যে দু' একটি গাড়ি দ্রুত ছুটে যাচ্ছে, কেউ তো তখন সন্ধ্যার পর রাস্তায় পারতপক্ষে বের হত না। আমার খুব ইচ্ছে করছিল সীমার সঙ্গে যে-বিকেলে হেঁটেছি সেই অনুভূতিটা ফের জেগে

উঠুক, কিন্তু মনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে এসেছে খালি রাস্তার ঠাণ্ডা। অনেকক্ষণ হেঁটেছি, অর্থহীন হাঁটা সেই বোধও জেগে গেছে তখন। হঠাৎ দেখি ওদের বাসার সামনে দাঁড়িয়ে আছি, জানালায় বাতি। বাতির রং হলুদ কমলা লেবুর মতন। অনেকক্ষণ তাকিয়েছিলাম, অনেকক্ষণ। ঠিক মনে নেই কখন ফের হাঁটা শুরু করেছি। আর তখনই বুকের মধ্যেকার জমা করা শব্দটা চিৎকার করে উঠেছে, সব চিন্তা ছাপিয়ে।



আমি আস্তে বলেছি, ফিরে চলো বাবা। তখন অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে। রাস্তা খালি, ঝোপঝাড়ে খসখস আওয়াজ উঠছে। হয়তো শেয়াল, হয়তো বাগডাস। মসজিদের কাছে এসে গেছি। মিনারটা বাতাসে কাঁপছে।

কয়েক পলক থেমে আমি বলেছি, পাড়ার আনছার আলী সাহেবকে তোমার মনে আছে

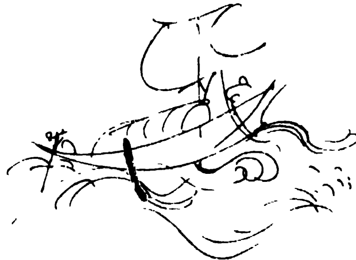
বাবা ? সেই যে খুব নামাজ রোজা করতেন ভদ্রলোক, সব সময় মসজিদে নামাজ পড়তেন। একবার কার্ফু দিয়েছে। ভদ্রলোক এশার নামাজ মসজিদে পড়বেনই। লাগোয়া বাসা তাঁর। হেঁটে হেঁটে মসজিদে এসেছেন। একটা সৈন্য দেখেছিলো। সোজা মসজিদের ভেতর এসে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে মেরেছে। সারারাত মসজিদের ভেতর লাশ পড়েছিলো। সকালবেলা তাঁর ছেলেরা এসে তাঁকে কবর দিয়েছে, মসজিদের পাশেই, ঐ তো কবর, দেখেছো বাবা ?

অন্ধকারে ভালো করে কিছু দেখা যায় না। রাস্তার পাশে বাঁশের বেড়া, খানিকটা জমি উঁচু হয়ে আছে। বাবা খানিকক্ষণ চেয়ে থাকলেন, কিছু বললেন না। কোথাও কোন শব্দ নেই, ঝিঁঝি পোকার ডাক শোনা যাচ্ছে। কে যেন দূর থেকে হেঁকে উঠেছে ঃ কে যায় ; বাতাসে ঐ আওয়াজ থেকে থেকে কাঁপছে।

আমরা ফের হাঁটছি। রাস্তা জুড়ে ঝিঁঝির ডাক ; নিরবচ্ছিন্ন ধারায় শব্দের পর শব্দ, ডাকের পর ডাক কানের কাছে তৈরী হচ্ছে, আওয়াজটার আঘাতে ধ্বসে যাচ্ছে বাড়িঘর ঝোপঝাড় জঙ্গল মানুষের বসতি। সেই শব্দের মধ্যে ভেসে এসেছে গন্ধ, সেই বকুল গাছটা গন্ধের দোকান সাজিয়ে বসেছে। গাছটার কাছে এসে থমকে দাঁড়ালাম, বললাম, নিশিকান্তকে তোমার মনে নেই বাবা ? নিশির এক বুড়ি দাদী ছিল, দুচোখ ছানি পড়া, সংসারে আর কেউ ছিল না। সেই নিশিকে এই গাছটাতে গেঁথে মেরেছে। বুড়ি দাদী রোজ গাছের নিচে এসে বসত আর চেঁচাত ঃ কি রে নিশি গাছ থেকে নামবিনে। তারপর যে কোথাও চলে গেল বুড়ি, কেউ জানে না। নিশি গাছটায় বহুদিন গেঁথেছিল। ছাদ থেকে দেখা যেত, দু হাত ছড়ানো, নিশি সমস্ত পাড়াটার দিকে চেয়ে আছে।

বাবা এবারেও কিছু বললেন না। গাছটার দিকে একবার তাকিয়ে মাথা নিচু করে হাঁটছেন। অন্ধকারটা কচুরী পানার মতন রাস্তার বাঁকে জমে আছে চাপচাপ স্তরস্তর অন্ধকার। আমাদের বাসা কাছেই। ঐ ত মেহেদীর বেড়া, দালানের টুকরো, গেটটা খোলা। আমি মনে মনে বললাম, জানো বাবা তোমার ছাড়া পাওয়ার দুদিন আগে মা হঠাৎ করে মারা গেলেন। মা ভেবেছিলেন তুমি বোধহয় আর কোন দিন ফিরে আসবে না। হঠাৎ হাঁপাতে লাগলাম, আর হাঁটতে পারছি না, সেই ঝিঁঝি ফের কানের কাছে বেজে উঠছে, স্তরস্তর অন্ধকারের মধ্যে ঝিঁঝি ডাকছে।

বাবা গেট দিয়ে ঢুকলেন, তাকালেন আমার দিকে। আর আমার আঠারো বছরের দুচোখ বেয়ে পানি ঝরতে শুরু করল, সব কথা নষ্ঠ, আমি ফোঁপাতে লাগলাম, আস্তে আস্তে বললাম, যেন আমি না আর কেউ ঃ ভেতরে যেতে ভয় করছে বাবা।





তিন পাহাড়ের হরিণ

শওকত আলী

শীতের পাতা ঝরা শেষ হয়েছে সেই কবে। পশ্চিম থেকে মাতাল হাওয়া দিগদিগন্ত দাপাদাপি করে চলে যায়। পাহাড়ের গায়ে পাথরের ফাঁকে ফাঁকে হাওয়ার ঝাপটা শিস দিয়ে ওঠে, মনে হয় কোথায় কোন গুহার ভেতর স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার থেকে হিংস্র ময়াল তার শিকার দেখে শীৎকার দিয়ে উঠছে।

দিনের পর দিন চলে যাচ্ছে। দিগন্ত ঘোলাটে, প্রখর সূর্য মাথার ওপরে জ্বলে যায়, বনের ভেতর গাছতলায় শুকনো পাতার রাশ ওড়ে। পাতাঝরা ডাল-পালায় হাওয়ার ঝাপটা নিজেকে কেবলি আছড়ায়। প্রখর শুকনো হাওয়া বুকের ভেতরকার রসটুকু পর্যন্ত শুষে নিয়ে যায়। বুক জোড়া পিপাসা হাহা করছে চারদিকে।

হরিণের দলটা আকাশের দিকে তাকায়। আকাশটা নিষ্ঠুর। প্রখর সূর্যের দিকে তাকিয়ে দুপুর বেলা তারা পাহাড়ের গায়ে উঁচু পাথরগুলোর আড়ালে চলে যায়, আবার সূর্য ঢলে পড়লে আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে। সবার চোখ পড়ে থাকে দিগন্তের দিকে, হাওয়ার ঝটপটানি শুনলেই কান খাড়া হয়ে ওঠে। ঐ বুঝি মেঘ ডাকলো।

তারা রুদ্ধশ্বাসে চোখ ফিরিয়ে দেখে। তারপর হতাশ হয়ে আবার মুখ ফিরিয়ে নেয়। না বৃষ্টি হবে না, মেঘ নেই আকাশে। একদিন দু'দিন নয় বেশ কিছুদিন ধরে ওরা আট্‌কা পড়ে গেছে। বহুদিন আগে যে পথে এসেছিলো, সে পথ এখন আর নেই। তারা এসেছিলো গভীর খাদের পাশ দিয়ে। এক পাথর থেকে আরেক পাথরে লাফিয়ে লাফিয়ে। গত বর্ষার দারুণ বৃষ্টিতে কখন ধ্বস নেমে পাথরের চাঁইগুলো ভেসে গিয়েছে কেউ লক্ষ্য করে নি। এখন সেখানে রাস্তা নেই, গভীর খাদ।

এমনিতে ভারী আরামে ছিলো তারা। তিনদিকে পাহাড় খাড়া উঁচু হয়ে উঠেছে আর একদিকে

হাল্কা বন, বনের ওপারে দু'পেয়েদের বাস। দু'পেয়ে জানোয়ারগুলো প্রচণ্ড শব্দ করে কী যেন ছুঁড়ে মারে। তাই ওদিকে বনের জানোয়ার এগোয় না। হরিণের দলটা ওদিকে কখনো যায় নি। দলের বুড়োরা বলে দিয়েছিলো, দু'পেয়েরা যেদিকে আছে সেদিকে কখনো যেও না। ওরা ওদিকে কক্ষনো যায় নি। সামনে আর ডাইনে বাঁয়ে যদি হিংস্র কোন জানোয়ার থাকে তা'হলে তিরিশ চল্লিশ হাত পাথুরে খাড়াই বেয়ে ওঠার মত সামর্থ আর যারই থাক ওজনে ভারী বাঘ-চিতার নেই। ছোট ছোট পাথরে ভর্তি পাহাড়ের গা, খাড়াই পাহাড়ে একবার পা ফস্কালে গড়াতে গড়াতে পাথরে ঠোক্কর খেতে খেতে নিচে আছড়ে পড়তে হবে।

বেশ আরামে ছিলো হরিণের দলটা। খাড়াই পাহাড় ঘেরা একটুখানি সমতল। এইটুকু জায়গার ভেতরেই একটা ছোট্ট জলা, মাটির ভেতর থেকে ধীর ফোযারায় পানি বইছে আর সেই জলার চারদিক ঘিরে সবুজ ঘাস। শীতের প্রথম দিকেও ঘন কালো ঘাস ছিলো। এখন সবুজ ঘাস রোদে পুড়ে গিয়েছে শুকিয়ে। জলার ধার ঘেঁষে যে জায়গাটুকুতে ঘাস ছিলো তাও এখন বাচ্চা হরিণেরা খেয়ে সাফ করে দিয়েছে।

এখন এ জায়গা থেকে বেরুনো ছাড়া বাঁচার উপায় নেই। যদি বৃষ্টি হতো, তাহলে হয়তো তাদের এতো দুশ্চিন্তা ছিলো না। বৃষ্টি হলে ঘাস গজাতো গাছপালা সবুজ হয়ে উঠতো, এক বছরের জন্যে তারা থেকে যেতে পারতো। কিন্তু বৃষ্টি নামে না, দিনের পর দিন আকাশের দিকে চেয়ে আছে আর অস্থির হচ্ছে।

অস্থির হচ্ছে নিজেদের জন্যে নয়। বড়রা তো যেতেই পারে। বাচ্চারা এখনো ছোট। এখনও সাহস পায় না যে প্রকাণ্ড খাদ লাফ দিয়ে পার হবে, কি ঢালু পাহাড়ের গায়ে ছড়ানো পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে ওপরে উঠে যাবে।

আর এ জায়গা ছেড়ে গেলেই বেঁচে গেলো তাতো নয়। এ জায়গার বাইরে কোথায় যাবে? কোথায় খুঁজে বেড়াবে ঘাসের দেশ? যদি না পাওয়া যায়? শুধু দলসুদ্ধ সবাইকে খুঁজেই বেড়াতে হয়, তাহলে বনের হিংস্র জানোয়াররা কি ছেড়ে দেবে? এ তল্লাটের শয়তান হচ্ছে কালরাজ, তার নাগাল এড়িয়ে যাওয়া কি অতই সহজ?

তাই তরুণ হরিণেরা পথ খুঁজে ফিরছে। একটা পথ তারা খুঁজে পেয়েছে। অতি বিপজ্জনক রাস্তা। প্রকাণ্ড এক খাদের ওপারে পর পর ক'খানা বড় পাথরের চাঁই ঢালু পাহাড়ের গায়ে সাজানো আছে। পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে ওপরে চলে যেতে হবে। কিন্তু খুব সাবধানে, একবার পা ফস্কালে, কি একটা পাথর যদি গড়িয়ে পড়ে তাহলে নিশ্চিত মরণ। সে পথ দিয়েই কেউ কেউ বাইরে যায়, খুঁজে ফেরে কোথায় আছে ঘাসে ঢাকা সবুজ মাটি। কোথায় ঝর্ণার ঠাণ্ডা পানি টলটল করছে। কোন নদীর ধারে দিগন্ত বিস্তীর্ণ সমতলে সবুজ হাওয়া খেলা করে ফিরছে।

কিন্তু আজো সে দেশের সন্ধান কেউ দিতে পারেনি।

তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। হরিণেরা অপেক্ষা করছে একজায়গায় দাঁড়িয়ে। পথ চেয়ে আছে বাচ্চারা। কেউ কেউ কান পেতে আছে, যদি অতি পরিচিত শব্দটা শোনা যায়। সর্দার দলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। তার চকচকে গায়ে দিনশেষের আলোর আভা। মাঝে মাঝে সর্দার বলছে, না ওরা ফিরবে না। ফিরলে এতোক্ষণে ফিরে আসতো। কে জানে, হয়তো পালিয়েই গিয়েছে।

যা বেয়াদপ ছোকরা তোমাদের ঐ চিত্রল। এক বুড়ো হরিণ নিচুগলায় মন্তব্য করে। বাচ্চারা তরুণরা কেউ কথা বলছে না। তাদের বিশ্বাস হয় না। তারা কান পেতে রেখেছে। কোথাও একটু শব্দ হলেই বুকের ভেতরে সেই শব্দের প্রতিধ্বনি শোনে।

তারা জানে, চিত্রল ফিরে আসবে।

আজ ভোরে, তখন পূবের পাহাড় চূড়োয় ভোরের আলো সবে দেখা দিয়েছে তখনই বেরিয়ে যায় চিত্রল অশান্ত আর চপল। ওরা তিনবন্ধু। সেই যে গেলো, তারপর আর ফেরেনি। ওরা কী খবর নিয়ে আসে সেই জন্যে এখন সবার অপেক্ষা। বুড়োরা আর সর্দার নিজেদের মধ্যে কী যেন কানাকানি করছে। এক সময় সর্দার জিজ্ঞেস করলো, তোমরা দেখেছো কেউ, ওরা কোন দিকে



গেছে? একটু থেমে আবার জিজ্ঞেস করে, ওরা কি কাউকে কিছু বলে গিয়েছে?

সর্দারের কথার জবাব কেউ দেয় না। কেউ জানলে তো! চিত্রল কাউকে কিছু বলে না। অশান্ত চপল তার অত বন্ধু,তারাও জানে না। সে কারো শাসন মানতে চায় না। জাতের নিয়ম কানুনের পরোয়া করে না। যখন ইচ্ছে, যে দিকে ইচ্ছে চলে যায়। আবার ইচ্ছেমত ফিরে আসে। যা কিছু কথা ওর, সব বাচ্চাদের সঙ্গে। তাদেরকে ও গল্প শোনায়,কোথায় আকাশ ঝকঝকে নীল। কোথায় বিশাল হ্রদে রাতের জ্যোৎস্না ছলোচ্ছল ঢেউ দিয়ে মাটি ছুঁয়ে যায়—কোথায়

মাইলের পর মাইল জুড়ে শুধু সবুজ আর সবুজ।

সে বলে আর তার দু'চোখের ভেতরে কেমন যেন কোমল আলো জেগে ওঠে। ওর কথা শুনতে শুনতে বাচ্চাদের শরীরে কী রকম কাঁপ লেগে যায়। গল্প বলা শেষ হলে বাচ্চা হরিণদের ডেকে বলে, আমরা একদিন সেই দেশে যাবো।

তারপর সে নাচতে আরম্ভ করে দেয়। বলে, আমরা এমনি নাচতে নাচতে যাবো, চলো এসো সবাই।

তখন সেই জ্যোৎস্নার মধ্যে খোলা মাঠে ওদের নাচ সুরু হয়ে যায়। খটাখট খটাখট হুরূরে হুরূরে শব্দ বাজতে থাকে। পাহাড়ে পাহাড়ে সেই শব্দ অস্ফুট প্রতিধ্বনিত হতে থাকে অনেকক্ষণ ধরে। অনেক রাত হয়ে যায়, তবু বাচ্চারা মায়ের কাছে ফেরে না।

সেই চিত্রলের মনের খবর কে বলবে ? দস্যিপনায় তার জুড়ি নেই, দুঃসাহসের সীমা নেই।

সর্দার ফের জানতে চাইলো, কেউ বলতে পারে কি না, চিত্রল কোন দিকে গিয়েছে। কেউ বলতে পাবে না।

সর্দার চিত্রলকে শাসন করো, চপলের বাবা কথা বললো হঠাৎ।

সর্দার মুখ ফেরায়। অশান্ত আর চপলের মা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। তাদের দু'চোখের ভেতরে কী রকম একটা অজানা ভয় থমথম করছে।

অন্যান্য বুড়োরাও তখন বলাবলি করে, নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে। ছোকরা যা গোঁয়ার। একেক দিন রাত হয়ে যায়। তবু সে ফেরে না। সারা বনময় ঘুরে বেড়ায়। চওড়া চওড়া খাদ, নিচে তাকালে বুক কেঁপে ওঠে, তাও সে হাসতে হাসতে লাফ দিয়ে ডিঙিয়ে চলে যায়।

আজ হয়তো অনেক দূরে কোথাও গেছে। ফেরার কথা হয়তো মনেই ছিলো না। যখন মনে হয়েছে তখন হয়তো পথ খুঁজে পাচ্ছে না। আর যদি - - - - -

কথাটা ভাবতেই বুক কেঁপে ওঠে ভয়ে। কথাটা কেউ মুখ দিয়ে উচ্চারণও করতে চায় না। কিন্তু মনে মনে সবাই বোঝে। সবাই দেখেছে তাকে। কী ভয়ঙ্কর দেখতে। শয়তানটা বহুদিন ধরে তাদের দলের পেছনে লেগে আছে। হলদে গায়ে কালো কালো ডোরা, মাথাটা কী প্রকাণ্ড, চোখ জোড়া অসম্ভব নিষ্ঠুর, দেখলেই হাত-পা হিম হয়ে আসতে চায়। কতবার সে পিছন থেকে লাফিয়ে পড়েছে। দল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছে কোন শিশু হরিণকে। সর্বদা তটস্থ থাকতে হতো তখন। এ জায়গায় আস্তানা নেওয়ার পর আর সে হামলা কবতে আসতে পারে না। কিন্তু লোভ তাব যায়নি। কতদিন দেখা গেছে, টিলার ওপর মাথা তুলে দৃপ্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। রাগে গরগর করছে, ল্যাজ আছড়াচ্ছে, আর থেকে থেকে কী হুঙ্কার।

সবাই দেখেছে শয়তানটাকে। সবারই বুকের ভিতরে আশঙ্কা থমথম করে উঠলো। যদি কালরাজের মুখে চিত্রল চপল অশান্ত পড়ে, তাহলে ?

কথা বলতে পারে না কেউ। সর্দার মাথা উঁচু করে ডাইনে-বাঁয়ে তাকালো। না কোথাও কোন সচল কিছু দেখা যায় না। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। একটুপর আর কিছুই দেখা যাবে না সর্দার ডেকে জিজ্ঞেস করে সবাইকে, ওদের খুঁজতে যাবে কেউ ?

কেউ সাড়া দেয় না। গাছে পাতা নেই, তবু যেন নিস্পত্র ডাল থেকে উষ্ণ নিঃশ্বাস এসে লাগছে কারো কারো গায়ে।

ওদের চুপ করে থাকতে দেখেই কি না কে জানে সর্দার গালাগাল দিতে আরম্ভ করলো, ভীরুর দল, তোদের মরাই ভালো।

বাচ্চারা দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলো, ওরা একসঙ্গে কথা বলে উঠলো। বললো, সর্দার পথ ঘাট চেনে, বুড়োরা রাক্ষুসে জানোয়ারদের চেনে, আমরা কেউ চিনি না। বড়রা যাক, ওদেরই যাওয়া উচিত প্রথমে।

ওদের কোলাহল শুনে ধমকে ওঠে সর্দার, এ্যাই চোপ্। শিং বাগিয়ে ধরে বলে, চ্যাচাবি তো খুঁচিয়ে মারবো।

গালাগাল করতে থাকে সর্দার। বলে অমন বেয়াদপ হরিণ দলের কুলাঙ্গার। কালরাজ যদি ওকে চিবিয়ে খায় তবে তার উচিত শাস্তি হয়।

হরিণেরা চুপ করে শোনে। তিনটে বুড়ো ছিলো, শিঙ্গের ভারে মাথা নুয়ে পড়েছে তাদের। তারা মাথা নেড়ে নেড়ে বলে, হ্যাঁ ঠিকই তো, ছোকরা আমাদের কথা শোনে না। গোঁয়ার একরোখা। ওর বাপের মত, বাপকে খেয়েছিলো কালরাজ, ছেলেকে কি আর ছেড়ে দেবে।

সর্দারের কথা শোনার পর অশান্ত আর চপলের মা ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠলো। চিত্রলের জন্যে কাঁদবার কেউ নেই। শুধু বাচ্চারা চিত্রলের কথা ভাবতে লাগলো। তাদের তীর বেগে ছোটার কায়দা কে শেখাবে? হিংস্র জানোয়ার সামনে এলে কি ভাবে রুখে দাঁড়াতে হবে, কি ভাবে ক্ষিপ্রগতিতে তার চোখে ধূলো দিতে হবে, কার কাছে শিখবে এ সব? আর কে বলবে জ্যোৎস্নালোকিত হ্রদেব গল্প? পাঁচ-পাহাড়ের চূড়োয় যেখানে রুপোর মত বরফ ঝলমল করে সেখান থেকে কেমন করে ঝর্ণাধারা বয়ে আসে, কোথায় যেন সমুদ্র আছে, শুধু নীল পানি, আর তাব বুকে পাহাড়ের মত ঢেউ অনবরত দুলছে। কে শোনাবে তাদের এসব কথা? বড়দের জটলা থেকে বাচ্চারা একপাশে সরে দাঁড়ায়। কথা বলে না কেউ। তাদের আপন বলে আর কেউ থাকবে না। আর কেউ বলবে না যে দুনিয়া অনেক বড়। এই শুকনো বনভুমি পার হয়ে পাহাড়ের ওপারে যে আরো সবুজ দিগন্ত আছে, সেই বিপুল মুক্তির কথা শোনাবার জন্যে আর কেউ থাকবে না তাদের কাছে।

কারো কারো চোখে পানি টলমল করে ওঠে।

আর ঠিক তক্ষুনি কে যেন বলে উঠলো, এই চুপ। শোনো তো কিসের শব্দ।

সবাই চুপ করতেই শোনা গেলো, হ্যাঁ আসছে। খুরে খুরে শব্দ বাজছে নাচের ছন্দের মত।

ততক্ষণে অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। ভাঙ্গা চাঁদ ঝুলছে পাহাড়ের ওপরে। আর সেই জ্যোৎস্নায় ক্রমশঃ স্পষ্ট দেখা গেলো। তিনটে সজীব অন্ধকার যেন ধেয়ে আসছে। কাছে আসতেই চেনা গেলো। তিন বন্ধু—চিত্রল, অশান্ত, চপল।

ওরা হাঁফাচ্ছিলো, চপল বললো, কালরাজ তাড়া করছিলো পেছনে, বাব্বাঃ শয়তানটা কী দৌড়ায়। অশান্ত ধমকে উঠলো, চুপ করবি তুই। আর বলবার কথা পেলি না।

চিত্রল সর্দারের মুখোমুখি মাথা উঁচু করে দাঁড়ালো। তারপর বললো, অনেক অনেক দূরে আছে সবুজ ঘাসের দেশ। সূর্য যখন ওঠেনি তখন থেকে ছুটতে হবে আর সূর্যটা ডুবে আকাশ থেকে যখন লাল রং মুছে যেতে থাকবে তখন পৌঁছানো যাবে সে জায়গায়। একটা নদী পার হতে হবে, নদীর ওপারে শুধু সমতল মাটি। কেবল সবুজ আর সবুজ।

কিন্তু যাবে কি করে? চিত্রলের কথার মাঝখানে বাধা দিলো এক বুড়ো হরিণ।

চিত্রল হেসে জিজ্ঞেস করলো, কেন যেতে অসুবিধা কোথায়?

কেন, ঐ যে কালরাজ ওৎ পেতে আছে।

চিত্রল সমবেত সব হরিণের মুখের ওপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে নিলো। তারপর বললো, আসলে

ভয়টা আমাদের নিজের ভেতরে। আজ আমরা তিনজন একসঙ্গে ছিলাম। গায়ে গায়ে লেগে ছিলাম সর্বক্ষণ, কালরাজ হামলা করতে এসেও পারে নি। আর আমরা যদি ভয় পেয়ে এক একজন এক একদিকে ছুটে যেতাম তাহলেই মরতে হতো আমাদের। আমরা যদি একসঙ্গে থাকি, একজোট হয়ে মুখোমুখি দাঁড়াই, তাহলে কেউ আমাদের ওপর হামলা করতে সাহস পাবে না।

চিত্রল আরো কিছু বলতো হয়তো, তার আগেই কে একজন বলে উঠলো, ঐ ছোকরাকে আর আস্কারা দিও না। ওর কথা শুনে এখান থেকে বেরুলেই আমরা মরবো। কালরাজ আমাদের কাউকে ছাড়বে না। অনেক দিন ধরে সে হরিণের রক্তের স্বাদ পায় নি। না, আমরা যাবো না।

সর্দার কিছু বললো না, শুধু দেখতে লাগলো।

চিত্রল আরকবার চারদিকে তাকিয়ে বললো, আকাশে মেঘের দেখা নেই। এখানকার ফোয়ারা শুকোতে আর দেরী নেই, তখন পানি না খেয়ে মরতে হবে। এখন হয়তো বাচ্চারা খাদ লাফিয়ে পার হয়ে যেতে পারবে। না-খেয়ে না-খেয়ে দুর্বল হয়ে পড়লে তখন সে শক্তিটুকুও আর থাকবে না। তখন বাচ্চারা শুকিয়ে না খেয়ে মারা পড়বে। তার চাইতে গেলে এখনই চলে যাওয়া ভালো।

ওর কথা কেউ শুনলো না। বুড়োরা সমস্বরে না না বলে চেঁচাতে লাগলো।

চিত্রল মাথা নিচু করে সরে এলো। কিছুটা হেঁটে এসে পেছনে তাকালো একবার। আহা বাচ্চাগুলোর ভারী কষ্ট হবে। এত সুন্দর বাচ্চারা, কী লাফালাফি ছুটাছুটি করছে—এরাই শুকিয়ে যাবে, হাড়-পাঁজরা দেখা দেবে। পিপাসায় কাতর হয়ে একসময় দিকবিদিক জ্ঞান হারিয়ে খাদের মধ্যে পড়ে পড়ে মরতে থাকবে। তখন ? তখন এই বুড়োরা কোথায় থাকবে ?

চারদিকে জ্যোৎস্না, পশ্চিম থেকে গরম হাওয়া বয়ে আসছে। সারাদিন পাহাড়ের গায়ে যে উত্তাপ জমেছিলো সেই জমানো উত্তাপ এখন হাওয়া হয়ে বইছে। চিত্রল আকাশের দিকে তাকালো। তারাগুলো ঝিকিমিকি কাঁপছে। অনেক অনেক দূরে তারার দেশ। চাঁদটা যে কত দূরে কে বলবে ? তার জানতে ইচ্ছে করে। তাদের দলের এক বুড়ো ছিলো, সে তাকে সমুদ্রের কথা বলেছিলো, পাঁচ-পাহাড়ের ধবল চূড়োর গল্প শুনিয়েছিলো। এখনও তার ইচ্ছে করে সেই সব দেশে যেতে।

কিন্তু এরা, এই জীবগুলো গর্ত থেকে বেরুতে চায় না মোটে। নিজের দলের হরিণদের কথা ভেবে করুণা হয় চিত্রলের।

তবু সে যাবে। দরকার হয় একাকী চলে যাবে।

এদিকে একটি একটি করে দিন যেতে লাগলো। আরো আগুন ছোটানো হাওয়া বয়ে এলো পশ্চিম থেকে। পাহাড়ের পাথরে পাথরে বুকজোড়া পিপাসা হা হা করে ফিরতে লাগলো। গাছের শুকনো পাতাও আর পাওয়া যায় না। ফোয়ারার পানি শুকিয়ে এসেছে, এখন আর স্রোত বয় না। আর কদিন কে জানে।

চিত্রলের কোন কাজ নেই। সে আর দূর দেশে যায় না। বাচ্চা হরিণদের ছুটতে শেখায়, জোরে লাফাতে শেখায় আর শেখায় ঢালু পাহাড়ের গায়ে পাথর থেকে পাথরে কিভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে যেতে হবে। যারা শিখে ফেলে তাদের নিয়ে যায় বাইরে, সেই বিপজ্জনক খাদের রাস্তা ডিঙ্গিয়ে বাইরের বন থেকে কিছু ঘাস-পাতা খাইয়ে আনে।

হরিণেরা সবাই এখন গালাগাল করে একে অপরকে। বাইরে যাওয়া হরিণের সংখ্যাও

বেড়েছে। কিন্তু তবু এ জায়গা ছেড়ে যে সবাই মিলে দূর অজানার পথে পা বাড়াবে, এমন সাহস কারো হয় না।

কালরাজ হঠাৎ সেদিন দেখতে পেয়েছিলো। দুপুরে টিলার মাথায় দুটো প্রকাণ্ড পাথরের আড়ালে সে ঘুমোচ্ছিলো। হঠাৎ ঘুমটা ভেঙ্গে যায়। কটা পাখি চ্যাঁ চ্যাঁ করে উঠেছিলো। উঠে বসতেই চোখে পড়ে তিনটে হরিণ একসঙ্গে বিদ্যুৎ বেগে ছুটে যাচ্ছে। সে লাফিয়ে ওঠে, এতো কাছে সে বহুদিন হরিণ পায়নি। কিন্তু হরিণগুলো যে কিভাবে নিমেষে পাহাড়ের খাদের ওপারে চলে গেলো, সে আজো ভেবে পায় না। হরিণ তিনটের পিছু সে ছাড়ে নি।

কালরাজ ছুটেছিলো ওদের পিছনে। কাছাকাছি গিয়েও ছিলো, কিন্তু ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে নি। কাছাকাছি হতেই দেখলো তিনটে হরিণই শিং বাগিয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রয়েছে।

কোনদিন এমন হয় নি। তার অবাক লেগেছিল। এ রকম তো হওয়ার কথা নয়। হরিণেরা তো চিরকাল বাঘ দেখে যে যেদিকে পেরেছে পালাতে চেয়েছে, অমন গায়ে গায়ে লেগে শিং বাগিয়ে রুখে দাঁড়ায় নি কখনো। কালরাজ দূর থেকে দাঁড়িয়ে হরিণ তিনটের সুঁচালো শক্ত শিংগুলোর দিকে তাকিয়ে ছিলো কিছুক্ষণ। শিংগুলোকে বড় বেশি ধারালো মনে হয়েছিলো তার।

তারপর থেকে কালরাজ লক্ষ্য রেখেছে কোন পথে আসে ওরা। পাহাড়ের গায়ে গায়ে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একদিনও কি পাবে না একটা হরিণকে। ওঃ। কতোদিন হরিণের রক্তের স্বাদ পায়নি, কতোদিন নরোম মিষ্টি মাংস খায়নি। মনে পড়লেই তার জিভ থেকে লালা ঝরতে আরম্ভ করে।

আরেকদিন কয়েকটা শুকনো ঝোপের আড়ালে আড়ালে হাঁটছিলো কালরাজ। লক্ষ্য রাখছিলো দুটি হরিণের ওপর। বড় হরিণটা খাদ পেরিয়ে এপারে এসে দাঁড়ালো। ছোটটা লাফিয়ে পার হবে ঠিক তক্ষুনি এক অলক্ষুণে পাখি চ্যাঁ চ্যাঁ করে চেঁচিয়ে উঠলো আর সঙ্গে সঙ্গে বড় হরিণটা ফিরে চাইলো। নড়লো না, পালিয়ে গেলো না। কালরাজ এগিয়ে গেলো। তার মনে হচ্ছিলো হরিণটা নির্ঘাৎ ভয় পেয়ে দিগবিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। সে কাছে গেলো, একপা একপা করে। আর একটা মাত্র লাফ। সে লাফ দেবে, এমন সময় দেখলো, হরিণটা লাফিয়ে ওপারে চলে গেলো।

কালরাজের মনে হচ্ছিলো, এ হরিণটাকেই সে কদিন আগে দেখেছে। আরো দুটো হরিণের সঙ্গে শিং বাগিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিলো সেদিন। স্পষ্ট মনে পড়ে তার, দুই শিং এর মাঝখানে একটা চওড়া শাদা চিহ্ন দেখেছিলো সেদিনও।

তার জেদ চেপে গেলো। চিরকাল সে রাজার মত হেঁটে ফিরেছে সারা বনে। সে যখন নির্জন দুপুরে হেঁটে যায় তখন বনের পাখিরা চেঁচায়। কে যায়, কে ? অন্য পাখিরা উত্তর দেয় রাজা যায়, বনের রাজা। বনের রাজা কালরাজ, আজ হোক কাল হোক, সে দেখে নেবে হরিণের দলটাকে। তার সঙ্গে চালাকি !

সে পাহাড়ের গায়ে দুটো প্রকাণ্ড পাথরের আড়ালে আস্তানা গাড়লো। আর লক্ষ্য রাখলো, কবে কখন ওরা দল বেঁধে বের হয়।

বেশিদিন অপেক্ষা করতে হলো না। একদিন দেখলো, তখনও সন্ধ্যা হয়নি ভালো করে। সারারাত সে ঘুরে বেড়িয়েছে শিকারের খোঁজে। তিন দিন ধরে কিছুই পাচ্ছে না। ভোরের দিকে আস্তানায় ফিরছে এমনি সময় দেখলো অনেকগুলো হরিণ সেই খাদের ওপার থেকে একে একে এপারে লাফিয়ে আসছে। কালরাজের লোভী জিভ পানিতে ভর্তি হয়ে গেলো। আনন্দে সে

গরগর করে উঠলো। ল্যাজটাকে আছড়ালো কয়েকবার। তারপর এগিয়ে গেলো। নিঃসাড়ে সে এগোতে লাগলো। যে চড়াই বেয়ে হরিণেরা ওপারে উঠে আসবে সেই চড়াইয়ের মাথায় গিয়ে দাঁড়ালো। এমনিতে খাড়া চড়াই, ঢালু পাহাড়ের গা-ভর্তি নুড়িপাথর বিছানো। একটু নাড়া লাগতেই একটা নুড়ি গড়িয়ে পড়লো। শব্দ হলো।

হ্যাঁ, শব্দ হলো। আর চকিতে তাকিয়ে দেখে নিলো চিত্রল। শয়তানটা ঠিক এসে দাঁড়িয়েছে। সর্দার তখনো ওপারে। বাচ্চারা এক এক করে সবাই লাফিয়ে এসেছে। সে ডাকলো অশান্ত, চপল।

মুহূর্তে তিনজন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে গেলো।

কালরাজ দেখলো, দেখে অবাক লাগলো তার। হ্যাঁ সেই হরিণ তিনটা। নাকি এরা হরিণ নয়, অন্য কোন জীব? অবাক লাগে তার। আরো আশ্চর্য, দেখলো, বাচ্চা হরিণগুলো এক এক করে লাফিয়ে লাফিয়ে আবার খাদের ওপারে চলে যাচ্ছে। তার মানে, মুখের গ্রাস আবার ফস্কাবে। অসম্ভব। কভি নেহি! কালরাজ গর্জে উঠলো।

নিচে খাদের ধারে যেখানে তিনটে পাথর পাশাপাশি মাটিতে গাঁথা সেখানে হরিণ তিনটে দাঁড়িয়ে। ঘাড় বাঁকিয়ে রেখেছে হরিণগুলো। লড়াইয়ে ডাকছে যেন। এতো সাহস তাদের। কালরাজ রাগে গরগর করতে করতে ল্যাজ আছড়াতে আছড়াতে দেখলো একে একে বাচ্চা হরিণগুলো ওপারে, তার হাতের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। তিনটে ছিলো একটু আগে একটা গেলো। ঐ আরেকটা । কালরাজ গর্জে উঠলো। পাহাড়ে পাহাড়ে তার গর্জনের প্রতিধ্বনি শোনা গেলো। না, আর পিছোবে না সে। দেখে নেবে হরিণের দলটাকে।

খাদের মুখে, যেখানে কটা পাথর ঢালু পাহাড়ের গায়ে গাঁথা, সেখানে নামতে পারলে খাদের ওপারে যেতে দেরী লাগবে না। আর তা হলেই নরোম উষ্ণ মিষ্টি রক্তমাংসের স্বাদে মুখটা ভরে যাবে। কালরাজের দুচোখে লোভ চকচক করতে লাগলো। সে পায়ে পায়ে ঢালু পাহাড়ের গা বেয়ে নামতে লাগলো। হরিণের লোমগুলো পর্যন্ত দেখতে পায় সে। আর একবার মাত্র একটা লাফ। আন্দাজ করে ঠিক মতো একটা লাফ শুধু!

কালরাজ বসে পড়ে। শরীরটা গুটিয়ে আনে, পেছনের পা দুটোতে সারাজীবনের শক্তি এনে জড়ো করে।

হুঁশিয়ার, চিত্রল চেঁচিয়ে উঠলো, শয়তানটা এক্ষুনি লাফ দেবে।

একটা বাচ্চা হরিণ তখনও ওপারে যেতে পারেনি। বাঘ দেখে ভয় পেয়ে থরথর করে কাঁপছে সে।

চিত্রল আক্রমণোদ্যত হিংস্র লোভী জানোয়ারটাকে দেখছে। দেখছে আর ঘেন্না হচ্ছে তার। ঘাতক খুনী জীব, তার গায়ের গন্ধ, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, সব কিছুর মধ্যে কীরকম যেন একটা ঘেন্না মেশানো আছে বলে মনে হয় তার। চিত্রল মনে করতে চেষ্টা করলো, তার মা-বাবাকে মেরেছিলো এই শয়তানটাই। কতো হরিণ যে ওর পেটে গিয়েছে, কেউ তার হিসেব দিতে পারে না। কিন্তু এবার? এবার আর তা হতে দেবে না চিত্রল, এখানে এই ঢালু খাড়াইয়ের পাশে তোকে আজ উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে দেবো। সে মনে মনে বলে। আয় চলে আয়, চিত্রল ডাকে যেন বাঘটাকে। ডাকে আর দেখে, ডোরাকাটা দাগগুলো যেন তার শয়তানীর সাজ। জানোয়ারটার চোখের ভেতরে কী রকম ধূসর শীতল একটা আলো জ্বলছে। চিত্রল চেনে, সে আলো হচ্ছে বিশ্রী লোভের আলো।

হঠাৎ চিত্রল চেঁচিয়ে উঠলো, হুঁশিয়ার। লাফ দিয়েছে বনের রাজা কালরাজ। বাচ্চা হরিণটা চিৎকার করে উঠলো। মাত্র কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার। কালরাজ পাথর তিনটের ওপর এসে পড়লো। বিদ্যুৎ বেগে ওপরে উঠে গেলো চিত্রল, চপল, অশান্ত। বাচ্চা হরিণটা ছিটকে পড়ে নিচের একটা পাথরে ভর দিয়ে দাঁড়ালো। কালরাজ পড়ামাত্রই বড় পাথর তিনটার নিচের নুড়িগুলো গড়িয়ে পড়লো। দুলে উঠলো পাথরটা। কালরাজ দেখলো হাত বাড়ালেই বাচ্চাটাকে পাওয়া যায়।

যেই থাবা বাড়াতে যাবে, হঠাৎ অনুভব করলো তার পেটের কাছে কয়েকটা ধারাল খোঁচা লাগছে। চকিতে তাকিয়ে দেখলো তিনটি হরিণ তাদের ধারালো শিং দিয়ে তাকে ঠেলে ফেলতে চাইছে। কালরাজ শরীরে একটা প্রবল ঝাঁকুনি দিলো তারপর ফিরে দাঁড়ালো। পেছনের একটা পা রাখার জায়গা পাথরটাতে নেই। নিচে কোন মাটি পাচ্ছে না সে,যে পায়ে জোর পাবে। তবু জানোয়ারটা রাগে লোভে হিংস্রতায় কুটিল হয়ে উঠলো। সে চিনে নিলো হরিণটাকে যেটা তার মুখের গ্রাস সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে। চিত্রল কাছে ছিলো, চিত্রলের মাথা লক্ষ্য করে সে একটা থাবা মারলো। ধারালো নখ লেগে চিত্রলের গলার কাছ দিয়ে অনেকটা জায়গা চিরে গেলো। লাল হয়ে উঠলো গলাটা।

ছোট্ট একটুখানি জায়গা পাথরের ওপর পাথর আল্‌গা হয়ে লেগে আছে, বাঘের ভারী শরীরটা যেদিকে হেলছে পাথরটা সেদিকে ঝুঁকে পড়ছে।

কালরাজ বুঝলো এক্ষুনি পাথরটা খসে গড়িয়ে পড়বে। নিচের অন্ধকার খাদের দিকে ও তাকিয়ে দেখলো। দেখে বুকের ভেতর কী যেন কেঁপে উঠে। না, তার উঠে যাওয়া দরকার। সে ওপরের দিকে একটা শক্ত পাথর খুঁজলো, যেখানে সে লাফ দিয়ে উঠে যেতে পারে। দেখলো কয়েক হাত দূরেই পাথরটা আছে। সে চলে যাবে এখনকার মত। কিন্তু মুখের গ্রাস কে ফেলে রাখে ? বাচ্চা হরিণটাকে দেখে সেই মুহূর্তে সারা জীবনের ক্ষুধা যেন তার পেটের মধ্যে জ্বলে উঠেছে। বাচ্চা হরিণটার দিকে আরেকবার সে থাবা বাড়ালো।

বাচ্চাটার বাঁচবার আশা নেই, নিজের ঘাড় থেকে দরদর করে রক্ত ঝরছে, তবু চিত্রল চেঁচিয়ে ডাকলো, অশান্ত, চপল। তারপর শিং বাগিয়ে এগিয়ে গেলো। অশান্ত চপল তার ডাক শোনার আগেই সে শিংসুদ্ধ মাথাটা বিদ্যুৎ গতিতে সামনের দিকে এগিয়ে দিলো। কি একটা ফুঁড়ে শিং দুটো ভেতরে প্রবেশ করলো বলে মনে হলো তার। আর সঙ্গে সঙ্গে নাকের কাছে একরাশ লোম এবং দুর্গন্ধ এসে লাগলো। আর ঠিক তক্ষুনি মনে হলো, কি একটা প্রচণ্ডশক্তি তার পিঠের ওপর ভেঙ্গে পড়েছে। সে মুখটা ফেরাতে চাইলো, পারলো না। সব কিছু ভুলে গিয়েছে সে তখন। কেবলি মনে হচ্ছে, জন্ম জন্মের শত্রু এই জানোয়ারটার কাছে তার হার মানলে চলবে না। পেছনের পা দুটোর ওপর ভর করে প্রচণ্ড শক্তিতে সামনের দিকে সে মাথার বোঝাটাকে ঠেলে ফেলতে চাইলো।

সবাই তখন বিমূঢ় হয়ে দেখছে।

পাথরটা দুলছিলো, তার নীচ থেকে দুটি একটি করে নুড়ি খসে পড়ছিলো। এক সময় একটা পাথর খসে পডলো আর সঙ্গে সঙ্গে বাঘটা চিত্রলের পিঠ ছেড়ে সামনের থাবা দুটো দিয়ে কী যেন আঁকড়ে ধরতে চাইল। মুহূর্তের জন্য মাত্র, তারপরই পাথরটা আলগা হয়ে কাত হলো এবং বনের রাজা কালরাজকে নিয়ে পড়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে বাঘটার পেটে শিং গাঁথা অবস্থায় চিত্রলও পড়লো সেই অনেক নিচে, অন্ধকার খাদে, যে অন্ধকার থেকে কেউ কোনদিন আর উঠে আসে না।

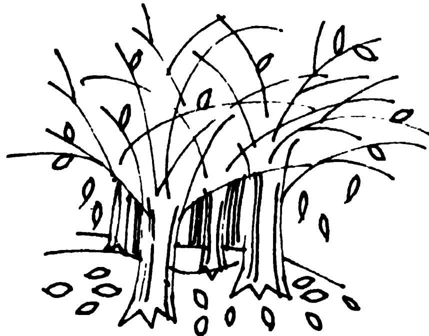
তখন সকাল হচ্ছে, পাখীদের কলকাকলিতে সারা বন যেন ঝঙ্কার দিচ্ছে। পূব পাহাড়ের মাথায় সোনার মত রোদ ঝলমল করছে। হরিণেরা একে একে খাদ পার হয়ে এলো।

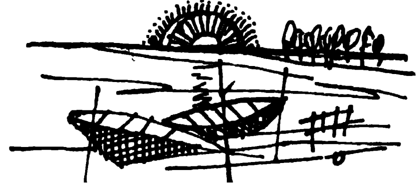
বাচ্চারা ধীর পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে। বুড়োরা কথা বলছিলো না। চিত্রলের মা বাবা নেই। কেউ কাঁদছিলো না ওর জন্য। অশান্ত আর চপল সবার পেছনে আসছিলো।

কিছুদুর এগোবার পর সর্দার ডাকলো, কোনদিকে যেতে হবে ?

অশান্ত সামনের দিকে তাকিয়ে দেখলো, চপলও দেখলো, তারপর তারা এগিয়ে গেলো বাম দিকে, হ্যাঁ, বাম দিকে। অশান্ত সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললো, বাম দিকে চলো। পাহাড় বন পার হয়ে গেলে নদী দেখবো আমরা। নদী পার হয়ে গেলে পাবো সেই সমতল যেখানে মাইলের পর মাইল জুড়ে শুধু সবুজ আর সবুজ।

বাচ্চারা লাফাতে লাফাতে চললো চপল আর অশান্তর পেছনে পেছনে। তারা কল্পনায় দেখতে পাচ্ছিলো, বামের রাস্তা নদী পার হয়ে সবুজ প্রান্তরে গিয়ে উঠেছে। তারপর সবুজ প্রান্তর পার হয়ে তারা পৌঁছোবে পাঁচ-পাহাড়ের কোলে, যার চূড়োয় রুপোর মত বরফ ঝলমল করছে। দেখবে সেই বরফ গলে ঝর্ণা হয়ে কেমন করে নেমে যাচ্ছে। সেখানেই তারা থামবে না। পাহাড় আর ঝর্ণা পার হয়ে তারা আরো এগিয়ে যাবে। এগিয়ে গিয়ে দেখবে, বিশাল সমুদ্র আর তার বুকে নীল পাহাড়ের মত ঢেউ আকাশের বুক ছোঁবার জন্য উপরে উঠছে আর নামছে।





কাণ্ডারী

বশীর আল্ হেলাল

কুদরত আগে নৌকা বাইত, এখন রিকশা চালায়। সেদিন সেই কথা সে এক সাহেবকে বলছিল। সাহেব তার রিকশায় উঠেছিলেন। বলছিল, আগে মাল্লা আছিলাম, অহন রিকশালা হইছি।

কুদরতের বয়স এগারো-বারো বছর। সাহেব তো ওইটুকু ছেলেকে রিকশা চালাতে দেখে অবাক। জিজ্ঞেস করেছিলেন, খোকা, তোর বয়েস কত?

সে বলেছে, ক্যান, এগারো-বারো বছর হইব।

সাহেব বলেছিলেন, এই বয়েসে কেউ রিকশা চালায় নাকি রে, অ্যাঁ?

কুদরত তখন সবচেয়ে সহজ উত্তরটাই দিয়েছিল। বলেছিল, দ্যাখতাছেন এই বয়সে মানুষে রিকশা চালায়, তয় কন, এই বয়সে কেউ রিকশা চালায় নাকি!

মোটা সাহেবটি সে-দিন হো হো করে একপেট হেসে চুপ মেরে গিয়েছিলেন, আর কোনো কথা বলেন নি। শুধু বলেছিলেন, বাপু, অ্যাকসিডেন্ট ঘটিয়ে বসিস নি যেন—বড় জরুরী কাজে বাড়ির বার হয়েছি।

কুদরত ভাবে, ওই এক কথা পেয়েছে শহরের সাহেবরা। বড় জরুরী কাজে বাড়ির বার হয়েছি! সবাই জরুরী কাজে বাড়ির বার হয়েছে, কেবল এই কুদরত ছ্যাড়া গায়ে হাওয়া লাগাবার জন্যে রিকশা নিয়ে পথে নেমেছে। তার ইচ্ছা হয় সাহেবদের ভালো করে দু-কথা শুনিয়ে দেয়। শুনিয়ে দেয়, সেও কম ঠেলায় পড়ে রাস্তায় নামে নি, হ্যাঁ। ইচ্ছা হয়, প্রত্যেকটা সাহেবকে সে এক এক করে শুনিয়ে দেয় তার সেই কাহিনী। শুনিয়ে দেয় কেন সে গ্রাম ছেড়ে শহরে এল—শুনিয়ে দেয়, ছিল নৌকার মাঝি, কেন রিকশাওয়ালা হলো।

কিন্তু সে চুপ করেই থাকে, সে কাহিনী আর কাউকে শোনায় না। শহরের মানুষ কে কার কথা শোনে।

যাই হোক, সেই সাহেব তবু লোক ভালোই ছিলেন। রিকশা থেকে নেমে পুরো আধুলিটাই কুদরতের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু বেশির ভাগ সাহেব তো তাকে নাবালক পেয়ে ন্যায্য ভাড়াটাও দিতে চান না। শুধু তাই নয়, কত আজব রকমের সব কথা যে তাঁরা খয়রাত করে যান। কেউ বলেন, এতটুকু ছোঁড়া, অত পয়সা দিয়ে করবি কী রে, অ্যাঁ? কেউ বলেন, বাছা, পয়সা দিয়ে তো সিগারেটই ফুঁকবি আর জুয়ো খেলবি। কেউ আবার অবাক হয়ে বলেন, একজন বড় মানুষ যা চায় তুইও যে দেখছি তাই চাইছিস খোকা?

এক সাহেব তো রিকশায় চড়ে সুরু করলেনঃ এই, তোর বয়েস কত রে? প্যাডেলে তোর পা-ই ঠেকে না, আর রিকশা নিয়ে বেরিয়েছিস যে বড়? আবার দ্যাখো না, রিকশাখানাকে ছোটাচ্ছে কী রকম। বলি, এই ছোঁড়া, অ্যাকসিডেন্ট করবি নাকি রে—অ্যাঁ?

তাই শুনে কুদরত ছুটন্ত রিকশার আসনে বসে কোমর বেঁকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে বলেছিল, এইডি আমার ময়ুরপঙ্খী নাও।

কিন্তু সেই সাহেব তাঁর গন্তব্যে পৌঁছে রিকশা থেকে নেমে ভাড়া দেয়ার বেলায় দিচ্ছেন কত? না আট আনার জায়গায় চার আনা পয়সা। সে অবাক হয়ে বলে, কী দ্যান সা'ব?

সাহেব বলেন, ক্যান, যা ভাড়া তাই দি?

চাইর আনা কি ভাড়া অইল সা'ব? কই কোন্ হালায় রিকশালা আপনেরে আমতলি থিক্যা বেলতলি চাইর আনায় লয় তাই জিগান দেহি কেউরে?

সাহেব তখন বলেন, হোনো আজব কথা। হ্যাঁ রে, তরে আবার রিকশালা কইব কোন্ হালায়—তুই হলি গিয়া রিকশালার ছাও। তর বাপরে যেই ভাড়া দেওন লাগত হেই ভাড়া তুই তরে দিবার কস?

কুদরত তখন বলেছিল, সাহেব, এইডা কি একডা কথা অইল? আপনে ইমান থেক্যা কন, আমি কি বেশী সময় লাগাইছি, না আপনেরে কষ্ট দিছি, না—

সাহেব বাধা দিয়ে বলেন, দ্যাখ্, মানুষের ইমান লইয়া কথা কইস্ না। আমার ইমান ঠিকোই রইছে। ল, আর এক আনা ল।

আর এক আনা পয়সা দিয়ে তিনি গট্‌গটিয়ে চলে গিয়েছিলেন। কুদরত আর কী করে, তার ঘামে-ভেজা কপাল, ঘাড় আর কচি গাল দুটো গামছায় মুছতে মুছতে সাহেবের চলে যাওয়ার পানে তাকিয়ে থেকেছে। রাত্রির অন্ধকারে মুরগির ঘাড় মট্‌কে ধরে শিয়াল যেভাবে পালায়, তিনি তখন সেইভাবে পালাচ্ছিলেন। কিন্তু তখন আকাশে মাটিতে কড়া রোদ্দুর। সেই কড়া রোদ্দুরে গা ডুবিয়ে বেলা এগারোটার তপ্ত ধোঁয়াটে আকাশের দিকে মুখ করে কুদরত শুধু বলেছিল, আল্লা, আমারে জলদি সে'না কর্—আমারে জলদি বড় কর!

এখন তার রিকশায় যাচ্ছেন এক 'ম্যাম-সা'ব'। এই মেম-সাহেবদের কুদরত বড় ভালোবাসে। তাঁরা তার মা-বহিন-তুল্য। তাঁদের সে ভালোবাসে এইজন্যে যে তাঁরা বড় কম কথা বলেন। এইটুকু ছেলেকে রিকশা টানতে দেখে শুধু মুখে চুক্ চুক্ শব্দ করেন, কোনো কথা বলেন না। মনে দুঃখ পান বলেই মুখে কথা ফোটে না। এবং রিকশা থেকে নেমে ঠিক ভাড়াটি দেন। এইজন্যেই তাঁদের কুদরত বড় ভালোবাসে। ভালো লাগার আরো একটা কারণ—আহা, তাঁরা সুন্দর সেজেগুজে থাকেন। যেমন তাঁদের মন সুন্দর, তেমনি বসনভূষণ সুন্দর। তাঁরা চুলে পরেন ফুল, সঙ্গে সুবাস বয়ে আনেন। ছোটো-চাচার কাছে সেই যে ফুলপরীর গল্প শুনেছিল, সেই ফুলপরীরাই তো তার রিকশায় এসে ওঠে। যদি একটি গাছের ছায়ায়, কি পথের মোড়ে, কি

বাড়ির দরজায় কোনো মেম-সাহেবকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকাতে দেখে, অমনি সে রিকশা নিয়ে ছুটে যায় হাওয়ার বেগে। বলে, 'আহেন আম্মা—কই যাইবেন?' এই হলো তার স্বভাব।

আর তিনি রিকশায় উঠে বসলে তখন কুদরতের গায়ে একগুণ বল দিগুণ হয়, হ্যাণ্ডেলের উপর দুই মুঠি যেন বজ্র-মুঠি হয়ে ওঠে, প্যাডেলের উপর পা-দুটিতে তখন তার অসম্ভব শক্তি। সে তখন ঝন্‌ঝনিয়ে ঘন্টি বাজিয়ে গান পর্যন্ত ধরে ঃ

ওরে ও রে আমার ময়ূরপঙ্খী নাও!

মেমসাহেবদের নিয়ে রিকশা ছোটাতে তার ভারি ভালো লাগে তার কারণ তাঁরা তার রিকশায়



চড়লে তার অকারণ বু-জানের কথা মনে হয়। মনে হয়, বু-জানই বা চড়েছে তার রিকশায়।

হায় বু-জান কখনো তার রিকশায় চড়ে না। কত সাধ তাকে রিকশায় চড়াবে। কিন্তু বু-জান শুনলেই আঁৎকে উঠে জিভ কেটে বলে, হায়, এইডা তুই কেমন কথা কস্‌। তুই আমার পরানের ভাই—তর রিকশায় আমি চড়মু। তর রিকশায় চড়নও যা তর মাথায় পারা দেওনও তা।

তাই শুনে কুদরত হাসে। মনে মনে বলে, বু-জান এতকাল শহরে থাকলে কী হবে, তার

গায়ের এখনো গাঁয়ের গন্ধ যাইতে দেরি আছে।

অথচ কুদরত নৌকার বৈঠা ছেড়ে রিকশার হাতল ধরেছে বু-জানেরই জন্যে। বা-জান বড় শখ করে বু-জানের বিয়ে দিয়েছিল শহরে। স্বামী তার চাকরি করত কারখানায়—তেজগাঁয়। তের শ ছিয়াত্তরের বৈশাখের ঝড়ে কারখানার বিরাট বাড়ির নিচে চাপা পড়ে সে মারা গেল। খবর পেয়ে বাপ-বেটা দুজনেই শহরে ছুটে এসেছিল। বু-জান তখন তিনটি ছোটো ছেলেমেয়েকে দুই হাতে আঁকড়ে ধরে বুক চাপড়ে কাঁদছে। কুদরত দুই হাতে চোখের পানি মুছতে মুছতে বলেছিল, বু-জান, চলো—গেরামে চলো। শহরে আর থাওনের কাম নাই।

কিন্তু বা-জান বলেছিল, বা-জান, তোর বইন গেরামে গিয়া খাইত কীডা, হেই কথাডা আগে চিন্তা করিস। আমাগোরই দিন চলে না—আমরাই শহরে আইয়া ভিখ মাইগ্যা প্যাট চালানের কথা ভাবতা আছি।

কুদরত তখন বলেছিল, তাইলে বা-জান, তুমি যাও গিয়া। আমি আর গেরামে ফিরতাম না—বু-জানের লগে থাকতাম।

বা-জান বলেছিল, এহানে তুই কী করতিস বা-জান ?

কুদরত বলেছিল, সাহেবগো বাড়ি কাম করতাম—ক্যান আমাগো রশিদ-ভাই আর তার বইন লতিফন যেই কাম করে।

বা-জান বলেছিল, এতগুলি মান্ষের হেতে প্যাট ভরত না রে বা-জান।

সে কথা ঠিক! সাহেবদের বাড়ি চাকর-নফরের কাজ করে কেবল নিজের পেটটাই চলে, অন্যের পেট চালানো যায় না। তাই কুদরত শেষ পর্যন্ত রিকশা চালানোর কাজ নিয়েছে। রিকশা চালানোর তার বয়স হয়নি। রিকশার সীটে বসলে প্যাডেলে পা-ই ঠেকে না। সীট ছেড়ে রডে বসে কোমর বেঁকিয়ে কোনো রকমে প্যাডেল ঘোরাতে হয়। কোনো রিকশার মালিক তার হাতে রিকশা ছাড়তেই চায় না। শেষ পর্যন্ত হাতে-পায়ে ধরে একজনকে রাজি করিয়েছে। সে-দিন এক ভদ্রলোক তার রিকশায় চড়ে বলেছিলেন, তোদের রিকশা চালাতে দেয় কে তাই ভাবি। হ্যাঁ রে, এই বয়েসে রিকশা টানিস, কাজ-রোগে যে মরবি!

কুদরত বাঁই বাঁই করে রিকশা ছোটাতে ছোটাতে বলেছিল, কী যে কন সা'ব—মরমু ক্যা? আমরা যদি মরি, আপনাগোরে চালাইত কেডায়? আপনেরা আমাগো পায়ে চলেন কিনা কন?

হ্যাঁ, যে কথা বলতে গিয়ে এত কথা—মেমসাহেবরা তার রিকশা কেরায়া নিলে তার বড় আনন্দ হয়। কিন্তু তার চেয়েও আনন্দ হয় ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তার রিকশায় চড়লে।

ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা তার রিকশায় চড়লে কুদরতের কী যে ভালো লাগে। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েগুলিই শুধু কুদরতকে মানুষ বলে গণ্য করে। আর তাদের মনে ভয়-ডরও কম। বড়রা যদি রিকশায় চড়ল তো কত রকমের কথা। 'এই, আস্তে চালা, সাবধানে চালা—অ্যাকসিডেন্ট করিস না বাছা—এই যে দ্যাখো, লাগাল বুঝি ধাক্কা!' এমনি যত প্যানপ্যানানি। সব ছাগলের বাচ্চা।

কিন্তু কুদরত কখনো কোথাও ধাক্কা লাগায় না। ধরো, রিকশায় বসে হঠাৎ সামনে একেবারে চোখের উপর বিরাট ট্রাক দেখে সাহেব হয়তো আঁৎকে উঠলেন। কিন্তু তখন কুদরত তাদের গাঁয়ের সেই কার্তিক মাসের ছোটো নদীটিতে স্বচ্ছ স্রোতে চিকন মউরালা মাছটির মতন সাঁৎ করে রাজপথের কল্লোলে ঠিকই ঢাউস ট্রাকটিকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেছে। তার একটু বুক কাঁপে নি।

কিন্তু বাচ্চা মানুষদের অমন ভয়-ডর নাই। তারা হই হই করে উঠবে রিকশায়। উঠে কেউ বসল, কেউ বসল না—অমনি তাড়া লাগাবেঃ রিকশালা, জোরে চালাও, জোরে—আরো জোরে।

তাছাড়া, ফুটফুটে বাচ্চা মানুষগুলি রিকশায় চড়লে কুদরতের তার রিকশাকে আর রিকশা বলে মনে হয় না, মনে হয়, সে ডোঙা বোঝাই ফুল নিয়ে যাচ্ছে—পদ্মফুল—লাল সাদা তাজা উজ্জ্বল পদ্মফুল। তাদের গাঁয়ের পদ্ম-বিলে কত পদ্ম। সেখানে ডোঙায় করে মাছ ধরতে গিয়ে সে তো শুধু মাছ নিয়ে আসে না, মাছের সঙ্গে পদ্ম আনে ডোঙা বোঝাই করে।

কুদরত তাই স্কুলের ছুটির সময় স্কুলের ধারে-কাছে থাকে। ছুটির ঘন্টা পড়লে ওরা গেট পেরিয়ে বাঁধ-ভাঙা পানির মতো ছুটে আসে। তাদের মধ্যে দু-তিন জন বাচ্চা মানুষ যখন ব্যাগ-হাতে পড়ি-মরি করে ছুটে এসে তার রিকশায় ওঠে, তার গর্বের অন্ত থাকে না। সে তখন রাজপথের জনস্রোত আর গাড়ি-ঘোড়ার ভিড়ের দিকে নজর ফেলে কল্পনা করে, সে জবর মাল্লা। খ্যাপা গাঙের খরস্রোতে শক্ত হাতে বৈঠা বেয়ে তাকে যাত্রী পার করতে হবে—নিরাপদ ঠিকানায় পৌঁছে দিতে হবে তাকে। ঘাম চক্‌চকে শরীরে গায়ের সকল বল একত্রিত করে সে ক্রিং ক্রিং ঘন্টা বাজিয়ে রিকশা নিয়ে রাজপথের স্রোতে নেমে পড়ে। খানিকক্ষণ গাড়িটাকে হাতে টেনে তারপর প্যাডেলে পা রেখে লাফিয়ে উঠে গান ধরেঃ

হুশিয়ার! হুশিয়ার!
ও মাঝি রে—
আজি ঝড় তুফানে চালাও তরী
হুশিয়ার! হুশিয়ার!

সে-দিন সকালবেলা দুই সাহেব তার মেজাজটাকে খারাপ করে দিলেন। খালি গায়ে সকালবেলার ফুরফুরে হাওয়া লাগিয়ে গান গাইতে গাইতে সে রিকশা নিয়ে বেরিয়েছিল। বড় রাস্তার মোড়ে গিয়ে দাঁড়াতে কোত্থেকে দুই সাহেব এসে উঠলেন। তাঁরা তাকে রাস্তায় রাস্তায় কম ঘোরানো ঘোরালেন না। কুদরতের ঘাম ছুটে গেল। তারপর ভাড়া দেয়ার বেলায় দেখা গেল, তাঁরা আসলে কিপ্‌টের বাদশা। ভাড়ার পয়সা হাতে নিয়ে কুদরত বলল, এই আপনেগো ইনসাফ?

তাঁদের একজন বললেন, তুই ইনসাফের কী বুঝিস রে?

ব'লে তাঁরা আর দাঁড়ালেন না।

বেচারা কুদরত আর কী করে, তার মনটা তেঁতো হয়ে গেল। সে পেছন থেকে চীৎকার করে বলল, আমি এত বড় একখানা সংসার চালাইতেছি, আমি ইনসাফ বুঝমু না?

কিন্তু সাহেবরা তা শুনলেন কিনা কে জানে। কুদরত লুঙির খুঁটে কপালের ঘাম মুছে খালি রিকশা নিয়ে আবার যাত্রা করল। সে আস্তে আস্তে প্যাডেল করছে। হঠাৎ দেখে, বিরাট একখানা ঘিয়া রঙের চক্‌চকে গাড়ি রাস্তার মাঝখানে অচল হয়ে পড়ে রয়েছে। গাড়িটা নড়েও না চড়েও না। শুধু প্রথম বর্ষার কোলাব্যাঙের মতো থাবা গেড়ে বসে মাঝে-মাঝেই ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর ডাক ছাড়ে। কিন্তু 'ইস্টার্ট' আর নেয় না। কুদরত তাই দেখে খুব হাসতে লাগল।

রিকশা চালাতে চালাতে এই রকমের দৃশ্য দেখলে কুদরতের মজা লাগে। সে দু-একটা ইয়ারকি-ফাজলামি না করে পারেই না। গাড়িটার পাশ দিয়ে যেতে যেতে সে হাত দুলিয়ে উঁচু গলায় বলল, ও মিয়া, আপনাগো গাড়ির যে সর্দি অইছে—বুকে তইল্ মালিশ করন লাগব—হ।

বলে সে গান ধরেছিল, আর ফিরে তাকায় নি। তখন তাকে পিছন থেকে কারা ডাকল। কচি মিষ্টি আওয়াজে কারা কল্‌কলিয়ে ডাকল। কুদরত পেছনে মুখ ঘুরিয়ে দেখল, দুটি বাচ্চা মেয়ে আর একটি বাচ্চা ছেলে স্কুলের পোষাক পরে বইয়ের ব্যাগ পানির বোতল হাতে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়িয়ে আছে। তারাই তাকে হাত নেড়ে ডাকছে।

কুদরতের বুঝতে দেরি হলো না। সে ব্রেক কষে কোমর বেঁকিয়ে রিকশা থামাল। তারপর নেমে রিকশার মুখ ঘোরাল। গাড়ির কাছে রিকশা নিয়ে গিয়ে দাঁড়াল। বলল, কোন ইশ্‌কুলে যাইবেন? আহেন, ওডেন। আহা, আপনাগো গাড়ি খারাপ অইছে? তয় ডর নাই, আহেন, আমি পৌছাইয়া দিমু।

খোকা-খুকুরা কুদরতের রিকশায় উঠে খুব আনন্দে কলরব করতে লাগল। প্রতিদিন গাড়িতে করে স্কুলে গিয়ে গিয়ে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল কিনা, তাই আজ খোলা রিকশায় খোলা আকাশের নিচে হেলে দুলে ছুটতে তাদের কী যে মজা লাগছে।

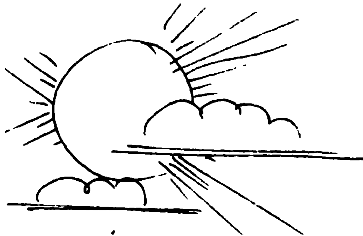
কুদরত মুখ ঘুরিয়ে বলল, আপনেরা পঙ্খীরাজের কিস্‌সা হোনেন নাই?

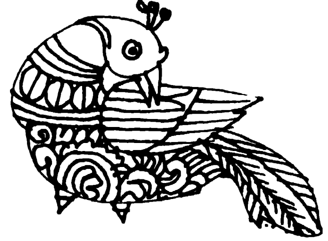
ওরা সমস্বরে বলল, শুনেছি শুনেছি!

আমার এই রিকশা সেই পঙ্খীরাজ।

খোকা-খুকুরা বলল, সত্যি সত্যি সত্যি।

তারপর ওরা হাসতে লাগল। কুদরত রিকশাওয়ালাও ওদের সঙ্গে হাসতে লাগল।





টিটিচিকোরি

বুদ্ধদেব গুহ

ভবানীপুরের গঙ্গাপাড়ের একটি জরাজীর্ণ ভাড়াবাড়িতে রায়পরিবার থাকতেন আজ থেকে তিরিশ বছর আগে। ছোটবাবু ছিলেন জগৎ রায়। অবিবাহিত, উপার্জনহীন। বাড়ির ভাইপো-ভাইঝি বোনপো-বোনঝি তাঁকে ডাকত, 'ছোটকামা' বলে। মামা এবং কাকা মিলিয়ে।

ছোটকামা বললেন, "অ্যাই পাপা, পা'টা একটু টিপে দে তো! বড্ড ফাঁকিবাজ হয়েছিস তুই।"

পাপা পায়ের কাছে গিয়ে বসল তক্তপোশে। দু'হাতে ছোটকামার পা টিপতে লাগল।

বাড়ির উঠোনের মস্ত বিলিতি আমড়াগাছটাতে পাতার আড়ালে বসে দাঁড়কাক ডাকছিল লাল টাগরা বের করে। গরমের দুপুর। ঝাঁঝাঁ করছিল সাদা রোদ। কা-খ্বা-খ্বা করছিল কালো কাক।

ডুনা জল নিয়ে এল। ছোটকামা কনুইতে ভর দিয়ে একটু উঠেই ঢকঢক শব্দ করে জল খেলেন।

"কোথায় ছিলাম রে?" ছোটকামা শুধোলেন গল্পের খেই ধরিয়ে দেবার জন্যে।

"ঘনুমামা এখন তাঁর টাট্টুঘোড়ায় করে চলেছেন বাড়েষাঁনের জঙ্গলে," টুলু বলল।

"হ্যাঁ, বাড়েষাঁনের জঙ্গলে," ছোটকামা শুরু করলেন, "ঘনু চলেছে। গরমের দুপুর। গো-পোড়ানো হাওয়া বইছে বনে-বনে, পাহাড়ে-পাহাড়ে। সাপেরা সব গর্তের মধ্যে। জংলি ইঁদুর পাহাড়ি নালার ভিজে বুকের পচা পাতার আড়ালে মুখ লুকিয়ে। বনমুরগি আর তিতির, আসকল, বটেরদের সরু-সরু গলা তিরতির করে কাঁপছে তখন, গান গাইতে থাকা গায়িকার গলার শিরার মতো। ঝরঝর শব্দ করে বয়ে চলেছে পথের দু'পাশ দিয়ে প্রমত্ত ঝরনার মতো লাল, হলুদ, খয়েরি, কালো শুক্‌নো পাতা, হাওয়ার স্রোতের সওয়ার হয়ে কালো কালো নানা আকৃতির পাথরের আর গেরুয়া মাটির উপর দিয়ে। তেষ্টায় ছটফট-করা ময়ূর ডেকে উঠছে বনের গভীর থেকে 'কেঁয়া-আ, কেঁয়া-আ-আ' করে। ডাকছে কালী-তিত্বর জঙ্গলের বুকের

গভীরের মধ্যে লুকনো টাঁড় থেকে। নীলকণ্ঠ পাখি উড়ে যাচ্ছে কোনাকুনি পথের উপর দিয়ে মত্ত হাওয়ায় ঘুরপাক খেতে-খেতে, লাট-খাওয়া ঘুড়ির মতো। ঘনু চলেছে বিলিতি ক্যালেণ্ডারের বহুরঙা ছবির মতো সুন্দর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে তার টাট্টুঘোড়ায় চেপে, টগবগ.... টগবগ....টগবগ। শব্দ উড়ছে ঘোড়ার খুরে হাওয়ার খুরে। হাজার হাজার অদৃশ্য সব ঘোড়সওয়ার যেন হাওয়ার সওয়ার হয়ে কী এক লড়াইয়ে মেতেছে সেই মর্মরিত বনে-বনে।"

কোথায় যাচ্ছেন ঘনুমামা আজকে, ছোটকামা? পাহাড়ি গ্রামের অত্যাচারী টিকায়েতের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে কি? না, গত রাতে যে ভালুকমায়ের ছানাকে খাদের কুলিরা চুরি করে এনেছিল, তাকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিতে?" ডুনা শুধোল উৎকণ্ঠিত গলায়।

"না না, ওসব নয়। আজ ঘনু চলেছে এক দারুণ জায়গায়। এক অবাক পৃথিবীর গভীরের এক অবাক ছবিতে। বলতে পারিস, চলেছে তীর্থযাত্রাতেই। সেই জঙ্গলের গভীরের নীল ঝিলের জল যদি কেউ খায়, কেউ চান করে সেখানে, তবে তার খিদে-তেষ্টা, দুঃখ-কষ্ট কিচ্ছু থাকে না। ছেলে হলে জিন, মেয়ে হলে পরি হয়ে যায় সে," ছোটকামা বললেন।

খুকু হাতপাখা দিয়ে হাওয়া করছিল। ছোটকামা'র মাথার চুল থেকে হাল্কা আর্নিকা তেলের মিষ্টি-মিষ্টি গন্ধ ভাসছিল ঘরে। আলতো হয়ে।

"কোথায় সে জায়গা গো ছোটকামা? নাম কী সে জায়গার?" তিমির শুধোল চোখ বড়-বড় করে।

"বনেরই বুকের দামি ঝিনুকের মধ্যে লুকিয়ে-রাখা দুর্মূল্য মুক্তোর মতো সেই ঝিল। নাম তার টিটিচিকোরি।"

"কী বললে, কী বললে? কী? কী?" ওরা সমস্বরে শুধোল অদ্ভুত শব্দটা শুনে।

"টিটিচিকোরি।"

"টুমি ডাওনি ককনও ছোটকামা? টুমি নিডেও ডাওনি?" পিতৃমাতৃহীন গাগা বলল। গাগার বাবা ছিলেন রায়বাড়ির ন'ভাই। স্বামী-স্ত্রী বিয়ের দু' বছরের মাথায়ই ট্রেন অ্যাকসিডেণ্টে মারা যান। গাগার তখন এক বছর বয়স। এখন গাগার বয়স দশ। পাপার চেয়ে বছরখানেকের ছোট সে। এখনও ওর মুখে এরকম আধো-আধো বুলি। কাককে বলে টাক, ভাতকে বলে ভাট।

"না, আমি নিজে যাইনি কখনও। একবার যেতে হবে। যত তাড়াতাড়ি পারি," বলেই ছোটকামা হঠাৎ নিজের ভাবনাতে বুঁদ হয়ে গেলেন।

গল্পের স্রোতে বাধা পড়ায় টুলু বকল গাগাকে। বলল, "বড় বেশি কথা বলিস তুই।"

গাগা বলল, "বেঠ, আমি আড এড মড্যে নেই।" রাগ করেই উঠে যাচ্ছিল ও।

ছোটকামা বললেন, "বোস, বোস। তোর দোষ কী? দোষ তো আমার। শোন বলি। টিটিচিকোরি ঠিক যে কোথায়, তা ঘনুই জানত। তবে শুনেছি বাড়েশাঁনের জঙ্গলের মধ্যে। তার মুখেই শুনেছিলাম তো আমি। মারুমার, গাড়ু, লাত, মুণ্ডু, চাহালচুঙরু, বাড়েশাঁন, লাতেহার, লোহারডাগা, রাংকা এমনি সব কত জঙ্গলেই না যেত ঘনু! আমাকেও নিয়ে যেত মাঝে-মাঝে ডালটনগঞ্জ থেকে। কিন্তু কোনও জঙ্গলের সঙ্গেই টিটিচিকোরির তুলনা হয় না। গা-ছমছম ভয়ের, গা-রিমঝিম ভাল লাগার এমন জায়গা পালামৌ জেলার আর কোথায়ই ছিল না। এমনই বন যে, সূর্যের আলো পৌঁছয় না সেখানে। সেই বনের মধ্যে কতরকম যে গাছ, ফুল, ফল, পাখি। কত জানোয়ার, পোকা, প্রজাপতি। আর তার ঠিক মধ্যিখানে এক ছোট্ট ঝিল। আয়নার বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখা ছোট আয়নারই মতো। আর শীতের কোয়েল নদীর চেয়েও তার জল

পরিষ্কার। কচি কলাপাতা-রঙা উপত্যকার মধ্যে-মধ্যে ঝিঙে-রঙা পাহাড় পেরিয়ে পথ। একটি নয় রে, পরপর সাতটি পাহাড়; ঝিলের পাশে। সাত বোনের মতোই ঘিরে রয়েছে ঝিলটিকে হাতে হাত ধরে। তাদের একজনের গায়ে শালবনের শাড়ি, অন্যজনের সেগুনবনের। কারও শিমূলের লালে লাল, কারও করমের, কারও-বা সিসুর। আলাদা-আলাদা বন, এক-এক বোনের গায়ে। সেই যে সাত পাহাড়ের পাহারা-ঘেরা ঝিল, তারই নাম টিটিচিকোরি। বুঝলি গাগা, জ্যোৎস্নারাতে জিন-পরিরা চান করতে নামে সেই ঝিলে। যদি তাদের কেউ দেখে ফ্যালে, তবে তার মৃত্যু নির্ঘাত। তাই যদি-বা কেউ যায়ও টিটিচিকোরিতে, সন্ধের পর থাকে না মোটেই।"



"তা হলে? ঘনুমামা যাচ্ছেন কেন? যেতে-যেতে যদি রাত হয়ে যায়?" উদ্বিগ্ন গলায় শীলা বলল।

"আজকে রাতের বেলা তো সে থাকবেই সেখানে। ঘনু একটা ডেয়ার-ডেভিল পাগল। জিন-পরিদের চান করা দেখবে নাকি চাঁদের আলোয়। চাঁদের সাপেরা খেলা করবে তখন জলে, তারার ফুল ভেসে বেড়াবে, আর তারই মধ্যে পরিরা জলের সুঁচ জলের সুতো দিয়ে জলেরই মধ্যে নকশি-কাঁথা বুনবে।"

"আররে, মলে ডাবে ডে! ডুবে ডাবে না?" গাগা বলল, "ঘনুমামা মলে ডেলে আমাডের কী হবে? কাড গড়প ঠুনব আমডা?"

"মরতে যে পারে, তা ভাল করেই জেনেশুনে তো যাচ্ছে রে। মরতে যে ভয় পায়, সে কি

টিটিচিকোরিতে যেতে পারে কোনওদিন ?"

"তাডপড ?" গাগা আবার শুধোল।

শীলা বলল, "ঘনুমামার কি ভয়ডর নেই ?"

"ভয় তো আমাদের জন্যেই। ঘনুর অভিধানে ভয় বলে কোনও কথাই ছিল না। ঘনু কী বলত জানিস ?"

"কী ?"

"বলত, ভয় কথাটা মুছে দেওয়াই উচিত অভিধান থেকে।"

"কেন ?" খুকু বলল গোলাপী ঠোঁট ফাঁক করে।

"ভয় বলে আসলে কোনও জিনিসই নেই। তা থাকে শুধু ভীরুদেরই মনে। না-জানারই আর-এক নাম ভয়। যা-কিছুই আমরা জানি না, যা-কিছুই আমাদের অভিজ্ঞতার বাইরে, তাতেই আমাদের ভয়।"

"বলো, বলো !" নীলা বলল।

"হ্যাঁ," ছোটকামা বললেন, "চলেছে তো চলেইছে ঘনু। দুপুরের খাওয়া বলতে একটি বাখরখানি রুটি, দুটি ল্যাংড়া আম আর একটু আমলার আচার। ঘোড়াকেও ঘাস খাইয়েছে। কিন্তু জল পায়নি একটুও। ঘোড়ার পিঠে বাঁধা যে ছাগল ছিল, মানে ছোট্ট ভিস্তি, তার জলও শেষ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। টিটিচিকোরিতে না পৌঁছলে আর জলের আশা নেই।"

"তারপর ?"

"বেলা পড়ে আসছে। রোদটা ক্রমশ ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। গাছের ছায়াগুলো লম্বা থেকে আরও লম্বা হয়ে লুটিয়ে পড়ছে পুবের জঙ্গলের পায়ে কালো আঁচলের মতো, সূর্য যতই হেলছে পশ্চিমে। সামনে দেখা যাচ্ছে জানোয়ারের আর জংলি মানুষদের পায়ে চলা সরু শুঁড়িপথ। ফরেস্ট ডিপার্ট-এর পথ ছেড়ে হঠাৎই বাঁ দিকের গভীর বনের মধ্যের উপত্যকায় হুমড়ি খেয়ে নেমে গেছে সেই শুঁড়িপথটি। যেন ভয়ে-ভয়েই।"

"ঘনু তার ঘোড়ার লাগামে টান দিল। তারপর দু'হাঁটু দিয়ে ঘোড়ার পেটে একটু চাপ দিয়ে ডান দিকের লাগাম ঢিলে করে বাঁ দিকের লাগাম সামান্য টাইট করেই ঘোড়াকে নামিয়ে দিল সেই উপত্যকায়।"

"গাছগুলোতে একটিও পাতা নেই। শূন ডালপালাগুলো মাথার উপরে হাত উঁচু করে বৃষ্টির প্রার্থনা জানাচ্ছে যেন মেঘহীন নীলিমার কাছে। বন তো নয়, যেন হাজার-হাজার নাগা-সন্ন্যাসীই শোভাযাত্রা করে চলেছে দ্রুতপায়ে, স্থবির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকেই।"

"তারপর বলো ছোটকামা, বলো," রুদ্ধশ্বাসে বলল আবার খুকু। তার ফরসা সুন্দর বালা-পরা, সুগোল ডান হাতখানিতে ধরে থাকা তালপাখাটি থেমে গেল উত্তেজনায়। ছোটকামাও থেমে গেছেন। টিটিচিকোরির পথের বর্ণনা স্তব্ধ করে দিয়েছে সকলকেই। গ্রীষ্মের দুপুরের গরম ও অস্বস্তির কথা বেমালুম ভুলে গেছে ওরা সকলে। ছোটকামার পিছনে ফেলে আসা জীবনের স্মৃতি মন্থনের সঙ্গে-সঙ্গে একদল কিশোর-কিশোরীও যেন চলে গেছে অনেক বছর আগের এক অদেখা গহন জঙ্গলের গভীরের আশ্চর্য ভয়ঙ্কর, সুন্দর সেই অদেখা টিটিচিকোরির পথে। ছোটকামার জঙ্গলের বন্ধু ঘনুমামার টাট্টুঘোড়ার খুরের শব্দের প্রতিধ্বনি উঠছে তাদের প্রত্যেকেরই কচি মুখে। উত্তেজনা ফুটছে অন্ধকার রাতের সারসার তারার মতো উজ্জ্বল চোখে। ধুকপুক করছে বুক।

"তারপর ?" একটু ভয় পেয়েই ছোট কামার বুকের কাছ ঘেঁষে বসে বলল খুকু।

"তারপর কিছুটা এগোনোর পরেই ঘনু ঘন বাঁশের জঙ্গলে পৌঁছে গেল। যেখানে বড় বাঘ, বাইসন আর হাতিদের আড্ডা। বড়-বড় শঙ্খচূড় সাপ যেখানে ছায়াতে কুণ্ডুলি পাকিয়ে থাকে শুকনো পাহাড়ি নালার ভেজা-ভেজা বালির মধ্যে। এরা রেগে গেলে মাইলের পর মাইল তাড়া করেও লেজের উপর সটান দাঁড়িয়ে মানুষকে মুখে-মাথায় ছোবল মারে, দড়ি বাঁধারও উপায় থাকে না কোনও। সেই জঙ্গলও একসময় পেরিয়ে এল ঘনু। তারপর পৌঁছল গিয়ে চিলবিল গাছেদের বনে। মেমসাহেবদের মতো গায়ের রঙ তাদের। একটিও পাতা নেই এখন কারও গায়েই। মেমসাহেবদের গা থেকে মিষ্টি-মিষ্টি গন্ধ বেরোচ্ছে। শেষ সূর্যের আলো সিঁদুরে করে তুলেছে তাদের শরীর। পাতার ঝরনা-বওয়ানো হাওয়ায় ভেসে গরমের শেষ বিকেলের গায়ের পাঁচমিশেলি তীব্র ঝাঁঝালো কটু গন্ধ আসছে দূরের হরজাই জঙ্গলের গা থেকে। মিশে যাচ্ছে মেমসাহেবদের গায়ের গন্ধের সঙ্গে। পথের দু'পাশের ঝাড়ে-ঝাড়ে হাজার-হাজার লাল-রঙা ফুলদাওয়াই ফুটে উঠে বনপথকে এক লালচে আভা দিয়েছে। তেমন আভায় শুধুমাত্র কোনও বনপথই আভাসিত হতে পারে।"

"ঘনুমামা ?"

"হ্যাঁ ঘনু চলেছে সেই লালিমাতে আভাসিত পথ বেয়ে টগবগ ... টগবগ ... টগবগ ... । তবে ওর টাট্টুর চালও যেন বদলে গেছে এখন। তার খুরের শব্দ অতি সাবধানে 'আর যাওয়া ঠিক হবে কি হবে না' সেই প্রশ্ন এবং উত্তর করতে করতে চলেছে নিজের সঙ্গে নিজেই। যেন বাঁয়ার সঙ্গে ঢিমেতালে কথা বলছে বাঁয়া। সেই মেমসাহেবদের বন পেরিয়ে সবে হরজাই জঙ্গলের মধ্যে ঢুকেছে ও, আর সঙ্গে-সঙ্গে বনের মধ্যে থেকে তৃষ্ণার্ত গলায় ডাকতে থাকা ময়ূর -ময়ূরী, তিতির, আসকল্, বটের, টিয়া, ময়না, টুনটুনি, বুলবুলি, সবাই কোন্ মন্ত্রবলে হঠাৎই চুপ করে গেল। থেমে গেল জোরে-জোরে আওয়াজ করে কাঠ ঠুকতে থাকা কাঠঠোকরাও হঠাৎ। লেজ তুলে-তুলে চিঁহর-চিরি-র-রচিরি চিঁহর-র-র করে ডাকতে থাকা কাঠবিড়ালিরাও থেমে গেল। ঠিক সেই সময়েই বনের অণু-পরমাণু, রন্ধ্রে-রন্ধ্রে ভরে দিয়ে গম্‌গম্ আওয়াজ করে ডেকে উঠল কেঁদো বাঘ। পালামৌয়ের বাঘ। হুঁ-আঁ-ও। ঘোড়াটার শরীরে কাঁপুনি এল ম্যালেরিয়া জ্বরের মতন। ঘনু তার গলায় আদর করে হাত বোলাল। কিন্তু ঘোড়া সামনের দু'পা জোড়া করে একবার শূন্যে তুলে পরক্ষণে নামিয়ে নিয়েই কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। নটনড়নচড়ন, নট কিচ্ছু। কয়েকবার ডেকেই কিন্তু থেমে গেল বাঘটা। বোধহয় জল খেতেই যাচ্ছে।"

"টিটিচিকোরিতে ? তা'পর ?"

"শোন্। টিটিচিকোরিতে ঘনু যখন পৌঁছল গিয়ে, তখন সূর্য নামছে পাটে। তার গোলাপি আভায় টিটিচিকোরি ঝিলকে মনে হচ্ছে যেন এক গোলাপি সায়র। সাত-বোন পাহাড়েবা হাত-ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে তাকে ঘিরে গোলাপির মধ্যে সবুজের ছায়া ফেলে। প্রত্যেকের গায়েই গভীর জঙ্গলের শাড়ি। পাতাঝরা বনই সব। অথচ আশ্চর্য, পাতা ঝরেনি তাদের একটিও। চারদিক থেকে ঘন বনের সবুজ আঙুলগুলি নেমে এসে ঝিলের গায়ে হাত ছুঁইয়েছে সযতনে। টিটিচিকোরির ঝিলের একপাশে সেগুনবনের পাহাড়ের একটু উঁচুতেই একটা গুহা। তার উপর বসে আছে সাদা-মাথা মেছো বাজ।"

"ঘোড়া নিয়েই উঠতে লাগল ঘনু সেদিকে। খুব আস্তে আস্তে। একটু বাদেই সন্ধে নামবে। গুহার মুখের কাছে এসেছে, ঠিক সেই সময়ে একটা মস্ত ভালুক গুহা ছেড়ে বেরিয়ে এসেই

পেছনের দু'পায়ে দাঁড়িয়ে উঠে সে যে কত্তবড় তাই-ই দেখাল ঘনুকে। ভাবখানা, দেখেশুনে বাহাদুরি কোরো বাহাদুর। তার বুকের উপরের দিকে ইংরেজি 'ভি' অক্ষরের মতো একটি মোটা সাদা দাগ। হিমালয়ান বেয়ার। কী রে, পা টেপা থামালি কেন রে পাপা ?" ছোটকামা বললেন।

টিটিচিকোরিব পাশ থেকে বড় কষ্ট করে পাপা ভবানীপুরে ফিরে এসে আবার ছোটকামার পা টেপা শুরু করল।

"তারপর" খুকু বলল, "বলো ছোটকামা !"

"আজ আর নয়। আবার এর পরেব রবিবার। বড্ড ঘুম পাচ্ছে। যা, তোরাও ঘুমিয়ে নে একটু," বলেই অত্যন্ত নিষ্ঠুরের মতো ছোটকামা কোলবালিশটা টেনে নিয়ে পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়লেন।

ওরা সকলেই হতাশার গুঞ্জরন তুলে হয় লুডো, নয় ক্যারাম, নয়তো কলের গানের কাছে ফিরে গেল।

কাদের বাড়ির রেডিওতে তখন 'অনুরোধের আসর'-এর গান হচ্ছিল 'হারা মরু নদী শ্রান্ত দিনের পাখি ...'। খুব কম লোকের বাড়িতে রেডিও ছিল তখন। কলকাতার সব মানুষই তখন এত বড়লোক হয়ে যায়নি। আরাম ছিল না, টিভি ছিল না, কিন্তু বড় শান্তি ছিল। আবামেব সঙ্গে শান্তিকে গুলিয়ে ফেলেনি তখনকার মানুষ।

২

পরের রবিবারও কিন্তু ছোটকামা, রাতের বেলা টিটিচিকোরিতে ঘনুমামা কী দেখলেন, তা কিছুতেই বলেননি। না, তারপরের বা তারও পরের রবিবারও নয়। ঘনুমামা সত্যি-সত্যিই পরিদের চান করতে দেখেছিলেন কি না, তাঁর কোনও বিপদ হয়েছিল কি না, সে সবও নয়।

প্রতিবারেই ছোটকামা টিটিচিকোরিতে ঘনুমামার পৌঁছনোর বর্ণনাই দিতেন নতুন করে, নতুন ভাষায়। যেন টিটিচিকোরিতে পৌঁছনো অনেকগুলিই পথ ছিল বিভিন্ন দিক দিয়ে। তাঁর স্মৃতি আর কল্পনার মধ্যে তো নিশ্চয়ই ছিল। যে যাত্রী যে পথ বেছে নেবে, নেবে। তার খুশিমতো। তখন বলাতেও বড় খুশি ছিল। বলতেন, 'জানিস, ওখানে পৌঁছলে মানুষের আর খিদে পায় না, ঘুম পায় না, ঝগড়া করতে ইচ্ছে করে না কারও সঙ্গেই। ছেলেরা জিন এবং মেয়েরা পরি হয়ে যায় টিটিচিকোরিতে পৌঁছেই। কোনও দুঃখই তাদের আর ছুঁতে পারে না। খাওয়ার কষ্ট, পরার কষ্ট, আমার মতো একা-একা জীবন কাটানোর কষ্ট, কোনও কষ্টই না।'

পাপা একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, 'আপনি নিজে তো যাননি কখনও ? একদিনও না ?'

'নাঃ, হয়নি যাওয়া। হলে তো ...।' খুবই হতাশার সুরে বলেছিলেন ছোটকামা।

ছোটকামা তিরিশের দশকের ডালটনগঞ্জ, বারোয়াডি, লাতেহার, বেতলা, ছিপাদোহরের জঙ্গলে কাঠ আর বাঁশের ব্যবসার স্মৃতি, ঘনুমামার মতো সঙ্গীর সঙ্গ, এই সবই পিছনে ফেলে এসেছিলেন চিরদিনের মতো, ভাগ্যের হাতে মার খেয়ে। ওরা যদি কেউ জিজ্ঞেস করত, 'যেতে ইচ্ছে করে না ওখানে ফিরে আপনার ? দেখতে ইচ্ছে করে না রাতের বেলার টিটিচিকোরিকে ?' ছোটকামা মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে বলতেন, 'নাঃ।' বলেই সেই প্রসঙ্গ চাপা দিতেন সঙ্গে সঙ্গেই। এ-সব প্রসঙ্গ মানে টিটিচিকোরি বা কোয়েল নদীর বা লাতেহারের পণ্ডিতজির দোকানের অথবা ছিপাদোহরের হাটের প্রসঙ্গ, এমনকি ডালটনগঞ্জ সংক্রান্ত কোনও কথা উঠলেও উনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে অন্যমনস্ক হয়ে নিচু গলায় বলতেন,' 'অন্য কথা বল। অন্য কথা। পাপা, গাগা, খুকু,

তোদের পড়াশুনো নেই? তোরাও কি আমার মতো অপদার্থ হয়েই থাকবি? বেকার? পরের বোঝা?'

৩

অনেক দিন, চল্লিশটি বছর পেরিয়ে এসেছেন ছোটকামা। পেরিয়ে এসেছে পাপা এবং গাগাও, এই কলকাতা শহরও। দেখতে-দেখতে।

বদলে গেছে কলকাতা, বদলে গেছে জীবন। বদলে গেছে মানুষের সফলতার সংজ্ঞা, চাওয়া-পাওয়ার ধরন-ধারণ। ছোটকামা, পাপা এবং গাগারও এখন বড় কষ্ট। স্বপ্নবিলাসীদের জায়গা নেই এই শহরে আর। বেঁচে থাকা সত্যিই বড় কষ্টের হয়ে গেছে। রোজগার নেই, স্বজন নেই, দু'বেলা ডাল-ভাতেরও সংস্থান নেই। তা ছাড়া বেঁচে থাকার মানে তো শুধুই খাওয়া-পরা-থাকার সুখ নয়! ছেলেবেলার সেইসব দুপুর এখন স্মৃতির মণিকোঠায় দুর্মূল্য আতর-মাখানো পশমিনা শালই হয়ে আছে।

অকলুষিত রোদ মাথায় করে চল্লিশ দশকের গোড়ার দিকের কলকাতার স্তব্ধ, সুন্দর, নির্জন, ঝাঁঝালো দুপুরে ট্রাম যেমন দৌড়ে যেত, তেমন করে দৌড়ে যায় না আর ফাঁকা পথ দিয়ে গাঁগাঁ শব্দ করে লাইনের উপর হেলতে-দুলতে। গল্প বলার আর গল্প শোনার মতো পরিবেশ, সময় আর শান্তি আজকের কলকাতার দুপুরে আর একটুও নেই। সকালবেলায় ফটফট শব্দ করে রাস্তা ধোয় না আর করপোরেশনের লোকেরা। অলিগলিতেও হাঁটা যায় না আর স্বচ্ছন্দে। কোনও পথেই। কাবুলিওয়ালা হেঁকে যায় না সকালের চিলের কান্নার মধ্যে, 'হিং চাই, হিং ....' বলে। বিকেল হলেই বেলফুল আর কুলফি ফেবি করে যায় না ফেরিওয়ালা। সারা শহরের লোকই আজ ফেরিওয়ালা হয়ে গেছে। কিছু না কিছু বেচার আছে প্রত্যেকটি মানুষেরই। হারিয়ে গেছে সেই সব দিন, পরিবেশ, অনুষঙ্গ।

রবিবার দুপুরে আর কোনও ঘরেই মামা-মাসি, কাকা-পিসিদের ঘিরে শিশু আর কিশোরেরা গল্প শোনে না। টিটিচিকোরির পথের বাঘের মতো হুঁয়াউ .... হুঁয়াউ করে হুঙ্কার দেয় এখন ঘরে-ঘরে টিভি, নিস্তব্ধতাকে খানখান করে দিয়ে। যতটুকু প্রয়োজন, তার চেয়ে অনেকই বেশি জানা হয়ে গেছে যেন এখনকার কিশোর-কিশোরীদের। শৈশবের সব শিউলীগন্ধী বিস্ময়ই আজ মরে, পচে, ফুলে, গাড়ি চাপা-পড়া পথের কুকুরের মতো জীবনের পথপাশে পড়ে আছে। প্রযুক্তি আর বিজ্ঞানের শকুনেরা ছিঁড়ে খাচ্ছে তাকে।

বড়ই লোভ জমেছে সকলের মনে। নানারকম, অঢেল, অপ্রয়োজনীয় ভোগ্যবস্তু, অবাস্তব সব বিজ্ঞাপনে। চাই, চাই, এটা চাই, ওটা চাই, সবই চাই। নিজের নিজের যোগ্যতার অথবা প্রয়োজনের কথা ভুলে গিয়ে প্রত্যেকেরই পেতে ইচ্ছে করছে সমস্ত কিছুই। যা-কিছু প্রতিবেশীর আছে, অথবা আছে আত্মীয়-স্বজনের, সহকর্মীর। 'নেই, নেই,' আর 'চাই, 'চাই,' করে দৌড়তে-দৌড়তে মুখে রক্ত তুলে আছড়ে পড়ে মরে যাচ্ছে তারা এক সময়, অলক্ষ্যে।

পিপাসা, বড়ই পিপাসা। বড় খিদে এখন চারদিকে। সত্যি খিদে, মিথ্যে খিদেও। যা তারা চায়, তার কত সামান্য পেয়েই এই একটা মাত্র ছোট্ট জীবনে কী দারুণ খুশি হওয়া যেত, সুখী থাকা যেত, তা একবারও ভাবার সময়টুকু, অবকাশটুকু পর্যন্তও আজকের কলকাতার বাবা-মায়েদের নেই। অথচ পাপা-গাগাদের কৈশোরে ছিল। তাদের শৈশব ও কৈশোরকে দারিদ্র্যের মধ্যেও রাজকুমারের মতোই উপভোগ করেছিল তারা।

সেই সব স্নিগ্ধ, শান্ত দুপুরের, ছোটকামার গল্প-শোনা সরল পবিত্র শিশু ও কিশোর-কিশোরীরা এখন সকলেই প্রায় প্রৌঢ়। টুলু নাম-করা ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে। ডুনা বিলিতি

কমার্শিয়াল ফার্মে মোটামুটি ভাল চাকরি করে। কাপি স্টেটস-এর নেভাডাতে সেট্‌ল করেছে। চারখানা গাড়ি ও বাড়ির মালিক এখন। শীলা ইংল্যাণ্ডে। ওর স্বামী নিউক্লিয়ার মিসাইল বানায়। পৃথিবী ধ্বংস করবে তো, তাই খুব ভাল থাকে। তিমির কলকাতাতেই বড় ব্যবসা করে। খুকু থাকে বোম্বেতে। তার বর চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। পাঁচ বছর পরপর আসে একবার কলকাতায়। ওর ছেলেমেয়েরা বাংলা বলতেও পারে না। মারাঠি বলে মাবাঠাদের মতন।

সকলেরই বিয়েও হয়ে গেছে। ছেলেমেয়েও। কারও-কারও ছেলেমেয়ের বিয়েও হয়ে গেছে। অপদার্থ রয়ে গেছে শুধু পাপা আর গাগাই। ভ্যাগাবণ্ড ওরা। ইনস্যুরেন্স-এর এজেন্সি, জমি-বাড়ির দালালি, ছুটকোছাটকা কাজ করেছে পাপা জীবনের বিভিন্ন সময়ে। ইন্টারমিডিয়েটের পর আর পড়েনি।

গাগারও বয়স বেড়েছে আরও, চল্লিশ বছর। কিন্তু মনে সে একটুও বাড়েনি। শিশুর মতোই কথা বলে এখনও ট-ট করে। আজকের কলকাতার ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজে গাগা-পাপাদের কোনই জায়গা নেই। ছোটকামার বন্ধু, ধুতির উপর নীল টুইলের শার্ট পরা, টাট্টুঘোড়ায় চড়া ঘনুমামাই এখনও ওদের স্বপ্নের হিরো। বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন। চল্লিশটা বছর যে পেছনে ফেলে এসেছে সেই গল্প শোনার দিনগুলো থেকে, তা যেন মনেই পড়ে না ওদের।

মনের বয়স হয়নি ছোটকামারও। ব্যবসা ডুবে যাওয়ায় তিবিশ দশকের শেষের দিকে সেই যে পালামৌয়ের স্বপ্নময় কাব্যিক পরিবেশ ছেড়ে তিনি কলকাতায় এসেছিলেন ভাগ্যান্বেষণে, তখন থেকেই ভাগ্যের হাতে মার খেতে-খেতে-খেতে একেবারেই ডানা ভেঙে পড়ে আছেন। এখন সম্পূর্ণই সমাহিত। প্রত্যেক পরাজয়ের মধ্যেও জয়ের মুহূর্ত নিহিত থাকে। আর কিছুই হবার নেই, হবেও না। তবুও প্রায় বিনা-রোজগারেই যে এই নিষ্ঠুর শহরে কী করে এত দীর্ঘদিন হাসিমুখে বেঁচে থাকা যায়, তার এক জাজ্বল্যমান উদাহরণ ছোটকামা। হয়তো পাপা এবং গাগাও। টিটিচিকোরি ওদের চোখকে স্বপ্নের অঞ্জন দিয়ে ভরিয়ে রেখেছে। নির্লোভ, সরল, উচ্চাশাহীন এক আশ্চর্য জীবনযাপন করে যাচ্ছে এখনও এই তিনজন মানুষ, এই লোভসর্বস্ব ভণ্ডামির শহরে।

ভাই-বোনেদের মধ্যে অনেকেই বাড়ি করেছে। গাড়িও করেছে প্রায় সকলেই। তারা ভাল থাকে, ভাল খায়। তাদের ছেলেমেয়েরা দারুন ইংরেজি গান গায়, কবিতা লেখে ইংরেজিতে।

গাগা একদিন বলেছিল, 'কী লে পাপা, একটা গাড়ি ঠাকলে বেঠ হট, না লে ? নিজেড গাড়ি। বেঠ, ভাবটি গাডি কিনব একডা।'

'বেশ তো', পাপা বলেছে।

গাগা মাঝে-মাঝেই ভাবে একটা গাড়ির কথা। এত লোকের গাড়ি আছে! তবে, গাড়িই যদি কেনে ও কোনওদিন, তবে একটা লাল-রঙা দোতলা বাসই কিনবে। আত্মীয়-স্বজন, পাড়ার মোড়ের মুদিটি, বিহারের দ্বারভাঙা জেলায় যার বাড়ি, হাজারিবাগ জেলার সিমারিয়া গ্রামের পরামানিক, ভিখিরি বুড়ি মোক্ষদা, পাড়ার মুড়ি-তেলেভাজার দোকানি পুলিনদা, যে তাকে প্রায়ই ধারে সিগারেট দেয় এবং অনেক সময় পয়সাও নেয় না, তাদের সকলকে নিয়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে যাবে, আর সকলে মিলে ফুচকা খাবে। এখন ফুচকার দাম কত হয়েছে কে জানে! কত্ত বছর খায়নি। ওদের ছেলেবেলায় পুরনো দু'পয়সায় দশটা করে ছিল।

জগৎ রায় মানে ছোটকামার খোঁজ এখন শুধুমাত্র গাগা ও পাপা'ই রাখে। রায়-পরিবার বড় হয়ে ওঠার পর ছোটকামাকেও সেই আশ্রয় ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে। পরিবার বড় শুধু

আয়তনেই হয়নি, বিত্তের মাপেও মস্ত বড় হয়েছে। অর্থ আসার সঙ্গে-সঙ্গেই দারিদ্র্যের সঙ্গে যে-সব মূল্যবোধ মাখামাখি হয়ে থাকে, তা উধাও হয়ে গেছিল রায়-পরিবার থেকে, অন্য অনেক পরিবারের মতো। ছোটকামা ভেবেছিলেন, সারাটা জীবনই অমন গল্প বলেই কাটিয়ে দেবেন। মাত্র একজনের তো পেট। চলেই যাবে কোনও না কোনও দাদার সঙ্গে থেকেই। চাহিদাও তো ছিল না তেমন কিছু। খদ্দরের পাজামা আর পাঞ্জাবি, তাও নিজের হাতেই কাচতেন। যা খেতে দেওয়া হত, তাই-ই খেতেন। কিন্তু হয়নি তা।

বারাসাত ছাড়িয়ে একটি গ্রামে কলকাতার এক ভদ্রলোকের বাগানবাড়ির আউটহাউসে থেকে তাঁর আম-বাগান দেখাশোনা করার ভার নিয়েছেন ছোটকামা বছর-পাঁচেক হল। অনেক কিছুই ধরা-ছাড়ার পর। টিনের ছাদের একটি কামরা। গরমে বড়ই গরম এবং শীতে খুবই ঠাণ্ডা হয়। তবু গাছগাছালি, পাখপাখালি, বর্ষায় ব্যাঙের-ছাতা, ব্যাঙ, লজ্জাবতী লতার ঝাড়। ছোটকামা বলেন, 'চমৎকার! বেশ জঙ্গল-জঙ্গল ভাব। দারুণ লাগে রে গাগা, বুঝলি? পালামৌ-পালামৌ গন্ধ আছে বেশ।'

প্রতি রবিবারেই গাগা আর পাপা এখনও ছোটকামার কাছে আসে। যদিও ওদের রোজই রবিবার। ছোটকামা তেমনই গল্প বলেন বোনপো আর ভাইপোকে।

বাগানের মালী ওড়িশাবাসী গণেশ চমৎকার মসুর ডাল রাঁধে। সেও থাকে পাশের ঘরে, একা। বৃষ্টি ও শীতের দিনে ছোটকামার হট ফেভারিট খিচুড়ি রেঁধে দেয় গণেশ। বোনপো, ভাইপো আর কামার পকেট হাতড়ে যা বেরোয় তাই দিয়েই রান্না হয়। ভালবেসে খিচুড়ি খেয়ে আটচল্লিশ বছরের গাগা আর ঊনপঞ্চাশ বছরের পাপা পঁয়ষট্টি বছরের ছোটকামার গল্প শোনে ছেলেবেলার মতোই। হাতে তালপাখা নিয়ে শুয়ে থাকা ছোটকামা আজও তেমনই চমৎকার করে গল্প বলে যান, ক্লান্তিহীন।

চেহারা ওদের তিনজনেরই জীর্ণ হয়ে গেছে। কিন্তু মন তেমনই সজীব আছে। এখনও ওদের কল্পনায় নিস্তব্ধ কাঁচপোকা-ওড়া গ্রীষ্ম-দপুরের বাড়েষাঁনের গহন অরণ্যে ঘনুমামা তাঁর টাট্টুঘোড়ার পিঠে চেপে টিটিচিকোরির দিকে চলেন। টগবগ ··· টগবগ ··· টগবগ ··· শব্দ হয় ঘোড়ার খুরে-খুরে। শেষ বেলার সিঁদুরে লাল রঙ লাগে আজও দীর্ঘাঙ্গী মেমেদের মতো চিলবিলের পাতা-ঝরা জঙ্গলে। এখনও কল্পনায় নাগা-সন্নিসিদের মতোই বৃষ্টি নীরব প্রার্থনায় হেঁটে যায় পত্রশূন্য গাছেরা স্থবির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

জন্মাবধি কলকাতা শহরের বাইরে একদিনের জন্যেও না-যাওয়া পাপা আর গাগাকে ছোটকামার গল্পের জাদু যেন ভবঘুরেই করে দিয়েছে। ওদের মনের চোখে গত চল্লিশ বছরে একটুও ক্ষুণ্ণ হয়নি সেই মেমেদের মতো জ্যৈষ্ঠের চিলবিল বনের নরম সৌন্দর্য।

ছোটকামা সবসময়ই হাসেন। হাসির আগে জিভ আর টাগরা দিয়ে একটা অদ্ভুত শব্দ করেন। বোঝা যায় যে, এবার কোনও হাসির কথা বলেই নিজেও হাসবেন। এতরকম কষ্টের মধ্যেও হাসতে একটুও কষ্ট হয় না ছোটকামার। অবাক হয়ে পাপা ভাবে। এতদিনেও কিন্তু একটুও ক্লান্তি আসেনি ছোটকামার কল্পনার অরণ্যচারণে। সেই পঞ্চাশ বছরের আগের ডালটনগঞ্জ, লাতেহার, বারোয়াডি, গাড়ু, মুণ্ডু অথবা লোহারডাগার দিনগুলি এখনও জ্বলজ্বল করে তাঁর স্মৃতিতে।

খাওয়াদাওয়ার পর গেঞ্জিটাকে পেটের উপরে গুটিয়ে তুলে খাটের উপর আসনপিঁড়ি হয়ে বসে খয়েরি লুঙ্গি পরে আরামে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে ছোটমামা বললেন, "গাগা, পাটা টিপে দে তো একটু।"

আটচল্লিশ বছরের গাগা পঁয়ষট্টি বছরের ছোটকামাকে বলল, "বিছানাতে ঢোও তুমি আগে তাপ্পড দেব। বসে-বসে কি পা টেপায় কেউ? গল্প বলতে হবে কিন্তু।"

ছোটকামা হাসেন। বলেন, "আমাদের গাগাটা ঠিক একই রকম রয়ে গেল।" নিজেও যে সেই একই রকম রয়ে গেছেন, সে-কথা একবারও মনে হয় না তাঁর।

দশ বছরেই থেমে আছে গাগা। অনেকেই ভাবে এবং বলে যে, গাগা স্বাভাবিক নয়। ওর বুদ্ধি জড়। একসময় তো সাইকিয়াট্রিস্টও দেখানো হয়েছিল। কিন্তু পাপা আর তার ছোটকামা জানেন যে, গাগা প্রকৃতই ভাগ্যবান। এর চেয়ে বড় স্বাভাবিকতা আর কিছুই হয় না। সারাজীবন শৈশবে বেঁচে থাকার মতো সুখ কি আর কিছু আছে?

ছোটকামা শুরু করলেন, "সেদিন বিকেলে খুব দুর্যোগ, বুঝলি। সকাল থেকেই শুরু হয়েছিল। প্রচণ্ড বৃষ্টি আর ঝোড়ো হাওয়া। জানুয়ারির শেষ। ওই সময়টায় প্রতি বছরই জঙ্গলে ওরকম হয়। পালামৌতে যা শীত দেখেছি, ওয়ার্লডেও তা দেখিনি।"

পাপা ভাবছিল, ছোটকামার ওয়ার্লডের বিস্তৃতি পশ্চিমে পালামৌ আর পুবে কলকাতা!

"তাডপড?" গাগা বলল।

"মুগের ডালের ভুনি-খিচুড়ি হাতা-হাতা, ফার্স্টক্লাস গাওয়া ঘি, আর একেবারে কড়কড়ে করে ভাজা আলু আর শুকনো লঙ্কা খেয়েই সন্ধে লাগতে না লাগতেই তো আমি আর ঘনু বিশ্বাসবাবুদের হুলুক পাহাড়ের নীচের মারুমারের ক্যাম্পের কাঠের ঘরে দরজায় আগল দিয়ে শুয়ে পড়েছি পাশাপাশি খাটিয়া লাগিয়ে। খাটিয়ার নীচে জ্বলন্ত কাঠকয়লার আগুন কালো-রঙা মাটির কালো মালসাতে। গায়ের ওপর দু'আঙুল মোটা দেহাতি কম্বল। ঘনু বলেছিল, 'আঃ, দু'কম্বলিকা ঠাণ্ডা পড়েছে রে আজ জগা!' সবে ঘুমটা এসেছে, বুঝলি, ঠিক সেই সময়েই দরজাতে কারা যেন ধাক্কা দিতে লাগল খুব জোরে-জোরে।"

"তাডপড?" গাগা বলল।

"আমি তো ভয়েই বাঁচি না। ভয়ে আর শীতে দাঁত খটখটিয়ে বললাম, কোনওমতে, 'কৌন হ্যায় হো? তারা কী বললে জানিস?"

"টি? টি? বড কামা।" গাগা আবার বলল চোখ বড়-বড় করে।

"তারা বলল, 'তেরা বাপ হ্যায় হো।' তখন ঘনু ফিসফিস করে বলল, 'জগা, ডাকাত! দিগা পাঁড়ে', বলেই দেওয়ালে হেলান দিয়ে রাখা বন্দুকটা টেনে নিল নিজের দিকে।"

গাগা রুদ্ধশ্বাসে বলল, "তাডপড?"

তারপর?"

৪

ওই রকমই এক রবিবারের দুপুরে গাগা আর পাপাকে গল্প বলতে বলতেই ছোটকামার খুব ঘাম দিতে লাগল। বুকে খুব ব্যথা। বর্ষার দিন ছিল। বৃষ্টি হচ্ছিল বেদম। গরম ছিল না একটুও, অথচ ঘেমে চান করে যাচ্ছিলেন।

পাপা দৌড়ে গেল ডাক্তার আনতে। মোড়ের মুদির দোকানি রাধাবাবুর কাছে হাতঘড়িটা বন্ধক রেখে সাইকেল-রিকশা করে ডাক্তারকে নিয়ে এল পাপা। বুকে স্টেথিস্কোপ বসিয়ে ধপধপে সাদা পোশাক-পরা বিলেত-ফেরত ডাক্তার খুব ভাল করে পরীক্ষা করলেন ছোটকাকামাকে। মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে শুধোলেন, "কী হল গো মালী তোমার? ও মালী, কথা বলো!"

ছোটকামা কথা বলতে পারছিলেন না। মাথা নাড়ানেল বালিশের দু'পাশে। মুখ দিয়ে একটু

লালা গড়াল। হাত দিয়ে বুক দেখিয়ে ইশারাতে বললেন, বুকে খুব ব্যথা।

ঝোড়ো-কাকের মতো ভিজে, ওষুধ কিনে যখন ফিরল পাপা, তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। ঘরে লণ্ঠন জ্বলছে। ভবানীপুরের গঙ্গার পাড়ের একটি বাড়িতে আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে যেমন জ্বলত। ছোটকামার মাথার কাছে তাঁর প্রাণের প্রহরীরই মতো গাগা বসেছিল।

ছোটকামা মুখ হাঁ করলেন একবার। গাগা মুখে জল ঢেলে দিতে-দিতে বলল, "এইবাড়ে কোয়েলড পাড়ের ঠটানে ডাহ করটে নিয়ে ডেটে হবে, বুডলি পাপা ? টময় হয়ে গেটে।"

মনে পড়ল পাপারও। ছোটকামা বলতেন, ডালটনগঞ্জের ওই শ্মশান ছাড়া আর কোথাওই তাঁকে যেন দাহ না করা হয়।

জ্ঞান যেন একটু একটু করে ফিরে আসছে। ঘুমের ইনজেকশানের কাজ শেষ হয়ে এসেছে।

ছোটকামা বললেন, "জল।"

আবার জল দিল পাপা।

জল খেয়ে চোখ মেললেন, হাসলেন। ফিসফিস করে বললেন, "টিটিচিকোরি।"

তাঁর চোখের সামনে হুলুক পাহাড়ের নীচের শীতের রাতের নীল কুয়াশা, কোয়েলের ওপারেব কুট্‌কু, হুটার, খোড়োয়ার, কুজরুম ; ঔরঙ্গা আর কোয়েল নদীরসঙ্গমের কেচকির, সব ছবিগুলো যেন এক-এক করে ফুটে উঠতে লাগল। ট্রেন যাচ্ছে ঔরঙ্গার ব্রিজের উপর দিয়ে। গুম্-গুম্-গুম্-গুম্ ···· । মাথার মধ্যে অনেকগুলো বছর গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে গেল।

"নিয়ে যাবি রে ?" ছোটকামা বললেন।

"কোথায় ?" ওবা দুজনে খোঁচা-খোঁচা পাকা দাড়ির মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে বলল।

"টিটিচিকোরি", আরো-একবারও উচ্চারণ করলেন অস্ফুটে ছোটকামা। তারপবই থেমে গেলেন। আর কথা বলেননি। ওই অবস্থাতেই যদিও ছিলেন তিনদিন। ওই আমবাগানের টিনের ঘরেই।

না, কোযেলের পারের শ্মশানে নয়। এই সভ্য শিক্ষিত মানুষদেব শহর কলকাতার অত্যন্ত নোংরা, লজ্জাকর গুণ্ডামি এবং চরম অশান্তির পরিবেশের এক শ্মশানেই ছোটকামাকে পোড়াল গাগা আর পাপা। শ্মশানের যা ছিরি, এই শহরে মৃত্যুর পবেও শান্তি নেই মানুষের।

শ্মশানে কেউই আসতে পারেনি, এক ডুনা ছাড়া। যদিও ওই তিনদিনে সব বাড়িতেই ঘুবে ঘুরে খবর দিয়েছিল গাগা। পাপা সবসময়ই ছিল ছোটকামার কাছেই। কেউই আসতে পারেনি। কারণ, একজন ভাগ্যাবণ্ডের জন্যে নষ্ট করার মতো সময় কলকাতায় কারও নেই। সকলেই ব্যস্ত, সাকসেসফুল। অনেক রকম কাজ তাদের প্রত্যেকেরই। যাতায়াতের ভীষণ অসুবিধেও আজকাল। ডুনাই এসেছিল একমাত্র। কিন্তু তারও সেরিব্রাল অ্যাটাক হয়েছিল একটা। একটা পা টেনে-টেনে হাঁটে। গাগা প্রত্যেককেই বলেছিল বাড়ি-বাড়ি গিয়ে, তার ছেলেবেলার খেলাব আর গল্প শোনার প্রত্যেক সঙ্গীকে, তাদের স্ত্রী এবং স্বামীদের, ছেলেমেয়েদেরও বলেছিল, 'ঠোটোকামা টলে ডাচ্ছেন টিটিচিকোরিতে, টোমরা ঠেট ডেকা ডেকে ডেও।'

তবুও আসেনি কেউ। ছেলেবেলার সঙ্গীরা ছেলেবেলা ফুরোলেই বড় দূরে চলে যায়। মস্ত করে হাত বাড়ালেও তাদের ছোঁয়া যায় না পরে।

পাশের পূতিগন্ধময় গঙ্গায় চান করে শেষ বিকেলে শ্মশানের বাইরে বেরিয়েই পাপা বুঝতে পারল যে, গাগার সঙ্গে তার বন্ধনটাও এবার ছিন্ন হয়ে যাবে। যোগসূত্র ছিলেন ছোটকামাই। ছোটকামার বেহালাটা, একমাত্র সম্পত্তিটা কাঁধে নিয়ে আগে-আগে চলছিল বেঁটে গাগা। একটু

কুঁজো হয়ে। এই নিষ্ঠুর আধুনিক পৃথিবীতে আটচল্লিশ বছরের শরীরের নিঃসহায় বিত্তহীন শিশুটি কী করে যে একা-একা বেঁচে থাকবে তা ভাবতেও পারে না পাপা। ওর নিজের তো কোনও ···· । গাগার জন্যে ভারী চিন্তা হতে লাগল।

অবশ্য পরমুহূর্তে ভাবল, প্রতিদিন তো গাগা একা-একাই বেঁচে এসেছে। ওর জন্যে পাপা তো বটেই অন্য কেউও কিছুমাত্র করেনি। শুধু গাগাকেই নয়, এই আধুনিক পৃথিবীতে বিত্তবান-বিত্তহীন, প্রাপ্তমনস্ক-অপ্রাপ্তমনস্ক প্রত্যেকটি মানুষকেই একা-একাই বাঁচতে হয়। সংসার থাকলেও তারা এমনি একাই থাকত। একাই বাঁচতে হত। ভাবার মতো মন নিয়ে যে মানুষই জন্মেছে, সে সবসময়ই একা। চিরদিনের।

বাস থেকে শ্যামবাজারের পাঁচমাথার মোড়ে নেমেই প্রচণ্ড শোরগোলের মধ্যেই পাপা, গাগার গায়ের খুব কাছে দাঁড়িয়ে বলল, "কি করবি এখন তুই" পাপার কথার উত্তর না দিয়েই ও বলল, "টুই ?"

"আমার মেস তো ছেড়ে দিচ্ছি। না ছাড়লে এবারে তাড়িয়েই দেবে। বলেছে তাই। আট মাসের টাকা বাকি। ওদের দোষ নেই।"

"আররে, আমি টো আড মর্ডিনি এখনও ! তোড কোনওই চিন্টা নেই। আমি ঠাকলে টুইও ঠাকবি। ঠিক ডেখিস।"

"তা তো বুঝলাম। কিন্তু প্রত্যেক মানুষেরই তো ঠিকানাও লাগে একটা, না কি ?"

গাগা হেসে ফেলল শিশুবই মতো। বলল, "যে মানুটডেব কোটাও ডাওয়ার ঠাকে, যাডের কেউ টিটি লেকে ককনও, টাডেরই ডরকার টিকানার। আমাডের কোন্ ডরকার ? টুই একটা বোকা।"

"বাঁশদ্রোনির ওই সাধুর আখড়াতে আর ক'দিন বাঁচবি ? কী করে বাঁচবি ? তার উপরে আমাকেও নিয়ে যাবি বলছিস ! পাগল তুই !"

গাগা চারধারের অগণিত ঘর্মাক্ত, ডিজেলের ধোঁয়ার মধ্যে কুঁজো হয়ে হেঁটে যাওয়া ক্ষুধার্ত মানুষের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল পাপাকে, "ড্যাক্, ড্যাক্, এডা ড্যামন কলে বাঁটকে, আমডাও টেমন কলেই বাঁটব। অটো চিন্টা কডিস না। আমাডেট কী ? ঝাডা হাট-পা টো ! টল্, টুই আমাড ঠঙ্গেই টল।" পাপার হাত ধরে টনল ও।

ঘোরের মধ্যে একটু এগিয়েও গেল পাপা। কিছুটা ভিড়ের ঠেলাতেও। গাগার কানে মুখ ঠেকিয়ে পাপা বলল, "গাগা, একটা জায়গায় যাবি ?"

"কোটায় ? কোটায় ডে ?" শিশুর সারল্যে আর ঔৎসুক্যে বলল গাগা।

"টিটিচিকোরি।"

গাগা সঙ্গে-সঙ্গেই দাঁড়িয়ে পড়ে একগাল হেসে বলল, "ভেলি গুড আইডিয়া। টল, টল। আমডা টিটিচিকোরিতেই ডাই। পডিদের টান করা ডেকি গিয়ে।"

পাপা একদৃষ্টে গাগার দিকে চেয়ে রইল।

পাপা এবং গাগা ভিড়ের ধাক্কায় এলোমেলো হতে হতে ঝড়ে পড়া পাখির মতো পালক খসাতে খসাতে সাত-বোন পাহাড়ের সাত বনের শাড়িপরা পাহাড় ঘেরা পরিদের আবাস টিটিচিকোরির দিকে চলতে লাগল। মার্কারি ভেপার ল্যাম্পের খয়েরি আলোর মধ্যে ওদের অন্য গ্রহের দুটি জীব বলেই মনে হচ্ছিল।

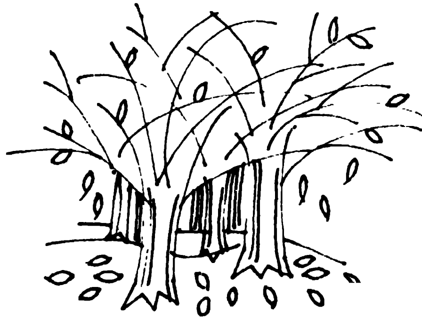
পাপাকে ঘিরে রাখা হাজার-হাজার মূক, মাথা-নিচু মানুষের বিভিন্নমুখী স্রোতের মধ্যে

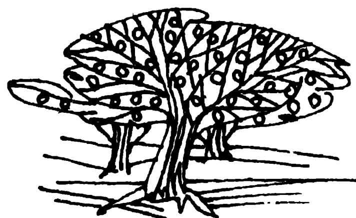
বৃষ্টিভেজা, কাদাময় পথের মধ্যে পা হড়কে-হড়কে দূরগামী বাসের জন্যে দৌড়তে থাকা বৃষ্টিভেজা মানুষদের ভ্যাপসা ঘামের গন্ধের মধ্যে পাপার মনে হচ্ছিল যে, ওর চারধারের প্রতিটি মানুষই জীবিকার জন্য দৌড়োদৌড়ি করছে, সকাল থেকে সন্ধে অবশ্যই কিন্তু তাদের প্রত্যেকেরই আসল গন্তব্য বোধহয় ছিল টিটিচিকোরি। জীবিকা কখনওই জীবন নয়। টিটিচিকোরিই আসল জীবন।

হঠাৎই গাগা বলল, "সট্টি বলটি পাপা, বড্ডই খিডে পেয়েটে ডে। ঠেই ভোডবেলা এক কাপ টা খেয়েটি ঠুডু। আড কিটু খাইনি।"

পাপা মুখে ওকে কিছু না বলে মনে-মনে বলল, 'চল্, চল্ গাগা, দেবশিশু ভাই আমার, তাড়াতাড়ি চল্। পা চালিয়ে যাই, যেখানে খিদে নেই, তৃষ্ণা নেই, ঈর্ষা নেই, লোভ নেই, পরশ্রীকাতরতাও নেই। সাত-বোন, পাহাড় ঘেরা সাত-রঙা জঙ্গলের শাড়ি গায়ে জড়িয়ে সেই নীল ঝিলকে পাহারা দেয় যেখানে। রাতের বেলায় রূপোলি চাঁদের সাপেরা কিলবিল হিলহিল করে জলে খেলা করে বেড়ায়, তারারা রাশি-রাশি সবুজাভ নরম ফুল ফুটিয়ে তোলে উড়াল ভিজে চুলে সাঁতরে যাওয়া পরিদের নাভিতে; আর সেই পরিরা জলের সূঁচ, জলের সুতো দিয়ে জলেরই মধ্যে নকশিকাঁথা বোনে।

'চল্, চল্ গাগা, যাই, সেইখানে যাই .... সেই .... পরিদের দেশে .... যাই চল্ .... ।





বাবা

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ

কিছুতেই মন বসছিল না পড়ায়। খোলা বইয়ের পাতার মধ্যে ভেসে উঠছিল আলেকজান্ডারের মূর্তিটা। টগবগ করে সামনে ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছেন, হাতের বড় তলোয়ারটা রোদে ঝলমল করছে। শত্রু সৈন্য চীৎকার করতে করতে চারদিকে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ছে।

আজ থেকে 'কল্পনা' হলে 'আলেকজান্ডার দি গ্রেট' শুরু হবে। কিছুতেই কথাটা ভুলতে পারছিলাম না। কিছুদিন আগেও 'ফ্লাইং কার্পেট', 'জাম্বো দি গ্রেট' ফিল্ম দু'টো মিস করেছি। আজ থেকে আবার 'আলেকজান্ডার দি গ্রেট'। আগের ফিল্ম দু'টো দেখে এসে কামালরা সবাই ক্লাশ মাতিয়ে রেখেছিল। সুযোগ পেলেই ক্লাসে বেঞ্চি থেকে উঠে এসে ফিল্মের সব গল্প করত। তারপর জোরে হাততালি একসঙ্গে। বারে বারে ভাবলাম, এবার যেমন করেই হোক ফিল্মটা দেখতে হবে। কিছুতেই মিস করা চলবে না। ইতিহাস বই খুলে আলেকজান্ডারের ছবিটা খুলে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। ঘরের পাশ দিয়ে মা যেতেই ছবি দেখা বন্ধ করে জোরে জোরে পড়তে সুরু করলাম। কতক্ষণ যে এভাবে পড়েছিলাম মনে নেই। হঠাৎ করে ছোট আপা ঘরে ঢুকে বললেন, এতক্ষণ ধরে কি পড়ছিস আবোল তাবোল ?

—আবোল তাবোল ? ভীষণ রাগ হলো আপার ওপর। সব সময়েই উনি যেন আমার খুঁত ধরতে আসেন। ঠোঁট উল্টে বললাম, আবোল তাবোল কিসের আবার ? বইতে যা লেখা আছে তাই পড়ছি।

—বইতে লেখা আছে ? তাই নাকি ? আচ্ছা দেখা ত বইতে কোথায় লেখা আছে আলেকজান্ডার

সাত বার ভারত আক্রমণ করেছিলেন ? এগিয়ে এসে বলেন ছোট আপা। বেণী দুটো ঝুলে পড়ে টেবিলের ওপর।

—এই দেখ না। আঙুল দিয়ে বইয়ের একদিক দেখিয়ে দিলাম।

—সেদিকে তাকিয়ে আপার মুখটা সন্ধ্যেবেলার আকাশের মত গম্ভীর হয়ে গেল।

—মিথ্যে পড়া ভান করিসনে খোকা। যা পড়বি ভাল করে পড়লে তোরই লাভ হবে। পড়ায় ফাঁকি দিলে ক্ষতিটা কার হবে বলতে পারিস ? আমাদের নয়। কথাগুলো বলেই ছোট আপা চলে গেলেন সেখান থেকে। রাগে আমার চোখমুখ লাল হ'য়ে উঠল। কে ডেকেছিল শুধু শুধু উপদেশ দিতে ? পড়তে আর ইচ্ছে হলো না। বইটা বন্ধ করে ঘরের বাইরে চলে গেলাম।

পরদিন স্কুলে যেতেই কামালের সঙ্গে দেখা। আমার ঘাড়ে সজোরে একটা থাপ্পর দিয়ে বলল, হ্যালো ফ্রেন্ড, খবর শুনেছিস ?

আমি না-জানার ভান ক'রে ওর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে বললাম, কিসের খবর!

শুনিসনি তাহলে ?

—না ত!



—কোন তিমিরে আছিস তুই ? কল্পনা হলে 'আলেকজান্ডার দি গ্রেট' শুরু হয়েছে গতকাল থেকে। চল, ম্যাটিনী শো দেখে আসি আজ।

পকেট থেকে দু'টাকা বের করে কামাল দেখাল। তখনো আমার পয়সা জোগাড় হয়নি। মুখে হাসি টেনে এনে বললাম, চল তাহলে সবাই একসঙ্গে যাই।

—পয়সা জোগাড় করেছিস ত!

—বাড়ি থেকে ম্যানেজ করে নেব।

—অল রাইট। চল, ক্লাশে ঢোকা যাক।

ক্লাসের দিকে এগিয়ে চললাম দু'জন।

টিফিনে পেট ব্যথার নাম করে ছুটি নিলাম হেড মাস্টারের কাছ থেকে। বাড়ি ঢুকে বই আর খাতা একে একে রাখলাম টেবিলের ওপর। খাওয়া শেষ করে দুপুরে মা, আপা সবাই ঘুমুচ্ছেন। সকালে কিছু পুরোন খাতা বিক্রি করেছিলাম। পঞ্চাশ পয়সা পকেটে আছে। দরকার আরো দেড় টাকার। মা'র জমান পয়সা কোথায় থাকত জানতাম। শোয়ার ঘরে কুলুঙ্গির ওপর একটা কোটোর ভেতর মা পয়সা জমিয়ে রাখতেন। কতদিন দুপুরে ওখান থেকে পয়সা সরিয়েছি, মা টেরও পাননি। আজও অসুবিধে হলো না। ঘুমন্ত মা'র দিকে চেয়ে পা টিপে টিপে দেড় টাকা বের করে নিঃশব্দে রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। বাইরে কামাল, জামান, আমজাদ সবাই অপেক্ষা করছিল। ওদের কাছে যেতেই সবাই ঘিরে ধরল।

—পেয়েছিস?

মাথা নেড়ে বললাম, হ্যাঁ। মা কি আর সহজে দিতে চায়। অনেক কষ্টে আদায় করেছি।

—পেয়েছিস যখন তখন আর কি। চল, এমনিতেই দেরী হয়ে গেছে। বেশী দেরী হলে আবার টিকিট পাওয়া যাবে না।

সবাই হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিলাম। মনটা আনন্দে ভরে উঠল আমার। এতদিন পর আমার প্রিয় আলেকজান্ডারকে পর্দায় দেখতে পাব।

সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে হাতে বইপত্র নিয়ে চুপি চুপি পড়ার ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। কেউ কোন সন্দেহ করল না, এমনকি ছোট আপাও নয়। ওরা সবাই ভেবেছে অন্যান্য দিনের মতো আমি স্কুল থেকে এসেছি।

খানিকক্ষণ পর পড়তে বসলাম। পড়ায় কিছুতেই মন বসছে না আজ। চোখের সামনে ভাসছে সিনেমার দৃশ্যগুলো। সম্রাট আলেকজান্ডার, সেলুকাস, অস্ত্রের ঝনঝনানি, আহত সৈনিকদের আর্ত রব, ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের শব্দ সব মিলিয়ে আমাব কাছে একটা অপূর্ব সুন্দর অনুভূতি। এভাবে কতক্ষণ অভিভূত হয়েছিলাম জানিনে। পাশের ঘরে মা বাবার কথা কানে আসতেই সজাগ হয়ে উঠলাম।

বাবা এখুনি অফিস থেকে ফিরেছেন। জামা খুলে চেয়ারে বসেছেন বোধহয়। মা বাবাকে বলছেন, তোমার শার্টটা আর বেশী দিন পরতে পারবে না। অনেক জায়গা ফেঁসে গেছে।

—সেলাই করে দিও বরং। বাবার কণ্ঠস্বব।

—এভাবে সেলাই করে ত আর শার্টের আয়ু বাড়াতে পাববে না। তার চেয়ে একটা নতুন শার্ট তৈরী করে নাও। সবাই বলছে আজকাল কাপড়ের দাম অনেক কমেছে।

—এ মাসটা এটা দিয়েই চালাই কোন রকমে। আসছে মাসে না হয় দেখা যাবে। খোকার একটা শার্টে চলে না। অনেক জায়গায় যেতে হয় ওকে। এ মাসে ওর জন্যে একটা শার্ট করতে হবে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। বাবা বোধহয় চা খাচ্ছেন। হঠাৎ মা বলে উঠলেন, একি?

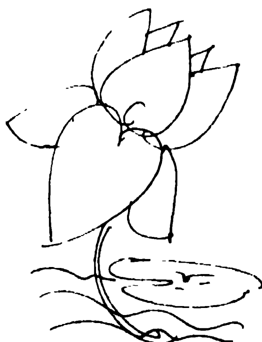
—কি হলো আবার? বাবার চোখে খানিকটা বিস্ময়।

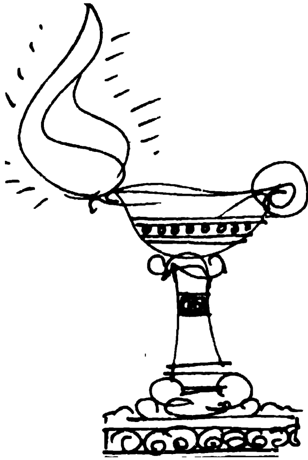
—আজ দুপুরেও কিছু খাওনি তুমি? অফিসে সারাদিন এত খাটো তুমি, সামান্য টিফিনটাও

খাবে না ? এভাবে ক'দিন শরীরটাকে টিকিয়ে রাখবে তুমি ?

—ভাল্লাগে না ঐ সব আজেবাজে জিনিস খেতে। বরং টাকাটা জমালে অনেক উপকার হবে। খোকার স্কুলের মাইনে, খুকীর কলেজের মাইনে ওখান থেকেই দেওয়া যাবে। তোমার কোটোতে ওটা রেখে দাও।

আমার হাত থেকে বইটা টেবিলের ওপর থেকে নিচে পড়ে গেল। চোখে দুটো ভয়ানকভাবে জ্বালা করে উঠল। কে যেন ভেতর থেকে সশব্দে চাবুক মারল আমাকে। প্রথম বুঝতে পারলাম. এতদিন ধরে কী অন্যায় করে এসেছি। বাবা না খেয়ে আমার জন্যে পয়সা জমাচ্ছেন, আর সেই পয়সা দিয়ে আমি সিনেমা দেখে ফূর্তি করছি বন্ধুদের সঙ্গে। বইয়ের দিকে তাকাতেই আলেকজান্ডারের মুখের বদলে চোখের সামনে ভেসে উঠল বাবার গোঁফ-দাঁড়ি ভর্তি শুকনো মুখটা। আমার মনে হলো, তিনি কারুর চেয়ে কোন অংশে কম নন, বরং আলেকজান্ডারের তুলনায় অনেক বড়, অনেক বড় ভালোবাসার সম্রাট।





জন্মদিনের উপহার

আল ফারুক

হাবুলমামার আসন্ন জন্মদিন উপলক্ষে সুখীখালা একটা পোর্ট্রেট উপহার দিলেন। মামার নিজেরই পোর্ট্রেট। কাঁচে মোড়া বিরাট সুদৃশ্য ছবি। শিল্পীর তুলির টানে হাবুলমামা যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছেন। নাক-চোখ-মুখ-ভ্রূ এমন নিখুঁত হয়েছে যে কি বলবো। এমনকি ঠোঁটের ডগায় যে হাসির রেশটি লেগে রয়েছে তাও নিখুঁত।

গেলবার হাবুলমামার জন্মদিনে সুখীখালা তাঁর নিজের ক্যামেরা দিয়ে নিজেই হাবুলমামার একটা ফটো তুলেছিলেন। মামার ঠোঁটে হাসির রেশ ফুটিয়ে ছবি তুলতে তাঁকে অনেক কসরত করতে হয়েছে। কতবার ক্লীক করেছেন ক্যামেরা। কিন্তু পছন্দ হয়নি পরমুহূর্তে। আবার 'পোজ' বদল করেছেন। আবার ছবি নিয়েছেন। এমনি অনেকবার চেষ্টার পর শেষকালে এই হাসি হাসি মুখের ফটো। সেই ফটো থেকে বিরাট আকারের তৈলচিত্র করিয়েছেন নামজাদা শিল্পীকে দিয়ে।

এ বছর জন্মদিনের ঠিক আগের দিন সুখীখালা নিজেই ছবিটা বয়ে নিয়ে এলেন।

সারা বাড়িতে তখন জন্মদিনের জোর প্রস্তুতি চলছে। ঘরদোর সাজানো, মালা, ফুল, খাবার-দাবারের আয়োজন ইত্যাদি নিয়ে আমরা ভীষণ ব্যস্ত। ছুটাছুটি আর হাঁকডাকে বাড়ি সরগরম। মামার নাম খোদাই করা 'বার্থ-ডে-কেক' আর রঙিন মোমবাতি তখনো এসে পৌঁছেনি বলে আমরা কিছুটা উদ্বিগ্ন।

এমন সময় সুখীখালা থপ্‌থপ্ করে সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠে এলেন। মোটাসোটা আয়েসী শরীর। সোফায় বসে পড়ে হাঁপাতে লাগলেন। তারপর একটু জিরিয়ে নিয়ে বললেন—তোর জন্মদিনে তো উপস্থিত থাকতে পারবো না। তাই আজই এলাম দেখা করতে।

—কেন আপা? হাবুলমামার জিজ্ঞাসা।

—কাল সকালের ফ্লাইটে চট্টগ্রাম যাচ্ছি জরুরী কাজে। তাই আজই এলাম।

একটু থেমে তারপর বললেন—তা দেখ্ হাবুল, তোর সেই ফটো থেকে আঁকা পোর্ট্রেট। তোর এবারের জন্মদিনের উপহার। আমি তো নিজে জন্মদিনে উপস্থিত থাকতে পারবো না, তাই আমার ইচ্ছে, তোর জন্মদিনে ছবিটা দেয়ালে শোভা পাক। ছবিটাই আমার উপস্থিতি।

হাবুলমামা লাজুক মুখে বললেন—এসব আবার কেন আপা। তোমার বুক ভরা আশীর্বাদই তো আমার জন্যে যথেষ্ট।

সুখীখালা রা-রা করে উঠলেন।—বলিস কিরে হাবুল। দশটা না পাঁচটা না—একটা মাত্র ভাই তুই। তোর জন্মদিনে জাঁক হবে না! আশীর্বাদের সাথে দক্ষিণা না থাকলে জমবে কেন। না-না হাবুল, তোর জন্মদিনে ছবিটা যেন অবশ্যই দেয়ালে টাঙ্গানো হয়। বোনের ইচ্ছেটা রাখবিনে হাবুল?

সুখীখালার গলাটা সত্যি করুণ হয়ে উঠলো। একটু থেমে তারপর বললেন—ভাবিসনি, তোর ছবি টাঙ্গাতে অসুবিধে হবে বলে সাথে করে একটা মইও নিয়ে এসেছি। মইটাও তোকে প্রেজেন্ট করলাম।

তাকিয়ে দেখলাম, সত্যি চাকরের মাথায় একটা নতুন মই। মইটা ধরাধরি করে দোতলায় তোলা হচ্ছে।

কাঁচে মোড়া হাবুলমামার ঢাউস অয়েলপেন্টিং আর মইটা রেখে অনেকক্ষণ গল্পগুজব করে সুখীখালা উঠে পড়লেন। যাবার সময় দেউড়ীর দোরগোড়ায় এসেও পই পই করে ছবিটা দেয়ালে টাঙ্গাতে অনুরোধ করে গেলেন।

সুখীখালা চলে গেলে আমরা সোফায় গোল হয়ে বসলাম। সুখীখালা বেতো মানুষ। তার ওপর গ্যাষ্ট্রিকের রোগী। বেশি খেতে পারেন না। তাঁর জন্যে আনা অবশিষ্ট খাবারগুলো আমরা পেটে চালান দিতে লাগলাম। খেতে খেতে হাবুলমামার জন্মদিন প্রসঙ্গে আলোচনা চলতে লাগলো।

সাবীল বললো—এবারের জন্মদিনের বিশেষত্ব হলো হাবুলমামার তৈলচিত্র।

শহীদ বললো—হাবুলমামাকে আমরা এবার ডবল-রূপে দেখতে পাবো।

মামী রসিকতা করে বললেন—অর্থাৎ ডবল ডেকার।

মামা ফোঁস করে উঠলেন। বললেন—তোর মামীর খোঁচাটা শুনলি। দিন দিন শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছি অথচ তোর মামী কিনা—কথাটা অসমাপ্ত রেখে হাবুলমামা মুখে ডালমুট পুরে নিলেন।

আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললাম—না মামা, মামী ঠিক সে অর্থে বলেননি। ডবল ডেকার দোতলা বাস তো—দু'টো গাড়ীই বলতে পারো। তোমাকে এবার দ্বৈত-রূপে দেখবো তো—মামী সেদিকটাই ইঙ্গিত করেছেন।

হাত ঝেড়ে হাবুলমামা বললেন—উঃ, ডালমুট ঝাল কিরে বাবা! তারপর বললেন—যাকগে, গুল্লী মারো ডবল ডেকারে। পোর্ট্রেটার কি করা যায় তাই বলো। আপা বারবার করে বলে গেলেন।

সুযোগ বুঝে বললাম—সে কথাই তো বলছি মামা। পোর্ট্রেটটা টাঙ্গালেই তো তোমার ডুয়েল-রূপ ফুটে উঠবে।

—ডুয়েল! হাবুলমামা ট্যারা চোখে তাকালেন। বললেন—ডুয়েল কি বলছিস? ফাইট-টাইটের কথা বলছিস না তো? ও সবের মধ্যে আমি নেই।

আরে ছোঁ! ফাইট হতে যাবে কেন? ভদ্রলোকেরা ডুয়েল-ফাইট করে কখনো? আমি বলছি, তোমার দুই মূর্তির কথা। একদিকে ছবির মধ্যে স্বপ্নের জগতের তুমি, অন্যদিকে মালা-চন্দনে সজ্জিত বাস্তব তুমি— দু'য়ে মিলে কী যে দেখাবে না তোমাকে—উহঃ!

সান্টু আবেগে গান গেয়ে উঠলো—তুমি কি কেবলই ছবি—পটে আঁকা—

হাবুলমামা হাসি মুখে ধমকে উঠলেন। বললেন—হয়েছে, হয়েছে। এবার তুড়ি মেরে লেগে পড়ো ছবি টাঙ্গাতে।



কিন্তু এই লেগে পড়তে গিয়েই যে শেষকালে এমন দুর্ঘটনা ঘটবে, হাবুলমামা বেকায়দায় পড়বেন আর মামী গুরুতর জখম হয়ে হাসপাতালে ছুটবেন এবং সব মিলিয়ে আমাদের এমন হয়রানি হতে হবে তা কে জানতো।

ছবি টাঙ্গাতে হলে প্রথমে স্থান নির্বাচন করতে হয়। কিন্তু এই স্থান নির্বাচন নিয়ে সমস্যা দেখা

দিল। হাবুলমামা সারা ড্রইং রুমটা আমাদের নিয়ে ঘুরে ফিরে দেখলেন। কোথায় বসাবেন ছবিটা। কোনো জায়গায়ই তাঁর পছন্দসই হয় না। শেষকালে আমার দিকে ঘুরে বললেন—কোথায় বসাই ছবিটা বলতো রে ক্যাবলা ?

সত্যি কোথায় বসানো যায় ছবিটা। সবাই মিলে ভাবতে লাগলাম। অনেক ভেবে আমি বললাম—কোথায় বসাবে ছবি, মামা, তুমি ঠিক করো। তবে আমার মনে হচ্ছে, ছবিটা এমন জায়গায় বসাতে হবে যাতে দরজা দিয়ে ঢুকতেই তোমার হাসি-হাসি মুখটা সবার চোখে পড়ে।

হাবুলমামা বললেন—দি আইডিয়া—বলে তিনি দরজার মুখোমুখি প্রশস্ত দেয়ালের একটা জায়গায় পেন্সিলের দাগ দিলেন। তারপর মই চাইলেন। বললেন—মই আন্।

আমরা ধরাধরি করে মইটা এনে জায়গা মত বসালাম। তিনি মই রাখার জায়গাটা দু'বার পরীক্ষা করলেন। তারপর আমাদের দিকে ফিরে বললেন—কে উঠবে ছবি টাঙ্গাতে ?

আমরা জবাব দেবার আগেই তিনি বললেন—ঘুঘুর কলিজা। নাঃ, তোদের দিয়ে কিসসু হবে না। সব অকর্মার ঢেঁকি। আমিই উঠছি মই-এ।

মই-এ এক পা দিতেই তাঁর বিশাল ওজনের ভারে নতুন মইটা মচমচ করে উঠলো। হাবুলমামা শংকিত কণ্ঠে বলেন—ভাঙ্গবে নাকি রে মই? ক্যাবলা শক্ত করে ধরিস। তারপর বললেন—দে, হাতুড়িটা দে—

হাতুড়ি, পেরেক, দড়ি ইত্যাদি ছবি টাঙ্গাতে যা-যা প্রয়োজন সব আগেই রেডি ছিল। মামার কথা মত হাতুড়ি দিলাম, পেরেক দিলাম।

মামা দেয়ালে ঠুকছেন—ঠুক—ঠুক—ঠুক—

কিন্তু উঁহু পেরেক তো ঢোকে না। যেখানেই আঘাত করেন সেখানেই সিমেন্টের আস্তরণটা পার হয়ে পেরেক যায় দুমড়ে। কী মুশকিল! মামা তাঁর দাগ দেয়া নির্দিষ্ট স্থান থেকে এদিক ওদিক সরতে সরতে অনেক দূর চলে এলেন। কিন্তু যে-কে সেই। পেরেক পোঁতা যাচ্ছে না।

মামা মই-এর ওপর থেকেই হেঁকে বলেন মই সরাতে। আমরা ঠেলে ঠেলে মই সরাই। কখনো ডানে-কখনো বামে। আর মামা সেই সময়টা হনুমানের মত মই ধরে ঝুলে থাকেন।

এভাবে মই ঠেলে ঠেলে পেরেক ঠুকতে ঠুকতে সদ্য চুনকাম করা দেয়ালটা বিচ্ছিরি হয়ে গেল। অজস্র ক্ষতচিহ্নের মত ফুটে উঠলো। কিন্তু তবু পেরেক পোঁতা আর হয়ে উঠছে না। মই ঠেলে ঠেলে আমরা হয়রান হয়ে গেলাম। হাত ব্যথা করতে লাগলো। বিরক্তি ধরে গেল। আর মামা তো গলদঘর্ম।

এক সময় ক্লান্ত হয়ে ব্যাজার মুখে হাবুলমামা বললেন—এ কেমন হলো রে ক্যাবলা ?

আমরা আর কি বলবো। চোখের সামনেই তো দেখতে পাচ্ছি অবস্থাটা। হাবুলমামা ঠোঁট উল্টিয়ে কিছুক্ষণ ভেবে নিলেন। তারপর মাথার চাঁদিতে দু'টো টোকা মেরে বললেন—হয়েছে।

আমরা সমস্বরে বললাম—কি হয়েছে মামা ?

হাবুলমামা বললেন—রোস্, মাথায় বুদ্ধি খেলেছে। যেখানে সেখানে পেরেক পুঁতে লাভ নেই। এতে শুধু দেয়ালই নষ্ট হচ্ছে। তার চেয়ে কাগজ-পেন্সিল নে। মেপেজুকে দেখতে হবে দেয়ালটার লম্বা, চওড়া আর উচ্চতা। ইঁটের মাপ নিয়ে তা দিয়ে ভাগ করতে হবে দেয়ালের মাপকে। তাহলেই ধরা যাবে ঠিক কোনখানে কত ইঞ্চি পরে ইঁটের জোড় রয়েছে। সেই জোড়ের মুখে পেরেক বসাতে হবে। তাহলে আর ইঁটের গায়ে পেরেক আটকে যাবে না।

কথা শেষ করে হাবুলমামা আমাদের দিকে বিজ্ঞোচিত চোখে তাকালেন। বললেন—কেমন

আইডিয়াখানা বল্‌তো ?

বললাম—দারুণ মামা। তোমার বুদ্ধির তারিফ করতে হয়।

মই-এর ওপরে বসে পা দোলাতে দোলাতে হাবুলমামা বললেন—তারিফ করতেই হবে। একি আর যার তার বুদ্ধি—স্বয়ং হাবুল—

পা দোলানিতে মইটা নড়ে উঠতেই মামার উচ্ছ্বাসপূর্ণ কথায় বাধা পড়লো। কোঁৎ করে একটা ঢোক গিলে চেঁচিয়ে বললেন—ক্যাবলা, মই শক্ত করে ধরিস।

তারপর শুরু হলো মাপজোক। পাশের বাড়ি থেকে ফিতে আনা হলো। ফিতের সাথে দঁড়ি বেঁধে সারা ঘর জুড়ে সে কি মাপামাপি ! লম্বা, চওড়া, উচ্চতা। পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ-অধঃ-ঊর্ধ। মাপের আর শেষ নেই। ফিতা টানাটানি আর যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ করতে করতে আমরা রীতিমত ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। শেষকালে এক সময় মাপামাপিব শেষ হলো। হাবুলমামা মাপ মত তিনটি জায়গা বেছে নিয়ে পেন্সিল দিয়ে কুলের আঁটির মত গোল দাগ দিলেন। তারপর খুশি-খুশি মুখে আমাদের দিকে তাকালেন। ব্যাপারটার একটা জলবৎ সহজ সমাধা মুহূর্তে হয়ে যাচ্ছে—এমনি একটা প্রশান্তভাব চোখেমুখে।

আমি বললাম—মামা জায়গাটা দেয়ালের একটেরেয় হয়ে যাচ্ছে না ?

হাবুলমামা বললেন—কুচ পরোয়া নেই। ছবি টাঙ্গানো নিয়ে কথা। দে—হাতুড়ি দে—পেরেক দে—

হাবুলমামা এবার নতুন পেরেক নিলেন। হাতুড়ি বাগিয়ে ধরলেন। আমাদের মই শক্ত করে ধরতে বললেন। মই যেন না নড়ে—সাবধান করে দিলেন।

আমরা শক্ত করে ধরেই ছিলাম। মামার কথা মত আরো জোরে মই ধরে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

হাবুলমামা মারাত্মক মুখ করে বললেন—দেখি বাছাধন, পেরেক কেমন দেয়ালে না ঢোকে। বলে মারলেন এক ঘা।—এই তো বাপের সুপুত্রের মত চলেছেন। ইস্‌ এখানে একটু আটকালো যে ! ও কিছু না। এখনই দিচ্ছি ঠিক করে। ওয়ান-টু-থ্রী—বলে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে মারলেন আর একটি প্রচণ্ড ঘা।

আর সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠলেন।—উঃহু-রে—গেছিরে—মরেছিরে—দুত্তোরি হাতুড়ির নিকুচি করেছে—

মামার কি হয়েছে বুঝবার আগেই হাবুলমামা হাত চেপে ধরে হাতুড়ি ছেড়ে দিয়েছেন। আর সেই হাতুড়ি পড়বি তো পড় মামীর মাথায়। মামার হৈ-হল্লা শুনে মামী পাশের ঘর থেকে ছুটে এসেছেন আর অমনি হাতুড়ি গিয়ে পড়লো তাঁর মাথায়।

হাতুড়ির আঘাত খেয়ে মামী চিৎকার করে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। রক্তের ফিনকিতে তাঁর মাথা ভেসে যাচ্ছে। মামীর অবস্থা দেখে আমরা সহসা মই ছেড়ে দিয়ে তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়লাম। আর সাথে সাথে মই পিছলে হাবুলমামা কলাগাছের মত চিৎপাত হয়ে পড়ে গেলেন।

হাবুলমামা যেখানে পেরেক পুঁতছিলেন তার পাশেই রাখা ছিল জন্মদিনের জন্যে কেনা হাঁড়িভর্তি দই আর মিষ্টি। হাবুলমামা মইসমেত সেই দই আর মিষ্টির হাঁড়ির মধ্যেই পড়লেন। মিষ্টি আর দই চেপ্টে তালগোল পাকিয়ে গেল।

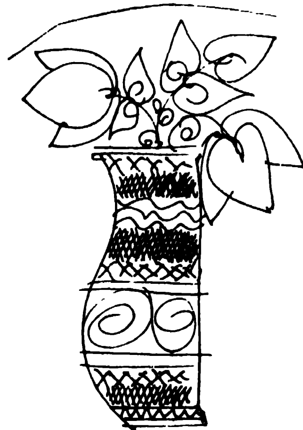
তখন একটা দৃশ্য বটে। জাঁতিকলে-পড়া ইঁদুরের মত হাবুলমামার দশাসই শরীরটা মই-এর

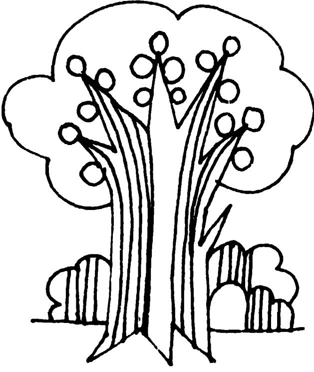
ফাঁকে আটকা পড়েছে। তিনি সেই ফাঁক দিয়ে বের হওয়ার জন্যে যতই হাত-পা ছুঁড়ছেন ততই দই আর মিষ্টিতে ছিটাছিটি হচ্ছে। এবং সারা গায়ে দই আর মিষ্টি লেগে কিম্ভুতকিমাকার হয়ে যাচ্ছেন।

মামার অবস্থা দেখে আমরা গা ঝাড়া দিয়ে উঠলাম। তারপর মামার দই মাখানো বিরাট দেহটা টেনে-হেঁচড়ে অনেক কষ্টে মই-এর ফাঁক থেকে বের করলাম।

পড়ে গিয়ে মামা কোমরে জবর আঘাত পেয়েছেন। হাতুড়ির ঘায়ে বাঁ হাতের একটা আঙ্গুল থেঁতলে গেছে। তার ওপর মই-এর ফাঁক থেকে টেনে-হেঁচড়ে বের করতে গিয়ে এখানে ওখানে ছড়ে গেছে। ওদিকে মামীর মাথা রক্তে জবজবে।

মামাকে ব্যাণ্ডেজ-ট্যাণ্ডেজ করে কোনো রকমে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। আর মামীকে নিয়ে সোজা হাসপাতালে।





অরণ্যের এক রাত্রি

আশিস সান্যাল

দূরের পলাশ, মহুয়া বনের মাথায় কখন সূর্যের শেষ রশ্মিটুকু লেপটে পরে চিক চিক হেসে উঠেছিল এখন আর তার কিছুই টের পাওয়া যাবে না। টের পাওয়া যাবে না, কখন আকাশ-সাঁতার-ক্লান্ত পাখিরা ঘরে ফেরবার পথে সমস্ত বনানী প্রদেশ কিচির মিচির শব্দে মুখর করে তুলেছিল। এখন চারিদিকে শুধু জমাট অন্ধকার। এই যে কিছুক্ষণ আগেও কোয়েল নদীর কিনারে একদল বুনো হাঁস আলগোছে হেঁটে বেড়াচ্ছিল, এখন আর তাদের কাউকে দেখা যাবে না। সমস্ত চরাচর এখন অন্ধকারের করাল গ্রাসে আবদ্ধ।

গ্রামের নাম গাড়ি। এখান থেকেই আমাদের যাত্রা শুরু হবে ঠিক আটটায়। খাওয়া দাওয়া সেরে তাই সকলে আমরা প্রস্তুত হয়ে পড়লাম। মোটামুটিভাবে সকলের মধ্যে একটা পরামর্শ হ'ল। ঠিক হল পথ প্রদর্শক হবে আলিমুদ্দিন। এই বন সম্বন্ধে তার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। তাছাড়া এখানকার পথঘাট, অলি-গলি সবই তার নখদর্পণে। সে সকলের আগে "স্পট-লাইট" ফেলতে ফেলতে এগিয়ে যাবে। তার পিছনে প্রথম সারিতে থাকবে শশীবাবু আর মহাত্মা। এরপর চারজন মালবাহী দেহাতি এবং সবশেষে থাকবো আমি আর রতনলাল। দেহাতিদের সঙ্গে নেবার কারণ হল, যদি কোন শিকার মেলে তাহলে ওরাই বহন করে গ্রামে পৌঁছে দিয়ে যাবে।

যথাসময়ে আমাদের যাত্রা শুরু হল। প্রথম ঘণ্টাখানেক গল্প করতে করতেই আমরা এগুলাম। বন যে এখন পর্যন্ত হালকা তা স্পষ্টতঃই বোঝা গেল। কেননা শাল-মহুয়া বন ভেদ করে স্পট-লাইটের আলো অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে যাচ্ছিলো। বোধহয় সেটা কৃষ্ণপক্ষের রাত। চারিদিকে ভয়ানক অন্ধকার। তার উপর গভীর কুয়াসার আস্তরণ। মনে হচ্ছিলো একটা অদ্ভুত রহস্যের মধ্যে ডুবে গিয়ে সমস্ত বনাঞ্চল স্তব্ধ হয়ে ভাবছে। আকাশে ছড়ানো ছেটানো তারাগুলো দপ্ দপ্ জ্বলছে। হঠাৎ এই বনের স্তব্ধতাকে ভেঙে দিয়ে এক ঝাঁক হাওয়ায় কেঁপে

উঠল সমস্ত অরণ্য। সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত শিহরণ আমার রক্তে দাপাদাপি শুরু করে দিলো। অনুভব করলাম, এই নির্জন অরণ্যে যেন আমাদের অসহায় একাকীত্বকে ঘিরে দুপাশে গাছগুলি ভয়ানক উপহাস করছে।

কিছুক্ষণ একটানা হেঁটে যাবার পর আমরা এক জায়গায় এসে সকলে থেমে গেলাম। আলিমুদ্দিন জানালে, এখান থেকে বন খুব গভীর। আর আমরা যেখানে যাচ্ছি, সে বন খুবই দুর্গম। সবাইকে সে তাই সাবধান করে দিল এবং শেষবারের মত তার নির্দেশগুলি জানিয়ে দিল আমাদের। আমার সঙ্গী রতনলাল এই প্রথম শিকারে এসেছে। লক্ষ্য করে দেখলাম, কথা শুনেই তার হাত পা থর থর করে কাঁপছে। তাকে অভয় দিয়ে বললাম, 'ভয় কি? তোমাকে ছেড়ে পালাবে না।'

দেখতে দেখতে আমরা আরো অনেকটা গভীর অরণ্যে ঢুকে পড়লাম। বন এখন এত গভীর যে, দূরের কিছুই আর দেখা যাচ্ছে না। শুধু স্পট-লাইটের আলো অরণ্য ভেদ করে যতদূর যায়, ততদূরই আমাদের নিশানা। কিন্তু কান সতর্ক রেখে চলেছি। কেননা বনে যে কোন মুহূর্তে বিপদ ঘটতে পারে। সামনে স্পট-লাইটের আলো ফেলতে ফেলতে চলেছে আলিমুদ্দিন। হঠাৎ তার হাতের আলোটা এক জায়গায় স্থির হয়ে গেল। চেয়ে দেখি, কিছুটা দূরে একটা মহুয়া গাছের তলায় দুটো বিরাটাকার হরিণ। আলোতে তাদের চোখ দুটো দপ্ দপ্ জ্বলছে। এখানে আলিমুদ্দিনের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি। কারণ, আলোটা একটু হেলে পড়লেই হরিণ দুটো ছুটে পালিয়ে যাবে। নির্দেশ মত আমরা দাঁড়িয়ে পড়লাম। আলিমুদ্দিন স্পট-লাইটের আলোটা নিয়ে এগিয়ে গেল কিছুটা। কেননা, রেঞ্জের মধ্যে না ফেলতে পারলে গুলি করে কিছু লাভ হবে না। মহাত্মাও বন্দুক প্রস্তুত করে নিয়ে এগিয়ে গেল তার পিছু পিছু। অনেকটা এগিয়ে গেছে তারা। এবার হরিণ দুটো রেঞ্জের মধ্যে এসে পড়েছে। আলিমুদ্দিন স্পটের আলোটা হরিণ দুটোর উপর ঠিক রেখে দাঁড়িয়ে পড়ল। মহাত্মাও মুহূর্তের মধ্যে বন্দুকের নিশানা ঠিক করে ফেলল। প্রথম সাফল্য লাভের আশায় আনন্দ তখন আমাদের মনে দোলা দিতে শুরু করেছে। কিন্তু, একি? পাশের জঙ্গলে একটা ভারী পায়ের শব্দ শুনে আমরা সবাই সচকিত হয়ে উঠলাম। একটা বিশাল প্রাণী যেন ছুটে আসছে আমাদের দিকে। সব কটা বন্দুক প্রস্তুত হয়ে গেল। আলিমুদ্দিন স্পট-লাইটের মুখ ঘুরিয়ে ফেলল সেদিকে। সঙ্গে সঙ্গে শব্দটা থেমে গেল। আমাদের মনে তখন একটা ভয়ানক উৎকণ্ঠার ঝড়। দু মিনিট প্রায় নিঃশব্দে কেটে গেল। আলিমুদ্দিন স্পট-লাইটের আলোটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জানোয়ারটাকে সন্ধান করতে লাগল। এক সময় শব্দটা আবার স্পষ্ট হয়ে উঠল। তেমনি উৎকণ্ঠায় আমরা প্রস্তুত হয়ে পড়লাম।

'ধ্যুৎ!' মহাত্মা তাচ্ছিল্যের সুরে কথা বলে আমাদের উৎকণ্ঠার সমাপ্তি ঘটালো। জিজ্ঞাসা করলাম 'কি?'

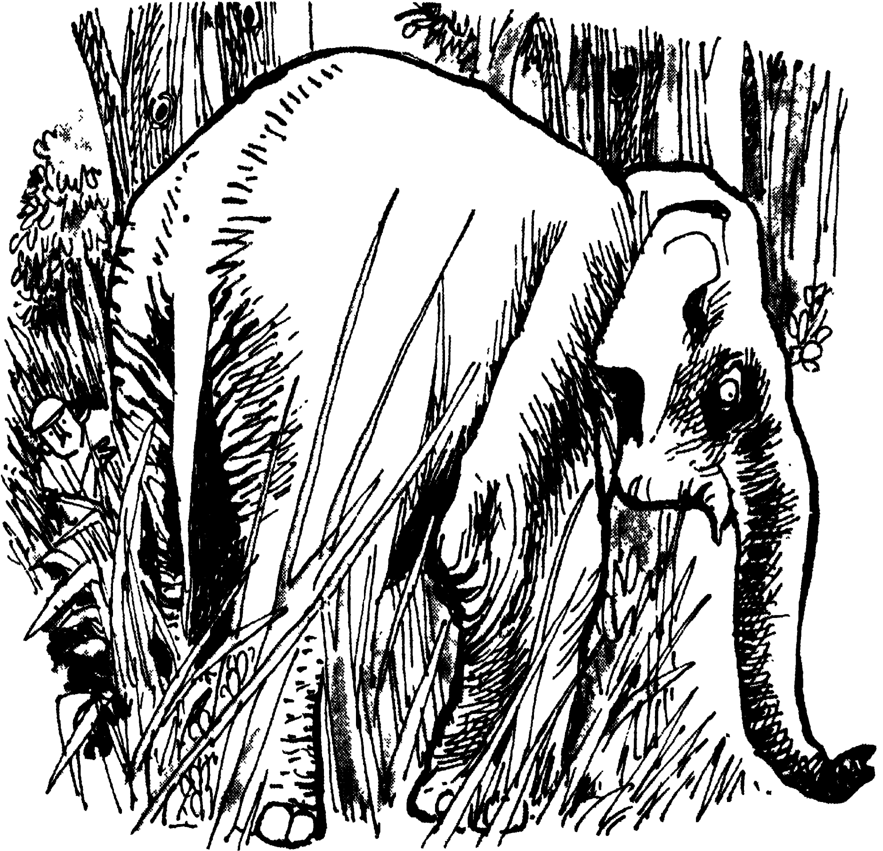
'কি আবার, বুনো শুয়োর।' উত্তর দিলো মহাত্মা।

ঠিক তাই, একটা বিরাট বুনো শুয়োর তার একপাল বাচ্চা নিয়ে চলেছে। প্রথমে সে হয়ত আমাদের দেখতে পায়নি। পথে স্পট লাইটের আলো দেখে থমকে গিয়েছিল। যাই হোক, লাভজনক শিকারটা হাতছাড়া হওয়ায় আমরা সকলেই কিছুটা বিমর্ষ হলাম।

আলিমুদ্দিন আশ্বাস দিয়ে বললে—'বনে এরকম হামেশাই ঘটে, ঘাবড়ে যাবেন না।'

আবার চলতে শুরু করলাম আমরা সকলে। বন ক্রমে আরো গভীর হয়ে উঠছে। চলার পথটাও এখন অনেক সঙ্কীর্ণ! দুপাশের ডালপালাগুলো এসে গায় লাগছিল। শীতটা পড়েছে খুব

বেশি। এতোক্ষণ বনে বিশেষ হাওয়া ছিলনা। এখন মৃদু হাওয়া বইতে শুরু করেছে। একে শীত, তার উপর এই হাওয়ায় মনে হচ্ছিল, যেন হাত পা জমে বরফ হয়ে যাচ্ছে। বন্দুক হাতে আছে বটে, কিন্তু হাত পা সেভাবে প্রস্তুত ছিল না। বাতাসে আর একটা অসুবিধাও হল। পাতা ঝরার এমন একটা টুপ টাপ শব্দ হচ্ছিল যে, হিংস্র শ্বাপদ খুব কাছে না এলে তার পায়ের শব্দ বুঝার কোন উপায় আমাদের ছিল না। অবশ্য বাঘের কথা স্বতন্ত্র। তবে আশার কথা এই যে, এতগুলো প্রাণী দেখে সে হয়ত এগুতে সাহস পাবে না। বেশ অনুভব করলাম, একটা ছোট টিলার ওপর



আমরা উঠছি। এখানে খুব খাড়া বড় পাহাড় প্রায় নেই। ছোট ছোট রুক্ষ পাহাড়গুলোই এখানকার সৌন্দর্য। আসামের বনে যেমন ঝোপঝাড় খুব বেশি, এখানে তেমন নেই। তুলনায় বেশ হাল্কা। শীতে হাত পা জড়ো সড়ো হয়ে আসছে। তবু এগোন ছাড়া কোন উপায় ছিল না আমাদের। ছোট টিলাটা পার হয়ে সবে সমভূমিতে নেমেছি। এমন সময় একটা ভয়ানক শব্দে আমরা সচকিত হলাম। মনে হল দুদল মানুষ যেন লাঠি নিয়ে মারামারি করছে। সামনের বাঁশবনে আলো পড়তেই সকলে ভয়ানক আঁতকে উঠলাম।

সর্বনাশ! একদল হাতী, আর এত কাছে!

আলিমুদ্দিন চেঁচিয়ে উঠল, 'ডেনজার, পালাও পালাও।' সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এত বড় দলটা

যেন ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলো। আমি আর রতনলাল ছিলাম সকলের পেছনে। বিদ্যুতের স্পর্শে আলো যেমন দপ্ করে জ্বলে ওঠে, তেমনি কেমন করে এক অলৌকিক শক্তিতে, সামনের বড় পাথরটা পার হয়ে অনেকটা পথ চলে এসেছিলাম তা এখন আর বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তবে মনে আছে, আমার পেছন পেছন যে রতনলাল ছুটে আসছিল, এ অনুভব আমার তখন ছিল না। আমার কেবলই ওর পায়ের শব্দে মনে হচ্ছিল, হাতীগুলো বুঝি তাড়া করে আসছে পিছু পিছু। এক সময় একটা বুনো লতায় আটকে মাটিতে পড়ে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করলাম একটা ভারি জিনিস আমার পিঠের উপর আছড়ে পড়ছে। সে যে আর কেউ নয়, আমার বন্ধু রতনলাল, এ কথা যখন জানলাম, তখন কিছুটা স্বস্তি খুঁজে পেলাম মনে।

আমরা যে আমাদের দল থেকে অনেকটা দূরে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি, তাতে কোন সন্দেহ ছিল না। কেননা নানারকম সাংকেতিক শব্দ করে কাছাকাছি কোন জায়গা থেকে কোন উত্তর পেলাম না। চারিদিকে প্রসারিত শুধু অন্ধকার। নিশুতি বনে কোথাও মানুষের কোন সাড়া নেই। আমরা অনেকক্ষণ কোথাও কোন মানুষের স্বর শোনা যায় কিনা তারজন্য অপেক্ষা করলাম। কিন্তু এভাবে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করাও বিপজ্জনক। আলিমুদ্দিনের কাছে শুনেছিলাম, এ বনে হরিণের সঙ্গে বাইসন, হাতীও দেখা যায় মাঝে মাঝে। সুতরাং এভাবে নিশ্চল দাঁড়িয়ে না থেকে একটা কিছু ব্যবস্থা করা যাক্। ওদের সন্ধান করা এখন বৃথা। তা ছাড়া এখানের রাস্তাঘাট আমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত। তাই কোন নিরাপদ স্থানে অপেক্ষা করাই শ্রেয়।

'চলো গাছটায় উঠে বসি।' ইঙ্গিতে মাথা নাড়ল রতনলাল। লক্ষ্য করলাম, তার বাকশক্তি প্রায় লোপ পেতে বসেছে।

একটা পাথর ডিঙিয়ে মাঝারি ধরনের একটা গাছের সামনে এসে দাঁড়ালাম। প্রথমে আমি হাঁটু গেড়ে বসলাম। রতনলাল আমার ঘাড়ে পা দিয়ে দাঁড়ালো। আমি উঠে দাঁড়ালে ও একটা বড় ডাল ধরে ঝুলে উঠে পড়লো। আমিও অনেক কষ্টে উঠে পড়লাম গাছে। বললাম, 'রাতটা এভাবেই কাটানো যাক্। তারপর সকাল হলে যা হোক একটা ব্যবস্থা করা যাবে।'

এভাবে কতক্ষণ কেটেছিল, তা এখন আর সঠিক বলা সম্ভব হবে না। একটা ভয়ানক আতঙ্ক আর অনিশ্চয়তার মধ্যে একটা মিনিটকে মনে হচ্ছিল যেন এক একটা প্রহর। চারিদিকে তখন ভীষণ নির্জনতা। মনে হচ্ছিল অন্ধকারের বুকে সমস্ত বনভূমি এখন ঘুমিয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে সামান্য হাওয়ায় যখন চারিদিকে ছড়ানো গাছের ডালপালাগুলি ঈষৎ কেঁপে উঠছিল, তখন হয়তো মনে করা যেতে পারতো, সোনার পালঙ্কে শায়িত কোন ঘুমন্ত রাজকন্যার ঘুম ভাঙ্গাবার সাধনায় রূপকথার রাজপুত্র নিরলস চেষ্টা করে চলেছে। কিন্তু আমাদের মন নির্জনতার অদ্ভুত রহস্যকে অনুভব করার জন্য প্রস্তুত ছিল না। বরং হাওয়ার সামান্য শব্দও প্রতিমুহূর্তে আমাদের মন আতঙ্কে ভরিয়ে তুলছিল। প্রার্থনা করছিলাম, বাতাস বন্ধ হয়ে যাক্। ডালপালা নড়বার শব্দ থামুক। এবং সমস্ত বনভূমিতে বিরাজিত হোক এক অপরিসীম নৈঃশব্দ্য।

অনেকটা দূরে একটা হরিণের ডাক শোনা গেলো। তারও পর শুকনো পাতায় একটা কিসের হেঁটে যাওয়ার শব্দ। রতনলাল আমার পিঠে ধাক্কা দিয়ে ওই শব্দটার প্রতি আমাকে সতর্ক করতে চেষ্টা করলো। অন্তুতঃ তার মনে কিছুটা আশা সঞ্চার করার ইচ্ছায় আমি ইশারায় জানালাম, ওটা কিছু নয়। কিন্তু মনে একটা অকারণ ভয় মাতামাতি শুরু করলো। রতনলালের পকেট থেকে টর্চটা আমার হাতে নিলাম। শব্দটা হঠাৎ থেমে গেল। মনে হল জানোয়ারটা বোধ হয় কিছু একটা সন্দেহ করেছে। সাধারণতঃ মানুষখেকো বাঘ না হলে, আলো দেখলে বা বন্দুক দেখলে

পথ ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু একমাত্র সেই ভরসাতেই তো আর থাকা যায় না। তা ছাড়া আমরা দুজনের মধ্যে কেউই শিকারী বলতে যা বুঝায়, তা নই। শিকারের অভিজ্ঞতাও তেমন নেই। দু একবার শিকারী দলের সঙ্গে বনে এসেছি, এই মাত্র। ভাগ্যক্রমে সেই মুহূর্তে আমাকে শিকারীর ভূমিকায় অভিনয় করে যেতে হচ্ছে। যাই হোক, কিছুক্ষণ আর শব্দটা শোনা গেল না। মনে কেমন যেন একটা কৌতূহল জাগলো। বাঁ হাতে টর্চের সুইচটা টিপে ধরলাম। সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রাণী হুড়মুড় শব্দে পালিয়ে গেল। সামান্য আলোতে যতদূর লক্ষ্য করলাম তাতে মনে হল, প্যান্থার জাতীয় কোন প্রাণী। কাছে কোথাও হয়ত জল আছে। সে হয়ত সেদিকেই যাচ্ছিল। অথবা কোথাও শিকার না পেয়ে নতুন শিকারের সন্ধানে এসেছিল এদিকে। তারপর এক সময়ে আমাদের দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিল। টর্চের আলো দেখে নিশ্চয়ই ভয় পেয়েছে খুব। তাই আত্মরক্ষার জন্য পালিয়ে গেছে অন্যদিকে।

আরো কিছুটা সময় এরকম উৎকণ্ঠায় আর অনিশ্চয়তায় কেটে গেলো। এক সময় রতনলাল আমার পিঠে ধাক্কা মেরে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো—

'রোশনাই।'•

সত্যি। লক্ষ্য করে দেখলাম, তিন চারটি টর্চের আলো কিছু সন্ধান করে বেড়াচ্ছে। মনে একটা আশা জেগে উঠলো। নিশ্চয়ই আমাদের দলের লোকেরা। তাছাড়া এই নির্জন বনে এত রাতে কেউ ঘুরে বেড়াতে পারে না। আমি প্রত্যুত্তরে আমার টর্চের আলো জ্বেলে ধরলাম। অপর দিক থেকে এইবার সঠিক উত্তর পাওয়া গেল। আমার নাম ধরে ডেকে উঠল একজন। মনে হল শৈলদার কণ্ঠস্বর। এইবার রতনলাল এবং আমি দু জনেই এক সঙ্গে চিৎকার করে উঠলাম 'এদিকে, এ-দি-কে'। এই আলো এবং উত্তর প্রত্যুত্তর বিনিময় করতে করতে প্রায় কুড়ি মিনিট পরে ওরা আমাদের কাছে চলে এলো। তখন দলে মাত্র চারজন। শৈলদা, শশীবাবু, মহাত্মা এবং আর একজন। এই লোকটি এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে ছিল না।আমরা গাছ থেকে নেমে এলাম। শৈলদা প্রায় দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরলো আমাকে। লক্ষ্য করলাম, একটা ভয়ানক দুশ্চিন্তায় তার চোখমুখের চেহারা পাল্টে গেছে। অবশ্য এটাই তার পক্ষে স্বাভাবিক। সে আমার সম্পর্কে পিসতুতো ভাই। এই অঞ্চলে ফরেস্ট অফিসারের কাজ করে। তার কাছেই এসেছিলাম আমি বেড়াতে। আমার বিশেষ অনুরোধে সে এই শিকারের ব্যবস্থা করেছিলো। তাই কোন একটা দুর্ঘটনা ঘটলে, সেটা তার পক্ষে মারাত্মক হয়ে দাঁড়াতো। শৈলদার মুখে এইবার একটা ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পেল। এতোক্ষণের সমস্ত অনিশ্চয়তাকে ঝেড়ে ফেলার মতো একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে সে বললো—

'বাস্, কি ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।'

'খুবই স্বাভাবিক', সমর্থন জানাল মহাত্মা। 'কোলকাতার লোক এই গভীর জঙ্গলে ভয়েই শেষ হয়ে যেতো। যাক ভালোভাবেই উপসংহার হয়েছে।'

'তোদের বললাম, সব সময় আমাকে লক্ষ্য করে চলবি, তা অন্যদিকে গেলি কেমন করে?' গলায় একটা দৃপ্ত গাম্ভীর্য টেনে শৈলদা এবার প্রশ্ন করলো।

'মানে পাথরটা ডিঙ্গিয়ে যেতেই মনে হল সামনে খোলা পথ রয়েছে।'

'কিন্তু হাতীর সামনে পড়লে কি আর রক্ষা ছিল।'

'হয়েছে। যা ঘটে গেছে, তা ভেবে আর লাভ কি?' শশীবাবু বললেন।

'কিন্তু ভাবুন তো আমাদের কথা।'

'কিন্তু তোমরাই বা আমাদের ছেড়ে গেলে কেমন করে?' এবার আমি পাল্টা প্রশ্ন করলাম।

'এত লোকের মধ্যে কে কোথায় গেল, তা বিপদের সময় নির্ণয় করা যায় না। নিয়ম হচ্ছে, যারা দলে আছে, তারা নির্দেশ মত চলবে। আমরা তো ভাবতে পারিনি, তোরা নেই। বিপদ কেটে যাবার পর যখন একসাথে হয়েছি, তখনই খেয়াল হল। তখনই খুঁজতে বেরিয়েছি তোদের। সঙ্গে সাহেবকে নিয়ে এসেছি। এ জঙ্গল তার খুব চেনা। অন্যান্য সকলে এখন তার বাড়িতে অপেক্ষা করছে। যাক্, এবার চল সেখানে। সবাই এতোক্ষণে হয়তো অস্থির হয়ে উঠেছে।'

সাহেবের আস্তানায় এসে দেখি বারান্দায় আগুন জ্বালিয়ে, সবাই তার চার পাশে গোল হয়ে আগুন পোহাচ্ছে। আমাদের দেখেই ওদের মধ্যে একটা মৃদু গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল। বুঝলাম, আমাদের না দেখে ওরাও চিন্তিত হয়েছিল।

বাইরে একটা কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া। হাওয়ার থাবায় সমস্ত অরণ্য অঞ্চল যেন কেঁপে উঠছে। নিঃশ্বাস ফেলার মত একটা অদ্ভুত শব্দ চারিদিকে যেন হুটোপুটি করে বেরাচ্ছে। ঘাসের উপর বিক্ষিপ্ত শিশির বিন্দুগুলো অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় জমাট বেধে গিয়েছে। এতোক্ষণ তেমন অনুভব করিনি, কিন্তু এখন সাহেবের বাড়িতে ফিরে আসার পর মনে হল, আমার পা দুটো শীতে অসাড় হয়ে গিয়েছে। তাই বারান্দায় জ্বালানো আগুন দেখে, তাড়াতাড়ি এসে তার পাশে বসলাম। জুতা এবং মোজা খুলে ফেলে আগুনে হাত পা গুলো সেঁকে নিতে আরম্ভ করলাম। একজন দেহাতি দু'কাপ চা নিয়ে এল আমার এবং রতনলালের জন্য। পরম সৌভাগ্য না থাকলে এ অসময়ে চা পাওয়া যায় না।

আমরা যখন আগুনের পাশে বসে চা খাওয়ায় ব্যস্ত, তখন সাহেব সবাইকে প্রস্তুত হবার জন্য ইঙ্গিত করল। সঙ্গে সঙ্গে সবাই উঠে দাঁড়ালো। শৈলদা এসে বললো—'তোরা এখানে থাক, আমরা আবার বেরুচ্ছি।'

কিছুমাত্র আপত্তি জানালাম না। কেননা এতোক্ষণের উৎকণ্ঠা এবং পরিশ্রমে ভয়ানক ক্লান্তি বোধ করছিলাম। তাছাড়া এই রাত্রিতে আবার বের হবার মত উৎসাহও আমার ছিল না। আমি আর রতনলাল ছাড়া সবাই বেরিয়ে গেল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি, তখন রাত চারটে। সামনে একটা খড়ের বিছানা পাতা ছিল। আমি আর বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে, শরীর এলিয়ে দিলাম তার ওপরে। কখন যে আমার দুচোখ বন্ধ হয়ে এসেছিল, তার কিছুই টের পেলাম না।

শিকার কাহিনী বা ভ্রমণ কাহিনী হিসেবে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা হয়তো এটি নয়। কিন্তু এক করুণ অভিজ্ঞতার বিবরণ হিসেবে এই কাহিনী স্মৃতিপট থেকে কখনও বিলুপ্ত হবে না। নির্জনতার যে একটা অদ্ভুত আস্বাদ আছে, অনিশ্চয়তার যে একটা অজানা শিহরণ আছে, অরণ্যের যে একটা দুর্গম আনন্দ আছে, পালামৌয়ের নির্জন অরণ্যে অতিবাহিত একটি রাত সেই অভিজ্ঞতাই যেন মনের মণিকোঠায় সঞ্চিত করেছে। এখনো কান পাতলে, স্মৃতিপটে বেজে ওঠে অরণ্যের হাতছানি, বাতাসের অবিরল শব্দ, আর অন্ধকারের রহস্যময় প্রতিধ্বনি।



গোগোদার সঙ্গে উলুউলু দেশে

বেলাল চৌধুরী

গোগোদাকে চেনো না তোমরা, সে কি! তোমরা তো দেখছি আমাদের জাতীয় গল্পবৃত্তান্তের কিস্‌স্যুই জানো না। গোগোদার মতো অত বড় বীরপুরুষের নামই শোন নি? কি আশ্চর্য কথা! যার নামে বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খায়, যার এক হাঁকে কেঁপে ওঠে আসমুদ্রহিমাচল। সমগ্র ভূ-ভারত খুঁজে বেড়ালেও যার জুড়ি মেলা ভার। কাছিমের পিঠে চেপে তিনি ঘুরেছেন কত না দেশবিদেশ, পাড়ি দিয়েছেন সাতসমুদ্র তেরো নদী। এক লম্ফে ডিঙিয়েছেন কত না পাহাড়-পর্বত। যেমন তাঁর বীরত্ব তেমনি তিনি অফুরন্ত গুণেরও খনি বটেন। তাঁর মতো রূপবান, তুখোড় খেলুড়ে, দক্ষ শিকারী, ডাকসাইটে আঁকিয়ে, গাইয়ে, বাজিয়ে সচরাচর খুব কমই দেখা যায়। আর তিনি যে একজন নামকরা নাচিয়ে তো তাঁর নামকরণ থেকেই টের পাওয়া যায়। জি ও গো জি ও গো অর্থাৎ গোগোদা শুনেছি, মাঝে মধ্যে রেগে গেলে নাকি সে এক তুলকালাম কাণ্ড, জীবন্ত ক্ষেপণাস্ত্রের চাইতেও ভয়ংকর হয়ে ওঠেন। এসব কথা সাধারণত দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরাই বলাবলি করে। আমি কিন্তু কখনো তাঁকে তেমনভাবে রাগতে দেখিনি বরং আমি বরাবরই দেখেছি, তিনি বেশ ফুরফুরে ফুর্তির মেজাজেই থাকেন। আমোদ উল্লাসে মেতে থাকতেই ঢের বেশি ভালবাসেন। তাঁর মতো শিশুকে প্রকৃতির লোক আমি খুব কমই দেখেছি। আমাকে তিনি খু-উব পছন্দ করেন। আর করবেন নাই বা কেন? আমি কি কারুর চাইতে কম তাঁর আদেশ-নির্দেশ মেনে চলেছি? উফ্, কত কত শক্ত কাজ আর পরিশ্রম! আর সারাক্ষণই ক্রমাগত এটা-ওটা খাওয়া, ছোটাছুটি দাপাদাপি করা, বিকট শব্দের বাজনা বাজানো ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কঠিন সব কাজ।

কি বুঝলে? কিস্‌স্যু বোঝনি! আসলে আমি গোগোদার ভীষণ ভক্ত, অনুরাগী আর বাধ্য। তাই তো একবার তিনি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর বান্ধবী ইল্লির দেশে। সে দেশের নাম উলুউলু। তোমরা হয়তো ভূগোলে বা মানচিত্রে উলুউলু দেশটি কোথাও খুঁজে

পাবে না। একমাত্র গোগোদা আর আমিই কেবল জানি, দেশটি কোথায় এবং কিভাবে যেতে হয়। তবে গোপনে তোমাদের আমি একটি সূত্র বলে দিতে পারি, সেটা হল সোজা তোমার নাক বরাবর।

উলুউলু দেশে যেতে হলে প্রথমেই যেতে হবে এক গুপ্ত নৌ-বন্দরে, যেখানে অসংখ্য তিমি, জাম্বো জেটের মতো প্রকাণ্ড কুঁজঅলা গায়ক তিমি, নীল তিমি, কমলা-সাদা-হলুদ ছোপ দেয়া, ময়ূরকণ্ঠী নীল, ধবধবে সাদা, লালশির, নীলশির, নীলপক্ষ, রাঙামুড়ি, সামনে সাদা, ডুবুরি, ডুব-না দেয়া, চোখ সাদা, পাতিহাঁস, রাজহাঁস, কচ্ছপ ও কাছিম, ছোট বড় নানা আকারের কুমির, কামট ও তাদের ছানা আর অগুণতি রঙবেরঙের রোগা মোটা গোল চ্যাপটা বেঁটে লম্বা মাছ, মাছের পোনা কোনটা ঠিক সাম্পানের মতো কোনটা বা ডিঙি নৌকার মতো। তোমার খুশিমতো যে কোনটাতে চেপে যেতে পারো। টিকিট-ফিকিটের বালাই নেই। শুধু পিঠে চেপে বসা, পরমুহূর্তেই দেখবে হুশ করে তুমি অগাধ জলের বুক কেটে ছুটে চলেছ তরতর করে। ওই নৌ-বন্দরের কর্মচারীদের মধ্যে নানা কাজে সাহায্য করবার জন্যে রয়েছে জাঁদরেল চেহারার কোলা সোনা নানা জাতের ব্যাঙ, বড় বড় দাঁড়অলা কাঁকড়া, শুঁপো ভোদড়। আর আবহাওয়া বিশারদের কাজ করেন গাঙশালিখ ও শঙ্খ চিল।

আমরা গিয়েছিলুম সব চাইতে দ্রুতগতিসম্পন্ন বিশাল এক নীল তিমির পিঠে চেপে। প্রচণ্ড গতি ভালবাসেন গোগোদা। জলের বুকে ফোয়ারা তুলে সাঁই সাঁই করে ঝড়ের গতিতে ছুটে চলছিল আমাদের নীল তিমি। বলতে লজ্জা নেই, আমি চোখ বুজে দুহাতে গোগোদাকে আঁকড়ে ধরে পেছনে বসেছিলাম। আমি আবার বিষম ভীতু কি না ? গোগোদা কিন্তু বেশ মনের আনন্দেই গাইছিলেন, 'লাল লাল মাছদের নীল নীল গান'। মাঝে মাঝে শিসও দিচ্ছিলেন। সে যাই হোক উলুউলু দেশে পৌঁছে আমার চোখজোড়া তো ছানাবড়া হবার যোগাড়। প্রথমেই পড়ল কোকাকোলা আর শরবতের নদী, তারপরেই আইসক্রিমের খাল বিল। কি ঝলমলে তার রঙ ! চার পাশে দুই তীরে তীরে ক্ষীরের ছানার অজস্র গাছপালা। ডালে ডালে ঝুলছে সোনালী রঙের বিস্কুট, কোনটাতে জ্যাম বা জেলি আবার কোনটাতে বা মাখন কিংবা মার্মালেড মাখানো আর রূপালী রাংতা মোড়া নানা ধরনের সুগন্ধী চকোলেট, লজেঞ্চুষের গুচ্ছ দুলছে ঝিরঝিরে হাওয়ায়। আমার তো জিব দিয়ে অনবরত লালা গড়াতে থাকল। আমি কি করব কিছুই আর বুঝতে পারছিলুম না। বাগানে বাগানে ফুটে রয়েছে মিষ্টি খইয়ের ফুল, মুড়ির মোয়া, ক্ষীরকদম্ব, নারকোলনাড়ু, শোন-পাপড়ি। উফ্ আমি আর তাকাতে পারছিলুম না। ঘুরে ঘুরে বাগানের খবরদারি করছে সাহেবদের মতো লালমুখো সব দশাসই ডেঁয়ো পিঁপড়ের দল। দেখলে ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে। নিচে ছড়ানো চমৎকার সাদা দানা চিনির বালি, চিকচিক করছে মিছরির নুড়ি। এদিক ওদিকে খেলনার দোকানগুলোতে থরে থরে সাজানো রয়েছে রাশি রাশি ফল। থোকা থোকা রস টশটশে আঙুর, গাঢ় লাল রঙা আপেল, উজ্জ্বল হলুদ সোনার বরণ নাশপাতি, ডাঁশা পেয়ারা, মিশমিশে কালো জাম, মসৃণ রূপসী কমলালেবু, দুষ্টু জামরুল, রক্তাভ ডালিম ও বেদানা আর ঘোর সবুজ রঙের ইয়া বড় বড় তরমুজ। শশা, কলা, পাঁপর ভাজা, রেশমী মিঠাই, ফুলকো লুচি ও পরোটারা ঘুড়ি হয়ে ঘুরছে আকাশময়। ভোঁ-কাট্টা হচ্ছে মাঝে মধ্যে। ডানা মেলে পাখির মতো ওড়াউড়ি করছে জিভেগজা, পান্তুয়া আর জিলেপি। সবার গায়ে সাইনবোর্ডের মতো বড় বড় হরফে লেখা আমাকে খাও, আমি খুব মিষ্টি, আমাকে পান কর ইত্যাদি।

ওখানকার রাষ্ট্রপ্রধান হলেন তিতিরদিদি। কি অসামান্য সুন্দরী ও রূপবতী। যেমন তাঁর রূপের ছটা তেমনি তাঁর জমকালো পোশাকের বাহার। এমনিতে বেজায় রাশভারি হলেও

আমাকে দেখে কেন জানি না ফিক্ করে হেসে ফেলেছিলেন। আর অমনি এক অবাক কাণ্ড। তাঁর হাসির সঙ্গে ঝরতে লাগল রাশি রাশি মুক্তোদানা। সে কি দৃশ্য! বলে বোঝাতে পারব না। তিতিরদিদির পরেই ইল্লির স্থান। ইল্লির রূপের গুণের বর্ণনা দেয়া অন্ততঃ আমার সাধ্যের অতীত। তাছাড়া গোগোদাই বা কি মনে করবেন? ইল্লির প্রধান সহচরী কাল্লুর সঙ্গে গোগোদা কেন জানি না আমাকে এত বিশেষভাবে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন যে আমি লজ্জায় তার



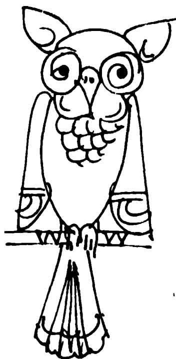
দিকে মুখ তুলেই তাকাতে পারিনি। ওখানে আরও যাদের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল তাদের মধ্যে বৈদেশিক মন্ত্রকের পুপলু, তথ্য ও বেতার দপ্তরের বাবুই, টেলিভিশন কেন্দ্রের শারি ও মৌরি, নৃত্য পটিয়সী মুন্না, সভাকবি ও ছড়াকার ঘুচাই, চারু ও কারু শিল্পী তাতাই, কুস্তিগীর ডোডো, সানাই ও বিউগল বাদক দুই যমজ ভাই বুদ্ধু-ভুতুম, বাঘা সাংবাদিক শার্দুল শাবক তিতাস, যন্ত্রবিদ্যাবিশারদ বাবু ভোজনপটু তকাই, বীরাঙ্গনা তৃণা, সুন্দরী শ্রেষ্ঠা নায়িকা রাজুমাসি, কোকিলকণ্ঠী সুগায়িকা দুই বোন রিঙ্কু ও টিঙ্কু, ক্রন্দন শিল্পী বুড়ি, বন্ধন শিল্পী রাবড়ি ও তুবরি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য অনেকেই ছিলেন। যাদের সকলের সঙ্গেই আমার দারুণ বন্ধুত্ব হয়েছিল। এবার উলুউলু দেশের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের বিবরণ দেয়া যাক। জনপ্রিয় দৈনিক কাগজে রয়েছে

তিনটি ঃ কাঁচাআম, ইলশেগুঁড়ি ও পাকাকলা।

দৈনন্দিন আহার্যের মধ্যে আচার চাটনি, পনির মোরব্বা, ফুচকা, আলু কাবলি ও আমসত্ত্বই প্রধান খাবার। বঁড়শি ফেললে চটপট উঠে আসে টকটকে লাল চিংড়ি ফ্রাই, হাতের পাতার মতো ইয়াব্বড় ভেটকির কাটলেট। অনুরোধ করলেই খুব সুন্দর রাঙা কুসুম সমেত জলপোচ ডিম পেড়ে দেয় মোরগেরা প্লেটের ওপর কিংবা সাজিয়ে দেবে ফাউল কারি বা আস্ত রোস্ট। তুলতুলে নধর খরগোশ, ধেড়ে ইঁদুর, ছুঁচো, মিনি বেড়ালের পিঠে চেপে ঘোরা যায় সারা শহর। বিরাট বিরাট মোষেরা হচ্ছে ডবল ডেকার। শজারু হচ্ছেন যাননিয়ন্ত্রণের কর্তাব্যক্তি। নানা কাজে তাকে সাহায্য করেন ময়না ও টিয়াপাখি। ইস্কুল-টিস্কুলের বালাই না থাকলেও আছে অনেক চিড়িয়াখানা, ফুলের বাগান, রঙিন টেলিভিশন কেন্দ্র, চড়ুইভাতির জায়গা আর দোকান ভর্তি কার্টুনের বই। টিনটিন, অরণ্যদেব, বাদুড়-মানব, জাদুর ম্যানড্রেক, মিকিমাউস, কার্লিকেওর স্মরণীয় কীর্তিকলাপ। সুকুমার রায়ের যাবতীয় রেখা ও লেখা, বিভূতিভূষণের আম আঁটির ভেঁপু, শিব্রাম চকরবরতীর গল্প, কমলকুমার মজুমদারের কাঠখোদাই, সত্যজিৎ রায়ের লিমেরিক, অমিতাভ চৌধুরীর ছড়রা সবাই গোগ্রাসে গেলে গ্যালনে গ্যালনে। পাগলা দাশু খুড়ো, সীতানাথ বন্দ্যো, বুড়ো আংলা, হর্ষবর্ধন গোবর্ধন, বিনি, ইতু, প্রোফেসর শঙ্কু, ফেলুদা, গুপী, বাঘা, যাদুকর বরফি, ঘনাদা, পদী পিসী এঁরা পৌরসভার সর্বজনমান্য বিশিষ্ট নাগরিক। নানার্থ বর্ণসংক্ষেপ অভিধান সরকারী উদ্যমে সম্পাদনা করেছেন প্রফুল্ল মূর্দ্ধন্য ণ। পূর্ণেন্দু পত্রীর গবেষণা-গ্রন্থ 'কি করে কলকাতা হল' গত বছরের রাষ্ট্রীয় 'পাতাবাহার' পুরস্কারের সম্মান মূল্য এক লক্ষ লজেঞ্চুষ। মতি নন্দীর 'স্ট্রাইকার' এবারকার সব চাইতে হিট ছবি। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ভয়ঙ্কর সুন্দর' সমস্ত হলগুলোতে একাদিক্রমে ৫২ সপ্তাহ ধরে হাউস ফুল চলে বিশ্ব রেকর্ড করেছে।

স্থানীয় ফুটবল লীগ পেয়েছে এবার বকপল্লী একাদশ। কোঁচ বক, গাই বক, লাল বক, খুন্তে বক, ওয়াক বক, কালো বক, কুঁড়ো বক, কানা বক প্রভৃতি দুর্ধর্ষ খেলোয়াড়েরা ছিল দলে। গোলদাতাদের শীর্ষস্থান অধিকার করেছে কানা বক। শীল্ডের ফাইনাল খেলা দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। সে কি উত্তেজনাপূর্ণ খেলা! সবাইকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল দু'টি বিদেশী দল। ছাঙ্গু হ্রদের 'অম্বুকুক্কুট বন্ধু একাদশ' ও লাডাকের 'টিট্টিভ প্রতিভা'। লম্বপুচ্ছ, জলপিপি, চক্রবাক, সোনাজঙ্ঘা, গগনভেরী, শরাল, ডাহুক পানকৌড়ি, গগনবেড়, হাড়গিলা, সারস, সলিলবায়সের মতো নামজাদা খেলোয়াড়রা ছিলেন দু দলে। পর পর দু দিন অতিরিক্ত সময় খেলার পরও ফলাফল অমীমাংসিতভাবে শেষ হবার মুহূর্তে 'অম্বুকুক্কুট বন্ধু একাদশের' ধুন্ধুমার সেন্টার ফরোয়াড আচমকা একটি দূরপাল্লার সটে গোল করে বসে। কিন্তু 'টিট্টিভ প্রতিভার' খেলোয়াড়রা গোলটির বৈধতা সম্পর্কে আপত্তি জানায়। টাকলামাকানের রেফারি টেকো কাক দুই প্রান্তিক মানুষ গোবির ন্যাড়া শকুন ও পামিরের খোঁড়া বাজের সঙ্গে এ নিয়ে সলাপরামর্শ করেছেন, এমন সময় দেখা গেল, অম্বুকুক্কুট দলের হাড়গিলা শীল্ডটি নিয়ে চোঁচাঁ দৌড় লাগিয়েছে। অমনি দারুণ হাতাহাতি আর হট্টগোলে সব ভণ্ডুল হয়ে গেল। এখন পর্যন্ত যতদূর জানি কর্তৃপক্ষ কোন সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে পৌছুতে পারেননি।

কখনো যদি উলুউলু দেশে যাবার জন্যে মনটা উড়ুউড়ু করে প্রথমেই কিন্তু যেতে হবে গোগোদার কাছে, আর গোগোদার কাছে যেতে হলে আসতে হবে আমার কাছে আর আমি কিন্তু এতক্ষণে নিশ্চয় বুঝতে পেরে গেছ এটা-ওটা-সেটা খেতে ভীষণ ভালবাসি। সুতরাং …



ফুটবল থেকে সাবধান

হাসান আজিজুল হক

ভল্টু বিষম খিদে নিয়ে সকালে বিছানায় উঠে বসল। অথচ যাকে বলে হেঁটে চলে বেড়াবার তাগৎ তা তার নেই। গতকাল বিকেলেই ব্যাপারটা ঘটে গেল। পল্টু ওদিক থেকে বলটা ধরে ফটুকে কাটিয়ে ভল্টুকে পাশ দিয়েছে। ভল্টুর সামনে কেউ নেই, গোল পর্যন্ত একদম ফাঁকা—খালি গোলকী রামু ভয়ে তলপেট চেপে দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক অমনি সময়ে—যাকে বলে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত কোথা থেকে লেদু এসে ধাঁই করে একটা চার্জ কষলে। ভল্টু পশ্চিম মুখে দাঁড়িয়ে ছিল, পায়ের পাতাও কাজেই পশ্চিম দিকেই ছিল। কচাৎ করে একটা আওয়াজ হলো, আর তার পায়ের পাতাটা সিম্পলি উত্তর দিকে ঘুরে গেল। তারপর আর ওর কিছুই মনে নেই, আবছা দেখলে রামু তলপেট ছেড়ে দিয়ে দুহাত তুলে নাচছে আর আকাট চাষা লেদু কিরকম অবাক গলায় বলছে, লাও বেপদ, পাটো গেল যি।'

এই অবস্থায় বাড়ি ঢোকার উপায় ছিল না। তাহলে আব্বার পিটুনীর চোটে বাকী ঠ্যাংটাও যেত। সেইজন্যে বেশ খানিকটা রাত্তির হলে ভল্টু লেদুর ঘাড়ে ভর দিয়ে চুপি চুপি নিজের ওপরের ঘরে উঠে গেছে। নিচে নামার কোন প্রশ্নই নেই, সেজন্যে ভল্টুকে গতরাতে একসের শুকনো চিড়ে চিবিয়েই কাটাতে হয়েছে। ওর এই ঘরে হাঁড়ি-কুড়ি খুঁজলে মাঝে মাঝে চিড়ে, চাল বা গুড়টুর একটু পাওয়া যায়। এই যা বাঁচোয়া। ছোট বোনটা একবার ডাকতে এসেছিল খেতে। ভল্টু আজ আর খাবে না। বারোমাসের পেত্যেকদিন বাড়িতে ভাত চিবোয় না ভল্টু।

এখন এই সক্কাল বেলায় ভল্টুর এমন ভয়ানক খিদে পেল যে সে পরিষ্কার বুঝতে পারল তার জ্বর হয়েছে। জ্বরটর হলেই খিদেয় সে অজ্ঞান হয়ে যায় এটা তার ছোটবেলাকার অভ্যেস। ডানপায়ের গোড়ালির কাছটায় টেনিস বলের মত ফুলে উঠেছে। 'জীবনে আর আমি ফুটবলের চেহারা দেখব না'—এই বলে ভল্টুর ডুকরে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করল, 'আর লেদু ব্যাটার পা'তো আর পা দিয়ে ভাঙা যাবে না—কাঠের উপর রেখে মুগুর দিয়ে থেঁতো না করলে উপায় নেই।'

ছোট বোনটা এই সময় আবার এলো। বেণী দুলিয়ে ঝংকার দিয়ে জিজ্ঞেস করল সে নিচে নামবে কিনা। আর ভন্টু মুহূর্তে কেমন উদাস হয়ে গেল, 'হায়রে, আমার কি এমন কেউ আছে যে দুটো খাবার এনে দেয় এখানে—আমার জন্যে একটু ভাবে এমন কেউ নেই এ বাড়িতে। এই যে আমি এখন এ্যালজেব্রা কষব—আর সে সব কি সাংঘাতিক সাংঘাতিক এ্যালজ্যেব্রা—ভাবলেও নাড়িভুঁড়ি বাইরে চলে আসে—সে সম্বন্ধে কারুর কি কোন ভাবনা চিন্তা আছে?' এই সব কথার পর ওর ছোট বোন বেচারা একটা আস্তো কাঁটালের অর্ধেকটা দিয়ে গেছে তাকে। তাই খেয়ে ভন্টু কোন রকমে প্রাণটা রক্ষা করেছে।

খাওয়া শেষ হতেই কিন্তু মনে পড়ল আজ এ্যাসিষ্ট্যান্ট হেড মাষ্টার ফটিকবাবুর ক্লাশ। এইবার ভন্টুর সত্যি সত্যিই জ্বর চলে এলো। সত্যি বলতে কি তার এত শীত করে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল যে সে মোটা একটা চাদর টেনে নিয়ে আগাগাড়ো মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লো। তখুনি নিচে থেকে আবার খড়মের আওয়াজ এলো। ভন্টু টান মেরে চাদর সরিয়ে দিয়ে মরিয়া হয়ে উঠে বসল। সে ভাবল এই রকম ঘাবড়ে গেলে বিপদ বেড়েই যাবে। —স্কুলেও যেতে হবে—এ্যালজেব্রার ব্যবস্থাও করতে হবে। গোড়ালীর কাছে এমন ব্যথা করছে যে ভন্টু উঠে দাঁড়াতে পারছিল না।

অতি কষ্টে নিচে নেমে এলো সে—উঠোনে আসতেই আব্বার সংগে মুখোমুখি, কোথায় যাচ্ছো?

ভন্টু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে এমন মারাত্মক একটা হাসি ছাড়লো যে আব্বার মাথা খারাপ হয়ে যাবার জোগাড়। তিনি অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে রইলেন আর তাঁকে দেখিয়ে ভন্টু হাত পা নাড়তে লাগলে এমনি ভাবে যেন তার পায়ে কিছুই হয়নি।—তেমনি হাসতে হাসতে বললে—'জী না, আমার কিছু হয়নি।

'জিজ্ঞেস করছি কোথায় যাচ্ছো।' ওর আব্বা গম্ভীর গলায় বললেন।

'এই যাঃ, দিচ্ছিলাম সব ভেস্তে'—ভাবলে ভন্টু—তারপর মুখ কাঁচুমাচু করে বললে, পল্টুর কাছে এ্যালজেব্রাটা একটু আনতে যাচ্ছি—মানে এ্যালজেব্রা আপনি কিনে দেননি তো। বোধহয় একটু চুপসে গেলেন ভন্টুর আব্বা। ভন্টু ওঁর চোখের ওপর দিয়ে মার্চ করতে করতে বেরিয়ে এলো। বাইরে এসেই তার মনে হোল গোড়ালীটার পাশে ঐ টেনিসবলটা দিয়ে তার জানটাই বেরিয়ে যাচ্ছে। সেটা চেপে ধরে 'মাই ফাদার' বলে ভন্টু বসে পড়লো।

এমন বিচ্ছিরি ব্যথা করতে লাগল যে ইচ্ছে হচ্ছিল পাটাকে কেটে বাদ দিয়ে দেয়। এইসময় লেদু কোথাথেকে দুটো গরু তাড়াতে তাড়াতে এসে হাজির।

'পা কি বুলে?' লেদু বললে।

'পা কি বলে দেখবি—এই দ্যাখ'—বলে ভন্টু বাঁ পা দিয়ে একটা লাথি ঝাড়ল লেদুর কোমর বরাবর। কিন্তু ঠিক সময়ে সরে গেছে লেদু। ফলে এই হলো ভন্টুর বাঁ-পাটাও জখম হলো। লেদুটা চাচা হলে কি হবে। আসলে প্রাণটা ওর বড্ড ভাল, বললে, 'আমার দোষটো কি বল্, আমি চার্জ্জ লোব না? চার্জ্জ না নিলে বলটো যি গোলে ঢুকিয়ে দিতিস।'

ভন্টু গম্ভীর হয়ে বললে, 'যাক' যা করেছিস করেছিস। বল খেলা গেলো আমার চিরদিনের জন্যে। পা-টা কেমন ফুলে উঠেছে দেখেছিস। তোর মন খারাপ করছে না আমার জন্যে?'

লেদু কাঁদো কাঁদো হয়ে বললে, 'তোর লেগে দুঃখুতে আমার জানটো বেরিয়ে যেচে র‍্যা।'

'তাহলে আমাকে একটু খুশী করা তোমার কর্তব্য কিনা?'

'লিচ্চয়'—লেদু বললে।

'তাই যদি ইচ্ছে তোমার, তাহলে বোর্ডিং-এ পল্টুর কাছে নিয়ে চল আমাকে—হাঁটার তো ক্ষমতা রাখিস নি।' লেদু ঘাড় নামিয়ে বললে, 'ওট্ তাইলে—ঘাড়ে করেই লিয়ে যাই তোকে।'



লেদুর চুল মুঠো করে ধরে ভল্টু মনের আনন্দে পল্টুর কাছে পৌছুল। সে তখন স্কুলের বারান্দায় বসে নস্যি টানছিল। সামনে এ্যালজেব্রাটা খোলা। ভল্টুকে ওমনি করে আসতে দেখে সে একেবারে থ হয়ে গেল, ফিসফিসিয়ে বললে, কাঁধ থেকে নামো গাড়োল কোথাকার। শীগগীর নামো।

'কেন' ? ভল্টু জিজ্ঞেস করল। লাইব্রেরীতে ফটিক স্যার বসে আছে। তোমাকে ওমনি অবস্থায় দেখলে আজ আর চারা নেই। এ্যালজেব্রা হয়েছে ?

'না'।

'তাহলে আজ তুই নির্ঘাৎ মারা যাচ্ছিস। তোকে আর রক্ষা করা গেল না।

ফটিকবাবুর নাম শুনেই ভল্টু তাড়াতাড়ি লেদুর ঘাড় থেকে নামার চেষ্টা করছিল। পায়ের ব্যথা নিয়ে লাফিয়ে নামারও উপায় নেই। আর লেদুটা এমনি হাঁদা যে যত তাকে নামিয়ে দিতে বলা হচ্ছে ততই সে স্কুলের খোলা মাঠে চক্কোর দিচ্ছে। 'কিগ ? কি বুলছ ?' লেদু এই কথা জিজ্ঞেস করে আর লাইব্রেরীর খোলা দরজার সামনে ভল্টুকে কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

'নেকু ? কি বলছি বুঝতে পারছে না ?' ভল্টু খিচিয়ে উঠলো।

'লাববে ?'

'কোথাকার চাষা বল্‌তো এটা। একশবার বলছি নামিয়ে দে, নামিয়ে দে। এতক্ষণ পরে বলে কিনা লাববে ? ওরে আস্তে আস্তে—ফেলে দিস না—মরে যাব, মরে যাব'—ভল্টু কঁকিয়ে উঠল আর সংগে সংগে হুড়মুড় করে লেদু তাকে নামিয়ে দিলে ঘাড় থেকে। 'ইষ্টুপিট, গাধা, উল্লুক'—মহাখাপ্পা হয়ে ভল্টু গালাগাল দিতে লাগল লেদুকে। 'জানিস পায়ে কি সাংঘাতিক দরদ হয়েছে তবু—'

'অয়, তা আমি কি করব—লাবিয়ে দিতে বুললে যে—' রাগে বাক্যহারা হয়ে ভল্টু লেদুর দিকে চেয়ে রইল খানিক। পল্টু সিরিক সিরিক করে একটা অদ্ভুত আওয়াজে হেসে বললে, 'যাক ছেড়েদে—অবোধ জীবতো—করে ফেলেছে। এখন এ্যালজেব্রার কি করবি বল। সকাল থেকে বসে বসে নস্যি টানছি, উপায় তো কিছু করা গেল না। তোদের আর কি ভাই, বাড়িতে থাকিস—স্কুলে না এলেই হোল। আমরা তো বোর্ডিং-এ থাকি, ক্লাশে না পেলে কান ধরে নিয়ে যাবে।

'ওই আনন্দেই থাক্' দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ভল্টু বললে, 'ফ্যামিলি লাইফের দুঃখুতো বুঝলি নে কোনদিন। বাড়িতে যদি জানতে পারে পায়ের এই দশা হয়েছে, মারের চোটে বাকি পা-টাও এ রকম করে দেবে—তারপর গরুর গাড়ি করে স্কুলে পৌঁছিয়ে দিয়ে বলে যাবে, হারামজাদাটাকে আচ্ছা করে কসুন তো।'

'ফটকে তাহলে তো আজ প্রাণে মারবে রে'—

পল্টু বললে, 'এ্যালজেব্রার এই অংকগুলোই আগের ক্লাশে কষতে বলেছিল। কেউ পারেনি বলে আবার দিয়েছে। আজ কষে নিয়ে না যেতে পারলে—'

'কি হবে চিন্তা করা যাচ্ছে না, ভল্টু পাদপূরণ করে দিলে।

'উপায় করি কি'—

'আমিও তো তাই ভাবছি।'

'ফুটবলটা বার করে নিয়ে আসব ? আমার ঘরেই থাকে।' ভল্টু জিজ্ঞেস করে।

'বল দিয়ে কি করবি বলদ কোথাকার ?'

'একটু খেলি।'

ভল্টু আর্তনাদ করে উঠল, 'পল্টা, তোর মনে এই ছিল—এমনি দাগা দিলি আমাকে ? জানিস এ জন্মের মতো বলখেলার দফা আমার রফা হয়ে গিয়েছে। পাখানা দেখেছিস। সেই তুই আবার

বলের কথা তুলিস এই সকাল বেলায় ?'

তোমার জন্যে দুঃখুতে বুকটো ফাটচে আমার। পা-টো ভেঙে ফ্যাললোম—লেদু আবার এসে ঘ্যানর ঘ্যানর শুরু করলে। 'তুই যাসনি এ্যখনো'—ভল্টু অবাক হয়ে গেল ওকে দেখে।

'বল নিয়ে এসে প্র্যাকটিশ করি একটু—বিকেলেই তো খেলা আজ সরফরাজপুরের সংগে'—পল্টু আর জিজ্ঞেস করার অপেক্ষা না রেখে ঘরে গিয়ে বল নিয়ে এলো। দেখেই লেদু লুংগী গুটিয়ে মালকোঁচা মারলে, 'গরু মাটে লিয়ে যাবার বেলা হয় নাই এখনও—দুবার পিটিয়ে লি—লাও, মারো দিকিনি'—বলে লেদু রেডি হয়ে গেল। তখন পল্টু ওর কানে কানে কি বললে আর ভল্টু দেখল গাধাটা মাথা নাড়ছে ঘনঘন পল্টুর কথায়।

প্রথম বলটা ধাই করে স্কুলের দেওয়ালে লেগে ফিরে এলো আর সংগে সংগে বলটাকে পাতিয়ে নিয়ে লেদু এমন একটা ভয়ংকর কিক্ লাগালে যে লাইব্রেরী রুমের দক্ষিণ-পূর্ব কোণের একটা ইট খসে পড়ল দুম করে।

এ্যাসিষ্ট্যান্ট হেডমাষ্টার ফটিকবাবু লাইব্রেরীর ভেতর থেকে হাঁক পাড়লেন, 'এই সকালে বল বের করেছে কে রে ?' বয়স হয়েছে তো মাষ্টার মশাই-এর—এই জন্যে গলাটা বেশ জমকালো হলেও কেমন কাঁপা কাঁপা, আবার টেনে টেনে বললেন, বলি বল বার করলে কে ?'

ভল্টু বসে বসে দেখছিল ফটিকবাবু বিবাট ভুঁড়ি, কাপড় ইত্যাদি সামলে বহু কষ্টে কাজ ফেলে চেয়ার ছেড়ে উঠে আসবার চেষ্টা করছেন। তক্ষুনি পল্টু দরজার কাছে গিয়ে ঘরে উঁকি দিয়ে বললে, 'মাষ্টার মশাই, আমরা।' বলতেই বিদঘুটে গলায় আকাশ ফাটিয়ে ভেংচিয়ে উঠলেন ফটিকবাবু, 'এ্যাঃ আমরা! দাঁত বের করা কোথাকার। বলতে লজ্জা হচ্ছে না ? বেকুফ, বলদ, গোময়।' 'সামান্য একটু প্র্যাকটিশ করছি মাষ্টার মশাই'—পল্টু একেবারে বিনয়ের অবতার। 'চোপ'—আবার বোমা ফাটার আওয়াজ হোল—'সক্কাল বেলায় পড়াশোনার ইস্তফা দিয়ে প্র্যাকটিস হচ্ছে! এ্যালজেব্রা কষেছিস ?'

'এইমাত্র শেষ করলাম। বিকেলে ম্যাচ তো মাষ্টার মশাই—তাই একটু পায়ের গাঁটগুলো ছাড়িয়ে নিচ্ছি।'

'হতভাগার কথা কি—গাঁট ছাড়িয়ে নিচ্ছি ক্লাশে আজ অংক না হলে তোমার গাঁট আমিই ছাড়িয়ে দেব। যা বলফল নিয়ে পালা।'

এই সময় দুম করে একটা বল এসে লাগল দরজায়। লেদুর মার। ইতিমধ্যেই আরও কয়েকজন এসে জুটেছে। 'এ্যই খবরদার, লাইব্রেরী ঘরে একটা বল এসে লাগলে ছাল ছাড়িয়ে নেব।' বলে ফটিকবাবু খালি গায়ে চেয়ারে গিয়ে বসলেন—পেতলের বিরাট একটা কলসীর মতো তাঁর ভুঁড়ি ঠিক যেন বাতাসে ভেসে রইল।

'টেক এম' পল্টু ফিরে এসে বললে লেদুকে।

ইংরেজী হলেও লেদু বুঝলে, বললে, 'এ্যাম যে হচে না—আমি কি করব ?'

'আবার মার—ভুঁড়িটাতো বাতাসে ভাসছে, দেখতে পাচ্ছো না নাকি—তোমাকে ম্যাচে খেলতে দেওয়া হবে না—এই সামান্য এইম নাই যার সে গোল করবে কিভাবে ?' ধাঁই—বল গিয়ে লাগল লাইব্রেরী ঢোকার সিঁড়িতে। ফটিকবাবুর ঘুম জড়ানো গলা শোনা গেল, 'ওরে আস্তে মার,—শেষে একটা সব্বোনাশ হয়ে যাবে।' ধাঁই, ঝন্ঝন্ ঝন্ঝন্—স্কুলের ঘন্টা উলটিয়ে পড়ল—আর বদনাটা উপুড় হয়ে গিয়ে সমস্ত পানি লাইব্রেরী ঘরের মেঝেতে গড়িয়ে চল্ল। 'এইযে বদমাস, শিয়ালমারা মামদোভূতের দল, বলি, একটু আস্তে আস্তে বুঝি প্র্যাকটিশ হয়না ?

লেদু এখন বলটা পাতিয়ে নিয়েছে। লুংগীটা বেশ ভাল করে কষে বেঁধে 'এ্যাঁক' করে একটা আওয়াজ করে কিক্ কষালে। বলটা মাটি ছেড়ে উঠল, ভল্টু চোখ বড় বড় করে চেয়ে আছে—পল্টু, ছদাই, ভ্যাবলা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে—বলটা বাঁদিকের দরজা দিয়ে সাঁৎ করে ঢুকে ডানদিকে ঘুরে গেল—তারপর পাখির মতো নিচে নেমে এসে—বিশ্বাস করা যাবে কি সে কথা? ফটিকবাবুর ভুঁড়িতে গিয়ে লাগল। টেবিলের ওপর গতকালকের নেভানো হারিকেনটা উল্‌টে ফেলে দিয়ে ঠিক যেন মনের উল্লাসে লাফাতে লাফাতে আবার বাইরে বেরিয়ে এলো।

ভুম—গম্ভীর একটা আওয়াজ বেরুল। ভল্টু ততক্ষণে চোখ খুলে দেখে ফটিকবাবু চেয়ার শুদ্ধু উল্‌টে পড়ে আছেন। আশ্চর্য ব্যাপার—উপুড় হয়ে গেছেন তিনি—নড়ন্ চড়ন কিছু নেই। 'এযে নড়েনা যেরে—ভল্টু প্রায় কেঁদে ফেলল। কিন্তু ওর কথায় কান না দিয়ে পল্টু লেদুকে বললে, 'কেটে পড় এক্ষুনি—তল্লাটে যেন পাওয়া যায়না তোকে—যা ভাগ।' লেদু যেতে যেতে শুধু বললে, 'ভুঁড়িটো জব্বর বটে বাপু—কি রকম আওয়াজ হোল শুনলে।

ফটিকবাবু চুপচাপ থাকলেন মিনিট খানেক। ভল্টু পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে চেয়ারটা তুলতে গিয়ে দেখল কপালটা ফুলে উঠেছে ওঁর। 'মাষ্টার মশাই খুব কি লেগেছে আপনার?' পল্টু যেন মর্মাহত হয়ে জিজ্ঞেস করল। আর বললে বিশ্বাস করবে না কেউ, দারুণ একটা বিস্ফোরণ ঘটে গেল। উনি বোধ হয় বললেন, 'চোপ'—কিন্তু দাঁত নেইতো, শোনাল 'হাপ'—তারপরেই আর কথা নেই ফটিকবাবু উঠে লাইব্রেরী ঘরের মেঝে দাঁড়িয়ে দুহাত তুলে ধেই ধেই করে নাচতে শুরু করলেন, 'আজ সব কটাকে রাস্টিকিট করব—যদি না করি আমার নাম ফটিক চক্রবর্তী নয়, আমার বাপের নাম তারিণীচরণ চক্রবর্তী নয়, আমার ঠাকুর্দার নাম হিরণ্যকশিপু চক্রবর্তী নয়। নিয়ায় কাগজ—যা হারামজাদা শীগগীর কাগজ কলম নিয়ায়।'

'কাগজ কলম টেবিলেই রয়েছে মাষ্টার মশাই।' পল্টু বিনীতভাবে বলল।

'হাপ—আবার মুখের ওপর কথা, যা বলছি কর—নিয়ায় কাগজ কলম।'

'টেবিলের কাগজ কলম দেব?'

'কক্ষণও না—ঘর থেকে নিয়ায়।'

অগত্যা পল্টু কাগজ কলম আনতে গেল। ফটিকবাবু গর্জনে পাড়া কাঁপাতে লাগলেন, 'পঞ্চান্ন বছর বয়স হোল আমার—নিজের পরিবার পর্যন্ত আমাকে ঘাঁটাতে সাহস করেনা এই ভুঁড়ির জন্যে—এইজন্যে গোঁফ পর্যন্ত রাখিনি। হাটের লোক রাস্তা করে দিয়েছে এই ভুঁড়ি দেখে—আর তুচ্ছ কোথাকার কটা ছোঁড়া কিনা সেখানে তুচ্ছু গোচর্ম নির্মিত বর্তুল দিয়ে আমাকে আঘাত করে?'

পল্টু কাগজ কলম নিয়ে এলো। ফটিকবাবু নিজের ঘরে এসে তক্তপোষের ওপর জাঁকিয়ে বসলেন, 'ইদিকে আয় সব—লাইন দিয়ে দাঁড়া।' পল্টু ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে এগিয়ে এলো। 'কাম অন্, হোয়াট ইজ ইওর নেম?'—ফটিকবাবু পল্টুকে জিজ্ঞেস করলেন। পল্টু অবাক হয়ে গেল, 'স্যার, আমার নাম জানেন না আপনি, আমি পল্টু।'

'জানি তা কি হয়েছে? যা জিজ্ঞেস করছি তার জবাব দে—ইওর নেম?'—পল্টু'

'ইয়েস'—ফটিকবাবু খসখস করে পল্টুর নাম লিখলেন।

'হাউ মেনি হিট্‌স্?'

'কি বলছেন ?'

কবার বল মেরেছিস ?'

'দুবার।'

'মিথ্যে কথা। সত্যি বল নইলে—'

'চারবার।'

'ফোর হিট্স'—ফটিকবাবু আপন মনে কথাটা বলে লিখে রাখলেন। এমনি করে সবার রিপোর্ট নেওয়া হোল। বোর্ডিং এর রাঁধুনী এই সময় এসে বলে ফেললে, 'যাওতো বাপু সব এখন—স্যার, আজ চাল নেব ক'সের ?' আর যাবে কোথায়—বোমার মতো ফেটে পড়লেন ফটিকবাবু, 'তুমি কোন লাট্—যাও যাও ফলাচ্ছ—তোমার চাকরী নেই আজ থেকে। যাও বেরোও।'

এরপর ভল্টুর ডাক পড়ল।

'নেম ?'—ফট্টিকবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

'ভল্টু।'

'ফাদার্স নেম ?'

ভল্টু মিউমিউ করে তার আব্বার নাম বলল।

'সাবু খেয়েছ।'

'কি বলছেন মাষ্টার মশাই ?'

'ওতো ওরকম করবেই মাষ্টার মশাই। আসলে আপনার ভুঁড়ির ওপর বলটা ওই ভল্টুই মেরেছে তো।' পল্টু বলল।

'কি রকম ?'

'ওর পাটা একবার দেখুন না। এমন মার মেরেছে যে গোড়ালী একেবারে ফুলে ঢোল হয়ে গেছে। আহা বড্ড লেগেছে বেচারার।'

কথা শুনে ফটিকবাবু হাঁক ছাড়লেন, ইদিকে আয়।

ভল্টু অবাক হয়ে পল্টুর দিকে চাইতে গিয়ে দেখে সে তখন ওপরের দিকে চেয়ে কড়িকাঠ গুন্ছে। যেন কোন কিছুই সে জানে না।

'পল্টা'—বলে ভল্টু একটা গগনবিদারী চীৎকার করতে যাচ্ছিল, ফটিকবাবু ওর কানটা ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে ওকে সামনে দাঁড় করিয়ে দিলেন।

'হতভাগা—'

'মাষ্টার মশাই আমি গতকাল—'

'শাট আপ—কথা বললে খুন করব তোকে—গুণ্ডা, ডাকাত, বদমাস—'

'আমি গতকাল মাঠে ফুটবল খেলছিলাম, এই সময় হঠাৎ—'

'চোপ রও—উল্লুক পাজী।'

'হঠাৎ লেদু এসে এমন জোরে—'

'নড়তে নাড়ে বন্দুক ঘাড়ে। সেই তখন থেকে বলছি সকালবেলা বল খেলে কাজ নেই—কানে যাচ্ছে না তোমাদের।'

'এমন জোরে চার্জ কষলে যে'—ভল্টু তার গল্প বলেই যাচ্ছে।

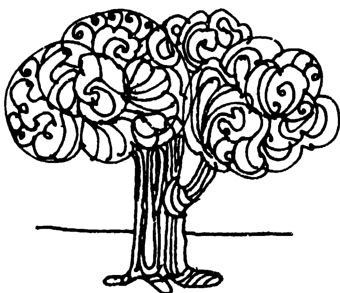
'পায়ের অবস্থা দেখছিস ভল্লুক কোথাকার—গ্যাংগ্রিন হয়ে মারা যাবি যে।'

'আমি এখানে একটা বলও মারিনি স্যার।'

'একটি চড়ে তোমার দাঁতকপাটি লাগিয়ে দেব—বলছি চুপ করতে। এই তোরা সব ভাগ এখান থেকে। স্কুলের সময় সবাই আসবি। সবকটাকে রাষ্টিকিট করতে হবে।' হঠাৎ পল্টুর দিকে নজর পড়তেই খিচিয়ে উঠলেন ফটিকবাবু, 'তুমি শয়তান ভেবেছ ক্লাশ নেবনা আজ? ওরে ওতে আমার কিছু হয়না। আমার নাম কি জানিস তো? দেখে আয়গে ইসলামপুর স্কুলের টিমে আমার নাম লেখা আছে সোনার কালিতে। আজ সারাদিন শুধু এ্যালজেব্রার ক্লাশ হবে।'

তারপর ফটিকবাবু তাঁর হোমিওপ্যাথির বাক্স খুলে একটা ঔষুধ বের করে ভল্টুকে খাইয়ে দিয়ে বললেন, যা বাড়ি যা, দুদিন চুপ করে বাড়িতে বসে থাকবি—স্কুলে আসবি না। পথে বেরুবি না—তোর বাবাকে আমি বলে দেব। হতভাগা পা-টার দশা করেছে কি—চিরদিনের মতো খেলাধূলা যে যাবে—যা ভাগ। নুনের পুটুলী করে রাত্রে সেঁক দিবি আর এই ঔষধ আজ সন্ধ্যায় এক পুরিয়া, কাল সকালে আর সন্ধ্যেয় এক এক পুরিয়া করে খাবি। যতসব শেয়ালমারা নিয়ে হয়েছে আমার কারবার। যা যা পালা।' এই বলে হাঁক দিলেন তিনি, 'পল্টা, তামাক সাজ।'





তাঁবুর জগৎ

রাহাত খান

রাজু কোথায় এসেছে বুঝতে পারলো না। বোধহয় আকাশের কাছাকাছি কোন একটি জায়গা। চারদিকে নীল রঙের জোছনা। এখানে ওখানে শাদা হাসির মতো মেঘ। একটা লাল রঙের পথ নীচ থেকে একটু একে বেঁকে উপরে উঠে গেছে। কে যেন খুব কাছাকাছি থেকে মৃদু স্বরে বললোঃ উপরে উঠে যাও রাজু। আমি তোমার সাথে আছি।

ঃ তুমি কে কথা বল্‌ছো ?

রাজু অবাক হয়ে প্রশ্ন করে। চারপাশে তাকায়। বলেঃ কে তুমি ?

অদৃশ্য লোকটা বললোঃ আমাকে চেনো না ? আমি মানুষকে স্বপ্ন দেখাই। মানুষকে স্বপ্নের দিকে নিয়ে যাই।

কথাগুলি শুনে রাজু আনন্দ অনুভব করলো। বললোঃ নাকি ? তা তোমার বয়েস কতো ? তুমি কি আমার মতো ছোট ছেলে ?

অদৃশ্য লোকটা আস্তে আস্তে যেন ঘুমের ভেতর থেকে বললোঃ আমার কোন বয়েস নেই। সবুজ রঙের কি কোন বয়েস থাকে ? আমি তোমার বন্ধু। যারা তোমার মতো স্বপ্ন দেখে আমি তাদের সবারই বন্ধু।

আমি তাহলে স্বপ্নের দিকে যাচ্ছি। রাজু ভাবলো। একবার তাকালো চারপাশে। নীল রঙের জোছনা ঝরছে, শীতের সকালে যেমন উদোম কুয়াশা ঝরে। ষ্টিমারের সার্চলাইটের মতো তীব্র আরক্তিম জ্বলছে সুমুখের পথটা। রাজু হাঁটাতে লাগলো। লাল রঙের ভেতর ডুবে গেল। কোথায় যেন টুপটুপ তারা ঝরছে। আস্তে পায়ে নদী বইছে। এমনি শব্দ। এমনি কলতান।

যেতে যেতে পথ আর ফুরোয় না। শাদা শাদা মেঘগুলি এখন পেছনে। লাল রঙের পথটার দু'পাশে নীলরঙের কুয়াশা বৃষ্টি। আমি একবার ড্রয়িং এর খাতায় আকাশ এঁকেছিলাম। রাজুর মনে পড়লো। আমার রঙের বাক্সের নীলের চেয়েও এই আকাশ অনেক বেশী গভীর নীল। তা

হবে। আমি তো এখন ঘুমের দেশের স্বপ্নের ভেতর আছি। যে স্বপ্ন দেখায় মানুষকে তার সঙ্গে আছি। রাজু নিচের দিকে তাকালো। বিকেল বেলা পশ্চিমের আকাশ যেমন হয়ে যায় আমি সেরকম রক্তিম হয়ে গেছি। লাল। সিঁদুরের মতো। আগুনের মতো।

তারপর চোখ ফেরালো আর অবাক হয়ে গেল রাজু। নীল রঙের জোছনা কোথাও নেই। এ আর একটা জায়গা। আর এক ঠাঁই সামনে এক বিশাল মাঠ। মাঠের চার পাশে তাঁবু। তাঁবুর পেছনে ধূসর রঙের মরাটে পাহাড়।

অদৃশ্য লোকটা বললোঃ জায়গাটা চিন্‌তে পারছ রাজু ?

ঃ না।

ঃ অনুমান করতে পার ?

ঃ তাও পারি না। এটা কি কোন সার্কাস পার্টির তাঁবু ?

অদৃশ্য লোকটার হাসি শোনা গেল। বললোঃ তুমি সোজা তাঁবুগুলির দিকে হেঁটে চলে যাও। এক একটা তাঁবুতে বসেছে এক এক রকমের দুনিয়া। সার্কাস পার্টিও বলতে পারো। বেশ মজার সার্কাস। ঘুরে ফিরে তুমি তাঁবুগুলি দেখো। বিদেশে বেড়াতে যায় না মানুষ ? ভ্রমণ করতে যায় না ? মনে করো তুমি ভ্রমণ করছ। তুমি সোজা চলে যাও।

রাজু চেঁচিয়ে বলল ঃ তা না হয় যাচ্ছি। কিন্তু এখানে ঢুকতে টিকিট লাগবে না ? টিকিট ছাড়া যদি ঢুকতে না দেয় ?

অদৃশ্য বন্ধু বললোঃ তোমার ইচ্ছাই তোমার টিকিট। ভুলে যেয়ো না এটা স্বপ্নের জগৎ।

ঃ না ভুলিনি। রাজু বললোঃ কিন্তু স্বপ্ন কি সবই ভালো ? ধরো দুঃস্বপ্নের কথা দুঃস্বপ্ন দেখে মানুষ কষ্ট পায়। এখানে এসব কষ্টের ব্যাপার-ট্যাপার নেই তো ?

ঃ থাকবে না কেন ? এখানে সব আছে। এখানকার সবকিছু তোমার ইচ্ছার সাথে ভাঙ্‌ছে, গড়ছে। এখানে তুমি যা খুশী করতে পারো। যা খুশী দেখতে পারো। ভেবো না রাজু। আমি তোমাকে দুটো সুন্দর, সঠিক তাজা চোখ দিয়ে দিচ্ছি।

ঃ চোখ ?

ঃ হ্যাঁ গো।

লোকটি হাসলোঃ আমি যে ফেরীওয়ালা। যারা ঠিক জিনিসটা ঠিক ঠিক দেখতে চায় আমি তাদের কাছে চোখ বিক্রি করি।

রাজু বললোঃ আচ্ছা আমি যাচ্ছি। তুমি কিন্তু আমাকে ফেলে চলে যেয়ো না।

রাজু হাঁটতে লাগলো। হাঁটতে হাঁটতে একটা গোলাকার তাঁবুর ভেতর ঢুকলো। ঢুকেই অবাক হয়ে গেল। অপরূপ এক দুনিয়া ভেতরে। এখানে ওখানে উদোম প্রাচীন রাজপ্রাসাদ, ধুলোর পাহাড়, শেওলা জমা দীঘি, উল্টানো সিংহাসন, স্তব্ধ মিনার, নিশ্চল অশ্ব মূর্তি, জংধরা তলোয়ার আর অগণিত মনুষ্যাকৃতি পুতুল। সবকিছুর উপর লেগেছে ঘুম আর ধুলোর ছাপ। কোথাও এতটুকু শব্দ নেই, এতটুকু জীবন নেই।

মনুষ্যাকৃতি একটা পুতুলের দিকে এগিয়ে গেল রাজু। ভাবলো আহা যদি প্রাণ থাক্‌তো এই পুতুলটার, যদি কথা বলতো !

ভাবলো, আর আশ্চর্য, পুতুলের ঘোলাটে মৃত চোখজোড়া জীবন্ত, চঞ্চল হয়ে ফুটে উঠলো। রক্তের দীপ্তি এলো মুখে। জীবন এলো শরীরের সর্বত্র। গম্ভীর অথচ মৃদু মন্দ্রিত গলায় পুতুলটা বললোঃ আমার নাম আখ্‌তানুন। যেখানে তুমি এসেছ এটা ইতিহাসের রাজ্য। এখানে যাদের দেখ্‌ছ সবাই আমরা নিজেদের কীর্তির জন্য বেঁচে আছি।

রাজু বললো ঃ ইতিহাসের রাজ্য ? এখানে তাহলে নিশ্চয়ই রাজা সলোমনকে দেখতে পাব ? ফেরাউন, দারিয়ূস, সীজার,আলেকজাণ্ডার, নেপোলিয়নকে দেখতে পাব ?

হ্যাঁ দেখতে পাবে।

ঃ বাঃ কি মজা! আমি সবার সাথে গল্প করবো জানো আখতানুন, ইতিহাস আমার খুব প্রিয় বিষয়। ভালকথা তুমি ইতিহাসে কোন্ কীর্তির জন্যে বেঁচে আছো ?

আখতানুন বললো ঃ নীল নদী পাড়ি দেবার জন্য আমি নৌকা তৈরী করেছিলাম।



সহৃদয় ব্যবহারের জন্য আখতানুনকে ধন্যবাদ জানালো রাজু। ছাতের উপর থেকে একটুকরো ঝুলন্ত অন্ধকার দুলতে শুরু করলো এই সময়। দূরে কোথাও ঘন্টা ধ্বনি উঠতে লাগলো সুসময় ফুরিয়ে যাওয়ার মতো বিষাদে, কান্নায়। দেখতে দেখতে আলো নিভে যাওয়ার

মতো জীবন চলে গেল আখতানুনের চোখ মুখ থেকে, শরীর থেকে। আবার নিশ্চল নির্বাক পুতুল হয়ে গেল আখতানুন।

রাজু সামনে এগোলো। কিছুদূর এগিয়ে একটা বিশাল দেয়াল-চিত্র দেখতে পেল সে। যুদ্ধের দৃশ্য। দুই দল মানুষ খোলা তলোয়ার হাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে পরস্পরের উপর। কেউ রক্তাক্ত অবস্থায় মৃত ঘোড়ার পাশে শুয়ে যন্ত্রণায় কাৎরাচ্ছে। লোহার শিরস্ত্রাণ পরা একজন যুবা পুরুষ একটু দূরে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ দেখছে আর হাত তুলে ভয়ঙ্কর ভঙ্গিতে সৈন্যদের এগিয়ে যাওয়ার আদেশ দিচ্ছে।

এ আবার কি? রাজু ভাবলো আর চোখ তুলে তাকিয়ে দেখলো একজন কঙ্কালসার বৃদ্ধ দেয়াল চিত্রটি দেখছেন মনযোগের সাথে। বৃদ্ধের কাঁধে বসে আছে ঘোরতর কালো রঙের লাল চোখো একটা বাজ পাখী। মাথার উপর নিঃশব্দে উড়ছে কতগুলি ভয়ঙ্কর শকুন।

ঃ কে আপনি, এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করে রাজু। বলেঃ দেয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে কি দেখছেন আপনি?

বৃদ্ধ ফিরে তাকাল ধীরে ধীরে। অঙ্গারের মতো কালো চোখ তুলে গভীর ব্যথিত কণ্ঠে বললোঃ নিজেকে দেখছি। আমার পরিচয় জিজ্ঞেস করছিলে না? আমি এক অনুতপ্ত, মৃত সৈনিক। হাজার বছর ধরে এখানে দাঁড়িয়ে কৃতকর্মের ফল ভোগ করছি আমি। শকুনিগুলি আমার সুন্দর চিন্তাগুলি খেয়ে ফেলেছে। বাজপাখীটা বুকের ভেতর মুখ ডুবিয়ে তছনছ করছে আমার সুখ ও শান্তি।

রাজু চেঁচিয়ে বললোঃ তাড়িয়ে দিন না ওগুলো ঢিল মেরে। দাঁড়ান, আমিই তাড়াচ্ছি।

বৃদ্ধ বললোঃ না ভাই, ওগুলো তাড়ানো যায় না। চড়া দাম দিয়ে ওগুলো আমিই কিনেছিলাম। ওগুলো আমাকে ছেড়ে যাবে না। তুমি কি ঢিল মেরে তোমার চোখ দুটি তাড়িয়ে দিতে পারো?

ঃ বুঝলাম না, রাজু চেঁচিয়ে বলেঃ আপনার কথা ঠিক বুঝলাম না। দয়া করে বুঝিয়ে বলুন।

বৃদ্ধ বললোঃ শকুনগুলি আমার লোভ। বাজপাখীটা আমার ক্রোধ। আমি এক ইতিহাস বিখ্যাত খুনী। আমার লোভ আর ক্রোধ মানুষের বহু ক্ষতি করেছে। আমি এখন অনুতপ্ত। কিন্তু এখন আমার অনুতাপের কোন মূল্য নেই।

রাজু বলেঃ ইতিহাসের লোক আপনি? কিন্তু কই, আপনাকে তো চিনতে পারলাম না।

বৃদ্ধ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেঃ ইতিহাসে আমার নাম আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট।

আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট। রাজু ভীষণ অবাক হয়ে যায়! তার বিশ্বাসই হয় না এই বৃদ্ধ আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট যার মাথায় ছিল একরাশ কোঁকড়ানো সোনালী চুল। খাড়া নাক আর কঠিন চিবুকের শক্তিশালী পুরুষ আলেকজাণ্ডারের এ যেন একটা ঠাট্টার ছবি।

রাজু নিজেকে সামলে নিয়ে বলেঃ আপনি আমার সালাম নিন সম্রাট। আমি আপনার একজন ভক্ত। আপনার বীরত্ব আর দিগ্বিজয়ের কাহিনী নিয়ে পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ পৃষ্ঠার বই লেখা হয়েছে। বিস্ময়কর আপনার শক্তি ও সাহস। মেসিডোন থেকে পাকিস্তানের পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল আপনার রাজ্য। ইতিহাসে আপনি অদ্বিতীয় সম্রাট। আমাদের ক্লাস এইটের বার্ষিক পরীক্ষায় আপনার উপর এবার একটা প্রশ্ন আসবেই। উত্তরগুলি আমার ঝাড়া মুখস্থ। শুনবেন?

ঃ ওঃ তাই নাকি? বৃদ্ধ করুণ ব্যথিত সুরে হাসলো। বললোঃ আমাদের আমলে আমরা রাজা-রাজরারা নিজেদের লোক দিয়ে ইতিহাস লেখাতাম। এই নিয়ম পৃথিবীতে এখনো চলছে তাহলে? আশ্চর্য! আমি ভেবেছিলাম ইতিমধ্যে দুনিয়ার মানুষ আমাদের চালাকী ধরে ফেলেছে।

ব্যাপারটা কি জানো রাজু? নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি টাকা-পয়সা বাহুবল-লোকবল বাড়াবার জন্যেই আমি একটার পর একটা দেশ জয় করেছি, হাজার হাজার লাখ লাখ মানুষ খুন করেছি, শহর গ্রাম লুঠ করেছি। কিন্তু পাছে সাধারণ মানুষ আমাকে ঘৃণা করে এই ভয়ে নিজের লোক দিয়ে আমি নিজের ইতিহাস লিখিয়েছি। কায়দা করে ইতিহাস এমনভাবে লেখা হয়েছে যাতে খুন কে মনে হয় বীরত্ব, লোভকে মনে হয় উচ্চাশা। রাজু আমরা রাজা বাদশার দল নিজেদের স্বার্থেই আইন করতাম, কানুন বানাতাম। কিন্তু ইতিহাসে এইসব মুষ্টিমেয়দের আইন টিকবে না! বর্ষার পাহাড়ী নদী দেখেছ রাজু? ইতিহাস হলো সেইরকম একটা বেগবান নদী। আজ হোক কাল হোক ইতিহাসের তীব্র স্রোতে যুগের ময়লা আবর্জনা ভেসে যাবেই।

বৃদ্ধ কথাগুলি বলে অল্প অল্প হাঁপাতে লাগলো। বললোঃ ভেল্কিবাজী আর জুলুমবাজী টিকবে না রাজু। বহু মানুষের স্বার্থ, সুখ ও সুবিধার উপর একজন বা কয়েকজন নায়কের শাসন আর মানুষ মানবে না। শীঘ্রই সময় আসছে যখন মানুষ নিজের পাওনা নিজেই আদায় করে নেবে।

রাজু তাকিয়ে রইলো বৃদ্ধ আলেকজাণ্ডারের দিকে। কঙ্কালসার বৃদ্ধের কাঁধে বসে আছে একটা ভয়ঙ্কর বাজ পাখী। মাথার উপর ঘুরপাক খাচ্ছে কতগুলি শকুন।

ছাতের উপর থেকে আবার দুলতে লাগলো ঝুলন্ত অন্ধকারের টুকরোটা। মৃদু গম্ভীর নিনাদে বাজতে লাগলো সময়টা বেদনাময় করে দিয়ে ঘণ্টা-ধ্বনি। দেয়াল-চিত্রের কাছে দাঁড়ানো বৃদ্ধ আলেকজাণ্ডারের ছবিটা দেখতে দেখতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

লুপ্ত হয়ে গেছে ইতিহাসের উদাস প্রাচীন রাজ্য। রাজু নিজেকে দেখতে পেল একটা বিচিত্র জায়গায়।

এবার আমি কোথায় যাই। রাজু ভাবলো আর মনের নিকট থেকে সেই অদৃশ্য বন্ধু বললো এবারে তুমি কালো রঙের তাঁবুর ভেতরে যাও : রাজু বললো আচ্ছা যাচ্ছি, কিন্তু তুমি আমার সঙ্গেই থেকো। আর কোথাও যেয়ো না। অদৃশ্য লোকটি মিষ্টি হেসে বললো, আমি তোমার চোখের ভেতর থাকি। স্বপ্ন দেখিয়ে বেড়াই। তোমাকে ফেলে আমি কোথায় যাবো?

রাজু ভরসা পেয়ে কালো রঙের তাঁবু'র ভেতর ঢুকলো। বিচিত্র এক দেশ। সীসার মতো মিহি কালো রঙের ধোঁয়া উঠছে চারদিক থেকে। সামনে এক নদীর চরা। কতগুলি পালকহীন ঈগল বসে বসে ঝিমুচ্ছে। বাতাসে তাদের পালকগুলি উড়ছে। শোঁ শোঁ আওয়াজ। এখানে ওখানে পত্রহীন বৃক্ষ। নদীটা ভাঙ্গা, শুকনো। ঘরগুলির দেয়াল নেই, রাজু অবাক হয়ে ঘুরে ঘুরে সব দেখলো। তারপর ঈগলগুলির কাছে গেল। ঈগলগুলি রাজুকে একবার তাকিয়ে দেখলো মাত্র। রাজু বললোঃ তোমাদের গায়ে পালক নেই কেন? ঝিমোচ্ছ কেন তোমরা? তোমাদের কি হয়েছে।

একটা বুড়ো ঈগল হাঁপাতে হাঁপাতে বললোঃ আমাদের পালক দিয়ে টুপি বানানো হয়। বিদেশে এই সোনালী পালকের খুব দাম। আমাদের গা থেকে পালক খসানো হচ্ছে বিদেশের বাণিজ্যের জন্য।

ঃ কিন্তু এভাবে গা থেকে পালক খসিয়ে নিলে তোমরা বাঁচবে? রাজু ব্যথিত হয়ে প্রশ্ন করে।

ঃ নিশ্চয়ই বাঁচবো। বেঁচে তো আছিই। দিব্যি টেনে টেনে নিঃশ্বাস নিতে পারছি।

বুড়ো ঈগল জবাব দেয়। বলেঃ তুমি কে হে বাপু ভেজা ভেজা কথা বলছো? আমাদের পালক নিয়ে আমরা যা খুশী করবো। যাও তুমি এখান থেকে, ভাগো ··· ,

ঃ আচ্ছা আমি যাচ্ছি।

রাজু বললোঃ কিন্তু ঈগল দাদু ..... টেনে টুনে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচার নামই বাঁচা নয়। কথাটা মনে রেখো।

ঃ আরে যা, যা, ফক্কর কাঁহেকা ....

বুড়ো ঈগল রেগে যায়ঃ বলে, বাপ-দাদা চৌদ্দ পুরুষ এভাবে বেঁচে এলাম আর তিনি কোথাকার এগারো বছরের এক ছোঁড়া এলেন এলেম দিতে!

দুঃখিত হয়ে রাজু সেখান থেকে চলে এলো। কিছুদূর গিয়ে সে একটা পাথর বাঁধানো পথ দেখতে পেলো। চারদিক থেকে সীসার মতো মিহি কালো ধোঁয়া উঠছে। কোথাও সবুজের চিহ্ন নেই। শ্যামল রঙ নেই। নদীগুলি ভাঙ্গা, শুকনো। ধূসর ছায়া বিছিয়ে পাহাড়গুলি দাঁড়িয়ে আছে প্রেতের মতো। রাজু পাথর বাঁধানো পথ ধরে হাঁটতে লাগলো। কোথা থেকে যেন জল-প্রপাতের শব্দ ভেসে আসতে লাগলো! কিছুদুর গিয়ে ভুল ভাঙ্গলো রাজুর। জল-প্রপাত নয়। একটা বিশাল বটগাছ ঘিরে খেলা করছে বৈশাখের মতো তুমুল বাতাস। চারদিকে খোলা। রাজু বটগাছের নিচে গিয়ে দাঁড়ায় আর অমনি কোত্থেকে যেন ছুটে আসে ঢোলা কোর্ত্তা, লম্বা বাঁকানো টুপি আর নৌকার মতো জুতো পরা একদল ছোটখাট মানুষ। না, মানুষ নয়। রাজু তাকিয়ে দেখলো একদল বানর।

ঃ আমাদের নগরে প্রবেশ করুন হুজুর। অনায়াসে প্রবেশ করুন। বানরগুলি কুর্নিশ করে কিচির মিচির করে বলেঃ পথে আসতে কষ্ট হয়নি তো? কি বললেন কষ্ট হয়নি? তাহলে নিশ্চয়ই কষ্ট হয়নি। আমাদের কি কপাল, পথে আসতে হুজুরের কষ্ট হয়নি!

বানরেরা নাচতে লাগলো আনন্দে। রাজু বললোঃ তোমাদের নগর কোথায়? চলো তোমাদের নগরে আমি যাব।

বানরেরা কলকণ্ঠে বলতে লাগলঃ নিশ্চয় যাবেন হুজুর, একশো বার যাবেন। হাজার বার যাবেন।

বানরদের চেঁচামেচিতে একটু বিরক্ত হয় রাজু। বলেঃ কিন্তু তোমরা ভাই যদি এ রকম হৈ চৈ করোতো তোমাদের নগরে আমি নাও যেতে পারি।

ঃ কি মজা কি মজা।

বানরগুলি উদ্বাহু নৃত্য করতে লাগলোঃ হুজুর আমাদের নগরে নাও যেতে পারেন। চলো হে, আমরা হুজুরের নামে গান গাই। আমাদের কি কপাল যে হুজুর আমাদের নগরে নাও যেতে পারেন!

বানরেরা কোরাস গান গাইতে লাগলো!

এ আবার কোন্ পাগলের পাল্লায় পড়লাম। রাজু ভাবনায় পড়ে। বানরদের গান শেষ হলে সে বলেঃ তোমরা বড় বিচিত্র জীব দেখছি!

ঃ জী হাঁ হুজুর, আমরা বড় বিচিত্র জীব।

ঃ তোমাদের জ্বালায় আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি!

ঃ আমাদের জ্বালায় হুজুর অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন! চলো হে,

বানরেরা আবার পরস্পরকে আহ্বান করেঃ চলো হুজুরের নামে আমরা গান গাই। হুজুর আমাদের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন!

ঃ এইও চুপ! রাজু আর থাক্‌তে না পেরে একটা ধাড়ী বানরকে ধমক লাগায়ঃ যদি বাড়াবাড়ি করো তো মার লাগাব বলে রাখছি ....

ধাড়ী বানরটা কাঁদকাঁদ হয়ে বলেঃ আমরা বড় বাড়াবাড়ি করছি! দিন হুজুর, মার লাগিয়ে

দিন আমাদের। বড়ো বাড় বেড়ে গেছে, পিটিয়ে তক্তা বানিয়ে দিন আমাদের! ওরে, হুজুরকে সবাই পিঠ পেতে দে। হুজুর দয়া করে আমাদের জুতো পেটা করবেন।

রাজু রেগে-মেগে আরো গোটা দুই ধমক লাগায়। তারপর হন্‌হন্‌ করে সামনের দিকে এগোয়। মেজাজ তার বিগড়ে গেছে। স্বপ্ন দেখার বন্ধু কানে কানে বললো এরা আগাছার দল। দুনিয়ার সর্বত্র আছে। কেমন লাগলো ওদের ?

ঃ কি বিচ্ছিরি !

রাজুর রাগ এখনো যায়নি ঃ আমার মেজাজ বিগড়ে দিয়েছে।

অদৃশ্য বন্ধু বললো, চলো রাজু, এগিয়ে চলো। রাজু এগিয়ে চললো। কিছুদুর গিয়ে রঙ বদলে গেলো। শাদা নীলের মেশামেশি একটা আশ্চর্য রঙ চারদিকে। একটু দূরে মস্ত একটা প্রাসাদ দেখা গেল! সামনে বিশাল খোলা প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণে জড়ো হয়েছে হাজার হাজার ছোট ছোট ভালুক শিশু।

এটা একটা বিদ্যালয়। অদৃশ্য বন্ধু রাজুর কানে কানে বললো। রাজু তাকিয়ে দেখলো ভালুক শিশুদের সামনে পেছনে বই, বই, আর বই। বইয়ের পাহাড়। সবাই বইয়ের পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে মুখে পুরছে। রাজু অবাক হয়ে যায়। কাছে গিয়ে সে বইগুলি পরীক্ষা করে। নানা ধরনের নানা বিষয়ের বই। ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, সাহিত্য, বিজ্ঞান বিষয়ের বই।

ঃ এই, তোমরা বইয়ের পাতা খাচ্ছ কেন ? রাজু একটা ভালুক শিশুকে প্রশ্ন করে।

ভালুক শিশু বলে ঃ এটা আবার কোন্ ধরনের প্রশ্ন হলো ? সিলেবাসে যা আছে তা থেকে প্রশ্ন করো, জবাব দিয়ে যাচ্ছি। হুঁ ..... জিজ্ঞেস করো।

রাজু বলে ঃ বইয়ের পাতা কেন খাচ্ছ তা তোমরা জানো না ?

ঃ না জানি না। ঐ যে আমাদের শিক্ষক, তাঁকে বরং তুমি জিজ্ঞেস করো ভাই।

রাজু তাকিয়ে দেখলো চশমা চোখে একজন ধেড়ে ভালুক বেত হাতে গম্ভীরভাবে বসে আছে। সে তার দিকে এগিয়ে গেলো। কাছে গিয়ে আদাব দিলো। বললো ঃ যদি কিছু মনে না করেন তো একটা প্রশ্ন করি !

ঃ বলো।

ঃ ছাত্রেরা বইয়ের পাতা খাচ্ছে কেন ?

ভালুক চশমাটা ঠিক করে বসালেন নাকের গোড়ায়। গম্ভীরভাবে বললেন ঃ তুমি ভুল দেখেছ। ওরা বইয়ের পাতা খাচ্ছে না, গিলছে !

ঃ গিলছে .....

রাজু আর্তনাদ করে উঠেঃ বইয়ের পাতা গিলে খেলে অসুখ হবে না ?

ঃ তা তো হবেই। এরজন্যে আমরা একটা উপায় বার করেছি। পরীক্ষা। ছেলেদের ফি বছর পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করেছি আমরা। পবীক্ষার খাতায় ছেলেরা গেলা বইয়ের পাতাগুলি উগ্‌ড়ে দিয়ে আসে। খুব সুন্দর ব্যবস্থা, তাই না !

রাজু বললো ঃ এভাবেই লেখাপড়া হচ্ছে ?

ঃ ঠিক ধরেছ ! এভাবেই লেখাপড়া হচ্ছে। যে ছাত্র যতবেশী বই গিলতে পারে সে তত ভাল ছাত্র। ছেলেরা যাতে সহজে বইগুলি গিল্‌তে পারে আমরা সেটা তদারক করি।

রাজু কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ছাত্রদের বই গেলা দেখল। একটা ভালুক ছেলে গোটা ইতিহাসটা গিলে ফেল্‌ল। শিক্ষক তাড়াতাড়ি গিয়ে এক গেলাস পানি দিলেন তার হাতে। বললেন ঃ ইতিহাসটা গিলেছ, পানি খেয়ে এবার ভূগোলটা গিলে ফেল।

ছাত্রটি বোধহয় শিক্ষকের খুব প্রিয়। সে একটু আপত্তি জানিয়ে বলল ঃ না স্যার, এক সঙ্গে এতগুলি আমি গিল্তে পারব না। আমার পেট ভারী হয়ে গেছে।

ঃ লক্ষ্মী বাবা, এরকম করে না ...

শিক্ষক তাকে সস্নেহে পানি খাইয়ে দেন। বলেনঃ কতকিছু এখনো গেলার বাকী আছে। ইতিহাস গিলেছ, এখনো বাকী আছে ভূগোল, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান, অঙ্ক, সমাজ-বিদ্যা, সাহিত্য ! সব গিল্তে হবে ..... পরিশ্রম করো বাবা,পরিশ্রম করো ...ফল পাবে।

ছাত্রটি তখন এক হাতে নিল ভূগোল আর এক হাতে সমাজ-বিদ্যা। বিনয়ের সঙ্গে বললোঃ দোয়া করবেন স্যার যেন ভালয় ভালয় সব গিলতে পারি।

রাজুর মন খারাপ হয়ে গেল। সে তখন স্বপ্ন দেখায় মানুষের যে বন্ধু, তাকে ডাকতে লাগলো। ডেকে বললো তুমি আমাকে আগাগোড়া ফাঁকি দিয়েছ। আমি এইসব দুঃস্বপ্ন দেখতে চাইনি। আমি স্বপ্নের মতো সুন্দর স্বপ্ন দেখতে চেয়েছিলাম। আমি আনন্দ চেয়েছিলাম। দুঃখ চাইনি। কষ্ট চাইনি।

অদৃশ্য সেই বন্ধু এসে তখন হাত ধরলো রাজুর। বললো ঃ মন খারাপ করো না, রাজু। যা তুমি ইচ্ছে করবে তা-ই পাবে। মানুষের স্বপ্ন মানুষের হাতের মুঠোয়। শেষ তাঁবুটার দিকে তাকিয়ে দেখো রাজু। এগিয়ে যাও।

রাজু মাঠের প্রান্তে সেই তাঁবুটা দেখলো। অদৃশ্য বন্ধুর নির্দেশ মতো তাঁবুতে গিয়ে ঢুকলো সে। চারদিকে আবীরের মতো কুয়াশা। কোথাও নীল ও শাদা রঙের ফোয়ারা ঝলসে উঠছে। তাঁবুতে গিয়ে ঢুকলো রাজু আর কতগুলি সুন্দর, অনুপম সুখের মানুষ এগিয়ে এলো দৌড়ে। এসো রাজু তুমি আমাদের। তোমার জন্য আমরা অপেক্ষা করছি।

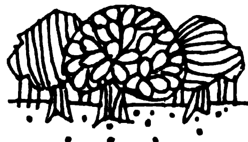
রাজু ওদের সাথে মিশে গেল। দেশ দেখলো। কি সুন্দর দেশ। খোলা আসমানের নিচে কাঁচা সবুজ রঙের মাঠ। মাঠের পাশ দিয়ে রূপালী নদী বইছে। নদীর ধারে কলার বাগিচা, খামার আর লোকালয়।

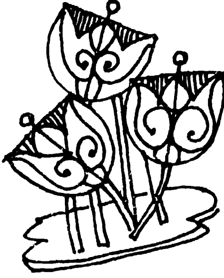
এখানে অন্ধকার নেই। চোখের পানি নেই। চাপা কান্না আর হিংস্র গর্জন নেই।

মানুষগুলি বললো, এখানে কলহ নেই, সন্ধ্যা নেই, আগুনের তাপ ও সন্দেহের জ্বালা নেই। এখানে এসো, রাজু। স্বপ্নের ভেতর এসো।

ওরা রাজুকে নিবিড় করে ডাকলো ঃ এখানে হাসি আছে, আলো ও কোমলতা আছে। এখানে নক্ষত্র জ্বলে, নেভে, নদী চুপ্ চুপ্, আকাশের নাম বন্ধু ও আমরা ...ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা স্বপ্নের উত্তরাধিকারী।

এখানে এসো রাজু। এখানে এসো।





ছেঁড়া কাগজ, ফুলের তোড়া

বুলবন ওসমান

তিন জনের কাঁধে তিনটে চটের থলে। রফু আর মধুর বয়স দশ, পরণে কালো ছেঁড়া প্যান্ট, খালি গা, উচ্চতায় দু'জন সমান। নাদুর বয়স আট, তারও উদোম গা, পরণে দড়ি বাঁধা ডোরা প্যান্টালুন, কি যে তার রঙ ছিল বোঝবার উপায় নেই, ময়লা লেগে লেগে কালো হয়ে উঠেছে। মাথার কোঁকড়া চুল ঘাড় ছাপিয়ে গেছে। তেলের অভাবে চুল কটা।

রমনা থানার সামনে রাস্তার এপারে লন্ড্রিটার পেছনে দুটো ছাপড়া আড়াল হয়ে রয়েছে। সামনে থেকে চোখে পড়ে না বলে ছাপড়া দুটো টিকে আছে। না হয় কবেই পুলিশ ভেঙ্গে দিত। রফু আর নাজু পিঠোপিঠি ভাইবোন, মধু তাদের প্রতিবেশী বন্ধু।

রোজ সকালে তাদের মা-বাবারা বেরিয়ে গেলে তারাও থলে কাঁধে বেরিয়ে পড়ে। মগবাজার, ইস্কাটন ছাড়িয়ে তারা কখনো কখনো কাওরান বাজার পর্যন্ত যায়। এদিকে শাহবাগ, রমনা পার্ক, পাবলিক লাইব্রেরি, বিশ্ববিদ্যালয় অঞ্চল সবই তাদের কাগজ কুড়োনর জায়গা। বেলিরোড ধরে শান্তিনগর, মালিবাগ, রাজারবাগেও তাদের যাতায়াত চলে। তিনজনে ক্ষিপ্র হাতে কুড়িয়ে চলে যত পরিত্যক্ত কাগজ। তাদের এই ক্ষিপ্রতার কারণ কাগজ কুড়োনো ব্যাপারটার সঙ্গে শুধু যে তারা তিনজন আছে তা নয়, আরো অনেক ছেলেমেয়ে এই কাজে কাঁধে থলে ফেলে ঘুরে বেড়ায়। যে যত আগে কুড়োতে পারে তার লাভ। না হয় সারা দিনেও এক থলে পুরবে না। এই কাগজ জমিয়ে জমিয়ে একদিন তারা মৌলবী বাজারে দিয়ে আসবে মহাজনের কাছে। তারা মন দরে কিনে নেবে। এই সব টুকরো কাগজ যাবে নারায়ণগঞ্জ, ফতুল্লায় হার্ডবোর্ড-পিজবোর্ড তৈরির কারখানায়। রফু, মধু আর নাজু ঘুরতে ঘুরতে প্রায়ই সকালে একবার বেলি রোড ধরে অফিসার ক্লাবের দেয়ালের পাশে এসে দাঁড়ায়। সকালে ক্লাবঘরটা নিশ্চুপ। কেউ নেই। টেনিস খেলার মাঠ ফাঁকা। বিকেলে এই জায়গার চেহারা পাল্টে

যায়। অনেক গাড়ি। অনেক লোকজন। গেঞ্জি আর হাফপ্যান্ট পরে খেলার মাঠে টেনিস বল নিয়ে ছুটোছুটি। তাই কখনও কখনও ওরা বিকেলে আসে খেলা দেখতে। সকালে খেলা না থাকলেও তারা আসে অন্য একটা আকর্ষণে। অনেক কাগজ পড়ে থাকে। সারা রাতের জঞ্জাল ঝাঁট দিয়ে ঝাড়ুদার ফেলে দিয়ে যায়। আর কোন পার্টি থাকলে খাবারের বাক্স কুড়িয়ে তারা চেটে চেটে খায়। সেদিন সকালে ওরা তিনজন অফিসার ক্লাবের দেয়ালের পাশে হাজির। বেশ কিছু কাগজ পড়ে আছে। চটপট হাত চালায় তিনজন। কাগজ শেষ। আজ কোন খাবারের বাক্স নেই যে তা নিয়ে চাটবে। না থাক। রোজ যে থাকবে এমন তাবা আশা করে না। অনেক সময় দারোয়ান আর ঝাড়ুদাব ঠোঙ্গা বা বাক্স নিয়ে চলে যায়। কিন্তু গতকাল রাতে যে খাওয়া-দাওয়া হয়েছে তার চিহ্ন পড়ে আছে, বাক্স নয়, একটা তাজা ফুলেং তোড়া। রাতের শিশির মেখে ফুলগুলো সতেজ। নাজু ফুলের তোড়াটা কুড়িয়ে নেয়।

তাকে ফুল কুড়াতে দেখে রফু বলে, ফেলাই দে, রাখনের কাম নাই।

না, রাখুম, সোন্দর ফুল, বলে নাজু।

হাতে ফুল রাখলে কাগজ টোকাবি ক্যামনে!

যখন কাগজ টোকামু ফুলগুলো মাটিতে রাখুম।

দরকার নাই ঝামেলায়। ফেলাই দে!

না, অমি রাখুম। নাজু জোর দিয়েই বলে। আমি বাড়িতে নিমু।

ফুল কি খাওনের জিনিস। কি লাভ নিযা!

না, আমি বাড়িতে নিমু! নাজু জিদ ধরে।

বড় ভাই হিসেবে রফু তার জোর খাটাতে চায, না, বাড়িত নিয়া কাম মাই, ফেলাই দে।

না, বলে নাজু ফুলের তোড়াটা থলির মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলে।

রফু হঠাৎ খপ করে নাজুর থলিটা নিয়ে নেয় এবং ক্ষিপ্র হাতে তোড়াটা বের করে নর্দমায় ফেলে দেয়।

নাজু অনেকক্ষণ একভাবে ফুলের তোড়াটাব দিকে চেয়ে থাকে। তোড়াটা আস্তে আস্তে ময়লা পানির নিচে তলিয়ে যায়।

একটা কথা বললে না নাজু, সে থলিটা কুড়িয়ে নিয়ে রমনা পার্কের দিকে হাঁটতে শুরু করে।

আকাশে ঘন মেঘ। এই সময় বৃষ্টি নামে।

রফু-মধু একটা ঝাঁকড়া জামগাছের নিচে আশ্রয় নেয়।

এদিকে নাজু একমনে মাঝ রাস্তা দিয়ে চলেছে। বৃষ্টির ধারা গড়িয়ে চলে তার কটা চুলের জট ধরে।

রফু চীৎকার করে ডাকে, এই নাজু পানিতে ভিজিস না ....

দু' দিন আগে তর জ্বর ছিল .....

নাজুর কোন ভাবান্তর নেই। তুমুল বৃষ্টির মধ্য দিয়ে আবছা একটা ছায়ামূর্তির মত সে ধীর পায়ে এগিয়ে চলে।

আমি তরে ফুল পাইড়া দিমু, নাজু শোন .... জোর গলায় ডাক দেয় মধু। বৃষ্টির শব্দে তার ডাক খানিক দূর গিয়ে মিশে যায়।

ভিজলে ভিজ, তরই জ্বর হইব .... মরবি ... গজ গজ করে রফু।

বড় মেঘটা এক নাগাড়ে আধঘন্টা বৃষ্টি ঝরিয়ে সরে গেলে রফু-মধু গাছতলা থেকে বেরিয়ে

রমনা পার্কের দিকে এগিয়ে চলে। বৃষ্টিতে ছেঁড়া কাগজ সব ভিজে গেছে। এখন আর কাজ হবে না। তারা পার্কে ঢুকে একটা বেঞ্চিতে বসে বলাবলি করে, নাজুটা যে কোথায় গেল।



মধু বলে, ফুলের তোড়াটা নিলে কি হইত ?

ফুল নিঁয়া লাভ কি ?

লাভ নাই, তবে অর ভালো লাগছে…

ফুল বড় মাইনষের জিনিষ। তারা গাছ লাগায়, ফুল কাটে, ফুল ফ্যালায়া দ্যায়… আমাগো ফুলের কোন কাম নাই…

নাজু বাচ্চা মানুষ ত…

রফু আর কোন কথা বলে না।

বেলা বাড়লে তারা পার্ক থেকে বেরিয়ে শাহাবাগের দিকে এগোয়। সঙ্গে নাজু নেই বলে তাদের কিছুটা খারাপ লাগে।

পি জি হাসপাতালের সামনে বা দোকানের সামনে তেমন কাগজ পড়ে থাকতে দেখল না।

হাঁটতে হাঁটতে তারা কাঁটাবন ফেলে প্রায় এলিফেন্ট রোড পর্যন্ত হাজির।

একটা ডাস্টবিনে বেশ কিছু কাগজ পড়ে থাকতে দেখে দু'জন ঝুঁকে পড়ে। ওপরের ভিজে কাগজ সরিয়ে তারা ফটাফট ঝুলিতে কাগজ পুরতে থাকে। এখন রফু আর মধুকে দুই বন্ধু বলে মনে হয় না। কেউ কাউকে যেন চেনে না। চোখে মুখে একটা অস্বাভাবিক ব্যগ্রতা। ক্ষুধার্ত কুকুর যেমন গ্রাস তুলতে থাকে, মুখ চোখ হিংস্র হয়ে ওঠে, তেমনি দু'জনের মুখে হিংস্রতা, লোভ। মুখে ঘাম জমতে থাকে।

কাগজ খুব বেশি ছিল না। অল্পক্ষণেই শেষ। চুপসে থাকা থলির নিচের দিক কিছুটা ফুলে ওঠে।

আরো কিছুটা এদিক ওদিক ঘুরে কোন কাগজ না পেয়ে তারা ফিরে চলে। বৃষ্টির পর চড়া রোদ। পেটে ক্ষিধেটাও চাড়া দিয়ে উঠেছে। পেট মোচড় দিচ্ছে।

ঝুপড়িতে ফিরে রফু দেখে নাজু শুয়ে। গায়ে একটা ছালা চাপান। তার মা রান্নার ধোঁয়ায় ঝুপড়ি ভরিয়ে ফেলেছে।

মা, নাজু শোয়া ক্যান ?

জ্বর।

কইলাম পানিত ভিজিস না। আমার কথা হুনল না।

বিকেলে রফু থলিটা ঝুলিয়ে আবার বেরতে যাবে, তার মা তাকে বাইরে যেতে নিষেধ করে। নাজুর কাছে বসতে বলে।

তার মা ছুটা কাজ সারতে যায়। আসবে সেই রাত ন'টায়। খাবার নিয়ে এলে ভাগ করে খাবে।

আটটার দিকে রফুর বাপ হাজির। মাঝ বয়সি লোক, শীর্ণ চেহারা। মুখে কাঁচা পাকা খোঁচা খোঁচা দাড়ি, খালি গা, পরণে ময়লা লুঙ্গি, কোমরে গামছা জড়ান।

বাপকে দেখে নাজু কান্না জুড়ে দেয়।

জ্বর বেড়েছে তার। কিছু খায়নি, ক্ষিধেও লাগছে।

আমারে কমলা আইনা দাও .. বায়না ধরে নাজু।

অখন বরষা কাল কমলা কই পামু, জবাব দেয় নাজুর বাপ।

আমি দেখছি, নিউ মার্কেটে পাওয়া যায়। আমারে কমলা আইনা দাও ..

কমলা কেননের কি টাকা আছেরে মা ...

আমি কিছু চাইলেই খালি তোমার টাকা থাকে না ...

আমরা গরীব মানুষ, কমলা খাওনের কপাল করি নাইরে মা ...

আমরা গরীব ক্যান ...

আল্লা আমারারে গরীব বানাইছে ....

আল্লা আমারারে গরীব বানাইল ক্যান ...

নাজুর বাপ নিজেকেও এই প্রশ্ন করেছে অনেক বার, কোন জবাব পায়নি। জীবনে তেমন

কোন পাপ করেনি। গ্রামে তবু একটা ভিটে ছিল, তাও গেল মহাজনের হাতে দেনা শোধ না হওয়ায়।

কমলা কমলা করে ঘ্যান ঘ্যান করতে করতে নাজু ঘুমিয়ে পড়ে।

রফু ভাবে সে কাগজের টাকায় নাজুকে কমলা কিনে দেবে। কিন্তু একটা কমলার দাম তিন টাকা ··· তাকে আরো অনেক কাগজ জমাতে হবে। কাল সকাল সকাল বেরবে কাগজ কুড়োতে।

সকালে নাজুর বাপ চলে গেল ঠেলাগাড়ি নিয়ে।

মধু ডাক দেয়, রফু বাইর হবি ····

আসি ··· রফু জবাব দেয়।

এই সময় আবার কাঁপন দিয়ে জ্বর আসে নাজুর।

রফুর আর বাইরে যাওয়া হয় না। মা আর ছেলে নাজুর মাথায় পানি ঢালায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

ঘন্টখানেক পর জ্বর একটু কমলে রফুর মা যে বড়িতে ছুটা কাজ করে তাদের কাছে ছুটি নেবে বলে বেরিয়ে পড়ে। রফুকে বোনের কাছে থাকতে হয়।

খানিক পর নাজুর মা ফিরে দেখে নাজু একা। রফু নেই। মা খুব রেগে যায় অসুস্থ ছোট বোনটাকে ফেলে যাওয়া! আসুক দেখাবে!

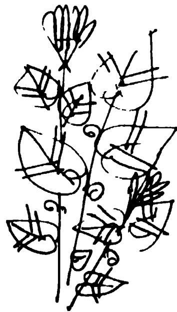
দু' মিনিটও যায়নি, রফু হাজির।

মা কিছু বলার আগেই সে নাজুর কাছে এগিয়ে যায়।

ডাকে, নাজু নাজু···

নাজু আস্তে আস্তে চোখ মেলে। দেখে রফু একটা ফুলের তোড়া সামনে বাড়িয়ে রেখেছে।

নাজু হাত বাড়িয়ে তোড়াটা নিয়ে দেখে। তারপর মাথার কাছে রেখে দেয়। সে কতটা খুশী হয়েছে ঠিক বোঝা গেল না, কিন্তু রফুর দু' চোখ তখন তৃপ্তিতে চিকচিক করছে।





চোর

নিয়ামত হোসেন

শহরের বড়োলোকরা প্রায় সারাক্ষণই ভিড় করে আছে এই নিউ মার্কেটে।

সব সময়ই গাড়ির ভোঁ বাজছে প্যাঁ-পোঁ। সায়েব-মেমসায়েব আসছে, গাড়ি থামাচ্ছে, প্রায় নাচতে নাচতেই ঢুকে যাচ্ছে বিরাট গেট দিয়ে সারি সারি চোখ-বাঁধানো নিউ মার্কেটের দোকানের গোলক-ধাঁধায়। আর রিকশা, বেবি-ট্যাক্সি, সাইকেল, পথচলা মানুষ, ফুটপাথের দোকানদার, সেসব দোকানের খদ্দের—সবার যেন এক গমগমে ভিড় লেগে আছে সবখানে।

নিউ মার্কেটের পাশেই বাজার। লোকে বলে কাঁচা বাজার। এখানে বিক্রি হয় চাল, ডাল, মরিচ, হলদি থেকে মাছ-মাংস-হাঁস-মুরগি পর্যন্ত।

এখানেও থামে সায়েব-মেম সায়েবদের গাড়ি। তাঁরা নেমে বাজারে ঢুকে বাজার করেন। তারপর আবার গাড়িতে উঠে চলে যান বাড়িতে।

সর্বক্ষণ প্রায় ভিড় এই কাঁচাবাজারেও।

সায়েব-সুবো ছাড়াও নানান ধরণের বড়োলোক, মধ্যবিত্ত ও গরীব মানুষের ভিড় এখানে। এই ভিড়ে একবার মিশে গেলে নিজের কথা আর মনে থাকে না—মানুষের ভিড়ে আর নানান রকম শব্দে মন আনমনা হয়ে যায়—কতো রকম কতো ধরণের অন্য রকম চিন্তা এসে মাথায় ভিড় করে।

ফকির আলিরও ঠিক সেই রকমই হয়।

মাঝে মাঝে এমন ভুল হয়ে যায় যে সে বাজার করতে-আসা সায়েবদের পিছু ধরতেও পারে না। অন্য ছেলেরা ধরে ফেলে।

সে হয়তো হাঁটছেই, হাঁটছেই—একবার মুরগির বাজারের ভিড় ঠেলে ঠেলে, একবার মাছের বাজারের লোকজনের গা ঘেঁসে ঘেঁসে, খেয়ালই নেই। এমন ভিড় যে অনেক সময় নিজের

শরীরের উপরও নিয়ন্ত্রণ থাকেনা প্রায়—লোকে ঠেলতে ঠেলতেই এপার থেকে ওপার করে দেয়। তার মধ্যে যদি কারো গায়ের উপর পড়ে যায় অমনি শুনতে হয় খিচানি—এই চোখে দেখিস না? গায়ের উপর এসে পড়িস, শালা নবাবের বাচ্চা।

সে সময় ফকির সোজা হয়ে হাঁটতে চেষ্টা করে যদিও, কিন্তু পারে না, কেউ হয়তো এমন ধাক্কা মারলো যে মাথার ঝুড়িটা লাগলো গিয়ে অন্য লোকের ঘাড়ে।

ঘাড়ে লাগা লোকটা ফকিরের মাথায় চটাশ করে এক চাঁটি মারে, এই হারামজাদা ইবলিসগুলার জ্বালায় বাজারেও আসা মুশকিল।

অন্য ছেলেরা হলে প্রতিবাদ করতো, ফকির লোকটার দিকে করুণভাবে তাকাবার চেষ্টা করে। লোকটা একটা ধাক্কা মারে ঘাড়েঃ ভাগ! ভাগ!

ধাক্কার চোটে আবার হোঁচট খেয়ে সামনের এক লোকের প্রায় কোলের মধ্যেই পড়ে ফকির। কিন্তু আর একদফা মার খাওয়ার আগেই ভয়ে পালিয়ে আসে ভিড়ের বাইরে।

এসে হাঁপায়। দেখে অন্য ছেলেরা ঠিক মতো সায়েব ধরেছে। সায়েবরা বাজার করছে আর তাদের মাথার ঝুড়িতে রাখছে।

নিজের উপর বিতৃষ্ণা আনে ফকির।

ইশ, এতোটা বেলা হলো চার আনার কামও হলো না! অথচ অন্য ছেলেরা হয়তো অনেক পয়সা পেয়েছে! মাকে কি বলবে গিয়ে? মাতো অপেক্ষা করে আছে বাসায়! কি নিয়ে যাবে ফকির আলি তার মায়ের জন্য!

হঠাৎ এক সায়েবকে লক্ষ্য করে ফকির।

ছুটে যায় সেদিকে।

ঃ সাব কুলি লাগবো?

কোন জবাব নেই তার কথার! সায়েবটি আপন মনেই নিজ পথ হাঁটেন, হয়তো ফকিরের কথার উত্তর দেবার প্রয়োজন অনুভব করেন না।

ঃ সাব কুলি লইবেন?

এবার খেঁকিয়ে ওঠে সেই লোকটি ঃ না, না, সর, সর, ভাগ—

ঃ সাব, লাগলে আমারে লইয়েন, কাতর মিনতি ফকিরের।

ঃ আরে লাগবো না তো কইলাম ব্যাটা, ভাগ, লোকটি ফকিরকে এমনভাবে তাড়া করতে উদ্যত হয় যেন মনে হয় স্থানটা তার চৌদ্দপুরুষের কেনা সম্পত্তি!

ফকির ভয়ে ভয়ে কিছুটা পিছিয়ে এসে আবার কাতরভাবে তাকায় সেই লোকটির দিকেঃ বকুনি দিয়েও যদি সায়েবের দয়া হয়!

কিন্তু কোথায় দয়া। ফকির দেখে তার-দিকে ফিরেও তাকায় না সায়েব, সোজা ব্যাগহাতে ভিড়ে মিশে যায়।

পিছন থেকে হিরু এসে গুঁতো দেয় পিঠে।

ঃ আরে ফকির‍্যা, পাইলি? ওইসে কিসু?

ফকির মাথা নাড়ে।

ঃ শালা তুই কোন কামের না। হাতের মুঠি খুলে দুটো চকচকে সিকি দেখায় হিরু। এক সাবরে লইসিলাম, হ্যার বাজার উডায়ে দিসি রিকসায়, আর এক সাব, খুব বড়োলোখ, মাঝে মাঝে মডর গাড়ি লইয়া আহে, হেরডা উডায়সি মডর গাড়িতে—চাইর আনা, চাইর আনা—আডানা, এই দ্যাখ।

পয়সা ট্যাকে গুঁজে রাখে হিরু। বলে, তুই খাড়াইলে খাড়া, আমি দেহি—ওইযে সাব আইতাসে।

ছুটে যায় হিরু।

বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকে ফকির।



নিজের উপর খুব অভিমান হয়।

আজ কি নিয়ে বাড়ি যাবে!

খুব ভয় হয় তার।

তার বাপ অনেকদিন ধরেই বাড়িতে বসা। কাম পায় না অনেকদিন হতেই। চেষ্টা করে অবশ্য প্রায়ই, কিন্তু হতাশ হয়ে ফিরে আসে। মাঝে মাঝে তাই চেষ্টা করে ঠেলাগাড়িতে মাল ঠেলবার কাজের। কোনদিন হয়, কোনদিন হয় না। মা-ও তার এক বাসায় কাজ করত, এখন করেনা!

কোলে ছোট বাচ্চা, সে বাড়ির লোকদের সেজন্য অসুবিধা!

ফকিরের বাপ বাজারের বোঝা বইবার আশায় কতোদিন ঘুরেছে। হয়নি। লোকে অল্পস্বল্প বাজার করে, দরকার হলে ছোট ছোট ছেলেদের মাথায় বোঝা চাপিয়ে বাড়ি যায়। দু'চার আনা যা হয় দেয়। বুড়ো মানুষদের এ কাজে বড় একটা নিতে চায় না কেউ। তাই আসতে হয় ফকির আলিকে।

আজ ফকির আলি ঠিকমতো সায়েবই ধরতে পারছে না।

বাড়িতে একমাত্র নিশ্চিত আয় ধরতে গেলে তারই!

অথচ আজ তার এই অবস্থা!

আধ সের আটা কেনার পয়সা যদি কোনমতে জোগাড় করতে পারত ফকির আলি! তাহলে কোনমতে খাওয়া যেতো ওবেলা।

মায়ের কথা মনে হয় ফকিরের।

মা-টা তার কতো ভালো। এমন মানুষ দুনিয়ায় আর হয় না। কোনমতে যদি পাঁচটা রুটি বানাতে পারে তো দুটো বাবাকে দেয়, দুটো তাকে দেয়, একটা দেয় ছোট ভাইকে। কোলের বাচ্চা শরীর বড় শুকনো, পেট ফোলা। সেও দুধের বদলে একটা রুটিই খেয়ে থাকে, বাবাও রুটি খেয়ে বাইরে গিয়ে বসে, যদি কারো কাছ থেকে আধখানা বিড়ি চেয়ে খাওয়া যায় সেই আশায়।

শুধু ফকির বসে থাকে। সে খেয়াল করে মায়ের কিছু নাই।

ঃ মা তুমি খাইলা না?

ঃ আমি খামু পরে, তুই খা তো! মা ব্যাপারটা যেন কিছুই না এইভাবে নিজ কাজে মন দেয়।

ঃ আমি খামু না, তুমি একডা লও। ফকিরের চোখ ফেটে পানি আসে।

ঃ কেমন পুলারে, আমার লাগবোনা, তুই খা, সক্কালে তরে আবার কামে যাওন লাগবো!

ঃ একডা খাইয়াও আমি কামে যাইতে পারুম!

মায়ের কালচে মুখে যেন একটা অপরাধী-অপরাধী ভাব। ছেলের চোখে চোখে তাকাতে পারে না। মুখ না ফিরিয়েই বলেঃ আমি হেই ব্যালা খাইসি, দুখান রুডি তর জন্য কিসু না, খায়া ফালা মানিক আমার, কথা কইস না।

বাবা পুনরায় সম্পূর্ণ শরীর নুইয়ে ভেতরে ঢুকে শুধায়, কিরে ফকির কি অইসে?

রাগ হয় ফকিরের। বলেঃ তোমার কি? তোমার তো খেয়াল নাই আমার মা খাইলো কি না খাইলো! তুমি তোমারডা বুজমতো পাইলেই অইলো!

রাগ না করেই তবু বলেঃ মায়ে কিসু খাই নাই!

ঃ হায় আল্লাহ! একি করলো ফকিরের মা! তুমি তোমারডা না রাইখাই সবটি দিয়া দিলা!

ঃ আপনেরে কে কইলো আমি খাই নাই। হের যতো কথা! মুখ লুকায় ফকিরের মা।

এমনি অনেক কথাই ফকিরের মনে পড়ছে আজ! এসব কথা এতো বেশি মনে পড়ছে যে তার আর সায়েব ধরা হচ্ছে না!

তার ছোট ভাইয়ের কথা মনে পড়ছে!

তাদের বস্তির বাড়ির সামনেই হিরণ মিয়ার মুদী দোকান। সেই দোকানের সামনের দিকে একটা কাঁচের বোয়েমে গোল গোল ফুল তোলা বিস্কুট রাখে। দু'পয়সায় একটি। এই বিস্কুটের জন্য এখনো ফুঁপিয়ে কাঁদে তার ছোট ভাই!

সেদিন বস্তি থেকে একটু দূরের এক বাড়িতে বিয়ে হল। সকাল থেকেই সে বাড়ির

আশেপাশে ঘুর ঘুর করছিল বস্তির অনেক ছেলেমেয়ে। রাত্রে খাওয়ার সময় ফকিরও গিয়েছিল, এতো ছেলেমেয়ের চিৎকার, হৈ চৈ, তবু ছোট ভাইয়ের কান্নায় একটি থালা নিয়ে গিয়েছিল সে! যদি একমুঠো পোলাও দেয়!

বিয়ে বাড়ির অতিথিরা খেতে বসলেন দু দফায়। খাওয়া হল, বিয়েও হল, সব্বাই চলেও গেল কিন্তু কিছুতেই ফকির গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতে পারলো না। দু একবার চেষ্টা করেও অনেকের সাথে তাড়া খেয়ে ফিরে এলো।

কয়েকজন খানসামা কাজ করছিল। তারা টেবিলের কাপড় ঝেড়ে আর আধখাওয়া পোলাও ও মাংস একটা বালতিতে জমা করল। তারপর গেট পেরিয়ে এসে রাস্তার পাশে ছুঁড়ে দিল ফেলে। আর ছুটে গেল একগাদা ছেলে মেয়ে। কাড়াকাড়ি, খাবলা খাবলি। এক মুহূর্তেই ঐ এঁটোকাঁটাও শেষ।

ফকির আধো অন্ধকারে দেখতে পেল, কয়েকজন ছেলেমেয়ে কোমরে থালা চেপে ধরে মোটা মোটা হাড় ব্যর্থতার সাথে চুষে খাচ্ছে!

সে আবার গেটের দিকে এগিয়ে গেল।

কিন্তু সেখানেও কোন আশা নেই মনে হল তার।

একটু পরে এক সায়েব ওদের দেখে বিরক্ত হয়ে একজনকে হুকুম করলেন ওদের কিছু কিছু করে দিয়ে বিদায় করতে।

ছেলেদের মধ্যে মহা উৎসাহ পড়ে গেল!

কখন আসে কখন আসে এই আশায় সবাই উদগ্রীব।

কিছুক্ষণ পর একটা ডিশে করে কিছু পোলাও নিয়ে একজন এল গেটের কাছে।

সকলে হাঁ হাঁ করে উঠল।

লোকটা ডিশটাকে সযত্নে মাথার সমান উঁচুতে ধরে চিৎকার করে উঠল, লাইন ধর, লাইন ধর, নইলে কারেও দিমুনা—

কিন্তু কে শোনে কার কথা!

কে ধরে লাইন!

সব্বাই যে যাকে পারে ঠেলে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করে আর যতোদূর সম্ভব থালা বাড়িয়ে দেয় সামনে।

লোকটা কোন রকমে এক মুঠি এক মুঠি করে যেই দেয় অমনি সকাতর আবেদন ওঠে, আমারে দ্যান, আমারে দ্যান .....

কেউ পেয়েও দাঁড়িয়ে থাকে। কেউ কাপড়ে লুকিয়ে ফেলে।

ঃ এই ভাগ্ ভাগ্ তরে না দিলাম।

কেউ হয়তো ধরা পড়ে যায় সেই লোকটার কাছে। তবু সে বলে,আর এট্টু দ্যান। দুগা। ফকির এইসব দেখতে দেখতে এক সময় খেয়াল করে লোকটার দানের কাজ সমাপ্ত হয় এবং সকলের আবেদন নিবেদন সত্বেও সে গেট বন্ধ করে দিয়ে সোজা ভিতরে চলে যায়।

অগত্যা কি আর করবে।

ফকির ফিরে আসে শূন্য থালা নিয়ে। রাত অনেক হয়েছে। এসে দেখে পোলাও-এর আশায় থেকে থেকে তার ছোট ভাই ঘুমিয়ে পড়েছে!

ফকিরের মনটা দুমড়ে-মুচড়ে টনটনিয়ে ওঠে ব্যথায়। যদি সামান্য একটু পোলাও আনতে পারতো, তাহলে তার ভাইটাকে, তার মাকে, বাবাকে খাওয়াতে পারতো! একটু একটু হলেও

সব্বাই খুশি হতো খুব।

এইসব পুরনো কথা ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলে ফকির। চারদিক ভালো করে তাকিয়ে দেখে নতুন সায়েব আসছে কিনা বাজার করতে।

উঁহুঁ, কেউ নাই।

সব্বার হাতেই নিজের নিজের ব্যাগ। কেউ কেউ কুলি নিয়েই ফেলেছে।

একজন ভদ্রলোক বেশ ভারী ব্যাগ নিয়ে হাঁটছেন। ফকির আলি কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

ঃ এই বেগুন কতো ক'রে ? ভদ্রলোক বেগুনঅলাকে শুধালেন।

বেগুনঅলা জবাব দিল ঃ এক টাকা।

তিনি চলে যাচ্ছিলেন, লোকটা ডাকলো, শুনেন সাব, এই যে—

তিনি দাঁড়ালেন।

তরকারীঅলা শুধায় ঃ আসেন না, কত লইবেন ?

ঃ লাগবে না!

আহা, কতো দিবেন ? কইবেন তো!

ভদ্রলোক কি যে ভাবলেন, দাঁড়ালেন না, হাঁটতে সুরু করলেন অন্য তরকারীর দিকে! সুযোগ বুঝে ফকির আলি পিছনে যেতে সুরু করে।

ঃ সাব কুলি লাগবো ?

ঃ উঁহু, উঁহু!

ঃ লন না সাব—মিনতির মত স্বর ফকিরের।

ঃ লাগবে না, যাঃ! তিনি ধমক দিলেন।

ফকির এবার নাছোড়বান্দা। তাঁর ভারী ব্যাগটা ধরে মৃদু টান দিয়ে বললো ঃ দশডা পাই দিয়েন সাব, আমি লয়ে যাই!

ভদ্রলোক হ্যাঁচকা টান দিয়ে ব্যাগটা ছিনিয়ে নিলেন। তারপর আরো জোরে ধমক দেন ঃ ভারী মজা তো! বলছি লাগবেনা তবু—যাঃ! যাঃ!

ফকির আলির মেজাজটা ভীষণ বিগড়ে যায়!

দূরে সরে আসে বিড় বিড় করে গাল দিতে দিতে। গাল তো সে বেশী দিতে পারে না। পারে দিতে লতু। কোন সায়েব ধমক দিলে সেও দূরে এসে যতো পারে মনের সুখে গাল দিয়ে প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করে।

ফকির আলিও দূরে এসে বিড় বিড় করে গাল দিয়ে ওঠে।

একজন মাঝবয়েসী ভদ্রলোক এ সময় হন্তদন্ত হয়েই যেন বাজারে ঢুকলেন। একটি দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে দোকানের এক পাশে দড়ি দিয়ে ঝোলানো চটের থলি ধরে শুধালেন ঃ ব্যাগগুলো কতো করে ?

ঃ এক টাকা।

ঃ কতো হবে ঠিক বলেন।

ঃ দুই আনা কম দিয়েন, দোকানদার বলে।

ঃ আট আনায় হবে ? ভদ্রলোকের সরাসরি প্রস্তাব।

ঃ কী যে কন সাব!

ঃ তাহলে কতো ? দশ আনা ?

ঠিক এই সময়ে ছুটে আসছিল আর কয়জন কুলি। তাড়াতাড়ি বলে ফেলল ফকির আলিঃ কুলি লইবেন সাব?

ঃ যাবি? ভদ্রলোক উল্টো প্রশ্ন করলেনঃ কতো লবি?

ঃ চাইর আনা দিয়েন সাব, মুখটাকে করুণ করল ফকির!

হ্যাঁ, চার আনা! দুই আনা পাবি, যাবি?

ফকির দেখল এটাও হয়তো ফসকে যাবে, ভয়ে ভয়ে বললঃ বিশ পাই দিয়েন সাব!

ভদ্রলোক রাজী হয়ে গেলেন।

অন্য কয়েকজন ছুটে এসেছিল। তারা বললো, আমারে লন সাব, আমারে লন সাব! কিন্তু ভদ্রলোকও সেদিকে খেয়াল করলেন না, ফকির আলিও দৃঢ়ভাবে ব্যাগটা ধরল যাতে হাতছাড়া না হয়।

ভদ্রলোকটির পিছু পিছু হাঁটতে হাঁটতে ফকিরের নানা কথা মনে হতে লাগলো। কুড়িটা পয়সা দিয়ে কি কেনা যাবে! তার ছোট ভাই পোলাও খেতে চেয়েছিল সেদিন, খাওয়াতে পারেনি। পারেনি এক টুকরো মাংস খাওয়াতে। কতোদিন যে হয়ে গেছে ওরা মাংস খায় না। সেদিন বিয়ে বাড়িতে ছেলেমেয়েরা ময়লা-ফেলা আস্তাকুড় থেকে খাওয়া হাড় কাড়াকাড়ি করে যেভাবে খাচ্ছিল সে কথা ফকিরের মনে পড়ে যায়। বিয়ে বাড়ি থেকে খাওয়ার যে খোশবু পাচ্ছিল সে, ওই শুকনো ফেলে দেয়া হাড়গুলোতে তার খানিকটা কি লেগে ছিল না? অনেক সময় বড়োলোকেরা যেভাবে হাড় খেয়ে ফেলে দেয় তাতে এক-আধ কুচি মাংস লেগে থাকে, আর বিয়ে বাড়ির ভোজের খাওয়ার সময় এঁটো-কাঁটার পাতে মাঝে মাঝে দু'একটা চর্বিও ফেলে দেয়া হয়। তিনটে হাড়ও যদি সেদিন পেতো ফকির! একটি দিতো মাকে, একটি বাবাকে আর একটি ছোট ভাইটিকে।

ভদ্রলোক মাংসের দোকানে গিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, উলটিয়ে-পালটিয়ে টিপে দেখে অবশেষে একসের মাংস কিনে ব্যাগে পুরে চাপালেন ফকিরের মাথার ঝুড়িতে। তারপর ঢুকলেন তরকারীর দোকানগুলোতে।

ফকিরের মাথায় মাংসের ব্যাগটা বেশ ভারী মনে হচ্ছিল। একসের মাংস, এমন আর কি! তবু যেন ভারী মনে হচ্ছে। সেদিন বিয়ে বাড়ির এঁটো কুড়িয়ে সবগুলো ছেলেমেয়ে যা পেয়েছিল তার থেকে তো এটা বেশি!

ফকিরের মনে হতে লাগল এ মাংস যেন তারই কেনা! সে-ই যেন বাজারে কেনাকাটা করছে তার বাড়ির জন্য।

ইতিমধ্যে ভদ্রলোকের তরকারী কেনা হয়ে গেছে! সব চাপানো হয়েছে ফকিরের মাথায়। তারপর ভদ্রলোক মাছের বাজারের দিকে এগোলেন। মাছের ঘরটিতে ভীষণ ভীড়। ঢোকা মুশকিল। ফকিরের ঢুকতে ইচ্ছা হলো না।

ভদ্রলোক ঢুকলেন, ফকিরকেও পিছু পিছু যেতে হলো। ওর মনে হল না ঢুকলেই ভালো ছিল।

ভদ্রলোক মাছের দর করছেন। এ-মাছ, সে-মাছ। ভীড় ঠেলে এগোনোও শক্ত। ফকির আলি পিছু পিছু যায় আর ভাবে এই বুঝি মাছ পছন্দ হয়ে যাবে, তারপর ওকে নিয়ে তিনি বাইরে আসবেন, গন্তব্যস্থলে নিয়ে যাবেন, তারপর কুড়িটি পয়সা দিয়ে চলে যাবেন। ....কিন্তু তারপর? তারপর আবার ফকির আলিকে 'কুলি লাগবো', 'কুলি লাগবো' করে সায়েব খুঁজতে হবে। যদি কাউকে পায় তবেই আটার পয়সা হবে নইলে এ দিয়ে কি হবে?

ফকির আলি কি যেন ভাবলো।

একবার উল্টো দিকে একটু গিয়েই আবার সায়েবের কাছে ফিরে আসলো। সায়েবকে ভালোমতো লক্ষ্য করে দ্রুত উল্টো দিকে ভিড় কাটিয়ে একটু গিয়েই ফাঁকা জায়গায় পড়লো এবং সেখান থেকে বুক টগবগ করা উত্তেজনা নিয়ে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব সোজা বাড়ির পথ ধরলো।

বাড়ির কাছাকাছি এসে আর ভেতরে ঢুকতে সাহস হয় না। কী বলবে সে ? মা কি খুশী হবে ? বাবা কী শুধাবে ? ছোট ভাইটি কী করবে ?

ঃ কে ফকির, আইছস বাবা ? মা শুধালো তাকে।

ঃ হ ! মাথার ঝুড়ি ছোট্ট ঘরের ছোট্ট মাটির মেঝেতে নামালো সে।

ঃ আরে একী ! চমকে ওঠে মা ! কার এগুলি ?

ঃ আমারোই !

ঃ এতো কিছু কই পাইলি ? এ্যাঁ ?

ঃ দিসে। ফক্বির বলে, আমারে এক সায়েব দিসে। সায়েব আমাকে খুব বালোবাসে। কইলো কি, যা লয়ে যা, তরে দিলাম !

ঃ হাঁচা কথা ? তরে দিসে ? মা যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না, কারোরডা লয়ে আসস নাই তো ?

ঃ না মা ! আমারে দিসে।

বাবা দেখে তো অবাক। চোখ দুটো তার যেন বেরিয়ে আসে অবাক হয়ে। ছোট ভাইটি খাবলা খাবলা করে ঝুড়ির মাংস তরকারী এলোমেলো করতে থাকে। মা তাড়াতাড়ি সামলে রাখে সব।

ফকিরের বাপ সেদিন নিজে হিরণ মিয়ার দোকানে গিয়ে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কয়েক প্রকার মশলা ধারে কিনে আনলো। তার মাও চেনা কোন বাড়ি থেকে চেয়ে নিয়ে এলো একটা এ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি।

কৌতূহলী দু'একজন উঁকি দিল ঃ অ ফহিরের মা, পুলায় কি আনছে, এত কি রানতাছ ?

ঃ না, এই একড়ু তরকারী, এমন কিছু না, সামান্যই।

ফকিরের সায়েব সেদিন অনেক দোয়া পেলেন।

পরদিন ফকির ঘর থেকে বের হলো না।

তার বাবা শুধায় ঃ ফহির, বাজারে যাবি না ?

ফকির কিছু বলে না।

মা বলে ঃ থাক, আজ না-ই গেলো, শরীলডা হয়তো বালা নাই। এসে ছেলের গায়ে হাত দেয়। না। জ্বর নাই।

তারপর দিনও যায় না ফকির। ঘরে বসে থা...

তিনদিনের দিন আর থাকা গেল না। যেতেই হল।

ভয়ে ভয়ে চারিদিক দেখে রওনা হল সে। কোনরকমে বুক ঢিপ ঢিপ করতে করতে বাজার পর্যন্ত গেল সে কিন্তু সায়েব ধরতে পারলো না। শঙ্কিতভাবে এদিক ওদিক চেয়ে বেড়াতে বেড়াতেই অনেক সময় হয়ে গেল। একবার বাজারের দিকে আসে আবার হঠাৎ সেই সায়েবের মতো কাউকে মনে হলে দ্রুত সরে যায়, ভিড়ের আড়ালে বা দোকানপাটের গলি ঘুচিতে লুকিয়ে থাকে। এইভাবে লুকোচুরি খেলে খেলে খালি হাতে সেদিন বাড়ি ফিরল সে।

পরদিন পুনরায় রওনা হয় বাজারে।

বেলা অনেক হয়েছে। ছোট ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে ফকিরের মা বসেছিল। হঠাৎ ছুটতে ছুটতে এসে খবর দেয় হিরু ঃ ও ফহিরের মা, শীগগীর বাজারে যাও ফহিররে মাইরা ফালাইলো। শীগগীর—

হঠাৎ বুঝতে পারেনি ফহিরের মা। কিন্তু বোঝা মাত্রই পড়ি কি মরি করে ছুটতে লাগলো বাজারের দিকে। হাঁপাতে হাঁপাতে যখন বাজারের ভেতর ছোট্ট জটলার কাছে এলো তখন চিৎকার শুনতে পেলো লোকের ঃ শালা চোর, বদমাশ! এইটুকুন পুলা, গিট্রে শয়তানী!

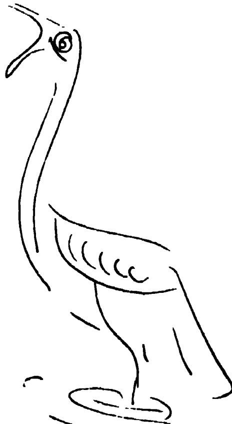
ঃ মারো শালা মুখে লাথ্থি! ভুঁড়ি গলিয়ে দাও কুত্তাটার!

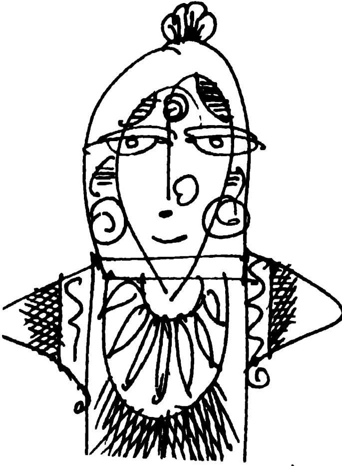
ভিড় ঠেলে হুড়মুড় করে ঢুকলো ফকিরের মা। ধুলোয় গা-হাত-পা মাখামাখি হয়ে মাটিতে অসহায়ের মত পড়ে আছে তার ক্ষীণশক্তির শিশু, একটি কিশোর—ফকির আলি। ঝুড়িটির পাত্তা নেই। ছেঁড়া প্যান্ট আরো ছিড়ে গেছে, শরীরে প্রহারের চিহ্ন ফুলে ফুলে উঠেছে। শরীরে শক্তি নেই, উঠে দাঁড়াবারও শক্তি নেই, পড়ে পড়েই লাথি খাচ্ছিল। ভিড় ঠেলে ঢুকেই ছেলের বুকে আছড়ে পড়ল ফকিরের মা। তারপর সামলে নিয়ে বুকে চেপে ধরে আশেপাশে তাকাল। ঠিক যেন অনেকগুলো চিল একটি ফুটফুটে মুরগি-ছানাকে ছোঁ মারতে উদ্যত, আর ছানার মা তাকে ডানা দিয়ে ঢেকে রেখেছে!

ভিড়টা একটু পিছিয়ে গেল মেয়ে মানুষ দেখে। কিন্তু সেই সায়েবটি এবং কয়েকজন বীর তখনও ফুঁসছেন ঃ শালার চোর! শয়তান! মাথা ভাইঙ্গা ফালামু!

ফকিরের মা হঠাৎ তীব্র ঝাঁঝ-মেশানো-গলায় ফকিরকে শুধায় ঃ সেদিন তাইলে তুই চুরি করসিলি! এ্যাঁ? তুই চোর!

ফকির তাকালো প্রথমে সকলের দিকে। তারপর মায়ের দিকে। তার মায়ের হাতে লেপটানো ছোট্ট শরীর থরথর করে কাঁপছে, কিন্তু মা দেখলো তার চোখ মুখ ঠোঁট দৃঢ়ভাবে স্বাভাবিক। সে অভিযোগ অস্বীকার করলো না অথচ তার সমস্ত মুখে দোষ-স্বীকারের কোন চিহ্নও নেই।





গয়নার বাক্‌সো

শেখর বসু

কাকিমা এদিক-ওদিক কী যেন খুঁজে চাপা গলায় বললেন, "আমার গয়নার বাকসো!" তারপর হতভম্ব হয়ে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকার পরে ছুটে গিয়ে স্টীলের আলমারির পাল্লা খুলে ফেললেন। আলমারি তন্ন-তন্ন করে খুঁজেও গয়নার বাকসো পাওয়া গেল না। কাকিমার গায়ের রঙ লালচে-ফর্সা, কিন্তু এখন একেবারে কাগজের মতো সাদা দেখাচ্ছিল। কাকিমা কাঁপা-কাঁপা গলায় আবার বললেন, "আমার গয়নার বাকসো!"

ঘরে আমি ছাড়া আর কেউ ছিল না। বললাম, "পাচ্ছেন না?" কাকিমা আমার কথার কোনো উত্তর না দিয়ে কাঠের আলমারিটা খুলে ফেললেন এবার। স্টীলের আলমারিতে কাকিমা আস্তে আস্তে খুঁজছিলেন, এবার তাড়াতাড়ি। এত তাড়াতাড়ি যে এটা-সেটা পড়ে যাচ্ছিল মাঝেমধ্যে। আমি তুলে দিচ্ছিলাম, কিন্তু কাকিমা এদিকে নজরই দিচ্ছিলেন না। খোঁজা শেষ করে কাকিমা আরও ফ্যাকাশে হয়ে বললেন, "নেই! কী আশ্চর্য! গেল কোথায়?"

আমি বললাম, "কোথায় রেখেছিলেন, মনে নেই?"

কাকিমা এবারও আমার কথায় কোনো উত্তর দিলেন না। না দিয়ে টেবিলের ড্রয়ার, শো-কেস খোঁজার পরে বেশ চেঁচিয়ে বললেন, "আমার গয়নার বাকসো চুরি হয়ে গেছে!" কাকিমা কথাটা এত চেঁচিয়ে বলেছিলেন যে তিন সেকেণ্ডের মধ্যে এ-ঘরে সবাই চলে এল। বাড়ির লোক বলতে আমরা বাদে তিনজন কাজের লোক আর ছোটকাকা। কাকাবাবু এখন এখানে নেই, অফিসের কাজে দিল্লী গেছেন।

ছোটকাকা সবে কলেজে ঢুকেছে। গম্ভীর হয়ে বলল, "অবাক কাণ্ড! গয়নার বাকসোটা তুমি ব্যাঙ্কের লকারে রেখে আসোনি তো?"

"না। বাকসোটা তো বছরখানেক হল বাড়িতেই আছে।"

"সে কী, অতগুলো গয়না তুমি বাড়িতেই রেখে দিয়েছ! ব্যাঙ্কের লকার রাখার মানে কী

তাহলে ? বাড়ির পাশেই ব্যাঙ্ক !"

কাকাবাবু চটে গেলে যেভাবে কথা বলেন, কথাগুলো ঠিক সেভাবেই বলল ছোটকাকা। কাকিমা রীতিমত ভেঙে পড়ে বললেন, "কী হবে এখন !"

ছোটকাকা আরও গম্ভীর হয়ে বলল, "পুলিশে খবর দিতে হবে।"

"পুলিশ" শব্দটা কানে যেতেই আমি বুঝতে পারলাম, ব্যাপারটা সত্যিই খুব গুরুতর। এদিক-ওদিক সতর্ক চোখে তাকিয়ে ছোটকাকা বলল, "আচ্ছা, গয়নার বাকসোটা তুমি ঠিক কোথায় রেখেছিলে ?"

কাকিমা থেমে-থেমে বললেন, "মনে হচ্ছে, বিছানার ওপর।"

ছোটকাকা একটু খোঁচা দিয়ে বলল, "মনে হচ্ছে ?"

কাকিমা এবার আমতা-আমতা করতে লাগলেন। "হ্যাঁ, মানে, বিছানার ওপরেই তো, এই তো এখানেই।"

"গয়নার বাকসো খোলা জায়গায় ফেলে রাখো কেন ?"

"ফেলে রাখিনি। এক-একবার মনে হচ্ছে, আলমারিতেই তুলে রেখেছিলাম।"

"চাবি দেওয়া ছিল আলমারিতে ?"

"হ্যাঁ।"

"চাবি ছিল কোথায় ?"

"আলমারির সঙ্গে লাগানোই ছিল।"

ছোটকাকা ঠিক কাকাবাবুর ভঙ্গিতে বলল, "তাহলে আর চাবি লাগানোর মানে কী ?"

কথাটা বলার পরে ছোটকাকা চোখ বন্ধ করে কী যেন ভাবল, তারপর চোখ খুলে বলল "আজ বাইরের লোক কে-কে এসেছিল এ বাড়িতে ?"

কাকিমা এ কথার কোনো উত্তর দিলেন না। তখন ছোটকাকা নিজেই উত্তর খুঁজতে লেগে গেল। দেখা গেল, সকালে থেকে বিকেলের মধ্যে এ বাড়িতে এসেছে কাজের লোকদের একজন আত্মীয়, ছোটকাকার তিন বন্ধু, কাকিমার চেনাশোনা মিসেস সিন্‌হা আর আমার বন্ধু লালটু।

ছোটকাকা এবার সবার দিকে চোখ ছোট করে তাকিয়ে বলল, "এ-বাড়ির কাউকেই আমি ছাড়ব না। দরকার হলে এক-এক করে সার্চ করব সবাইকে।"

সার্চ করার কথা শুনে আমি সবার আড়ালে নিজের পকেট দুটো দেখে নিলাম একবার। বলা তো যায় না যদি ভুল করে পকেটে ঢুকিয়ে রাখি। গয়নার বাকসো অবশ্য আমার এই ছোট্ট পকেটে ঢুকবে না, তবু ··· । আসলে পুলিশের কথা আমার মাথার মধ্যে ঘুরছিল সমানে।

সবাই মিলে সারা ঘর আর একবার তোলপাড় করে খোঁজা হল, কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না গয়নার বাকসো। কাকিমার মুখ এখন প্রায় কাঁদো-কাঁদো। সেদিকে তাকিয়ে ছোটকাকা বলল, 'এক কাজ করলে হয় না। আমি একজন গুণীকে জানি। অল্প বয়েস, কিন্তু সত্যিই গুণী। বাটি চালিয়ে হারানো জিনিস খুঁজে দিতে পারে। না পারলে এক পয়সাও নেয় না। ডাকব ?"

কাকিমা একেবারে ভেঙে পড়ে বললেন, "আমি আর কিছু ভাবতে পারছি না। যা পারিস কর্। তাড়াতাড়ি।"

"আচ্ছা বৌদি, গয়নাগুলোর দাম কত হবে ?"

"হাজার-পঞ্চাশ তো বটেই।"

মাথায় হাত দিয়ে ছোটকাকা বলল, "পঞ্চাশ হাজার ! তুমি তো তাও আবার পুরনো দিনের



হিসেব বলছ। এখনকার হিসেবে ওই গয়নার দাম লাখ-দুয়েক তো হবেই।"

গয়নার দাম শুনে কাকিমা আঁতকে উঠলেন।

ছোটকাকা কাকিমাকে অভয় দিয়ে বলল, "একদম ঘাবড়িও না। দেখা যাক কী করতে পারি। প্রথমে নিজেরা চেষ্টা করব, না পারলে পুলিশ, পুলিশ না পারলে প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সিকে খবর দেব।"

কাকিমা অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, "তুই বাটি-চালা না কিসের কথা যেন বলছিলি ?"

"হ্যাঁ, এক্ষুণি খবর দিচ্ছি। মস্ত বড় গুণী। গয়না খুঁজে বার করতে না পারলে এক পয়সাও নেয় না। কিন্তু পেলে, একটু ভাল রকমের দক্ষিণা নেবে, এই ধরো হাজারখানেক টাকা।"

কাকিমার চোখে জল এসে গেছে প্রায়। কোনোরকমে বললেন, "দুলাখ টাকার জিনিস খুঁজে দেওয়ার জন্যে এক-দু হাজার কোনো টাকাই নয়। আমার মনে হয়, চোররা এতক্ষণ সব গয়না গালিয়েও ফেলেছে।"

"অসম্ভব নয়, আজকালকার চোররা অসম্ভব সেয়ানা। ঠিক আছে, আমি এক্ষুণি যাচ্ছি, গুণীকে পাই কিনা দেখি।"

ছোটকাকা প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে।

কাকিমার কষ্ট দেখে আমারও খুব কষ্ট হচ্ছিল। বারবার মনে হচ্ছিল, আমি যদি ক্লাস ফাইভের বদলে টেনে পড়তাম তাহলে হয়ত এই বিপদের দিনে কাকিমার পাশে দাঁড়াতে পারতাম অনায়াসে! আমার আক্ষেপ আরও বাড়তে যাওয়ার মুখে ছোটকাকা বাটি-চালার কথা বলেছিল। বাটি-চালা আবার কী জিনিস? জীবনে শুনিনি তো! কাকিমাকে এই নিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করতেও সাহস হচ্ছিল না। কাকিমার যা মুখের চেহারা এখন!

ঘণ্টাখানেক বাদে ছোটকাকা ফিরে এল। সঙ্গে ছোটকাকাদের বয়সী আর একটি ছেলে। পরনে ধুতি, গায়ে চাদর। ঠিক এইরকম চেহারার পুরুতমশাই সরস্বতী পুজোর সময় দেখা যায় দু'চারজন। এই কি সেই গুণী ? এই কি বাটি চালায় ?

গুণীকে দেখে সারা বাড়ি ব্যস্ত হয়ে উঠল একসঙ্গে। তবে, কারও মুখে কোনও কথা নেই। কাকিমা অসম্ভব মুখ ভার করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কী ভাবে খবরটা যেন ছড়িয়ে পড়েছিল চারদিকে। আশেপাশের বাড়ির দুচারজন কৌতূহলী মুখে দূরে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করছিল নিজেদের মধ্যে।

একটা ছোট মাপের কাঁসার বাটি মেঝের ওপর উপুড় করে রাখল গুণী। তারপর ছোটকাকার দিকে তাকিয়ে গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞেস করল, "আপনার কী রাশি ?"

ছোটকাকা মৃদু গলায় কী যেন বলতেই গুণী বলল, "ঠিক আছে, আপনাকে দিয়ে চলবে। আপনি মেঝেয় বসে বাটির ওপর হাত দিন। আমি এখন মন্ত্র পড়ছি। মন্ত্র পড়া হয়ে গেলে, বাটি আপনাকে নিয়ে দৌড়বে। আপনি বাধা না দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে যাবেন। বাটি আপনাকে হারানো গয়নার কাছে নিয়ে যাবে। অবিশ্যি, গয়না যদি বাড়ির মধ্যে থাকে। গয়না বাড়ির বাইরে চলে গেলে আমার আর কিছু করার নেই।"

ছোটকাকা উবু হয়ে বসে বাটির ওপর হাত রাখতেই গুণী মন্ত্র পড়তে শুরু করে দিল। কী-সব কঠিন-কঠিন মন্ত্র, শুধু অনুস্বার, চন্দ্রবিন্দু আর বিসর্গ। একটা শব্দেরও মানে বুঝতে পারছিলাম না আমি।

ছোটকাকা আর গুণীকে ঘিরে সবাই দাঁড়িয়ে। কারও মুখে কোনো কথা নেই। হঠাৎ বাটি

নড়ে উঠল। তারপর খুব জোরে ছুটে গেল কাকিমার শোবার ঘরের দিকে। বাটির ওপর ছোটকাকার হাত, ছোটকাকা হামাগুড়ি দিয়ে ছুটছিল বাটির পেছন-পেছন।

বাটি থমকে গেল শোবার ঘরের দরজায়। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে শাঁ করে ঘুরে ছুটল রান্নাঘরের দিকে। রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে হঠাৎ ডানদিকে ঘুরে বসার ঘরে গিয়ে ঢুকল। বাটির পেছন-পেছন আমরাও। ঘরের মাঝখানে কার্পেট পাতা, সেই কার্পেটের অর্ধেক উলটে দিল বাটি। তারপর পেডেস্টাল ল্যাম্পের পাশ দিয়ে ছুটে কোণের রঙিন মোড়াটাকে ধাক্কা মারল। ধাক্কা খেয়েই মোড়া উলটোল, আর মোড়া উলটোতেই বেরিয়ে পড়ল গয়নার বাকসো।

কাকিমা প্রায় ছুটে গিয়ে ছোঁ মেরে বাকসোটা তুলে ডালা খুলে ফেললেন। বাকসোর মধ্যে থরে-থরে সাজানো একগাদা গয়না। কাকিমার মুখে হাসি আর ধরে না। সব দেখেশুনে বললেন, "ঠিক আছে, কিচ্ছু খোয়া যায়নি।"

কাকিমা গুণীকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, "নগদ হাজার টাকা এখনতো বাড়িতেই নেই। যা আছে দিচ্ছি, বাকিটা কাল দিয়ে দেব।"

গুণী সত্যিই গুণী, লাজুক মুখে বললেন, "ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই। আপনি আপনার সুবিধেমতো অসিতাভর হাত দিয়ে টাকাটা পাঠিয়ে দেবেন।" অসিতাভ ছোটকাকার নাম।

গুণী চলে যাবার পরেও বাইরের ভিড় অনেকক্ষণ ছিল এ বাড়িতে। মন্ত্রশক্তি নিয়ে নানান ধরনের গল্প হল। তারপর প্রশ্ন উঠল, কে চোর? বাড়ির কেউ, নাকি বাইরের? দিন-সাতেক এই নিয়ে বিস্তর গবেষণা হল, কিন্তু সন্দেহজনকরা সন্দেহজনকই থেকে গেল শেষ পর্যন্ত। চোর আর ধরা পড়ল না।

এই ক'দিনে বাটি-চালার আশ্চর্য ঘটনা আমি ডেকে-ডেকে সবাইকে শুনিয়েছি, কিন্তু কখনোই ভাবতে পারিনি, আমার জন্যে মস্ত একটা চমক অপেক্ষা করছে শিয়ালদা স্টেশনে।

আমি আর ব্রজদা স্টেশনে গিয়েছিলাম ছোটকাকাকে ট্রেনে তুলে দিতে। ছোটকাকা বন্ধুদের সঙ্গে দার্জিলিং যাবে। হঠাৎ দেখি ছোটকাকার তিন বন্ধুর মধ্যে সেই গুণী। গুণীর পরনে অবশ্য ধুতি চাদরের বদলে প্যান্ট শার্ট।

ছোটকাকাকে গুণীর কথা জিজ্ঞেস করতেই সে কী হাসি সবার। ব্রজদাও হাসছিল ওদের সঙ্গে। হাসতে হাসতে ছোটকাকা আমাকে বলল, "খবর্দার! এর কথা বাড়িতে কাউকে বলবি না। ফিরে এসে মজা হবে খুব।"

দার্জিলিং থেকে আটদিন বাদে ফিরে আসার পরে সত্যিই খুব মজা হয়েছিল বাড়িতে। মজার আসরে কাকাবাবুও ছিলেন। সব শুনে কাকাবাবু হাসতে হাসতে কাকিমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "খুব ভাল হয়েছে। তোমার একটা শিক্ষা হওয়ার দরকার ছিল। গয়নার বাকসো এখন থেকে আর যেখানে-সেখানে ফেলে রেখো না।"

সেই নকল গুণী ছোটকাকার কলেজের নতুন বন্ধু। নাম বরুণ, বরুণকাকা খুব মজা করতে পারে। একটু হেসে বলল, "না বৌদি, মাঝেমধ্যে এদিক-সেদিক ফেলে রাখবেন। না হলে আমাদের হাজার টাকাও জুটবে না, বেড়ানোও হবে না।"

কাকিমা চোখ পাকিয়ে বললেন, "বাঁদর কোথাকার! দাঁড়াও মজা দেখাচ্ছি।"

এবারের মজাটা আরও মজার। কাকিমা ট্রে ভর্তি করে রসগোল্লার পায়েস নিয়ে এলেন। আমরা সবাই পেট পুরে খেলাম।



লোকটা

এখ্‌লাসউদ্দিন আহ্‌মদ

মাথা ভরা প্রকাণ্ড এক টাক। তেল চকচকে। কপালের সংগে মিলেমিশে একাকার। হঠাৎ করে দেখলে সেখানে কপালটাকে আলাদা করে নেয় সাধ্য কাব।

টাকের তিন পাশ বেয়ে ঝালরের মত কয়েক গোছা চুল নীচের দিকে নেমে এসেছে। কুতকুতে চোখ। দু'চোখের ঠিক উপর বরাবর সাদা ধবধবে দুই ভুরু। যেন আঠা দিয়ে সেঁটে দেওয়া দু টুকরো শিমুল তুলো। ভুরু পেবিয়েই কয়েকটা গভীব খাঁজ। মনে হয় বাজ্যিব দুরুহ সমস্যাবলী তাঁর উপব ন্যস্ত।

রোগা, লম্বা টিংটিংয়ে। পরণে ঝোলা পাঞ্জাবী ও চুড়িদার পায়জামা। মুখে একরাশ চিন্তা ভাবনার মাখামাখি। সামনের দিকে বেশ একটু ঝুঁকে পড়া। এই লোকটাকে আমবা দেখি অহরহ এবং যত্রতত্র।

একএকদিন দেখতাম, কপালে বাড়তি কতকগুলো ভাঁজ ফেলে, ভুরু দুটোকে গুটিয়ে কাছাকাছি টেনে নিয়ে এসে, গম্ভীর মুখে হন হন করে কোথাও হেঁটে যাচ্ছেন, কিম্বা রাস্তাব কোন মোড়ে চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। আঙুলটা ঠোঁটের উপর উঠে এলো। চুপচাপ কাটলো কিছুক্ষণ। ভাবখানা, এই মাত্র কি যেন তিনি ভাবছিলেন এবং ভাবতে ভাবতে ভাবনার খেইটাই হারিয়ে ফেলে আবার ধরার চেষ্টা করছেন।

এই অবস্থাতেই মাঝে মাঝে আবার দেখা যায়, আশপাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া ; তিনি যিনিই হোননা কেন, হাত বাড়িয়ে খপ করে তাঁর হাত ধরে দাঁড় করিয়ে কি যেন জিজ্ঞেস করছেন। কেউ কেউ উত্তর দেন। কেউ কেউ আবার দেখি বিরক্তির সংগে মুখ ঝামটা দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পা বাড়ান।

লোকটাকে দেখা গেছে, কারো জবাব শুনে মুখটাকে আরও গম্ভীর করে হাত ছেড়ে দিতে।

আবার কারো কারো জবাবে দেখেছি হঠাৎ করে উৎফুল্ল হয়ে উঠতে। চোখ মুখের এমন ভাব যেন হঠাৎ করে হারিয়ে যাওয়া মণি-মাণিক্য হাতের নাগালে পেয়ে গেছেন।

সব চেয়ে মজার ব্যাপার হলো, এই লোকটার সংগে আমার আলাপ করার সুযোগও কোন দিন হয়নি। এমন একজনও পরিচিত কাউকে দেখি নি, এই লোকটার সংগে মৌখিক আলাপ আছে। অথচ এক পাড়াতেই আমরা বেশ কয়েক বছর ধরে এক নাগাড়ে বসবাস করছি। প্রতিদিন না হোক, প্রায়ই চোখে পড়ে, দেখি, এই পর্যন্ত, ব্যাস!

কিন্তু আজ এই ভর দুপুরবেলা সে লোকটা আমাকে প্রায় হকচকিয়ে আমারই বৈঠকখানার প্রায় মাঝখান বরাবর সশরীরে এসে হাজির হবেন তা আমি কস্মিনকালেও ভাবিনি।

জৈষ্ঠির দুপুর। কাঠ ফাটা রোদ বাইরে। রাস্তা ঘাট কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা। খাঁ খাঁ করছে চারদিক। ঘরেও তিষ্টোনোর উপায় নেই গরমে। ভ্যাপসা গুমোট গরম। কিন্তু তা সত্ত্বেও মনটাকে এক জায়গায় করে গুটিয়ে আনার চেষ্টা করছি। সকাল থেকেই কাগজ কলম টেবিলে তৈরী। পত্রিকার তাগিদ। যে ভাবেই হোক দু'চার দিনের মধ্যে একখানা গল্প দিতেই হবে। দু'চার দিনের আজই তিন'দিন পার হয়ে গেলো বলে। শেষদিন আগামী কাল। যা করার আজই করতে হবে। অথচ এখন পর্যন্ত কোন কিছুই ঠিক করতে পারিনি যে কি লিখবো?

চরম অস্থিরতার মধ্যে ঘরময় পায়চারী করে, 'যা হয় একটা কিছু লিখে ফেলি' এই ভাব নিয়ে সবেমাত্র কাগজপত্র ঠিক করে, কলমটাকে বাগিয়ে ধরে কাগজের উপর ছুঁইয়েছি। ঠিক তখনই, বলা নেই কওয়া নেই দরজা ঠেলে হুড়মুড় করে ঘরেব মধ্যে ঢুকে পড়ে, ব্যস্তসমস্ত হয়ে বারকয়েক ঘরের চারপাশটা চোখ বুলিয়ে, হঠাৎ করে আমার দিকে তাকিয়ে, চোখ দুটো টান টান করে আঙুলটা ঠোটের উপর উঁচিয়ে নিয়ে, ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করলেনঃ আচ্ছা, কি যেন ভাবছিলাম বলো তো?

বোঝ ঠ্যালা! আলাপ নেই পরিচয় নেই। কোন দিন কোন রকম বাক্যালাপও হয়নি। হঠাৎ করে এমন ভর দুপুরে, হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে দুম করে এ রকম একটা প্রশ্নে অবাক না হয়ে কি কেউ পারে? আমিতো প্রায় হকচকিয়ে গেলাম। বোকার মত বার কয়েক ঢোঁক গিলে আমতা আমতা করে বললামঃ আজ্ঞে?

আরও একটু কাছে সরে এসে চোখ দু'টো মিটমিটিয়ে গলাটা খাটো করে বললেনঃ বলছিলাম কি, খেই হারিয়ে ফেলেছি, বুঝলে? খেই হারিয়ে ফেলেছি। সকাল থেকে কি যেন একটা কথা ভাবছিলাম। ভাবতে ভাবতে যেই না একটা সমাধান প্রায় পেয়ে গেছি, ঠিক সেই সময়টাই ফেললাম খেই হারিয়ে। যেটা নিয়ে ভাবছিলাম, সেটাই ফেললাম হারিয়ে। এখন সমাধানটা নিয়ে কি করি বলোতো? মূলটাই যখন নেই, সমাধানটা নিয়ে আর কি হবে, এ্যাঁ?

কিছুক্ষণ থেমে, আবার বলে উঠলেনঃ বুঝলে, সকাল থেকে ভাবনার বিষয়টা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি, কিন্তু পাচ্ছি না খুঁজে। রাস্তাঘাটে কেমন কাউকে পেলাম না যে জিজ্ঞেস করে নেবো বিষয়টা। তাই তোমার কাছে ছুটে এসেছি। আচ্ছা, বলতে পারো ঠিক কি ভাবছিলাম?

জবাব না দিয়েই শশব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালাম আমি। ইতিমধ্যে হতচকিত ভাবটা আমার কিছুটা কেটে গেছে। এ লোক নির্ঘাত দার্শনিক না হয়ে যায় না। আপ্যায়নে ব্যস্ত হয়ে উঠলাম।

বললামঃ বসুন বসুন।

তিনি বসলেন। এবং বসার প্রায় সংগে সংগে পুনরায় প্রশ্নটা আমার দিকে ছুঁড়ে মারলেনঃ কি যেন.......

অত্যন্ত বিনয়ের সংগে বললাম ঃ আজ্ঞে, কি যেন একটা বলছিলেন, 'সমাধান' না কি। সেটা শুনলে হয়তো বা সূত্রটা খুঁজে বার করা যাবে। যদি দয়া করে ঐ সমাধানের কথাটা একটু খুলে বলেন।



ভদ্রলোক হঠাৎ করে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, এবং ঠিক তেমনিই উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলেন ঃ জ্ঞাতিগুষ্ঠি, সাংগপাংগ সব্বাইকে, হাত পা মুখ বেঁধে, একটা বড় ছালার মধ্যে ভরে হয় বুড়িগংগা না হয় চাটগাঁর কর্ণফুলিতে ভাসিয়ে দিলেই সব ল্যাঠা চুকে যাবে।

আমার তো চক্ষু চড়ক গাছে। বলে কি লোকটা, এ্যাঁ ? জলজ্যান্ত লোকগুলো, সে যেই হোক

না কেন, হাত পা বেঁধে পানিতে ফেলে দেবে ? সর্বনেশে 'সমাধান' দেখি।

বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা ভাবনা করে, অবশেষে নাকের ডগা ও মাথাটা বারকয়েক চুলকে নিয়ে বিজ্ঞের মত ধীরে ধীরে বললুম ঃ কোন গল্পের প্লট ফ্লট, এই আর কি মানে...

কথাটা আমার শেষ না হতে হতেই ঘরেব মধ্যে যেন ছোটখাটো একটা বোমা ফাটলো। রীতিমত খেঁকিয়ে উঠলেন তিনি ঃ গল্প। গল্পের প্লটের কথা বলছো ? আরে ছোঃ ওসব নিয়ে আবার কেউ চিন্তা ভাবনা করে না কি, এ্যাঁ ? বলিহারি যাই তোমাদের। গল্প একটা বিষয়, তার আবার চিন্তা ভাবনা করে সমাধান খোঁজা ? যত্তোসব।

গল্প সম্বন্ধে এমন তাচ্ছিল্যপূর্ণ মন্তব্যে আমার কান মাথা গরম হয়ে উঠ্লো। ভিতর ভিতর কোথায় যেন একটু অপমানিত বোধ করতে লাগলুম। বলে কি লোকটা ? গল্প লেখা যেন ছেলেখেলা। অথচ এরই তাড়নায় হাতে গোনা চার চারটে দিনের তিন তিনটে দিন কি লিখবো এই অস্থিরতার মধ্যে কাটিয়ে দিলাম।

লোকটা হাত নাড়িয়ে নাড়িয়ে অনর্গল বকেই চলেছেন ঃ হ্যাঁ, কি যেন বলছিলে ? গল্প, আরে লেখা আবার কঠিন কাজ নাকি ? একটা দুটো কি ? হাজারো গল্প আমার জানা আছে। এই যেমন ধরো, একটা লোক। মাস পয়লা মাইনে পেয়ে, পকেটের চিমসে ম্যানি ব্যাগটাকে কোলা ব্যাঙ ফোলা ফুলিয়ে বিশ পদের মাসিক ফর্দটা আঙুলের ফাঁকে নিয়ে বাজারে ঢুকলেন। মিনিট পনেরো পরেই ফর্দের সাত নম্বরে পৌঁছাতেই, ব্যাঙ ফোলা ব্যাগটা চুপসে একসা। ঘেমে ঘুমে কোন মতে টলতে টলতে বাজারের বাইরে এসে দাঁড়ালেন। এর পর বেশ কিছুক্ষণ ভদ্রলোক আর কিছুই জানেন না। যখন জ্ঞান হলো, তখন দেখলেন তিনি বাড়ির সামনে দাঁড়ানো, রিক্সাওয়ালা ভাড়া চাচ্ছে। পাঁচ টাকা। ভদ্রলোক জামার প্যান্টের এপাশ ওপাশের সব ক'টা পকেট হাঁতড়েও রিক্সার ভাড়াটা আর পূরণ করতে পারেন না। বাড়ির দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবতেই অজানা এক আশংকায় মুখটা কালো হয়ে গেলো। কি আর করেন, অগত্যা পাশের বাড়ীর কাজের ছেলেটাকে চোখ ইশারায় এক পাশে সরিয়ে নিয়ে, মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে 'বাবারে', 'বাছারে' ব'লে, অবশেষে নানান শর্তের মৌখিক চুক্তিতে, তার সাহায্যে ভাড়াটা মিটিয়ে ঘরে ঢুকলেন। কিছুক্ষণ নি' স্তব্ধ। পর মুহূর্তেই বিচিত্র ধরনের শব্দের বিস্ফোরণ। চকিতে বাতাসে ভর করে গোটা দুই আলু দু'একটা পটল রাস্তার উপর এসে হুমড়ি খেয়ে পড়লো। এর পর আর কি ? বাকি ঊনত্রিশটা দিন বাড়িটার 'তি নজর রাখো আর কান পাতো, লিখে শেষ করতে পারবে না।

এক নাগাড়ে কথাগুলো শেষ করে বার পাঁচেক জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিলেন তিনি। তারপর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার কিছু বলে উঠার আগেই, বলতে সুরু করলেন ঃ কিম্বা ধরো, সেই লোকটাই। বেশ কিছু বছর পর মাস পয়লা মাইনেটা নিয়ে বাজারে গেছে। বাজারে ঢুকেই দেখে চালের বাজার। বিরাট বিরাট উঁচু করা চালের ঢিপি। তার উপর আসন পিঁড়ি হয়ে তেল চকচকে নাদুস নুদুস কয়েকজন লোক। লোকটা তাদের সামনে মুখটা কাঁচুমাচু করে, মিনমিনে গলায় বললো, পঞ্চাশ টাকার চাল দাওতো।

চালওয়ালা আড়চোখে একবার তার দিকে তাকালো, তারপর দু'তিন মুঠো চাল খামচা মেরে লোকটার থলেয় ঢালতে ঢালতে বিনয়ের হাসি হেসে বললো ঃ হেঁ হেঁ পঞ্চাশ টাকার চাল মাপার অতো ছোট বাটখারা তো নেই ভাই সাব। তবে কি না কম হবে না। আপনি আমার বাপ দাদার আমল থেকে চাল নিচ্ছেন, আপনাকে কি কম দিয়ে পারি ? বরং পুরোপুরি তিন তিন মুঠিতে আমার লোকসানই হয়। হেঁ-হেঁ-হেঁ ....'

এরপর লোকটার অবস্থাটা একবার চিন্তা করো। যত ভাববে লিখে আর শেষ করতে পারবে না।

চুপ করলেন তিনি। পকেট থেকে রুমাল বের করে টাকটা একটু মুছে নিলেন। সেই সংগে মুখটাও। পকেটে রুমালটা রাখতে রাখতে বললেনঃ আমায় এক গ্লাস পানি খাওয়াতে পারো? ঠাণ্ডা পানি।

ঃ নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। এটা আর পারবো না, বলেন কি? ছুটলাম তড়ি-ঘড়ি পানি আনতে।

বড় এক গ্লাস পানি তাঁর হাতে দিতে না দিতেই এক নিঃশ্বাসে ঢক ঢক করে খেয়ে নিয়ে, আবার বলতে সুরু করলেনঃ বুঝলে, মাঝে মাঝে আমার এক মজার কথা মনে হয়। মনে হয় সামনেই বিরাট একটা পাহাড়। যেমন উঁচু তেমনি খাড়াই। সেই পাহাড়টার এক্কেবারে তুঙ্গে নানান রংয়ের জাব্বাজোব্বা পরা বেশ কিছু লোক নরম গালিচায় গা এলিয়ে বসে। প্রত্যেকেরই দু'হাতে দুই লালটু লাটিম। কেউ কেউ রং-বেরংয়ের ঝুমঝুমি বাজিয়ে, নিচের দিকে তাকিয়ে সুর করে ডাকছে, আয় আয় আ--য়। আর সেই সুরের তালে তালে, প্রায় নাচতে নাচতে, হাত পা ছাড়াই কতকগুলো প্রায় অসংখ্যই বলা যায়, বোঁচকার মতো, সব কি যেন সেই পাহাড়চূড়োয় গালিচা পেতে বসে থাকা লোকগুলোর দিকে তরতর করে পাড়ি জমাচ্ছে। প্রত্যেকের পিঠেই সাদা কাগজের উপর বড় বড় করে "চাল" "ডাল" "তেল" "লবণ" ইত্যাদি লেখা। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো কি, এইগুলোর পিছন পিছনে প্রত্যেকেই, মানে, আমি তুমি এ ও সে আমরা সবাই আমাদের শেষ পুঁজিটা পর্যন্ত হাতের মুঠোয় নিয়ে প্রাণপণে হাঁপাতে হাঁপাতে হোঁচট খেতে খেতে, হামাগুড়ি দিয়ে ঐ লেবেল আঁটা জিনিসগুলো ধরার চেষ্টায় উপরমুখো উঠতে চেষ্টা করছি। অল্পকিছু লোক ওগুলোর সংগে তাল মিলিয়ে উপরে উঠছে, কেউ কেউ আবার দেখছি, বোঁচকাগুলোর আগেই তরতর করে, গালিচার উপর এলিয়ে থাকা মানুষগুলোর কাছ বরাবর পৌঁছে যেতে না যেতেই তাদের হাত ধরে গালিচার উপর টেনে তুলে নিচ্ছে। আর আমরা যারা উপরে উঠার চেষ্টায় আঁকপাঁক করছি, তাদের সে এক চরম দুরবস্থা। কেউ মুখ থুবড়ে পড়ে আর উঠছে না। কেউ কেউ আবার জেদের বশে তরতর করে ছুটে উঠতে গিয়ে পা ফসকে এক্কেবারে খাদে পড়ে অক্কা। কারো আবার সারা শরীরে রক্ত ঝরছে ঝরঝর করে। কাউকে দেখা যাচ্ছে ড্যাবড্যাবে চোখ বার করে শুধু ছটফটই করে যাচ্ছে, এগুতে পারছেনা এক পাও। অধিকাংশই খাড়াই পাহাড়টার একেবারে নিচের দিকে মাটিতে বুক বিছিয়ে জিভ বার করে উপর দিকে তাকিয়ে ধুঁকছে। গলা দিয়ে কোন স্বর বেরুচ্ছে না তাদের। চোখ দু'টো দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত ঝরছে। বিশ্বাস করো, সব মিলিয়ে সে যেন এক বীভৎস ব্যাপার স্যাপার। সহ্য করতে পারি না। কোন মতে চোখ বন্ধ করে ফেলি।

এই পর্যন্ত বলে লোকটা চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। কোন সাড়াশব্দ নেই। আমিও চুপ। কোন কথা বলতে পারছি না। লোকটা কথাগুলো এমনভাবে বলছিলেন যে, শুনতে শুনতে কেমন যেন নিজেকে বোকা বোকা বলে মনে হচ্ছিলো আমার।

হঠাৎ করে লোকটা আবার কথা বলে উঠলেনঃ আচ্ছা, হঠাৎ করে তোমার এই গল্পের-প্লটের কথা মনে হলো কেন? গল্প টল্প লেখো বুঝি, এ্যাঁ?

মাথাটা একটু নেড়ে জবার দিলামঃ তা একটু আধটু মাঝে মাঝে লিখে থাকি।

ঃ কোথায় লেখো? খবরের কাগজে টাগজে লেখো না কি?

মাথা নেড়ে স্বীকার করলাম, মাঝে মধ্যে লিখে থাকি।

শুনে চুপ করে থাকলেন কিছুক্ষণ। তারপর সরাসরি আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন ঃ আচ্ছা, একটা কথা ঠিক করে বলো তো। এই ধরো তোমরা যারা লেখো টেখো তারা কিছু কিছু শব্দ একেবারে কোনকিছু না ভেবেই যত্রতত্র ব্যবহার করো কেন বলো তো ?

কথা শুনে আমি তো প্রায় হতভম্ব। কোন্ এমন শব্দ রে বাবা, যা না ভেবে চিন্তেই আমরা ব্যবহার করি ? ভেবে তো আমি কোন কূল কিনারাই পেলাম না। সঙ্কোচের সংগে জিজ্ঞেস করলাম ঃ আজ্ঞে কোনটা ? কোন শব্দগুলো বলুন তো ?

সঙ্গে সঙ্গে তিনি জবাব দিলেন ঃ কেন, আগুন ? এই 'আগুন' শব্দটা কি তোমরা ভেবে চিন্তে ব্যবহার করো ? প্রতিদিনই কাগজে দেখি, সমস্ত কাগজটা জুড়ে শুধু 'মাছের বাজারে আগুন' 'চালের বাজারে আগুন' 'আলু পটলে আগুন' 'মাংসে আগুন'—এই যে শুধু আগুন আর আগুন, এগুলো কি তোমরা ভেবে চিন্তে ব্যবহার করো ? আমার তো মনে হয় মোটেই না। ঠাণ্ডা মাথায় একবার একটু ভেবে দেখো তো, ব্যাপারটা যদি সত্যি সত্যি একদিন ঘটে যায়, তা হলে কি এক সাংঘাতিক কাণ্ডটাই না ঘটে যাবে।

এই পর্যন্ত বলেই সমস্ত শরীরটা একটু ঝাঁকুনি দিয়ে চোখ দুটো বন্ধ করে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর চেয়ারটা দু'হাত দিয়ে ধরে আমার কাছাকাছি সরিয়ে নিয়ে এসে আবার বলতে সুরু করলেন ঃ প্রত্যেক জিনিসের একটা সীমারেখা আছে, জানো তো ? না কি ?

মাথা নেড়ে সায় দিলাম ঃ জানি, অবশ্যই জানি।

ঃ বাজারেরও তো একটা দরদামের সীমরেখা আছে। ধরো চালের সের চার টাকা, সাড়ে চার টাকা-পাঁচ-সাড়ে পাঁচ-পৌণে ছয়-সাড়ে-এ-এ-এ-দপ করে সত্যি সত্যি একদিন চালের বাজারে আগুন লেগে গেলো। ঠিক এমনি ভাবেই তেলের বাজারে বিশ পঁচিশ তিরিশ ছুঁই ছুঁই,—দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো আগুন।

মোটা পাইপ নিয়ে দমকল ছুটে না আসতে আসতেই এক এক করে মাছ আলু পটল মাংস মশলাপাতি সাবান সোডা ঘি লংকা ইত্যাদির যাবতীয় হাট বাজার দোকান পাট দেশে যেখানে যতগুলো আছে সবগুলো একসংগে জ্বলে উঠলো দাউ দাউ করে। হুড়হুড় করে যেখানে যত লোক আছে নেমে পড়লো রাস্তায়। উত্তেজনায় সব টগবগ করছে। উত্তেজনা আর সহনশক্তিরও তো একটা সীমারেখা আছে ? দেখতে দেখতে লোকগুলোর চোখে মুখে বুকে হুহু করে জ্বলে উঠলো আগুন। এক থেকে আর একজন। সেখান থেকে দশজন। দশ থেকে শ'। হাজার। লক্ষ। এখান ওখান সেখান। মনে হলো, সমস্ত দেশটাই একটা আগুনের হল্‌কা। নেভায় সাধ্য কার ? লোকগুলো উন্মাদের মত ছুটে বেড়াচ্ছে এখান ওখান সেখান। সর্বত্র। যে যেখানে যাচ্ছে পুড়ে ছাই। যেখানে ঢুকছে ভেংগে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। অবশেষে দেখবে, সেই যে খাড়াই পাহাড়টার কথা বলেছিলাম, সেই পাহাড়টার দুধার ঘিরে হাতে হাত ধরে এগিয়ে যাচ্ছে সবাই। লক্ষ্য তাদের সেই পাহাড়ের চুড়োয় মখমলের গালিচায়, ঝুমঝুমি হাতে গা এলিয়ে থাকা লোকগুলো।সে কি উন্মাদনা। মনে হচ্ছে পাঁজা পাঁজা আগুন পাহাড়ের চার পাশ ঘিরে, হামাগুড়ি দিয়ে চুড়োয় বসে থাকা সেই লোকগুলোর দিকে এগুচ্ছে। আর ......।

উত্তেজনায় তিনি আর কথা বলতে পারলেন না। তাড়াতাড়ি হাতটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন ঃ দেখো দেখো, এই কথাটা ভাবতেই আমার সারাটা গা কেমন কাঁটা দিয়ে উঠছে।

লোকটা দুহাত দিয়ে মুখ ঢেকে বহুক্ষণ বসে রইলেন। সত্যি কথা বলতে কি লোকটার কথা

শুনে আমারও বুকের মধ্যে যেন, ভয়ে কি উত্তেজনায় ঠিক বলতে পারবো না, একটা বিচ্ছিরি রকমের গুররর-গুররর শব্দ করছিলো। মুখেও কোন রকম রা সরছিলো না।

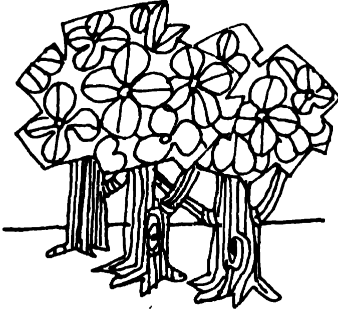
লোকটা হঠাৎ আমার হাঁটুতে হাত দিয়ে জ্বলজ্বলে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে ফিস ফিস করে বলে উঠলেনঃ বুঝলে, এই দিনটার আশায় কবে থেকে যে বসে আছি। আমি দেখতে পাচ্ছি, পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, সমস্ত দেশটা একটা মশাল হয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকেই এক একটা আগুনের হল্কা। পাহাড়টা ঘিরে ফেলছে ধীরে ধীরে। নেভায় সাধ্য কার।

কথাগুলো শেষ করেই লোকটা ব্যস্ত সমস্ত হয়ে উঠে পড়লেন। বিরক্তির সংগে বলে উঠলেনঃ দূর ছাই। তোমার সংগে বকবক করে বিষয়ের মত সমস্যার সমাধানটার কথাও ভুলতে বসেছিলাম প্রায়। সব্বোনাশ হতো আর একটু হলে। তুমি তো পারলে না, যাই দেখি রাস্তাঘাটের লোকজনকে জিজ্ঞেস করে দেখি, তারা কেউ কিছু বলতে পারে কি না। আচ্ছা চলি, কি বলো এ্যাঁ?

কথাটা শেষ না হতে হতেই, ঝড়ের মত যে ভাবে এসেছিলেন ঠিক সেই ভাবেই হুটপাট করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে, হন হন করে চোখের নিমেষে গেট পেরিয়ে রাস্তায় মিলিয়ে গেলেন।

কতক্ষণ হতভম্ব হয়ে বসেছিলাম ঠিক বলতে পারবো না। হঠাৎ টেবিলের উপর সাজিয়ে রাখা কাগজগুলোর দিকে চোখ পড়তেই টনক নড়লো। হাতের দিকে তাকাতে দেখি, কলম তখনও হাতেই ধরা। গল্পতো দূরের কথা। একটা আঁচড়ও কাটা হয়নি কাগজে।





পদ্য লেখার জোরে

মাহমুদুল হক

এক দেশে ছিলেন এক বাদশাহ। প্রবল প্রতাপশালী। হাতী-ঘোড়া সেপাই-শান্ত্রী কোন কিছুরই তাঁর অভাব ছিলো না। বাদশার নাম শমশের আলীজান।

কোন এক সময় বাদশাহ খুব অসুবিধায় পড়লেন। তাঁর নামের সাথে মিলে যায় রাজ্যে এমন লোকের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। ছুতোব, কামার, গাছকাটা শিউলী এদের সকলের নামও শমশের। গোটা রাজ্য শমশেরময় হয়ে আছে এক কথায়। তাই বাদশাহ একদিন উজীর, নাজীর, পাত্র, মিত্র সভাসদ সবাইকে ডেকে দরবারে ঘোষণা করলেন—আমার ক্ষমতা তোমাদের সকলের চেয়ে খুব কম করে হলেও তিন গুণ বেশী, সুতরাং আজ থেকে আমার নামকে তিন দিয়ে গুণ করে ঠিক এইভাবে উচ্চারণ কত্তে হবে ঃ—

শমশের
শমশের
শমশের আলীজান।

এই ঘোষণায় বিশেষ করে উজীর আক্কেল আলী খুব খুশী হলেন। তিনি বললেন—বাদশাহ নামদার দীর্ঘজীবি হউন!

উজীর আক্কেল আলী ছিলেন বাদশার সবচেয়ে প্রিয় পাত্র। তাঁর ওপর বাদশার বিশ্বাসও অগাধ। বাদশাহ ধরে নিয়ে আসতে বললে তিনি বেঁধে নিয়ে আসেন। বাদশাহ হাঁচলে কাশলে তিনি ডুক্‌রে কেঁদে ওঠেন।

একদিন হয়েছে কি বাদশাহ উজীরকে সঙ্গে নিয়ে তিন মহল প্রাসাদের পাশ কাটিয়ে হাওয়া খেয়ে বেড়াবার সময় দেখেন প্রাচীরের গায়ে একরাশ হিজিবিজি লেখা। বাদশাহ

বললেন—দাঁড়াও, পড়ে দেখা যাক।

আক্কেল আলী আক্কেল আলী
দেবো তোরে কি,
ঘুমের ঘোরে চাঁদিতে তোর
গাঁট্টা মেরেছি।

উজীর গরগর করতে করতে বললেন—এ্যাঁ, একি সত্যি কথা?

বাদশাহ্ বললেন—ক্ষেপেচো নাকি। কেউ ঠাট্টা করে লিখেছে আর কি!

বাদশার কথা শেষ হতে না হতেই উজীর চোখ বড়ো বড়ো করে বললেন—কি সব্বোনাশ! অই দেখুন বাদশাহ নামদার, বাঁ দিকের প্রাচীরে আপনার নামেও কি কোথায় সব লিখে রেখেছে।

বটে বটে, বলে বাদশাহ্ পড়ে দেখলেন ঃ

শমশের
শমশের
শমশের আলীজান,
আমরুল
জামরুল
কচু ঘেঁচু সবই খান!
শমশের
শমশের
শমশের আলীজান,
খিট্‌খিটে
মিট্‌মিটে
শকুনের মতো জান।

রাগে আগুন হয়ে বাদশাহ্ বললেন—দেখেছো কি ওটা? আমার জান বলে শকুনের মতো। এ্যাঁ, এতো বড় কতা।! ধত্তে পারলে ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়াবো।

উজীর বললেন—শূলে চড়াবো বাদশাহ্ নামদার, শূলে চড়াবো! যদি না পারি আমার নাম আক্কেল আলীই নয়। ইশ, কি বিচ্ছিরি কতা!

এরপর অন্যান্য দিনের মতো বাদশাহ্ দরবারে বসলেন। বললেন—কার কি আর্জি আছে পেশ করো। নাজীর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—বাদশাহ্ নামদার, আমার বাড়ীর উঠোনে আজ সকালে একটা ঘুড়ি উড়ে এসে পড়েছিলো, তাতে সব বাজে বাজে পদ্য লেখা।

বাদশাহ্ গম্ভীরভাবে বললেন—কি লেখা ছিলো? উজীর আবৃত্তি করে বললেন ঃ

শমশের শের নয়
    লেজ কাটা হনুমান,
বিড়ালের ডাক শুনে
    দেন তিনি পিট্‌টান।
কাঁঠালের মতো মাথা
    আক্কেল আলীটার

ঘাস খেগো বুদ্ধি
এন্‌তার এন্‌তার।

সকলে গাম্ভীর্য্য বজায় রাখবার জন্যে মুখ নিচু করে থাকলো



সভাসদদের মধ্যে থেকে একজন উঠে দাঁড়িয়ে সোজাসুজি আবৃত্তি করতে শুরু করে দিলেন ঃ—

তিনগুণ শমশের পেল্‌লায় ভূড়ি
দশগুণ বোকামিতে দেয় হামাগুড়ি।

খাঁদা নেকো টাক মাথা আবলুশ্ কাঠ
বিশগুণ লোভে টেকো ঘোরে মাঠ-ঘাট।

বাদশাহ ক্ষেপে উঠে বললেন—তার মানে? তোমরা সব পাল্লা দিচ্ছো নাকি?

সভাসদ বললেন—বাদশাহ নামদার বেয়াদবি মাফ করবেন, আজ সকালে আমার বাড়ীর সামনেও একটা ঘুড়ি এসে পড়ে, তাতে লেখা ছিলো ওইসব।

বাদশাহ বিরক্ত হয়ে সেদিনকার মতো দরবার ভেঙে দিলেন।

পরদিন উজীর দরবারের দিকে আসবার পথে দেখেন গাছের ডালে ঝুলছে একটা রঙীন এবং বেশ বড়ো রকমেরই একটা ঘুড়ি। ঘুড়িটার ওপর রঙ দিয়ে তাঁর মুখ খুব বিশ্রীভাবে আঁকা। আর তাতে লেখা ঃ—

আক্কেল আলী উজীর বটে
কুলোপানা কান,
পেটের পিলে বাড়ছে কেবল
গোলায় বাড়ে ধান।

উজীর তক্ষুণি বাদশার কাছে ছুট্লেন। বললেন—কাঁহাতক আর সহ্য করা যায় বাদশাহ নামদার, একটা বিহিত কত্তেই হবে। বাদশাহ বললেন—আজ থেকে রাজ্যময় আইন জারী করা গেল, ঘুড়ি ওড়ানো আর ঘুড়ি তৈরী করা দুটোই বন্দো। যারা মানবে না, তাদের হাত কেটে দেওয়া হবে, হাত। উজীর বললেন—খাসা আইন হয়েছে বাদশাহ নামদার। এইবার বাছাধনেরা জব্দো হবে, অ্যাঁ!

পরদিন দেখা গেল শাহীমহলের সামনের ময়দানে রাজ্যের যতো ছেলেপিলেরা শুখনো কলাপাতার তৈরী গোল গোল কি সব ঘুড়ির মত ওড়াচ্ছে।

বাদশাহ হাঁক পেড়ে বললেন—ধরো ওদের, হাত কেটে দাও ওদের সকলের।

বাদশার হুকুমে ছেলেদের সবাইকে গরু বাঁধা করে ধরে আনা হলো। বাদশাহ চীৎকার করে বললেন—তোমরা আমার হুকুম অমান্য করে ঘুড়ি উড়িয়েচো কেন?

তাদের মধ্যে থেকে একজন চটপটে গোছের ছেলে জবাব দিলো—আমরা তো ঘুড়ি ওড়াই নি। ঘুড়ি তো চারকোণওয়ালা কাগজের তৈরী হয়।

বাদশাহ বললেন—যা উড়ে তাই ঘুড়ি। ছেলেটি খুব আশ্চর্য হয়ে বললে—তাহলে পাখী, তুলো, ধুলো, হাওয়ার জাহাজ সবই কি ঘুড়ি? পাখীদের উড়তে দিচ্ছেন কেন, ওদেরও বারণ করে দিন।

বাদশাহ গর্জন করে বললেন—চোপ্ রও! ব্যাপারটা গণ্ডগোলের ঠেক্ছে। ঠিক হায়, পণ্ডিত কই! পণ্ডিত এসে বললেন—বাদশাহ নামদার, বই তো অন্য রকম কথা বলে। যাহা ঘুরঘুর করে ওড়ে তাই ঘুড়ি।

ছেলেটি চোখ বড়ো বড়ো করে বললে—ঘুরঘুর করে আবার কিছু ওড়ে নাকি! আপনি কিছুই জানেন না দেখছি। ওড়ে তো পৎ পৎ করে আর ফুরফুর করে। ঘুরঘুর করে ওড়া হয় না ঘোরা হয়, যেমন চোর ডাকাতরা ঘুরঘুর করে ঘোরে।

পণ্ডিত বললেন—থামো দিকি, বেশী ফ্যাচোর ফ্যাচোর কোচ্চো কেন বাপু। তা বাদশাহ নামদার একটু সময় লাগবে, বিষয়টি বিবেচনা করে দেখতে হবে কিনা।

বাদশাহ বললেন—বেশী সময় দিতে পারবো না। এক্ষুনি নথিপত্তোর হাতড়ে দ্যাকো। এট্টা

বিহিত কত্তেই হবে।

পণ্ডিত বললেন—এ কি আর গোলায় ধান জমানো বাদশাহ নামদার, এ হলো গিয়ে আপনার দশমুনে অভিধান ঘাটাঘাটির ব্যাপার, সময় দিতেই হবে।

বাদশাহ একটা আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে বললেন—দিলাম। একঘণ্টা।

চটপটে ছেলেটি পণ্ডিতকে বললে—চলুন, আমরাও আপনাকে সাহায্য করবো।

পণ্ডিত বক বক করতে করতে ওদের সবাইকে নিয়ে নিজের ঘরের দিকে গেলেন। ঘরের ভিতর থেকে ধাক্কা দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে বের করে নিয়ে এলেন দশমুনে এক বাণ্ডিল। তারপর বিড় বিড় করে আঙ্গুল গুণে বললেন—ক খ গ ঘ—ঘয়ে ঘুড়ি। সব্বোনাশ করেচে! এ যে ব্যান্জোন্ বন্নের চার নমবোর। গোটা তাড়াটাই খুলতে হবে। ঘুড়ি শব্দো পাওয়া যাবে এক্কেবারে সেই গোড়ার দিকে।

ছেলেরা সবাই বললে—আপনি বুড়ো মানুষ, টানা হ্যাঁচ্ড়া আপনার শরীরে কুলোবে না। আপনি সামনের দিকটা ধরে থাকুন, আমরা সবাই মিলে বাণ্ডিলটা পিছনের দিকে গড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছি, তাহলেই চট করে খোলা হয়ে যাবে। পণ্ডিত বললেন—খুব ভালো কতা বাপুবা, তাড়াতাড়ি পাঠ উদ্ধার হয়ে যাবে।

ছেলেরা সবাই একযোগে বাণ্ডিলটা ঠেলতে ঠেলতে গড়িয়ে পিছনের দিকে নিয়ে চললো। পণ্ডিত ধরে বসে রইলেন সামনের দিকটা।

তারপর হলো কি, বাণ্ডিলটা ঠেলতে ঠেলতে ছেলেরা একসময় হাঁপিয়ে পড়লো, কেননা সেটা ছিল বিরাট। ওজনেও দশ মণের সমান। তাই না পেরে এক সময় সবাই ছেড়ে দিলো। এক পলকে সড় সড় করে সেটা আগের মতো আবার জড়িয়ে গিয়ে এক ধাক্কায় পণ্ডিতকে ছুঁড়ে দিলে সামনের সমুদ্রে।

ছেলেরা সবাই তক্ষুনি বাদশার কাছে ছুটে গিয়ে নালিশ জানালো। বললে—বাদশাহ নামদার, দেখুন পণ্ডিতের কি কাণ্ড! আমাদের বললে তোদের নিয়েই যতো অনর্থ, তোরাই অভিধান ঘেঁটে বের কর ঘুড়ি মানে কি. আমি ততোক্ষণ একটু সাঁতরে আসি। তারপর তিনি সেই যে সাঁতরাতে গিয়েছেন এখনো পর্যন্ত ফেরার নামটি নেই।

বাদশাহ বললেন—বুড়ো মানুষের অনেক দোষ, যতো সব বায়নাক্কা। আক্কেল আলী দ্যাকো দিকি কি ব্যাপার।

উজীর সাগর পারে গিয়ে দেখেন পণ্ডিত রীতিমতো হাবুডুবু খাচ্ছে। তিনি চেঁচিয়ে বললেন—এই বুঝি আপনার অভিধান ঘাঁটা?

পণ্ডিত হাঁপাতে হাঁপাতে কোনোমতে পাড়ে উঠে এসে বললেন—বুঝলেন কিনা, বিদ্যা হলো সমুদ্দুর, তাই একটু ঘেঁটে দেখছিলাম আর কি।

উজীর বললেন—তা পেলেন কিছু?

পণ্ডিত বললেন—পেলাম আর কই। বুড়োমানুষ, আপনাদের মতো দেহও নেই, ক্ষমতায় কুলালো না। ঘুড়ি শব্দোটা একেবারে তলদেশে কিনা, ওটা খুঁজে আনা যার তার কম্মো নয়।

উজীর কি যেন ভাবলেন। তার মনে হলো বাদশার জন্যে তিনি কি না করতে পারেন। বিদ্যাসমুদ্দুরের তলদেশ থেকে ঘুড়ি শব্দের অর্থ খুঁজে আনা তো সহজ কাজ। বরং বাহাদুরী দেখানোর এই এক সুযোগ। বাদশাহ নিশ্চয়ই খুব খুশী হবেন।

তিনি বললেন—কোথায় দেখিয়ে দিন।

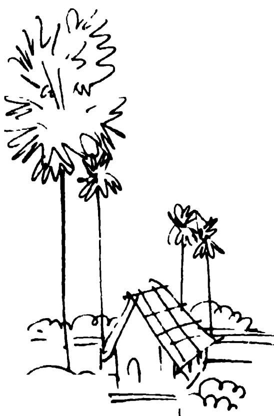
পণ্ডিত বললেন—মাঝিদের বলুন, ওরা মাঝখানে গিয়ে ঠিক জায়গা মতোই ঝুপ্ করে নামিয়ে দেবে।

উজীর বললেন—ঠিক হায়!

জেলে নৌকোর মাঝিরা তাদের ডিঙিতে করে সমুদ্দুরের একেবারে মাঝখানে গিয়ে চ্যাংদোলা করে উজীর আক্কেল আলীকে ঝুপ্ করে ছেড়ে দিলো। উজীর আক্কেল আলী সেই যে সমুদ্দুরের তলোদেশে ঘুড়ির অর্থ আনতে গেলেন আর ফিরলেন না।

ছেলেরা দল বেঁধে শাহীমহলের ময়দানে ঘুড়ি ওড়াতে ওড়াতে সুর ধরলোঃ

উজীর গেলেন রসাতলে
বাদশা গেলেন ঘরে
নিজের পায়ে কুড়ুল মেরে
মাথা ঠুঁকে মরে।
ঢ্যাম্ কুড়কুড়, ঢ্যাম্ কুড়কুড়
তা ধিন্ ধিন্‌তা ধিন্
পদ্য লেখার জোরেই কেবল
এলো সুখের দিন।





স্বপ্ন

মাহবুব তালুকদার

রোজ রাতে খোকন স্বপ্ন দেখে। বড় মজার আর সুন্দর সেই স্বপ্ন। লালপরী আর নীলপরী দুবোন এসে ওকে উড়িয়ে নিয়ে যায় অনেক, অ-নে-ক দূরে। পরীদের মতো খোকনের তো পাখা নেই। তাই, ওরা দুজন তার দুহাতে ধরে উড়িয়ে নিয়ে চলে! আকাশের মাঝপথ দিয়ে যেতে যেতে ভারী অবাক হয় খোকন। মেঘগুলো যেন তুলোর পেঁজার মতো তুলতুলে; ধরতে গেলেই হাতের ফোকর দিয়ে পালিয়ে যায়। তারাগুলোর দিকে তাকিয়ে মনে হয়, হাজার হাজার মণি মুক্তো যেন চিকচিক করে জ্বলছে। দুটো একটা পুরে পকেটে রাখতে ভারী ইচ্ছে যায় খোকনের। কিন্তু পরীরা ভাববেটা কি?

প্রথম যেদিন খোকন স্বপ্ন দেখেছিল, ভারী ভয় হয়েছিল তার। বুক শিরশির করা ভয়টা। খোকন কেঁদেই ফেলেছিল আর কি! লালপরী ওর চোখের দিকে তাকিয়ে টের পেয়েছিল বোধ করি। একটা মন্তর শিখিয়ে দিয়েছিল তাকে ঃ ভয় ভয় ভয়—করব তোকে জয়। ব্যস! ঐ মন্তরে বুকের সব ভয় ফুরুৎ করে উড়ে পালাল। তবু প্রশ্ন করল খোকন ঃ আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছ তোমরা?

ঃ হাজার পরীর দেশে। নীলপরী বলল ঃ সেখানে আমাদের রাণী আছেন নাম তাঁর রংধনুপরী। রংধনুর মতো সাতটা রং তাঁর পাখায় কি না!

ঃ ওখানে গিয়ে কি হবে?

ঃ রংধনুপরী খেলবে তোমার সাথে।

ঃ আমার কি খেলনা আছে, না লাটাই আছে? অভিমানে গাল ফুলল খোকনের ঃ একটা সাইকেল পর্যন্ত নেই!

ঃ সব হবে। লালপরী আশ্বাস দিয়ে বলল।

খোকনের ভারী মজা। পরীদের রাণী রংধনুপরীকে কাছে পেয়ে খুব খুশী হ'ল সে।

রাজপুরীতে ঢুকেই দেখল কি তকতকে ঝকঝকে সারাটা বাড়ি! রেশমী কাপড়ের পর্দা সরিয়ে রংধনুপরীর ঘরে ঢুকতে দেখল, সাত রংয়ের পাখা ছড়িয়ে ফুটফুটে পরী রাণী তার জন্যে অপেক্ষা করছে।

এগিয়ে যেতেই হাসিমুখে রংধনুপরী এসে তার হাত ধরল। মস্ত বড় পদ্মফুলের পাতায় এনে বসাল তাকে। এটা নাকি সিংহাসন! খোকন গিয়ে যেই ওটার ওপরে বসল, অমনি তার কাপড়-জামাগুলো ঝলমলে শাহী পোশাক হয়ে গেল। রাণীর সহচরী দুজন পরী সোনার থালায় জর্দা নিয়ে এল ওদের সামনে। পরীরাণী আদর করে খাওয়াল তাকে। তারপর ওরা দুজনে মিলে কত কি খেলা! পরীদের বাগানে রুপোর গাছে হীরের ফুল ফোটে। যেমন ফুলের রূপ, তেমনি খুশবু। সেই গাছের ফাঁকে ফাঁকে পরীরাণী হারিয়ে গেল। খোকন খুঁজে বের করল তাকে।

ফেরার আগে খোকন ভেবেছিল, রংধনুপরীর কাছ থেকে একটা সাইকেল, লাটাই, কিছু মাঞ্জা দেওয়া সূতো চেয়ে নেবে। পরীদের দেয়া সূতো নিশ্চয়ই কাটতে পারবে না আর কারো ঘুড়ি। সাইকেলের চাকাগুলো যদি রুপোর পাতের হয় তাহলে কি মজা! সবাই চেয়ে চেয়ে দেখবে।

কিন্তু কি যে হোল, ওগুলো চাইবার আগেই ঘুম ভেঙ্গে গেল খোকনের। ঘুম ভেঙ্গে কান্না জুড়ে দিল সে। মা পাশেই ছিলেন। বললেন ঃ কি হয়েছে খোকন?

ঃ আমি সাইকেল কিনব। খোকন আবদার ধরল। তার সাথে কান্না।

মা ওর মাথায় চুলে হাত বুলিয়ে আদর করলেন ঃ বড় হয়ে নিশ্চয়ই কিনবে।

ঃ বড় হয়ে নয়। একটু থেমে আবার কান্না ছড়িয়ে মায়ের গলা জড়িয়ে রাখল সে ঃ এখন।

সোনামণি লক্ষ্মীমণি আঁচল দিয়ে চোখ মুছিয়ে মা বললেন ঃ এখনও রাত পোয়াতে ঢের বাকী আছে। আরেকটু ঘুমোও।

কিন্তু খোকনের চোখের পাতা আর বুঁজল না। শুয়ে শুয়ে লালপরী, নীলপরী আর রংধনুপরীর কথা ভাবল। ভাবতে ভাবতে ভোর হয়ে এলো। খোকন সবার আগে উঠে শিউলি কুড়োতে বাগানে চলে গেল।

সারাদিন খোকনের মন মেজাজ খুব খারাপ। ওদের পাশের বাড়ির মিঠু কি সুন্দর ঘুড়ি ওড়ায়। ওর লাটাই এ রং-বেরংয়ের সূতোর ঝালর বাধা আছে। ঘুড়ির সূতো ছাড়লে বেশ সুন্দর ঘুরতে থাকে ঝালরটা। মিঠুর সাইকেলও নতুন আর মজবুত। প্রথম একদিন ওটার সীটে বসে খোকন দেখেছিল, তোফা আরাম করে বসার জায়গা। কিন্তু মিঠু আর এখন তার সাথে খেলে না। খোকনের সাথে সাইকেল চড়ছিল বলে মিঠুর বাবা মিঠুর কান ধরে কষে চড় লাগিয়ে বলেছিলেন ঃ কতদিন বলেছি না, ছোটলোকের সঙ্গে মিশবি না।

খোকন সেই থেকে আর ওমুখো হয়নি। সত্যি তো মিঠুরা কত বড়লোক! মিঠুর বাবার বিরাট একখানা গাড়ী আছে। আয়নার মত মসৃণ গাড়ীটার দেহ। খোকনের এক একদিন ইচ্ছে করেছে গাড়ীটা ছুঁয়ে দেখতে। ও বাব্বা! তাহলে রক্ষে নেই।

ওসব কথা মনে হয়ে সাইকেল কেনার কথা কখন হারিয়ে ফেলেছে খোকন, নিজেই বুঝতে পারেনি। আবার মনে হলেও নিজেদের অবস্থার কথা ভেবে সে চুপ করেছে। কত কষ্ট করে দিন চলে তাদের। ভাঙ্গা একটা সাইকেলে চেপে এই বুড়ো বয়সে দাদু অফিসে যায়। দাদুর ঐ লক্কর-ঝক্করটাকে সাইকেলই বলতে ইচ্ছে করে না। মিঠু ওটা দেখে হাসে কিন্তু খোকন হাসে না।

নিজেদের অসুবিধার কথা খোকন কখনো বোঝে, কখনো বোঝে না। দাদুকে অফিসে যাওয়ার সময় কতদিন বলেছে ঃ দাদুভাই, আমাকে সাইকেল কিনে দাও। দেবে ত?

: একশবার দেব। দাদু আদর করে বলেন ঃ খুব ভাল করে লেখাপড়া শেখ।
ঃ বা রে। আমি যে ক্লাশের ফার্স্ট বয়।



ঃ হ্যাঁ, তাই ত। দাদু যেন সহসা নিজেকে সামলে নেন ঃ বেশ, আমার সাইকেলটাই তোমাকে দিয়ে দেব।

ঃ বয়ে গেছে আমার ঐ লক্কর ঝক্কর নিতে। খোকন মুখ ভার করে রাখে।

আর কথা না বলে দাদু ওকে আদর করে অফিসে চলে যান। তারপর বিকেলে ফেরার পথে কোনদিন চকলেট, কোনদিন মার্বেল নিয়ে আসেন। ওগুলো পেয়ে খোকনের মুখে হাসি ফোটে।

রাতে আবার সেই স্বপ্ন। মেঘের দেশ, তারার দেশ পেরিয়ে লালপরী আর নীলপরীর হাত ধরে এগিয়ে চলল খোকন। চাঁদের বুড়ী দোক্তা মুখে সুতো কাটছে। বুড়ীকে দেখে খোকন বলল ঃ বুড়ী, তোমার ত ভারী রূপ। জানো, তোমার রূপের আলোয় আমাদের সারা দেশ জোৎস্নাময় হয়ে যায়।

ঃ এ আর কি রূপ দেখছ? ফোকলা দাঁতে বুড়ী হেসে ফেলল ঃ কমবয়সে আমার রূপের আলোয় সবার চোখ ধাঁধিয়ে যেত। তোমার পরীরাণীর মত রূপসী ছিলাম তখন।

ঃ তাই নাকি! খোকনও হাসল।

পলক পড়তে না পড়তে পরীরাণীর রাজ্যে পৌঁছে গেল খোকন। সত্যি ভারী সুন্দর আর রূপসী রংধনুপরী। নিজের দিকে তাকিয়ে খোকন দেখল, তাকেও কম সুন্দর দেখাচ্ছে না। মাথায় হীরে বসানো পাগড়ী সারা গায়ে রত্নরাজিখচিত পোশাক। খোকন এসে পরীরাণীর হাতে ধরল। ফুলের দোলনায় চড়ে দোল খেল দুজনে। তারপর ওরা একটা ফুলের ওড়াগাড়ীতে চাপল। পরীরাণী বলল ওটার নাম নাকি পুষ্পরথ! আকাশে পাতালে সব জায়গায় উড়ে যেতে পারে ওটা। পরীরাণীকে নিয়ে খোকন পুষ্পরথে এক চক্কর ঘুরে এল। আর কি আশ্চর্য! পুষ্পরথে চড়তে গিয়ে পরীরাণীর কাছ থেকে সাইকেল চেয়ে নেয়ার কথা বেমালুম ভুলে গেল সে।

ঘুম ভাঙ্গতেই খোকন আবার কেঁদে উঠল ঃ আমি সাইকেল কিনব।

মা প্রথমে সোনামণি বলে আদর করলেন। তাতে কান্না থামল না খোকনের। এরপর বেজায় রেগে গেলেন মা ঃ রোজ খালি এক কথা! গরীবের ছেলে গরীবের মত থাকবে না। ঘোড়া রোগ হয়েছে আর কি!

খোকন আরো জোরে গলা ফাটিয়ে কান্না শুরু করল।

ওঘর থেকে দাদু এগিয়ে এলেন। বললেন ঃ কি হয়েছে দাদুমণি?

ঃ সাইকেল কিনবে! মা রাগের সুরে কথাটা বলে রান্নাঘরে চলে গেলেন।

ঃ বেশ তো, কালই সাইকেল কিনে আনব তোমার জন্যে। দাদু প্রসন্নমুখে বললেন ঃ আজ অফিসে ঈদের বোনাস পাওয়া যাবে। কাল তোমার সাইকেল নিয়ে আসব।

ঃ সত্যি? অবিশ্বাসের দৃষ্টি ছড়িয়েও আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠল খোকন।

দাদু ওর গালে টোকা দিয়ে বললেন ঃ সত্যি, সত্যি, সত্যি।

সারাটা দিন কি করে কোথা দিয়ে কাটল, খোকন টের পেল না। পাড়ায় সমবয়সী বন্ধুদের যাকে যাকে পারল খবরটা দিয়ে এল। খুব ইচ্ছে ছিল মিঠুকেও বলে কথাটা। কিন্তু মস্তবড় লোহার গেট পেরিয়ে ওদের বাড়ির ভেতরে ঢুকতে খোকার সাহস হোল না।

রাতে ঘুমুতে গিয়ে খোকনের ভীষণ আনন্দ। কালই তার সাইকেল কিনে আনবেন দাদু। মনে মনে কল্পিত সাইকেলটার গায়ে হাত বুলাল সে। বিছানায় শুয়েও ওটার যেন স্পর্শ পেল। খোকন ভাবল, আজও স্বপ্নে রংধনুপরীকে দেখতে পেলে কথাটা তাকে জানাতে হবে। খোকন তাড়াতাড়ি টুপ করে ঘুমিয়ে পড়ল।

কিন্তু খোকন সেদিন রাতে পরীরাণীকে দেখতে পেল না। লালপরীকে না নীলপরীকেও নয়। স্বপ্নই এলো না খোকনের চোখে। সারাটা রাত চোখ জুড়ে কেবল ঘুম থাকল। শুধু ঘুম।

ভোর বেলা চোখ খুলে বড্ড মন খারাপ হয়ে গেল খোকনের। মুখে একটা বিষাদের কালো ছায়া। চোখ মুখ শুকনো শুকনো। এমন মজার মজার স্বপ্ন ছিল তার; সব স্বপ্ন যেন চুরি হয়ে গেছে। আজ যে সাইকেল কেনার কথা, তাতেও বিশেষ আনন্দ জাগল না মনে।

দাদুকে একলাটি পেয়ে চুপি চুপি সব খুলে বলল খোকন। তার স্বপ্নের কথা। লালপরী, নীলপরী আর রংধনুপরীর কথা। হীরার ফুল, রুপোর গাছ, পুষ্পরথের কথা পর্যন্ত। তারপর খোকন বলল ঃ কাল রাতে যে কোন স্বপ্ন দেখলাম না দাদুভাই! লালপরী, নীলপরী, এমনকি পরীরাণীকেও না।

দাদু ওর চুলে আদরের হাত বুলিয়ে বুকের কাছে জড়িয়ে বললেন ঃ স্বপ্ন যে তোমার সত্যি হ'তে চলল দাদুভাই।

ঃ তার মানে? খোকন ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

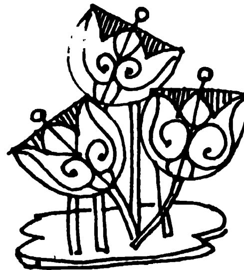
মিষ্টি করে হেসে দাদু বললেন ঃ তোমার মনে আকাঙক্ষা ছিল বলে তুমি স্বপ্ন দেখতে। এব্বার সে আকাঙক্ষা পূর্ণ হবে। তাই স্বপ্নরা আর ঘুমের চাদর মুড়ি দিয়ে তোমার কাছে আসবে না। স্বপ্ন যে সত্যি হয়ে যাবে।

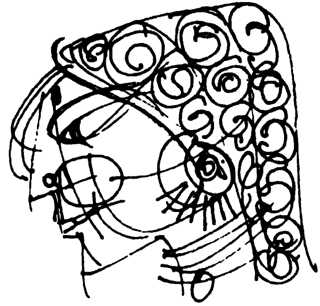
দোকানে যাবার জন্যে তৈরী হয়ে নিতে দাদু পাশের ঘরে গেলেন। খোকনকেও বললেন ভাল কাপড় পরে তৈরী হয়ে নিতে। কিন্তু খোকন উঠল না, চুপচাপ বসে রইল। কি যেন ভাবনা তার মনে।

একসময়ে খোকন আলতো পায়ে দাদুর ঘরে এল। আস্তে করে ডাকল ঃ দাদু!

ঃ কি রে? দাদু ফিরে তাকালেন।

ঃ আমি সাইকেল চাই না। স্বপ্ন চাই। খোকন বলল।





হুকু-ভুকুর গল্প

বলরাম বসাক

সেই যে ভালুক দুটো। দুই ভাই। একজন হোঁৎকা মুখো। আরেকজন ভোঁৎকামুখো। কেমন করে হাঁটে বল তো?

একজন হাঁটে হোদুল-দোদুল-নোদুল-নোদুল।

আরেকজন হাঁটে হুম্-হা। গুম-হা।

একজনের পায়ে ঘুঙুর। আরেকজনের গলায় ঘণ্টা। যখন দুজন গলা ধরাধরি করে হাঁটে, তখন শব্দ হয় ঝুমুর-ঝুম্ টুং-টাং।

ছোট ভালুক বড় ভাই। তার নাম হুকু। বড় ভালুক ছোট ভাই। তার নাম ভুকু। দুজনের মধ্যে যা ভাব না—। হুকু লাল জামা পরলে ভুকু সবুজ প্যান্ট্ পরে। হুকু নীল টুপি পরলে ভুকু হলদে মোজা পরে।

দুজনে হাত ধরাধরি করে গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে যায়। আর গাছতলায় বসে আইচ্কিরিম্ কিনে খায়।

একদিন হুকু আর ভুকু—কী যেন—কী—কেন—চাক্রি বাকরি ছেড়ে ছুঁড়ে-ওমা—একেবারে দেশে চলে গেল। কেন? দেশে কী?

দেশে পাতার ছাউনির দুটো ঘর—হাত দেড়েক উঁচু। সেই ঘরদুটোতে কষ্টমষ্ট করে ওরা দুজন ঘুমুতো। চারপাশে গাছ। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড। আম গাছ। জাম গাছ। মহুয়া গাছ। গাছে গাছে মৌচাক, ইয়া বড় বড়। দুজন ঘুম থেকে উঠে প্রথমে একটা হাই তুলত বিরাট হাঁ করে। আর তুড়ি বাজাত তিনবার। ঠুকুৎ-ঠুকুৎ-ঠুকুৎ। তারপর খেত আম জাম মহুয়া মধু, ছাগলের দুধ, জল, শেষে একটা কাঠি। খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে হুকু ভুকু কী করে?

"কী করা যায় বল্ তো?"

"আচ্ছা ঢোলটা বাজানো যাক্।" বলেই হুকু ঢোলটা বের করে বাজাতে শুরু করে, ডিডিম্ ডিম্ ডিডিম ডিম্।

"আচ্ছা তাহলে নাচা যাক্।" বলেই ভুকু নাচতে শুরু করে—হুলা হুলা হুলু হুলা।

তারপর একসময় ভুকু ঢোল বাজাতে বসে, আর হুকু নাচতে শুরু করে। বেশ ভালো, দিনগুলো কাটছিল মন্দ না।

কিন্তু একদিন কী যেন কী—কেন— কী—হুকুর হাতে একটা কোদাল। ভুকুকে বলল, "তুইও একটা কোদাল নে।"

"কেন?"

"চল, মাটিটা খুঁড়তে খুঁড়তে খুঁড়তে খুঁড়তে পৃথিবীর ওপারে চলে যাই।"

"চল্।"

দুটো কোদাল হাতে নিয়ে হুকু ভুকু হোদুল দোদুল হুম্‌হা গুম্‌হা করতে করতে এলো মাঠের ওপর। কোপ বসাতে লাগল ধপাধপ ধপাধপ।

খুঁড়তে খুঁড়তে এত্তো এত্তো মাটি বেরুল। আরও বেরুল। আবও।

খালি মাটিই বেরুচ্ছে। শেযে একখানা টোপব। সোনাব তৈরি। মাত্র একখানা। "ওমা একখানা যে। আবেকখানা হলে না হয ..."

তখন ওরা আরও খুঁড়ল। কিন্তু খোঁড়াখুঁড়ি করেও সোনাব টোপর দুখানা হল না।

এখন সোনার টোপরটা মাথায় দেবে কে? হুকু? না ভুকু? দুজনেরই মাথায় হাত গালে হাত।

হুকু বলল, "টোপর আমারই হওযা উচিত।"

ভুকু বলল, "উহু ওটা আমারই হওয়া উচিত।"

"শুধু শুধু তোর হবে কেন শুনি?"

"শুধু শুধু তোরই বা কেন হবে?"

বড় ভালুক ছোট ভাই-এর এমনতর গোঁ দেখে ছোট ভালুক বড় ভাই হুকু খুউব্ রাগ করল। বলল, "আমি না তোর দাদা, গুরুজন?"

তখন বড় ভালুক ভুকু মুখটুক গালটাল ফলিয়ে বলল, "আমিও তো তোর ছোট্ট ভাইটি আদুরে।"

বাস্। কী ঝগড়া বেধে গেল দুজনের মধ্যে। সে-ঝগড়া কিছুতেই থামে না!

"হুম্ হা গুম-হা—এ টোপর আমার।"

"হোদুল দোদুল নোদুল নোদুল —এ টোপর আমার।"

"হুম্-হা গুম-হা—এ টোপর আমার।"

"হুম-হা ...আমাব।"

"নোদুল নোদুল ... আমার।"

তখন পাড়াপড়শী খরগোশ, কাঠবেড়ালী, মোরগ, নেকড়ে, হাঁস-টাঁস, জিরাফ-টিরাফ—সব এসে পড়ল। বলল, "কী হল তোমাদের? ঝগড়া করছ কেন? তোমাদের কি খিদে পায় না?"

"হ্যাঁ পায়।" হুকু বলল।

"পায় তো।" ভুকু বলল। বলেই ঝুমুর ঝুম্ টুংটাং করতে করতে ঘরে ঢুকল। তারপর মধু মেখে আমের আচার খেতে বসল। ফুরিয়ে গেলে আতা খেল। ফুরিয়ে গেলে মধু খেল। ফুরিয়ে গেলে খেজুরের গুড় খেল। ফুরিয়ে গেলে জল খেল। হেউ করে একটা ঢেকুর তুলে, কাঠি

চিবুতে চিবুতে ঘুমিয়ে পড়ল। নাক ডাকল, ঘোর্-ঘোর্-ঘোরাৎ।

যাক বাবা, পাড়াপড়শীরা ভাবল, ঝগড়াটা তাহলে খতম।

তারপর ঘুম ভাঙলে দুই ভাই হাত পা ছুঁড়ে, মস্ত হাঁ করে, হাই তুলল। ঠকাৎ-ঠকাৎ—তুড়ি বাজাতে বাজাতে হুকু এদিক তাকাল, সেদিক তাকাল। চোখ পড়ল সোনার টোপরটার দিকে...

"এ সোনার টোপর আমার।"

"না, আমার।"

"বলছি আমার।"

আবার ঝগড়া বেধে গেল। ভীষণ ঝগড়া। পাড়াপড়শী খরগোশ-টরগোশ সবাই যার-যার



দরজায় খিল এঁটে কানে আঙুল দিয়ে বসে রইল। কী কাণ্ড! ছিলি ভালো আমজাম মধু খেয়ে, ঢোল বাজিয়ে, নেচে, নাক ডাকিয়ে—কোথ্ থেকে কী না কোথ্ থেকে কী ...মাটি খুঁড়তে শুরু করে দিলি। তা মাটি না হয় খুঁড়লি... তায় সোনার টোপর পেয়ে গেলি। তাও একখানা। তা সোনার টোপর না হয় পেলি, একখানা পেলি, ...তা বলে তা-ই নিয়ে ঝগড়া?

হাঁস-টাঁস জিরাফ-টিরাফ সব গালে হাত দিয়ে বসে রইল। ওদিকে দুভায়ের ঝগড়া খালি বাড়ছে বাড়ছে আর বাড়ছে।

"তুই একটা বেবুন।"

"তুই বেবুন।"

"তুই একটা সাবান।"

"তুই সাবান।"

তখন শেয়ালদাদা, মাথায় ভীষণ বুদ্ধি, তাই মাথায় একটা টুপি পড়ল। আর নাকে চশমা। দেখি কী করা যায় ...

গুটি-গুটি-গুটি-গুটি হাঁটল শেয়ালদাদা।

"কী রে, তোরা ঝগড়া করচিস্ কেন?"

"এই যে শেয়ালদাদা, বল দিকিনি এই সোনার টোপরটা কার?"

"হ্যাঁ তুমিই বলতো ঠিক করে, ওটা কার?"

"সোনার টোপর নিয়ে ঝগড়া করচিস?" বলেই শেয়ালদাদা করলে কী, কাছেই একটা টুল ছিল, লেজটা দিয়ে সেই টুলের ধুলো বেশ করে ঝাড়ল। তারপর গ্যাঁট্ হয়ে বসল টুলের ওপর।

"দেখি তোদের সোনার টোপরটা কেমন?"

"এই যে।" হুকু তাড়াতাড়ি সোনার টোপরটা এনে দিল। শেয়ালদাদা চশমাটা খুলে সোনার টোপরটা চোখের কাছে এনে ভালো করে দেখল।

"হুঁ।" তারপর আবার চশমা পরে বলল, "কেমন করে পেলি?"

"মাটি খুঁড়ে।" হুকু বলল।

"হুঁ, কী দিয়ে মাটি খুঁড়েচিস্?"

"এই কোদাল দিয়ে।" ভুকু বলল।

"হুঁ, কতবার মাটি কুপিয়েছিস?"

হুকু মাথা চুলকোতে লাগল। ভুকু গাল চুলকোতে লাগল। ঠিক কতবার মাটিতে কোপ বসিয়েছে হুকু? ভুকুই বা কতবার কুপিয়েছে—তা কি কেউ গুনে রাখে?

"কী-রে, রা-নেই কেন?" শেয়ালদাদা হুকুর দিকে চোখ পাকিয়ে তাকায়, "কতবার কুপিয়েছিলি?"

হুকু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকায়। আর মাথা চুলকোয়।

শেষে একটা ধমক খেয়ে ঘাবড়ে-টাবড়ে হাঁচো-ট্যাচো অনেক কিছু করে হুকু ফস্ করে বলে ফেলল "ছেষট্টিবার।"

আর তুই?" শেয়ালদাদা ভুকুর দিকে তাকাতেই ভুকু ঢোক গিলতে গিলতে বলল, "আমিও ছেষট্টিবার।"

দুজনেই সমান মাটি কুপিয়েছ? ওহ্-হো, বেজায় মুশকিলে ফেললে। শেয়ালদাদা মাথার টুপিটা খুলে ফেলল। একহাতে সোনার টোপর আর আরেকহাতে টুপি নিয়ে বলল, "তোদের কি মাটি খোঁড়ার কাজ শেষ হয়েছে?"

"উহুঁ।"

"তা হলে মাটি খোঁড়ার কাজ শেষ কর।" বলেই শেয়ালদাদা সোনার টোপরটা মাথায় পড়ল, "এখন এই সোনার টোপরটা আমার মাথাতেই থাক্। মাটি খোঁড়া শেষ হলে তোদের মধ্যে যে সবচে' বেশিবার মাটিতে কোপ বসাবে সে-ই এই সোনার টোপর পাবে। বুঝলি? নে, চট্পট্ মাটি খোঁড়া শেষ কর।"

তক্খুনি হুকু কোদাল হাতে নিল। ধুপ করে মাটিতে কোপ বসিয়ে দিয়ে বলল, "হেই সাতষট্টি।"

"এ কী, হুকু যে বেশিবার মাটিতে কোপ বসাবে। তাই ভুকুও তাড়াতাড়ি একটা কোদাল নিয়ে, ধুপ করে একটা কোপ বসিয়ে দিয়ে বলল, "হেই সাতষট্টি।"

হুকু তখন আবার কোপ বসাল। "হেই আটষট্টি।" সঙ্গে সঙ্গে ভুকুও কোপ বসাল, "হেই আটষট্টি।'

"হেই উনসত্তর।"

"হেই উনসত্তর।"

"হেই সত্তর।"

"হেই সত্তর।"

একটু পরে শেয়ালদাদা টোপর মাথায় উঠে দাঁড়াল। টুপিটা টুলের ওপর রাখল। বলল, "শোন হুকু ভুকু, আমি একটু ঘুরে আসছি বাজার থেকে। আমি যে পালাচ্ছি না তার প্রমাণ, আমার এই টুপিটা তোদের টুলে রেখে গেলাম। বুঝলি তো? এবার তোদের মাটি খোঁড়ার কাজ শেষ কর।"

"আচ্ছা।" হুকু ঘাড় নাড়ল।

"আচ্ছা।" ভুকু ঘাড় নাড়ল। তারপর আবার মাটি খোঁড়া শুরু করল, "হেই একশ বত্রিশ।"

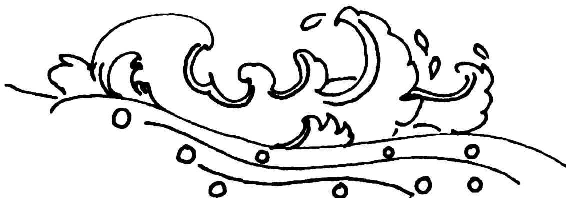
"হেই একশ বত্রিশ।"

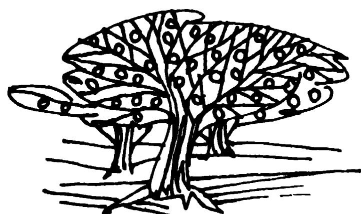
তারপর—

তারপর শেয়ালদাদা চম্পট।

না না, চম্পট নয়। শেয়ালদাদা খুউব ভালো। পাড়াপড়শীদের সঙ্গে যুক্তি করে সোনার টোপরটা জাদুঘরে রেখে এল। আর হুকু ভুকু? তারা মাটি খুঁড়েই যাচ্ছে, "হেই একলক্ষ বারো হাজার তিনশ সাতাশ।"

"হেই একলক্ষ বারো হাজার তিনশ সাতাশ।"





বিষমভরার বাঘ

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

মাঠের মাঝখানে মস্ত এক মজা দীঘি। নাম বিষমভরা। এককালে এই দীঘি বিষমভাবে ভরা ছিল বলেই হয়তো এইরকম নাম হয়েছিল। কালে দীঘি শুকিয়ে গেল। দীঘি শুকিয়ে গিয়ে ভরে গেল শর বনে। তার সঙ্গে আরো নানারকম গাছপালা গজিয়ে দীঘিটা পরিণত হলোএক গভীর জঙ্গলে। সেই জঙ্গলে একদিন হঠাৎ কোথা থেকে যেন এক বাঘ এসে বাসা বাঁধল।

বাঘটাকে প্রথম দেখল কুশো বাগদী।

তখন বৈশাখ মাস। মাসের সুরুতেই কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় ভিজে মাটি লাঙল দেবার উপযোগী হয়ে উঠল। তা খুব ভোরে হাল বলদ নিয়ে কুশো চলল মাঠের দিকে।

ভোরের দিকে ফাঁকা মাঠে মনের আনন্দে লাঙল দিচ্ছে কুশো। এমন সময় তার মনে হলো বিষমভরার জঙ্গলের দিকে পেছন ফিরবার সময় কে যেন তার পিঠের ওপর আলতো করে হাত রাখছে। একবার দুবার করে পর পর তিনবার এইরকম হবার পর কুশোর মনে সন্দেহ হলো। সেই দিগন্ত বিস্তৃত ফাঁকা মাঠে কুশো তখন ভয় পেয়ে গেল খুব। মনে মনে ভাবল, ভূতুড়ে ব্যাপার নয়তো? এবার সে খুব হুঁশিয়ার হয়ে পিছন দিকে নজর রেখে বিষমভরার কাছে এলো। বিষমভরার কাছে এসে যেই না পিছন হয়েছে অমনি আড়চোখে তাকাতেই দেখতে পেল জঙ্গলের ভেতর থেকে একটা ইয়া কেঁদো বাঘ বেরিয়ে এসে তার পিঠের ওপর থাবা দিয়ে তাকে আলতো করে ছুঁচ্ছে।

যেই না দেখা অমনি কুশোর চক্ষুস্থির। তবে আর পাঁচজনের চেয়ে কুশোর বুদ্ধিটা একটু সরেস বলে সে তক্ষুণি দৌড় ঝাঁপ না করে আগের মতোই লাঙল দিতে দিতে মাঠের একেবারে ওপ্রান্তে গিয়ে চোঁ চোঁ দৌড়। তারপর উৰ্দ্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে একেবারে গ্রামের ভেতরে গিয়ে চিৎকার করে উঠল—ওরে, কে কোথায় আছিস রে, শিগ্‌গির আয়। বিষমভরায় বাঘ বেরিয়েছে।

কুশোর চিৎকার শুনে গাঁ শুদ্ধু লোক সকলেই ছুটে এলো প্রায়। দুলেদের লক্ষ্মী চোখ দুটো বড় বড় করে বলল—সত্যি বলছ বাঘ ? নাকি বাঘের মতো দেখতে অন্য কোন প্রাণী ?

কুশোর গা দিয়ে তখন কালঘাম ছুটছে। বলল—কি যে বলো সব। বাঘ বাঘই। বাঘের মতো দেখতে আবার অন্য কোন প্রাণী হয় নাকি ? তাছাড়া আমি নিজে চোখে দেখেছি। ইয়া মোটা কেঁদো বাঘ। থাবা বার করে আমার পিঠের ওপর রাখছিল। নেহাৎ বরাৎ জোর, তাই বেঁচে গেছি এ যাত্রা।

গাঁয়ের প্রবীণ হরি ডাক্তার বললেন—তা তোমার হাল বলদের কি হলো ?

—সে সব মাঠেই পড়ে রয়েছে ডাক্তারবাবু। কোন রকমে প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে এসেছি আমি। একেবারে বুনো বাঘ। বন থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছে। এখনো রক্তের স্বাদ পায়নি বোধ হয়। পেলে আমাকে সহজে ছাড়ত না।

ডাক্তারবাবু এবার কপাল কুঁচকে বললেন—তবে তো মহা সমস্যার বিষয়। তুমি যখন নিজে চোখে দেখেছ বাঘকে তখন আর তোমার কথায় অবিশ্বাস করি কি করে বলো ? এখন বাঘটাকে না মারতে পারলে তো বিপদের শেষ থাকবে না। মানুষ গরু সব খেয়ে শেষ করে দেবে একধার থেকে।

গ্রামের আরো পাঁচজন যারা জড় হয়েছিল তারাও সকলে একজোট হলো এবার। বলল—তবে আর দেরি কেন ? বাঘটাকে কোন রকমেই এখান থেকে পালাতে দেওয়া হবে না। লাঠি সোঁটা নিয়ে সব এক্ষুণি তৈরী হয়ে পড়ো।

কুশো বলল—সেই ভালো। দিনের আলোয় কোন অসুবিধেও হবে না। চলো সব দল বেঁধে যাই।

এ খবর শুধু যে এই গ্রামেই চাপা রইল তা নয়। আসপাশের গ্রামগুলোতেও ছড়িয়ে পড়ল খবরটা। বিষমভরায় বাঘ ঢুকেছে। বাঁচতে চাও তো সবাই এসো।

আসপাশের গ্রামের লোকরাও তখন সঙ্গে সঙ্গে নানারকম ধারালো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। তারপর সবাই মিলে জোট বেঁধে চলল বিষমভরার দিকে।

বিষমভরায় গিয়ে সর্বাগ্রে সকলে মিলে বিষমভরার চারপাশ ঘিরে ফেলল। কিন্তু ঘিরলেই বা হবে কি ? বিষমভরা কি একটুখানি জায়গা ? গোটা বিষমভরা ঘিরতে গিয়ে সমস্ত দলটাই হাল্কা হয়ে গেল প্রায়। কাজেই সকলে সাহস হারিয়ে অস্ত্রশস্ত্র লাঠি সোঁটা হাতে নিয়ে বিষমভরার বনের বাইরেই দাঁড়িয়ে রইল হাঁ করে। ভেতরে ঢুকতে সাহস হলো না কারো। বাইরে থেকেই সবাই বলতে লাগল—কই কুশো ! কোথায় তোমার বাঘ ?

বাঘ তখন কোথায় ? একেবারে গভীর বনের ভেতরে।

অনেক চেষ্টা করেও তাকে দেখা গেল না।

কুশো এদিক সেদিক ঘুরে বলল—এই, এইখানেই ব্যাটা আমাকে থাবাচ্ছিল।

লক্ষ্মী দুলে বলল—তা তো হলো। কিন্তু বাঘকে এখন পাই কোথা ?

যেই না বলা অমনি একটা ঝোপের একটু অংশ নড়ে উঠল। আর কুশোও অমনি লাফিয়ে উঠে সেই দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল—ঐ। ঐ যে। ঐ দেখো বাঘ। ঐ ব্যাটা বসে আছে।

কুশোকে ঐভাবে লাফিয়ে উঠতে দেখে বাঘটা ভয় পেয়েই হোক বা রেগে গিয়েই হোক একেবারে এক লাফে কুশোর ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল।

কুশো তো 'বাবারে মারে' বলে চিৎকার করে উঠল তখন।

অন্যান্য লোকেরাও তখন ছুটে এলো। তারপর সবাই মিলে এলোপাতাড়ি বাঘটাকে বেশটি

করে ঘা কতক দিতেই কুশোকে ছেড়ে দিয়ে বাঘটা এক লাফে বনের ভেতরে গিয়ে ঢুকল।

সেই যে ঢুকল আর বেরুলো না।

বাঘের চেহারাটা সবাই তখন চাক্ষুষ দেখে আর তাকে ঘাঁটাতে সাহস করল না কেউ। সবাই মিলে যুক্তি করে চলল তখন থানায়।

এখানকার থানা হলো রায়না থানা। গ্রামের নাম নাড়ুগ্রাম। নাড়ুগ্রাম থেকে রায়না অনেক দূর। তবুও সবাই মিলে দল বেঁধে থানায় গিয়ে বাঘের কথা বলল। বাঘটাকে যাতে সরকারি কায়দায় ধরা হয় বা গুলি করে মারা হয় তার জন্য চেষ্টা করতে বলল।

থানার দারোগাবাবু সকলের কথা বেশ মন দিয়ে শুনলেন। তারপর বললেন—ঠিক আছে। তোমরা নিজেরাই আরো দু'একবার চেষ্টা করে দেখো বাঘটাকে মারতে পারো কিনা। তারপর যদি একান্ত না পারো তখন যা হোক একটা ব্যবস্থা করা যাবে। আর যদি কেউ মারতে পারো তবে তাকে নগদ পঞ্চাশটা টাকা আর একটা দোনলা বন্দুক আমরা পুরস্কার দেবো। একথা গ্রামের সবাইকে গিয়ে জানিয়ে দাও।



সবাই তখন গ্রামে ফিরে চারিদিকে ঘোষণা করে দিল কথাটা। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। ঘোষণা করাই সার হলো। শুধু হাতে বা সামান্য একটা ধারালো অস্ত্র নিয়ে যে বাঘ মারবে এমন সাহসই বা কার আছে? তাই ঘোষণা শুনে বাঘ মারবার জন্য সাহস করে এগিয়ে এলো না কেউই।

এদিকে পুরস্কারের কথা শুনে কুশোর মন তো অস্থির হয়ে উঠল। সে ভাবল, বাঃ রে! আমি দেখলুম বাঘ, আর বাঘ মেরে টাকা লুটবে আর একজন? এ কখনই হতে দেওয়া যায় না। টাকাটা যে আর একজন নেবে বা বাঘ মারার সম্মানটা যে আর একজন পাবে কুশো তা কোন মতেই সহ্য করতে পারবে না। কেননা যে লোকটা বাঘ মারবে লোকের মুখে মুখে তখন তার নামই ছড়িয়ে পড়বে। কুশো যে বাঘটাকে প্রথম দেখেছিল সে কথা কেউ ভুলেও বলবে না,সে নিয়ে কেউ মাথাও ঘামাবে না। তাই না ভেবে কুশোর মেজাজ গেল বিগড়ে। সে তখন নিজেই হঠাৎ পণ করে বসল যে, বাঘটাকে যখন সে-ই দেখেছে তখন বাঘ মারারো সম্মানটাও সে-ই

লাভ করবে। অর্থাৎ সে নিজেই মারবে বাঘটাকে।

কুশোর কথা শুনে কুশোর বউ তো অবাক। বলল—সে কি! তুমি গিয়ে বাঘ মারবে কি? এই তালপাতার সেপাইয়ের মতো চেহারা নিয়ে? বাঘ মারা কি যা তা লোকের কাজ? বাঘ মারতে গেলে হিম্মতের দরকার হয় কতো।

কুশো বলল—সে হিম্মত আমারও আছে। কেন, আমি কি পুরুষ মানুষ নই?

কুশোর বউ এবার কপাল চাপড়াতে লাগল—হায় হায়। তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? কি খেতে পাও তুমি যে বাঘের সঙ্গে লড়বে?

কুশো বলল—কোন রকমে বাঘটাকে মারতে পারলেই পঞ্চাশটা টাকা নগদ পেয়ে যাবো বুঝলি? সেই সঙ্গে পাবো একটা দোনলা বন্দুক।

—টাকাটা না হয় কাজে লাগল। কিন্তু বন্দুক নিয়ে তুমি কি করবেটা শুনি? কেমন করে বন্ধুক ছুঁড়তে হয় তা তুমি জানো? সামান্য একটা গুলতি দিয়ে কাক মারতে পারো না, আর তুমি ছুঁড়বে বন্দুক?

কুশো বলল—খবরদার বলছি। আমাকে অমন তুচ্ছ তাচ্ছিল্ল করিস না। যেমন করেই হোক বাঘ আমি মারবোই।

কুশোর বউ বলল—বেশ। তাহলে বাঘ মারবার সময় আমাকেও তোমার সঙ্গে নিতে হবে। মরি তো দুজনেই মরব।

কুশোর বউয়ের কথা কুশোর বেশ মনঃপুত হলো। বলল—তা মন্দ বলিসনি বউ। তোতে আমাতে দুজনে মিলেই বাঘ মারতে যাবো। কি বল্?

এই বলে একদিন ভর সন্ধ্যেবেলা কুশো আর কুশোর বউ চলল বিষমভরায় বাঘ মারতে। সন্ধ্যেবেলা গেল তার কারণ বাঘটা লোকজনের ভয়ে দিনের বেলা বেরুত না। বেরুত রাত্রি বেলা।

সেদিন ছিল পূর্ণিমা।

সন্ধ্যের পর সারা মাঠ চাঁদের আলোয় ঝলমল করছে। গ্রামের কাউকে কিছু না জানিয়ে কুশো আর কুশোর বউ বেশ মোটা দেখে একখানা লাঠি আর এক গোছা শক্ত দড়ি নিয়ে সাহসে ভর করে চলল বাঘ মারতে।

তারপর মাঠে নেমে যেই না ওরা বিষমভরার কাছে এসেছে অমনি বাঘটা করল কি বিকট গর্জন করে তেড়ে এলো দুজনকে। বাঘের সে কি গর্জন! গর্জনের চোটে বাঘ মারা তো দূরের কথা ভয়ে কুশোর হাত থেকে লাঠি দড়ি দুটোই ছিটকে পড়ল মাটিতে।

কুশোর বউ চেঁচিয়ে উঠল—ওগো। তুমি কেন বাঘ মারতে এসেছিলে গো?

বাঘ তখন কুশোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে একেবারে দু'হাতের থাবা দিয়ে জাপটে ধরেছে কুশোকে।

কুশোও প্রাণপণে জড়িয়ে ধরেছে বাঘের গলাটা।

সে এক দেখবার মতো দৃশ্য। যেন বাঘে আর কুশোতে বিজয়া দশমীর কোলাকুলি হচ্ছে। দুজনেই দুজনকে জড়িয়ে ধরে সে কি দারুণ ধস্তাধস্তি।

কুশোর বউও এদিকে তারস্বরে চেঁচিয়ে চলেছে—ওগো কত্তা গো! তুমি কেন ঝকমারি করে বাঘ মারতে এসেছিলে গো?

কুশো প্রাণপণে বাঘের গলাটাকে জড়িয়ে থাকতে থাকতেই বলল—তুই খামোকা চেল্লাস না

বউ। যা বলি তা কর দিকিনি। আমি কোন রকমে ঠেলে ঠেলে বাঘটাকে একটা গাছের কাছে নিয়ে যাই আর তুই দড়িটা কুড়িয়ে নিয়ে বেশটি করে গাছের সঙ্গে বেঁধে দে ব্যাটাকে। তারপর দেখ ধোলাই কাকে বলে। এমন মার মারবো যে তখন বুঝতে পারবে কার পাল্লায় পড়েছে বাছাধন।

এই বলে কুশো যথাশক্তিতে বাঘটাকে জড়িয়ে ধরে কোনরকমে ঠেলে ঠুলে নিয়ে চলল।

ভাগ্যক্রমে কাছেই একটা খেজুর গাছ ছিল। সেই খেজুর গাছের গায়ে বাঘটাকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গেল কুশো। তারপর যেই না কুশো বাঘটাকে গাছের সঙ্গে ঠেকিয়েছে কুশোর বউ অমনি তাড়াতাড়ি দড়ি দিয়ে বেশটি করে গাছের সঙ্গে বেঁধে ফেলল বাঘটাকে।

কুশোকে তখন পায় কে! আনন্দে কুশোর বুকের ছাতি তখন এত্তোখানি হয়ে উঠল। বাঘের গলা ছেড়ে দিয়ে পড়ে থাকা লাঠিটা কুড়িয়ে নিয়ে সে তখন বেদম প্রহার শুরু করে দিল বাঘটাকে।

বাঘ তো ওরকম মার বাপের কালে খায়নি কখনো। তাই মারের চোটে দারুণ হাঁক ডাক সুরু করে দিল। বাঘের হাঁক ডাকে আসপাশের গ্রামের লোকেদেরও পিলে চমকে উঠল তখন। তারা ভাবল বাঘটা বোধ হয় ক্ষেপেছে। তাই যে যার ঘরে খিল কপাট লাগিয়ে ভয়ে কাঁপতে লাগল সব।

এদিকে মারের পর মার তার ওপর মার খেয়ে যখন দেখা গেল বাঘটা আর একটুও নড়াচড়া করছে না—একেবারে মরে গেছে, তখন কুশো আর কুশোর বউ মরা বাঘটাকে টানতে টানতে নিয়ে চলল তাদের ঘরের দিকে।

পরদিন সকালে গ্রামের লোক কুশোর ঘরে রক্তাক্ত কলেবরে মরা বাঘটাকে দেখে তো খুবই অবাক হয়ে গেল। তখন বিস্ময়ের আর অন্ত রইল না তাদের। একবাক্যে সকলেই কুশোর প্রশংসা করতে লাগল।

লক্ষ্মী দুলে তাড়াতাড়ি খবর দিলো থানায়।

খবর পেয়ে দারোগাবাবু নিজে এলেন বাঘ দেখতে।

বাঘ দেখে সকলের সামনেঽ কুশোর হাতে গুণে গুণে পঞ্চাশটা টাকা পুরস্কার দিলেন। সেই সঙ্গে দিলেন একটা দোনলা বন্দুক।

বন্দুকটা অবশ্য কুশো নিল না। দারোগাবাবুর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বলল—আমরা গরীব মানুষ হুজুর। চাষবাস করে খাই। বন্দুক নিয়ে কি করব? তার চেয়ে আপনি একটা 'সারফিঁটিকেট' লিখে দিন। বাঁধিয়ে রেখে দেবো।

দারোগাবাবু তাই করলেন। কুশোর পিঠ চাপড়ে তাকে একটা সার্টিফিকেট লিখে দেবেন বলে চলে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন মরা বাঘটাকে গরুর গাড়িতে করে থানায় পৌঁছে দিতে।

গ্রামের সর্বত্র কুশোকে নিয়ে তখন ধন্য ধন্য রব উঠেছে।



রাজপুত্র

রশীদ হায়দার

যেই দেখুক, চোখ তুলে একবার তাকাবেই। তাকিয়েই যে চোখ নামিয়ে নেবে, এমন নয়; বারবার, খুঁটে খুঁটে মাথার ওপর চুলটা থেকে পায়ের আঙ্গুলের নখ পর্যন্ত দেখে বলবে—রাজপুত্রের মতো চেহারা। এখনই যদি রাজভাণ্ডার থেকে জড়ির জুতো, পাজামা, পাঞ্জাবী, পাগড়ি এনে বলা যায়—সাধন এগুলো পরোতো! ব্যস, দেখতে দেখতে সাধন প্রিন্স অব জলপাইগুড়ি বা জলপাইগুড়ির কুমার বাহাদুর হয়ে যাবে। দেখে মনেই হবেনা, এই কিছুক্ষণ আগেও ছেঁড়া গেঞ্জি ও ছেঁড়া খাকি হাফপ্যান্ট পরে থাকার জন্যে একটা ভিখিরির মতো চেহারা ছিল ওর।

সাধনের বাড়ি জলপাইগুড়ি ছিল বলেই জলপাইগুড়ির কুমার বাহাদুর বলে সম্বোধন করলাম। কিন্তু ওর বয়েস বেশি নয়। মনে হবে নয় পার হয়েছে, দশ ছুঁই ছুঁই করছে, অথবা কেবল নয়ের গোড়ার দিকে। এই বয়সেই রাজপুত্র হলে সবাই বলতো, ছোট কুমার বাহাদুর, ইয়াংগেস্ট। কিন্তু তা হয়নি। না হয়ে হয়েছে এক কন্ট্রাক্টরের ছেলে। চেহারা পেয়েছে রাজপুত্রের মতো, কিন্তু রাজপুত্র উপাধি পায় নি। পরে ছেঁড়া গেঞ্জি ও ময়লা খাকি প্যান্ট। তাতে তালিও আছে, আবার ছেঁড়া জায়গায় সেলাইও নেই।

সাধনরা যেদিন আমাদের পাড়ায় এলো, তখন সবাই একবাক্যে বললো,

ঃ ছেলে তো নয়, হীরের টুকরো।

সাধনের মা কমলা হেসে বলে,

ঃ আপনারা দোয়া করবেন।

'আপনারা দোয়া করবেন' কথাটা যত সহজ ও স্বাভাবিকভাবে লিখলাম, কমলা কিন্তু তত সহজ ও স্বাভাবিকভাবে বলেনি। তার বাংলা উচ্চারণ ভাঙা ভাঙা, যেমন করে বলতে চায়

তেমনটি না হয়ে অন্যভাবে জিবের ফাঁক দিয়ে কথা দুষ্টু ছেলের মতো ছুটে বেরিয়ে যায়। আমরা শুনে হাসি। সাধনের মা বুঝতে পারে, কিন্তু লজ্জা পায়না, মিটমিট করে হাসে।

আমরা হাসি সাধনের মা ভালো করে কথা বলতে পারে না বলে, আর বড়রা হাসে আজিজ সাহেবের নতুন বউ দেখে। আজিজ সাহেবের আগের বৌ আছে, তার তিনটি ছেলে ও দু'টি মেয়ে আছে। বড় মেয়ের বিয়ে হয়েছে, বড় ছেলের বিয়ে ঠিক হয়ে আছে। তাঁরা যখন পাবনায় এলেন জলপাইগুড়ি থেকে, তখন কমলা ও সাধনও এলো। ওখানে থাকতেই আজিজ সাহেব কমলাকে বিয়ে করেছিলেন। আর পাবনার শচীন চৌধুরীর সঙ্গে বাড়ি বদল করে যখন চলে এলেন, তখন সাধনের বয়স ওই নয় দশের কোঠায়।

প্রথমদিনই সাধনের মার মুখে আমি হাসি দেখেছি। খুব যে জোরেসোরে হাসে তা নয়, হাসলে দাঁত কখনো দেখা যায়, কখনো যায়না, মনে হয় খুব গরমের দিনে খানিক ঝিরঝিরে বৃষ্টি হয়ে গেল। বেঁটেখাটো মানুষটি, চোখ ছোট ছোট, গায়ের রং ফবসা ধবধবে এবং চুলগুলো জলপ্রপাতের মতো। এমন মায়ের ছেলে সাধন, গায়ের রং আর চেহারা পেয়েছে বাবার। আজিজ সাহেব দেখতে সুন্দর ও যথেষ্ট লম্বা চওড়া। সাধনকে তাই রাজপুত্র বললে কম বলা হয়না।

প্রথমদিনই সাধনের মার মুখে যে হাসি দেখেছি, সে হাসি কোনোদিন মিলিয়ে যেতে দেখলাম না। মানুষ আত্মীয় স্বজনের কথা মনে করেও মন খারাপ করে, চোখের পানি ফেলে, নিরালায় মুখ গম্ভীর করে বসে থাকে। কিন্তু কমলা ?

মা জিগেস করেছিলেন,

ঃ হ্যাঁ কমলা, তোমাদের বাড়ি কি জলপাইগুড়িতেই ?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ ওখানে তোমার কে কে আছে ?

ঃ মা, বাবা, এক ভাই ও তিন বোন।

ঃ মা বাবা ভাই বোনের কথা মনে পড়ে না ?

ঃ মনে পড়লে কি করব ? ফিরে তো আর যেতে পারব না !

হয় তো ফিরে যেতে পারবে না মনে করেই কমলা দুঃখ করে না। জলপাইগুড়ির পাহাড়ি এলাকায় তাদের ঘরবাড়ি ছিলো, ঘরের চাল, আকাশ ছিলো আর চা বাগানে কাজ ছিলো ; তারা সবাই সেখানে কাজ করত, মিলেমিশে, হাসিখুশীভাবে। সেই খুশী ও স্বাধীনতার দিনগুলো তখন সাধনের মার জীবন থেকে হারিয়ে গেলেও কেবল সাধনের দিকে তাকিয়ে বলে,

ঃ আমার সাধন আছে, আমার আর চিন্তা কি ? বলেই ফিক করে হেসে ফেলে।

আমার মনে হয় মানুষের দুঃখ কষ্ট সহ্য করার জন্যে আলাদা একটা মন থাকে। নইলে সাধন হতে পারতো প্রিন্স অব জলপাইগুড়ি, না হয়ে হয়েছে আজিজ কন্ট্রাক্টরের ছেলে, যে লোক ভুলেও বুঝি তার ছেলের দিকে তাকায় না, তার ছেঁড়া ফাটা পোষাকটা বদলে দেবার কথা মনেও আনে না। সাধন কিংবা তার মার এজন্যে কোনো অভিযোগ নেই। সাধন, বলা চলে দিন রাত আমাদের বাসাতেই থাকে, আমার ছোট ভাই রোকনের সাথে খেলা করে।

একদিন দেখলাম, সাধন একটা ইঁট মাথায় করে তাতানো রোদে দাঁড়িয়ে আছে। অদূরে, রোকন কাগজের ঠোঙ্গা থেকে কি যেন বের করে করে খাচ্ছে। আমাকে দেখেই রোকন দৌড়ে পালিয়ে গেল। সাধনকে জিগেস করলাম,

ঃ কি রে, তুই ইঁট মাথায় করে দাঁড়িয়ে কেন ?

ঃ রোকন আমাকে চানাচুর খাওয়াবে।

ঃ চানাচুর খাওয়ার জন্যে ইঁট মাথায় করে দাঁড়িয়ে ?

আমার এ প্রশ্নের জবাব সাধন দিতে পারে না। ইঁটটা তাড়াতাড়ি ফেলে দিয়ে, চুপ করে



অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে রইলো। কাছে ডেকে জিগেস করি,

ঃ রোকন তোকে আজকেই না আরো এমনভাবে কষ্ট দিয়েছে ?

মনে হলো, আমারই ভাইয়ের বিরুদ্ধে কিছু বলতে সাহস হারিয়ে ফেলেছে সাধন। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো, চোখ দুটো টানা টানা, মণি দুটো কালোয় কালোয় চক চক করছে। মাথায় হাত বুলিয়ে বলি,

ঃ কিরে, বললি না তো ?

ঃ আমাকে একদিন পিঁপড়ের মধ্যে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলো, একদিন সর্দি খাইয়ে দিয়েছিলো, আরেকদিন অনেকক্ষণ চোখ বেঁধে রেখে দিয়েছিলো।

ঃ আচ্ছা, ঠিক আছে। রোকনকে মজা দেখাচ্ছি। আচ্ছা তোকে এমন করে শাস্তি দেয় কেন ?

ঃ আমাকে যে আইসক্রিম খাওয়ায়, চিনেবাদাম খাওয়ায়, চানাচুর দেয়।

লক্ষ্য করলাম, খাবার জিনিসের নামগুলো বলার সাথে সাথে একটা ক্ষুধার ছায়া ওর চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়ছে, যেন চোখের মণি দুটো অনবরত ঘুরে ঘুরে খাবার জিনিসগুলোকে স্পর্শ

করে যাচ্ছে।

সেইদিনই রোকনকে সাধনের মার সামনে শাস্তি দিলাম। কমলা তাড়াতাড়ি ছুটে এসে রোকনকে হাত থেকে ছাড়িয়ে নিতে নিতে বললো,

ঃ ছিঃ বাবা, ওরা ছোট ছেলে, ওদের কি দোষ ধরতে আছে ?

ঃ তাই বলে অমন কষ্ট দেবে কেন ?

ঃ একটু কষ্ট পেলেও তো সখের জিনিসগুলো খেতে পায়। আমি তো দিতে পারি নে।

কথাগুলো বলতে সাধনের মার মুখে কোনো বেদনাই লক্ষ্য করি নি, বরং একটা মিষ্টি হাসির ছটা তার মুখটাকে যেন আলোকিত করে রেখেছে। অথচ ছেলে খেতে পায় না, এবং পেলেও এভাবে কষ্ট পায় মনে করে কমলার কাঁদা উচিত ছিলো। কিন্তু কি দিয়ে যে ওর মন তৈরী হয়েছে—হয়ত পাহাড়ি এলাকার পাথুরে ছোঁয়া ওর মন থেকে যায় নি বলে সহজে চোখ দিয়ে পানি বেরোয় না।

আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম তার দিকে। আমাকে আরো অবাক করে দিয়ে সাধনের মা সহজভাবে আমার দিকে তাকিয়ে সেই ঝিরঝিরে বৃষ্টির মতো হেসে বললো,

ঃ ছোটবেলা থেকে কষ্ট করতে শেখা ভালো। আমাদের জলপাইগুড়ির পাহাড়ে পাহাড়ে কাজ করতে খুব কষ্ট হতো, তাও তো করতে হতো!

আমরা যারা ওখানে উপস্থিত ছিলাম, কারো মুখ দিয়ে কথা বেরোয়নি। মানুষের মন যে কতোভাবে গঠিত হয়, তা ভেবে ভেবে আকুল হয়ে গেলেও হদিস পাওয়া যায় না। শুনেছি, আজিজ কন্ট্রাকটরের বাসায় একজন ঝি চাকরানীর যতোটা কাজকর্ম করতে হয়, কমলাকেও ঠিক ততটাই, এমন কি বেশিও করতে হয়। প্রায় সবসময়ই রান্নাঘরের ধোঁয়াকালির মাঝে ডুবে থাকতে হয় তাকে, আর একটু ফুরসৎ পেলেই আমাদের বাসায় চলে আসে, তখন দেখে মনেই হবে না, এইমাত্র কাজে কর্মে তার আর বাইরে বেরুনোর উপায় ছিল না।

মা জিগেস করেন,

ঃ তোমাকে এতোটা খাটায়, তুমি কিছু বলতে পারো না ?

ঃ কে খাটায় ? যে কাজ করি, তার চেয়ে অনেক বেশি কাজ দেশে করতে হতো। আর এতো ঘরে বসেই কাজ করি।

কথাগুলো শেষ করে কমলা সুন্দর দু'পাটি দাঁত বের করে ঝির ঝির করে হেসে ফেলে।

ঃ আচ্ছা কমলা, তুমি যে আমাদের বাসায় আসো ওরা জানে না ?

ঃ জানে।

ঃ কিছু বলে না তোমাকে ?

ঃ বলে, কিন্তু কানে তুলি না। কানে তুললে যদি ঝগড়া বাধে ? ঝগড়া হওয়া ভালো ? ঝগড়া হলে আমার সাধনকে যদি ভাত না দেয় ?

একটার পর একটা প্রশ্ন তুলে কমলা, হাসিমুখে চেয়ে রইলো, ভাবখানা এত বড় একটা সমস্যার কথা আদৌ চিন্তা না করে মা কথাটি তুলেছিলেন, সে সেটার অতি সহজে সমাধান করে দিলো।

ঠিক সেই সময় সাধন এলো আইসক্রিম খেতে খেতে। গায়ের গেঞ্জিটা ঝুলে পড়েছে—ময়লা, ছেঁড়া প্যান্ট আর মাথায় তেলের নেই বালাই—মনে হচ্ছে এইমাত্র কাদামাটির ভেতরে গড়াগড়ি দিয়ে এলো। কমলা হেসে সাধনকে বললো,

ঃ আইসক্রিম কে দিলো রে ?

ঃ আমি কিনেছি।

ঃ তুই কিনেছিস ? পয়সা পেলি কোথায় ?

ঃ তোমার বিছানার নিচে দুই আনা পয়সা ছিলো, তাই দিয়ে আমি দুটো কিনে একটা রোকনকে দিয়েছি, আর একটা আমি। তাই না রোকন ?

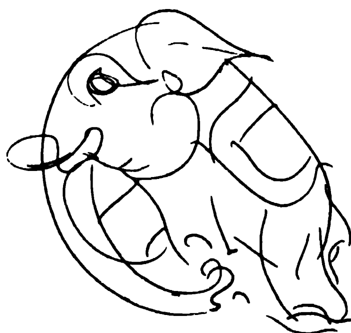
রোকন মাথা নেড়ে সায় দেয়।

কমলা বেশ জোরে হেসে বলে,

ঃ এখনই যদি চুরি করা শিখিস, বড় তো হসইনি।

ঃ তোমার কাছে পয়সা চাইলে দাও না। আর রোজ রোকনই তো খাওয়ায়। আজকে আমি রোকনকে খাইয়েছি। তাই না রোকন ? মা জানো, আজকে যে আইসক্রিমটা কিনেছি, খুব মিষ্টি, খুউব মিষ্টি, না রোকন ? আজকে আমি রোকনকে খাইয়েছি।

সাধন আর কথা বলতে পারছে না। খুশী জোয়ারের পানির মতো তার চোখ মুখ ছাপিয়ে উপচে পড়ছে, আর কমলা ? ছেলের খুশীর সাথে সাথে সে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে, কাঁদতে কাঁদতে একসময় সে ফোঁপাতে থাকে, ফোঁপাতে ফোঁপাতে কিছুক্ষণের মধ্যেই তার ফোলা-ফোলা চোখ মুখ আরো ফোলা-ফোলা হয়ে যায়, মনে হয় সে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদছিলো।





ক্যাপটেন ডি সুজা

দেবব্রত মল্লিক

খিদিরপুর বন্দর। কোল জেটি।

শেষ বার্থে রয়েছে 'বিশ্ব সমুদ্র'। মালবাহী জাহাজ। এ পাশে কাছাকাছি অন্য কোন জাহাজ নেই এখন। শুধু রয়েছে হাইড্রোলিক ব্রীজের দু পাশে দুটো জাহাজ। এম ভি হর্ষবর্ধন আর জলতরঙ্গ। প্রথমটি নিয়মিত আন্দামান যায় এবং অন্যটি মালবাহী।

এ সমস্ত দেখতে দেখতে মুখস্ত হয়ে গেছে রতনের। এরই মধ্যে বন্দরের রক্ষী বাহিনীতে কাজ করার অভিজ্ঞতা দাঁড়িয়েছে দু বছর। একটা রেল ইঞ্জিন ঝকঝক করতে করতে এসে জলের ট্যাঙ্কের কাছে দাঁড়াল। জল ভরবে নিশ্চয়ই। এধারে গেটের পাশে বটগাছের ছায়ায় রতন পাহারায় দাঁড়ানো।

হঠাৎ গেটের পাশে এসে দাঁড়াল একজন বৃদ্ধ। এক মাথা পাকা চুল। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি পরনে প্যান্ট, গায়ে একটা চেক চেক শার্ট, চোখমুখ দেখে মোটেও স্বাভাবিক ঠেকছে না। গেট থেকে আর একটু ভেতরে হঠাৎ ঢুকে এল।

ঃ আপ কৌন। কোথায় যাবেন?

বৃদ্ধ কিছুক্ষণ বিশ্ব সমুদ্র জাহাজের দিকে তারপর রতনের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। পরে বলে ঃ ই জাহাজ কব ছোড়েগি।

ঃ এ আর কোনদিনই ছাড়বে না।

ঃকেন? কেন? বৃদ্ধ বিমর্ষ, হতবাক।

ঃ বিশ্ব সমুদ্র এখন স্ক্র্যাপ। ভেঙে ফেলা হবে। বিক্রি হয়ে গেছে।

ঃ বিশ্ব সমুদ্র আর জলে ভাসবে না কখনো? পাগলের মত শব্দগুলো আওড়াতে থাকে বৃদ্ধ।

হঠাৎ হেসে হেসে বলেঃ এই জান তো, এটা আমারই জাহাজ ছিল।

এ কথায় রতন আর কোন উত্তর করে না। বুঝতে পারে বৃদ্ধের নিশ্চয়ই মাথা খারাপ। মিনিট দশ-পনের চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে বৃদ্ধ, তারপর গেটের পাশ থেকে চলে যায়। আবার ফিরে আসে। এবার রতনকে বলেঃ আমাকে একবার ভেতরে যেতে দেবে?

ঃ ভেতরে যাওয়া বারণ।

ঃ শুধু একবার। আমার কেবিনটা দেখে ফিরে আসব। অনুরোধ জানায় বৃদ্ধ। ঐ কেবিনে আমার বহু স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে।

ঃ আপনি সত্যি সত্যি পাগল দেখছি। ঐ ভাঙা জাহাজে উঠবেন? রতন পাশ থেকে বৃদ্ধকে জোর করে সরিয়ে দিল।

পরের দিন।

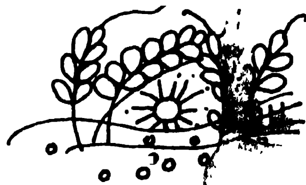


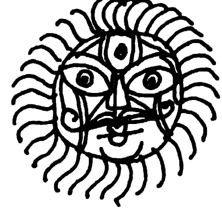
রতনের ডিউটি সেই একই জায়গায়। শুধু সময়ের হেরফের হয়ে বিকেলে হয়েছে। গেটের কাছাকাছি এসে দাঁড়াতেই অবাক। হই চই, মানুষে মানুষে ছড়াছড়ি। বিশ্ব সমুদ্র জাহাজের পাশে ভিড়ে ভিড়াক্কার। লোক পরম্পরায় খবর এসে পৌঁছল। বিশ্ব সমুদ্র জাহাজের কেবিনে একজনকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। তাজ্জব ব্যাপার। স্ক্র্যাপ জাহাজ। সেখানেও মৃত দেহ। পুলিশ এসেছে। এসেছে ফায়ার ব্রিগেডের লোক। জাহাজের মালিকপক্ষকে খবর দিয়ে আনানো হয়েছে। মৃত ব্যক্তি ওঁদের নাকি পরিচিত। দীর্ঘদিন এ কম্পানিতে কাজ করেছেন। নাম ডি সুজা। গোয়ার মানুষ। জাহাজের ক্যাপ্টেন ছিলেন।

মৃত ব্যক্তির সঙ্গে একটা ডায়রি পাওয়া গেছে। তাতে লেখা রয়েছেঃ আমি গত সপ্তাহের শিপিং নিউজ কাগজে দেখলাম বিশ্ব সমুদ্রকে স্ক্র্যাপ করা হবে। কথাটা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না। তাই ছুটে আসি কলকাতা বন্দরে। এখানে এসে দেখি, কথাটা সত্যি। গেটের একজন সান্ত্রীও তাই জানাল। আমি তাকালাম আমার প্রিয় বিশ্ব সমুদ্রের দিকে। আমার মনে হল ও যেন আমাকে দেখে অঝোরে কেঁদে চলেছে। আমারই কি কম কান্না পাচ্ছিল তখন। আমি সবার চোখে ধুলো দিয়ে আমার কেবিনে উঠে এসেছি। আমার সেই প্রিয় কেবিন। উঃ কতদিন এখানে আসিনি। দারুণ ভাল লাগছে আমার। আমার পরম ...এরপর আর কিছু লেখা নেই। কালির একটা দুটো আঁকিবুকি রয়েছে। ডাক্তারের অভিমতঃ হার্টফেল। পরম আনন্দের অন্য এক প্রকাশ।

গেটে দাঁড়িয়ে রতন কিরকম যেন একটা উত্তেজনা অনুভব করছে। বিভিন্ন বন্দর কর্মীরা আসছে, চলে যাচ্ছে। এক অদ্ভুত ঘটনা। কারো কারো অভিমত ঃ এমন জাহাজ-প্রেমিক কখনো দেখিনি। রতন সবকিছুই লক্ষ্য করছিল। প্রায় বিকেল চারটের সময় মৃতদেহটি জাহাজ থেকে নিচে নামিয়ে আনা হল। ডেড বডি শোয়ানো রয়েছে বিশ্ব সমুদ্রের পাশে। আরো কিছুক্ষণ এখানেই শোয়ানো থাকবে। তারপর যাবে মর্গে।

রতন একজনকে ওর জায়গায় দাঁড়াতে বলে এক ছুটে এসে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে মাথা গলাল। হ্যাঁ কালকের সেই বৃদ্ধ। খাটিয়ার ওপর শুয়ে আছেন। এখন ওঁর মুখে চোখে সেই অস্বাভাবিক ভাব নেই। অবিন্যস্ত এক মাথা পাকা চুল ও মুখ ভর্তি দাড়ি নিয়ে শুয়ে আছেন বৃদ্ধ। মুখে প্রশান্তির প্রতিচ্ছায়া।





কুড়ানো টাকার কুরুক্ষেত্র

ইমরুল চৌধুরী

কুড়ানো টাকা নিয়ে কুরুক্ষেত্র!

পুরো দশটা দিন দিশেহারা নারু কাণ্ড-জ্ঞানহীন কাণ্ডকারখানা ঘটিয়ে বসে। জানা মতো সকল চাতুরী খাটিয়ে চতুর নারু আমাকে ফতুর করে দেয়। যুক্তিযুক্তহীন যুক্তিতর্কে আমাকে ভড়কে দিতে চায়ঃ দ্যাখ ইমু, মানিব্যাগটা কুড়িয়ে পাওয়ার সময় আমিও তোর সংগে ছিলুম। পাওয়া টাকার পাওনা অংশ আমাকে দিতেই হবে।

বলে স্থির সংকল্প নারু পাওয়া টাকার আশায় পাওনাদার হবার ভান করে।

নারুর কচকচানি আমি তৎক্ষণাৎ নাকচ করে দিইঃ টাকাটা তুই কুড়িয়ে পাসনি। ফাঁকা রাস্তা থাকলেই টাকা কুড়িয়ে পাওয়া যায়না। এর জন্যে বাঁকা চোখ থাকা চাই। টাকা পাওয়ার ব্যাপারে তোর কোনো অবদান আছে তা আমি স্বীকারই করি না। আমি হককথার মতো নারুকে সাফ সাফ জানিয়ে দিই। নারু তথাপি নিজের হক ছাড়তে রাজী হয়না। বরং হক কথার হকিকত শুনিয়ে আমার সাথে হঠকারী করতে চায়ঃ 'তুইতো রোজই খালি হাতে ফিরিস। আমি সংগে ছিলুম বলেই তো মানিব্যাগটা তোর নজরে এলো। আমিই তো তোকে মানির মাণিক্য দেখালুম।' বলে নারু চানক্যের মতো আমার দিকে তাকায়। বাক্যবাণে আমাকে বাঁকা করতে চায়। বাক্যের চাকচিক্যে বাকায়দা ফায়দা ওঠাতে চায়।

আমি কায়দামতো নারুকে 'নো' করার চেষ্টা করিঃ তুই আমার সংগে ছিলি ওটা নেহাৎ কোইন্সিডেন্ট। তুই আমার সংগে না থাকলেও সেদিন কালিচরণ রোডে মানিব্যাগের মাণিক্য ঠিকই চিকচিক করতো। তুই ভেবেছিস ওই চাকচিক্য ছেড়ে আমি খালি হাতে হাততালি দিয়ে বাড়ী ফিরতাম। আর তুই কি কম বিদ্রোহই না করতে চেয়েছিলি আমার সংগে। ছোঁ মেরে মানিব্যাগটা ছিনিয়ে নিয়ে পুরো টাকাইতো আত্মসাৎ করতে চেয়েছিলি। ঠিক সময় মতো পা দিয়ে তর্জনী চেপে না রাখলে পুরো টাকার মালিকতো তুই হতিস্।

বলে আমি নারুর আসল উদ্দেশ্য ব্যক্ত করি। কিন্তু যেখানেই মানির প্রশ্ন সেখানে কোনো ক্ষীণ আশাও নিরাশ হতে দেয় না নারু। প্রয়োজনবোধে মুনি হতেও দ্বিধাবোধ করে না। মানির প্রশ্নে রক্তাক্ত হানাহানি ঘটাতেও তৎপর হয়ে ওঠে নারু। 'ফাও টাকার ফিফটিপার্সেন্ট তোকে দিতেই হবে ইমু।' রক্তচক্ষু নারু শক্তভাবে কথাগুলো উচ্চারণ করে। ফিফটিপার্সেন্ট আদায় করার জন্যে যেন শক্তভাবে গাঁট হয়ে দাঁড়ায়। ব্যাপারটা মিটমাট করে নিজের ভাগ নিয়ে নারু ভেগে পড়তে চায়।

নারুর আচরণ আমাকে বিস্মিত করে। আমি যতই স্মিতমুখে জবাব দিই নারু যেন ততই আমাকে ভীত করে তুলতে চায়। যতই নির্ভয় হবার ভাণ করি ততই নারু ভয় দেখিয়ে আমাকে রীতিমত পেরেশান করে তোলে। নারুর সকল চাতুরী প্রয়োগ সত্ত্বেও ওর ব্ল্যাকমেইলের মুখে টিকে থাকার চেষ্টা করি। একে একে ওর সকল প্রচেষ্টাই ফেইল হতে থাকে।

'তার মানে পুরো টাকাটা তুই একাই আত্মসাৎ করবি।' নারু যেন শেষ কথা জানতে চায়। আমিও সর্বশেষ কথা নারুকে জানিয়ে দিতে দেরী করিনেঃ 'তোর এখনও কোনো সন্দেহ থাকা উচিত নয় নারু। প্রয়োজন হলে বেমালুম তাই করবো। পুরো টাকাটাই আমি দু'হাতে দেদারভাবে উড়িয়ে ফুর্তি করে বেড়াবো। এটা তোর অনেক আগেই মালুম হওয়া উচিত ছিলো।'

বলতে বলতে নারুকে আমার শেষ কথাটা প্রচণ্ডভাবে মালুম করাবার চেষ্টা করি। নারুর মুখের সামনে বজ্রপাতের মতো দরজার খিল এঁটে খিলখিল করে উঠি।

'দুরহ' বলে দুরূহ নারুকে দূর হয়ে যেতে বলি। আর নারু রাগে দু'হাত রগড়াতে থাকে। খিল বন্ধ দরজায় প্রচণ্ড ঢিল মেরে সব লণ্ডভণ্ড করার জন্য যেন মারমুখো হয়ে ওঠে। তারস্বরে তারবার্তার মতো সংক্ষেপে ক্ষ্যাপা নারু তথাপি জানতে চায়, 'তাহলে এই তোর শেষ কথা ইমু।'

আমি দরজার খিল ধরে সেই রকম খিলখিলিয়ে উঠিঃ আর কথার বাড়াবাড়ি হওয়া উচিত নয় নারু। এখন তুই ভালোয় ভালোয় কেটে পড়তে পারিস।

বন্ধ দরজার ওপাশে রাগান্বিত নারুকে যেন সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাই আমি। উপায়ান্তর না দেখে যেন মন্ত্র উচ্চারণের মতো নারু বলে যায়ঃ আমি খেটে খাওয়া ছেলে ইমু। পাওয়া টাকায় আমার কোনো লোভ নেই। জেনে রাখিস কেবল কুঁড়ে লোকের জন্যেই কুড়ানো টাকা। তুই কুড়িয়ে পেয়েছিস আমি খেটে ওই টাকা আনবো। এই টাকা তোর পেটে সইবে না ইমু বলে যাচ্ছি।

বলতে বলতে নারু যাবার ভান করে।

আমিই আবার নারুকে থামাই। কোনো বদহজম হবে বলতে চাস? হ্যামবার্গার-চিকেন রোস্ট-ফ্রাইডপ্রন বদহজমের কিছু নেই নারু। না হয় কয়েকটা ফ্রুটসল্ট লাগবে বড়ো জোর।

বলে আমি জোর শব্দ তুলে নারুকে ফলস ঢেকুর শোনাই।

নারু শুনতে পায় কিনা জানিনে। তবে আমি স্পষ্ট শুনতে পাই নারুর জিভের চুকচুক শব্দ। রসনার রসে যেন আস্ত রসমালাই অনুভব করে নারু। নারুর সবটাই ফাও। ফাও টাকা। ফাও খাওয়া।

উল্টো নারুই আমাকে উপদেশ দেয়ঃ ফাও টাকার ভোগ তোর হবে না ইমু। বরং ভোগান্তিই হবে বলে যাচ্ছি।

বলে নারু যাবার জন্যে আবারও পা বাড়ায়। আমি নারুকে আবারও থামাইঃ তাহলে এও শুনে যা নারু, তুই সেদিন মাহবুব ক্লথ মার্কেটে ডবল নীটের যে জাপানী প্যান্ট পীসটা দেখেছিলি

আর সেদিন ফারাডাইস মার্টে লংকল্যার রেডস্ট্রাইপ সার্টটা দেখার পর থেকে তোর যে রকম হার্টবিট হচ্ছিল কাল থেকে আমাকে দেখা মাত্রই তোর সেই হার্টবিট মানে ...... ।

বলে আমি সম্পূর্ণ কমা সারার আগেই নারুকে ওর হার্টফেল করার চেষ্টা করি। কিন্তু নারু উল্টে নিজের বুক দাপড়ে দাপট দেখায়ঃ কাল থেকে কার হার্টকে বিট করবে তা তুই নিজেই টের পাবিনে ইমু।



বলতে বলতে নারু একেবারেই অদৃশ্য হয়ে যায়। আমি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। পাওয়া টাকা ছেড়ে ওর চলে যাওয়ায় খটকা লাগলেও আমি আপাততঃ নির্ভয়ে দরজা খুলে দিই। আপনমনে খোলা দরজার খোলা হাওয়া খাই। ভুলে যাই নারুও যে একজন অংশীদার। আমি কুড়ানো টাকার পুরোটা একাই ভোগ করতে গিয়ে ভোগান্তি বাড়িয়ে তুলি। নারুর কথাই ঠিক। যেন ক্ষণিকের মধ্যেই অদৃশ্য নারুর অদৃশ্য হাতের কারসাজি দৃশ্যময় হয়ে ওঠে। পরের দিনই টের পাই। বন্ধ দরজায় প্রচণ্ড শব্দে আমারই হার্টফেল হবার উপক্রম হয়। বন্ধ দরজা যেন খোলার অপেক্ষায় থাকে না। যেন আপনাতেই খুলে যায়। আর অপর প্রান্তের ষণ্ডা লোকের পাণ্ডা দেখে কাঁপুনী ধরে যায় আমার। শর্টহ্যান্ডের মতো শর্টকাটে কাজ সেরে ফেলতে চায়—মানে, মানিব্যাগ নিয়ে মানে মানে কেটে পড়তে চায়।

আমি বিনা বজ্রপাতে আকাশ থেকে পড়ি। কার মানি ব্যাগ! আমি কিছুই না জানার ভান করি। তাহলে কি নারু টাকা আদায় করার জন্যে গণ্ডা লাগিয়েছে। ভেবে আমার গণ্ডদেশ থেকে যেন ঘাম ঝরতে থাকে। হীন নারুর হীন কার্যকলাপে আমার ঘেন্না ধরে যায়।

এদিকে ষণ্ডা লোকটা ষাঁড়ের মতো চেঁচিয়ে ওঠে। পাওয়া টাকা নিয়ে হাওয়া হয়ে যেতে চায়। স্বীয় কথা বিশ্বাস করাতে গিয়ে আমাকে দ্বিগুণ বিস্মিত করে তোলেঃ আমি কি হাওয়া থেকে বাম্ম করছি। এই দেখুন না আজকের খবরের কাগজেইতো রয়েছে বলে সে বগলদাবা খবরের কাগজ সবলহাতে আমার দিকে বাড়িয়ে দেয়। আমি একদিকে বড়ো হাত করে তার দিকে দু'হাত বাড়িয়ে দিই অপর দিকে আমার ভেতরটা আস্তে আস্তে জড় হয়ে যেতে থাকে। ত্বরিতে আমার হার্টবিট তড়াক করে বেড়ে যায়, যেন তড়িতাহতের মতো আমি শুধু হাত বাড়িয়েই থাকি নির্জীবের মতো। আড়ষ্ট জিভে আমি স্পষ্ট করে বলতে পারিনে কিছুই।

কেবল বুঝতে পারি নারুরই দেয়া মরণ পণ বিজ্ঞাপন এবং তাও নিজের নামে নয় অপরের নামে। নারু পরকে দিয়ে অপরের ধন আর পরকেই দিতে চায়। বিজ্ঞাপন দেখে আমিও পণ করি। পাই পাই করে পাওনাদারদের পই পই জবাব দিই। কথার খই ছুটাই। মানে মানে সকলকে মানিয়ে অপরের মানিব্যাগ নিজের জেবে আগলে রাখি। পাওয়া টাকার পাওনা লোকদের ধাওয়া করে ফিরি। ধাওয়া করি আর দায় সারি। তাড়া করা লোকদের তাড়া খেয়েও তোড়া নোট হাত ছাড়া করিনে।

এক সময় নারুও তাড়া করেঃ 'তার মানে তুই অন্যায়ভাবে টাকাটা ভোগ করবি। মানিব্যাগটা মেরে দিয়ে একটা গর্হিত কাজ করবি।' বলতে বলতে নারু যেন আমাকে হিতোপদেশ দেয়। হিতে বিপরীতের মতো আমি হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। নারুর অপকর্মের একটা বিহিত করতে চাইঃ তাই বলে তুই যার তার নামে যাতা একটা বিজ্ঞাপন দিবি। অবিবেকজনিত অবিজ্ঞ কাজ করবি। নারু তথাপি বিজ্ঞলোকের মতো ভান করেঃ বিজ্ঞাপনটা নিশ্চয়ই বিফলে যায়নি। যার টাকা সে নিশ্চয়ই সন্ধান পেয়েছে।

বলে আমাকে কিঞ্চিৎ সন্দিগ্ধ করে তুলতে চায়। একটা পুলিশী কাণ্ডকারখানা না ঘটিয়ে নাকি আমি নিস্তার পাবো না এই বলে নারু আমাকে সতর্ক করে। সবিস্তারে আমাকে ক্রিমিন্যাল এ্যাক্ট সম্পর্কে অবহিত করে নারু। আমাকে ভয় দেখায় এবং ভাবিয়ে তোলে।

তথাপি টাকার মায়াডোর আমাকে বিভোর করে রাখে। আমি সহজেই কুড়ানো মানিব্যাগের মায়া ছাড়তে পারিনে। মানির মাণিক্য আমি কাঁকড়ার মতো আঁকড়ে থাকতে চাই।

নারু আমার ভাবসাব দেখে প্রীত হয় না। বরং হৃত টাকা পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় আমাকে আরও ভীত করে তুলতে চায়ঃ "টাকার আসল মালিক কে তা তুই নিজেও জানিসনে ইমু। আসল মালিক তোর কাছ থেকে টাকা আদায় করে নেবেই। পাওয়া টাকা ভোগ করার আশা তুই এখনও ছেড়ে দে। নিজের সর্বনাশ তুই নিজেই ডেকে আনছিস ইমু।

বলে নারু আমার সর্বনাশা পরিণতির ইংগিত দেয়। আসল মালিককে টাকা না দেয়া পর্যন্ত খবরের কাগজে নাকি বিজ্ঞাপন বেরুতেই থাকবে—এই বলে নারু আমাকে সচেতন করতে চায়। আমার নাকি চেতনা ফেরা দরকার বলে নারু আমার চেতনায় আঘাত করতে চায়।

নারুর সদুপদেশ যেন আমার বিবেকে ঝড় তুলে দেয়। আমি সৎকাজে নিজেকে মনোনিবেশ করি এবং নারুকে শেষ কথা জানিয়ে দিইঃ দেখ নারু পাওয়া টাকা দিয়ে বরং মেকি কাজ করা ভালো। পুরো টাকাটাই তার চেয়ে গেনডারিয়া মসজিদে দান করে নেকি হাসিল করবো।

নারু আমার কথা শুনে ন্যাকা সাজার চেষ্টা করে। উদগ্রীব হয়ে উৎসাহ দেয়ঃ তাই ভালো ইমু। সকলের নেক নজরে থাকার চেষ্টা কর। অপরের টাকার ওপর যে লোভ দেখিয়েছিস তাতে তোর কৃতপাপের কোনো ক্ষোভ থাকবে না। তোর বরং প্রায়শ্চিত্য করা দরকার।

মেকি নারু আমাকে উপদেশ দেয়। নেক কাজে দেরী করা উচিত নয় বলে নারু আমার নেক নজর থেকে উধাও হয়ে যায়। আমি সহজেই নারুর মেকআপ বুঝতে পারিনে।

তথাপি মেকি সিদ্ধান্তে অটল থাকি আমি। পাওয়া টাকা ও মেকি নারু—এ দুয়ের প্রাণান্তকর অবস্থা থেকে আমি আশু মুক্তি চাই। মুক্তি চাই গেনডারিয়ার জামে মসজিদের ইমাম সাহেবের কাছে যার সফেদ শ্বশ্রু গুম্ফময় অলৌকিক মুখাবয়বের দিকে তাকিয়ে তুলে দিই কালিচরণ রোডে কুড়িয়ে পাওয়া কালো মানিব্যাগ। নেকি হাসিল করি এবং কপর্দকহীন শূন্যহাতে ঘরে ফিরেও পুণ্যি অর্জনের এক অলীক চেহারায় উদ্ভাসিত হই।

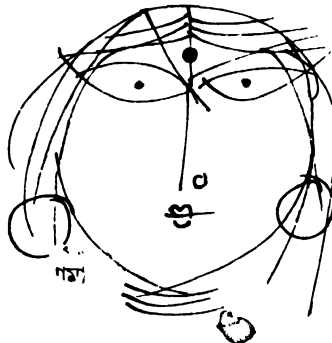
কিন্তু সেই অলীক উদ্ভাসিত চেহারা যেন ক্ষণিকের মধ্যেই মিলিয়ে যায়। মেকি নারু ওর মেকআপ নিয়ে স্মিতমুখে খিলখিল করে ওঠেঃ ভালোই হলো ইমু। তোরও নেকি হাসিল হলো আমিও চরিতার্থ হলাম।

আমি অর্থহীন সন্দিগ্ধ নারুর দিকে তাকাইঃ তাহলে কি…. ।

পুরো মানিব্যাগটা কেড়ে নেয়ার মতো নারু আমার মুখের কথাও কেড়ে নেয়ঃ আসল মালিককেই শেষ পর্যন্ত টাকাটা দিলি তবে ……

আমিও নারুর কথার গ্রাস কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করি। বিশ্বাস করি না নারুর কথায়ঃ তবে কি ইমাম সাহেবই …… ।

নারু যেন থাম থাম বলে চিৎকার করে ওঠে। পকেট থেকে কালিচরণ রোডের কুড়ানো কালো মানিব্যাগ বের করে রীতিমত আমার ঘাম ছুটিয়ে দেয়ঃ তুই আমাকে ইমামসাহেব বললেও আমার আপত্তি নেই। প্রয়োজন হলে আমি ইমামতিও করতে পারি। হা ঃ হা ঃ ইমু, তুই যেন কি বলছিলি। হ্যামবার্গার ফ্রাইডপ্রণ রেডস্ট্রাইপ লংকলার সার্ট। নারুর কথাগুলো আমার হার্টের ভেতর সূক্ষ্ম পিনের মতো চিন চিন করে বাজতে থাকে।





বারো বছর আগে

আবু কায়সার

রোকনপুর গাঁয়ের পুবপ্রান্তে অনেক দিনের পুরনো একটা বটগাছ। ডাইনীবুড়ির জটার মতো তার পাকানো ঝুরি নেমে এসেছে মাটির ওপর। বুড়ো বটের অজস্র ডালপাতার ফাঁকে ফাঁকে হাজারো পাখি দিনভর কিচির মিচির করে। রাত্রে আবার কিন্তু টু-শব্দটিও নেই। যখন বটফল পেকে ওঠে—তখন যেন শুরু হয়ে যায় পাখিদের মহোৎসব। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত সুইট-বলের মতো লাল লাল বটফলে মস্ত গাছের ছড়ানো ছায়াটা রংচঙে হয়ে ওঠে। জায়গাটা খুবই নিরিবিলি। দিন-দুপুরেও এদিকটায় কেউ সহজে পা বাড়ায় না। রোকনপুরের প্রকাণ্ড মাঠ পেরিয়ে, যদি কেউ কখনো এ পথে আসেই, তবে নিবিড় বটের ঠাণ্ডা ছায়ায় বসে একটুখানি জিরিয়ে না নিয়ে সে পারে না।

বারো বছর হ'য়ে গেলো। কিন্তু এই প্রকাণ্ড বটগাছের ঢেউ ওঠা শরীরের ওপর অনেকগুলো কালো কালো ফুটো এখনও মিলিয়ে যায়নি। বারো বছর আগে ওই গাছের ছাল-বাকলের ওপর শুকনো রক্তের দাগ ছিলো বেশ স্পষ্ট। কিন্তু গুঁড়ির ওপরকার ফুটোগুলো অ্যাদ্দিনে মিইয়ে এলেও একেবারে মিলিয়ে যায়নি। ফুটোগুলোর দিকে একবার চোখ পড়লেই বারো বছর আগেকার সেই অঘটনটির কথা মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে, ছোট নামের ছোট্ট একটি ছেলের কথা, যার বুকে পিঠে ওই রকম এক ঝাঁক ফুটো হয়েছিলো। আহা, বছর-বারো বয়সের সেই ছোট আজ বেঁচে থাকলে চব্বিশ বছরের যুবক হতো। বারো বছর কি কম সময়!

মিলিটারীরা ছোটকে হুড-খোলা জীপে তুলে এইখানটায় এনে বলেছিলো, আভি যাও, ভাগো হিঁয়াসে।...ছোট প্রথমটায় কেমন যেন একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলো। চমক ভাঙ্গতেই এক লাফে জীপ থেকে নেমে দৌড় দিয়েছিলো বটগাছটার নিচ দিয়ে। ভেবেছিলো, মাঠ পেরিয়ে নদীর দিকটায় চলে যাবে; কিন্তু জীপ থেকে সে গজ পনেরো যেতেই একটা কর্কশ শব্দে চমকে উঠলো গাছের ঘুমিয়ে পড়া পাখিরা। শব্দ হবার সঙ্গে সঙ্গে ছোট্ট একটা লাফ দিয়েই মুখ

থুবড়ে পড়ে গিয়েছিলো ছেলেটা। দরকার ছিলো না। তবু স্টেনগানের পুরো ম্যাগাজিনটা এক নিমেষে খালি করে ফেলেছিলো আর্মিরা। অস্ফুট শব্দ করে দু'মিনিটে স্থির হয়ে গেলো ছোটর ছোট্ট শরীর। তার পিঠের ওপর অনেকগুলো ফুটো—বুকের দিকে ক্ষতগুলো বড়ো।

পাখিরা স্তব্ধ হয়ে গেছে। রক্তে রাঙা হয়ে উঠেছে বটতলার ঠাণ্ডা মাটি। ফোয়ারার ধারার মতো টুকটুকে লাল শিশুর রক্ত ফিন্‌কি দিয়ে উঠে বোবা বটের বুড়ো চামড়ায় আলপনা আঁকলো। রক্তমাখা বেশ ক'টা বুলেট গাছের গুঁড়িতেই ঢুকে পড়েছে। চরাচর স্তব্ধ। যেন কিছুই ঘটেনি, এরকম সহজভাবে শিস্ দিয়ে বাজখাই গলায় কথা বলতে বলতে দু'টি হুডখোলা জীপ নিয়ে জনাবারো দখলদার সৈন্য শহরের দিকে চলে গেলো। কিছুক্ষণ পর ছোটর রক্তমাখা নিথর শরীরটার দিকে দলে দলে ছুটে আসতে লাগলো অগুন্‌তি লাল পিঁপড়ে। খুনীরা অবশ্য পরক্ষণেই বিপদে পড়েছিলো শহরে যাবার পথের ওপর। তাহলে, গোড়া থেকেই বলতে হয়।

মায়ের নিষেধ ছোট মানেনি। এই তুলকালাম তাণ্ডবের মধ্যে ও রোজকার মতো খেলতে গিয়েছিলো সেই পুবের মাঠে। নদীর ওপারে গোলাগুলির শব্দ হচ্ছে দু'দিন ধরে। পাকিস্তানী সৈন্যরা শহর ছেড়ে ঢুকে পড়েছে এমন পাণ্ডববর্জিত গাঁয়ে গঞ্জেও। ভয়ে দুশ্চিন্তায় সারা রোকনপুর তটস্থ। কখন ওরা এপারে এসেও হানা দেয়, কে বলবে। গ্রাম অবশ্য এর মধ্যেই প্রায় ফাঁকা হয়ে এসেছে। বেশির ভাগ পরিবার তাদের গাঁটরি-বোচ্‌কা গরু-ছাগল নিয়ে পশ্চিমের দিকে সরে যাচ্ছে। কিন্তু প্রাইমারী স্কুলের হেডমাস্টার গোলাম রসুল সাহেব দো-টানায় পড়ে কি করবেন, বুঝে উঠতে পারছেন না। ঢাকার কোনো সঠিক খবর পাওয়া যাচ্ছে না। স্থানীয় নেতারা ক'দিন আগেও হাটখোলায় এসে বক্তৃতা দিলেন। বললেন—কাজ একটাই, রুখে দাঁড়াতে হবে। জানালেন, ঢাকার রাস্তাঘাটে জোর লড়াই চলেছে—পাঞ্জাবীরা পিছু হটতে হটতে ক্যান্টনমেন্টে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে।

এইরকম খবর পেয়ে গাঁয়ের মানুষ, বিশেষ করে কম বয়েসী ছেলেগুলো উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলো। কেউ কেউ দু'একটা পাখি-মারা বন্দুক আর লাঠি-বল্লম যোগাড় করে কাছের জেলা-সদর আক্রমণ করারও পরিকল্পনা নিয়েছিলো। গোলাম রসুল অনেক কষ্টে জঙ্গী-যুবকদের হাত থেকে গাঁয়ের মধু মেম্বারকে রক্ষা করেছেন। পাকিস্তানের দালালী করছে বলে মারমুখো ছাত্ররা মধু মেম্বারকে এই মারে তো সেই মারে। কিন্তু নদীর ওপারে মিলিটারী আসবার সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। গ্রামবাসী এমন ঘাবড়ে গেছে যে তারা ঘরোয়া কথাও ফিস ফিস করে বলে। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে শোনা গেলো, জঙ্গী-ছাত্রদের নিয়ে নেতারা সীমান্তের দিকে রওয়ানা হয়ে গেছেন।

আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে গোলাম রসুলও সিদ্ধান্ত নিলেন গ্রাম থেকে সরে যেতে হবে। সেদিন দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর সামান্য বাঁধাছাঁদা শেষ হলে দেখা গেলো, ছোট নেই। কী ব্যাপার? না, সঙ্গী-সাথী নিয়ে রোজকার মতো সে যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলতে নদীর ধারে গেছে। বিরক্ত হলেন গোলাম রসুল। এটা একটা কথা হলো? এমন দুর্বিপাকের মধ্যেও ছেলেপিলেরা খেলতে যাবে? বাঁধাছাঁদা শেষ। এবার ঘরের দরজায় তালা দিয়ে বেরিয়ে পড়াই কেবল বাকি। ছোটর মা রাগে বিড়বিড় করছেন। বকাঝকা করছেন দুই মেয়ে রুমকি-ঝুমকিকে। ওদের অপরাধ, ওরা ছোটকে আট্‌কে রাখেনি, আগলে রাখেনি।

এতো দুঃখের মধ্যেও বেদনার হাসি ফুটে উঠলো গোলাম রসুলের মুখে। ছেলেটা শার্প। খুবই মেধাবী। লেখায় পড়ায় খেলার মাঠে ওর জুড়ি সারাটা ইস্কুলে নেই। কিন্তু ওই এক দোষ—বড়ো দুরন্ত, বড়ো ছট্‌ফটে। দেশ জুড়ে ধুন্ধুমার সুরু হবার পর থেকেই যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলার

হিড়িক লেগেছে ওদের ভেতর। একদল হয় মুক্তি বাহিনী—অন্য দল সাজে পাকিস্তানী সৈন্য! নদীর পারে ঝাউবনের মধ্যে দূর্গ বানিয়ে গাছের ডালের বন্দুক-কামান নিয়ে সেকি যুদ্ধ! বেলা আর একটু পড়লে নদীর ওপারে সারাটা গ্রাম জুড়ে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী জেগে উঠলো। গোলাগুলির শব্দ ক্রমেই বাড়ছে। বাড়ির সামনে, কাঁচা রাস্তায় তিনটে মালপত্র-বোঝাই গরুর গাড়িতে সপরিবারে যেতে যেতে আলতাফ পেশকার অবাক হয়ে তাকালেন গোলাম রসুলের মুখের দিকে! লোকটা পাগল নাকি? লটবহর নিয়ে দাওয়ার ওপর বসে ভাবছেটা কি? চেঁচিয়েই উঠলেন পেশকার সাহেব—কী ব্যাপার হেডমাস্টার। মনস্থির করতে পারছো না বুঝি? আরে,



যদি বাঁচতে চাও তো চলে এসো। ভাইরে, জানে বাঁচলে বাড়ি ঘর দোর আবার হবে।

ম্লান হেসে গোলাম রসুল বললেন—হ্যাঁ আলতাফ ভাই, এখুনি সব বেরিয়ে পড়বো। এতোক্ষণ রওয়ানা হয়ে যেতাম। গোল বাঁধালো পাজি ছেলেটা। ও ফিরে এলেই—তাঁর মুখের কথা শেষ হতে না-হতেই ব্যস্তভাবে পেশকার বলে উঠলেন—হ্যাঁ হ্যাঁ আর দেরী করা ঠিক হবে না। অবস্থা খুব খারাপ। শীগ্‌গির চলে এসো তোমরা। আমরা তাহলে এগোই।—বাঁশঝাড় পেরিয়ে আঁধার আঁধার তেঁতুল তলা দিয়ে গরুর গাড়িগুলো এগিয়ে গেলো জেলা বোর্ডের রাস্তার দিকে।

ধৈর্যচ্যুতি ঘটলে বেরিয়েই পড়লেন গোলাম রসুল। রাগত গলায় বললেন—তোমরা বসো। আমি পাজিটার ঘাড় ধরে নিয়ে আসি গিয়ে। তিনি পথে নামলেন। বেলা এখন আরো হেলে পড়েছে। নিকারি পাড়ায় পালিয়ে যাবার তাড়া নেই। মধু মেম্বারের বাড়ির কামলারা বেগুন ক্ষেতে কঞ্চির বেড়া দিচ্ছে। ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগলো গোলাম রসুলের কাছে। এদের কি কোনো চিন্তাভাবনা নেই? এমন দুর্বিপাকে এরকম ঠাণ্ডা মাথায় কাজকাম করছে কিভাবে? একি সাহস, না কি নির্লিপ্ততা? তিনি জোর পায়ে হাঁটা দিলেন মাঠের ওপর দিয়ে। মাথাটা যেন দপ্ দপ্ করছে। গলা শুকিয়ে খা খা। এরকম অবস্থার কথা সত্যি কেউ কল্পনাও করেনি। আলোচনা ভেঙ্গে গেলেই স্বাধীনতা-যুদ্ধ সুরু হয়েছে। আন্দোলন চলছে তো কতোকাল ধরেই। কিন্তু এবার এমন কি হলো যে আন্দোলন ঢাকা ছাড়িয়ে সারাটা দেশে ছড়িয়ে পড়লো এতো তাড়াতাড়ি! বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজন প্রায় সবাই সরে পড়েছে রোকনপুর থেকে। প্রবীণ শিক্ষক বীরেন পাঠক গতকাল গ্রাম ছাড়লেন। সদর দরজায় তালা দেবার সময় ভদ্রলোকের সে কি কান্না। ধরা গলায় উচ্চারণ করলেন—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী! মেয়েরা তুলসীতলায় মাথা খুঁড়তে লাগলো। বীরেন বাবু বাড়ির আঙ্গিনার একমুঠো মাটি দামী স্বর্ণরেণুর মতো পাঞ্জাবীর পকেটে ভবতে ভরতে বললেন—মা, আবার কি তোমার কোলে ফিরে আসতে পারবো?

গোলাম রসুল নিজে গিয়ে বীরেন বাবুকে হিজলী পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এসেছেন। অনেকেই গেছে। কিন্তু কয়েকটি দুর্দান্ত ছেলে এখনো গ্রাম ছাড়েনি। শহর থেকে পালিয়ে আসা পুলিশ-কনস্টেবলদের দু'টি থ্রী-নট-থ্রী রাইফেল যোগাড় করেছে ওরা! জেলা শহর অবশ্য ফল্ করেছে। নেতা ও কর্মীরা নেই। ডিস্ট্রিক্ট হাই-কমাণ্ডের বাড়িটা হানাদাররা বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে। শহরে মারা গেছে অনেক মানুষ। সারাটা শহর এখন মিলিটারীদের কব্জায়। ওদিকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে সক্ষম বাঙালীদের মুক্তিযুদ্ধে সামিল হবার আহ্বান শোনা যাচ্ছে ঘন ঘন। কিন্তু কোথায় গিয়ে, কার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে, তা স্পষ্ট বোঝার উপায় নেই।

মধু মেম্বার বাল্যবন্ধু হলেও বর্তমান অবস্থায় তাকে খুব একটা বিশ্বাস করেন না গোলাম রসুল! তাল তলার মজে-আসা দীঘি আর তারই লাগোয়া অনাবাদী জমিটুকুর ওপর লোভ আছে মধুর। অনেক দিনের লোভ। অবশ্য ন্যায্য দাম দিয়েই জমি আর দীঘিটা সে কিনে নিতে চায়। গোলাম রসুল একদিন কথায় কথায় বলেছিলেনঃ জমিটা অবশ্য পড়েই থাকে। তুমি লাঙ্গল দেওয়াতে চাও—দাওগে। কিন্তু দীঘিটা আমি পরিষ্কার করাবো। জমিটাও সাফকবালা করে দিতে চাইনা মধু—চষতে চাও চষো—আমাকে কিছু ধান দিও, তাহলেই হবে। হুঁকো টানতে টানতে মধু মেম্বার তখন বললোঃ শুনলাম, বেচে দিচ্ছো। দক্ষিণ পাড়ার আইনুদ্দিন মণ্ডল বলছিলো সেদিন। তা বেচবেই যখন ··· আমি কি দোষ করলাম হেডমাস্টর!

গোলাম রসুল একটু সতর্ক হলেন। গলা ঝেড়ে বললেনঃ আইনুদ্দিন একেবারে বানিয়ে বলেনি হে মধু। তবে কিনা—একটু ফাঁড়া ছিলো—কেটেও গেলো হঠাৎ। তাই বিক্রিবাটার কোনো কথাই ওঠেনা। তবে হ্যাঁ—কখনো যদি বিক্রি করতেই হয়—তোমাকে না জানিয়ে কিছু করবো না।

কিন্তু এখন? হেলে পড়া সূর্যের ম্লান আলো নিজের বিষণ্ণ মুখটায় মেখে নদীর ওপারে পাক খেয়ে ওঠা ধোঁয়া দেখতে দেখতে মনে মনে হাসলেন গোলাম রসুল। ভালোই হয়েছে। এবার আর টাকা দিয়ে জমি কেনার ঝামেলা থাকবে না মধুর। যে অবস্থা দেখা যাচ্ছে, তাতে হেডমাস্টারের নিজের আর ক'বিঘে,—পাঠক বাড়ির দোতলা দালান সুদ্ধু গাঁয়ের বেশির ভাগ

ঘরবাড়ি আর জমিজমা এবার মধুর হবে। ভাবতে ভাবতে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নদীর ধারে ঝাউগাছগুলোর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন গোলাম রসুল। এখানে, নদীর এই খাঁড়িতেই পাড়ার ছেলেরা যুদ্ধ যুদ্ধ খেলে। নিকারীদের ছেলেরা খুঁজতে আসে মাছরাঙার ডিম। কিন্তু কোথায় কি! নির্জন নদীতটে কাক পক্ষিটি নেই। এক অজানা আশঙ্কায় বুকের ভেতরটা দুলে উঠলো গোলাম রসুলের। কোথায় গেলো পাড়ার ছেলেরা? কোথায় গেলো ছোট? কী করবেন তিনি এখন! গলা ছেড়ে কয়েকবার ডাকলেন—ছোট, ছোট,—ছোটন রে—! গেলি কোথায় তোরা? কিন্তু আঁকাবাঁকা নদীর খাঁড়িতে কারো সাড়া শব্দই পাওয়া গেলো না। কেবল প্রতিধ্বনি ফিরে এলো কাঁপতে কাঁপতে—ছোটন—কোথায় গেলি তোরা!

আবির-রাঙা হয়ে উঠেছে পশ্চিমের আকাশ। বেলা যেতে আর কতোক্ষণ! ওরা কি তবে খালের ধার দিয়ে গাঁয়ে ফিরে গেছে! চিন্তিতভাবে ফিরে চললেন গোলাম রসুল। সারা গ্রাম নীরব নিঝুম। কেবল নিকারী পাড়ায় টেমির আলো জ্বলছে। আলো দেখা যায় দূরে—মধু মেম্বারের বাড়িতেও। আর প্রায় সব দিকেই কাঁচা সন্ধ্যার আবছা আঁধার। আশ্চর্য—এমন দিনেও ঝিঁ ঝিঁ ডাকে, জোনাক জ্বলে! গোলাম রসুলের মনটা ছেয়ে যাচ্ছে বিষণ্ণতায়। কতো প্রিয়, কতো পরিচিত এ পথ। আজ যেন অচেনা, অন্য রকম লাগছে সবকিছুই। মনে হয়, এ রাস্তা, এই গাছপালা কিছুই আর তার নয়। গোলাম রসুল নানা কথা চিন্তা করতে করতে কখন নিজের বাড়ির সামনে এসে পড়েছেন, ঠাহর করতে পারেন নি।

হঠাৎ চমকে উঠে থমকে দাঁড়ালেন তিনি। এ কি? ওরা কোথায়? বৈঠকখানার দাওয়ার ওপর তো কেউ নেই। একটা আলো পর্যন্ত জ্বালানো হয়নি। বাঁধাছাঁদা শেষ করে ছোটর মা আর রুমকি-ঝুমকিকে এখানেই তো বসিয়ে রেখে গেছেন! কিন্তু গেলো কোথায় সব! নাঃ। সারা বাড়ির আনাচে-কানাচে খুঁজে কোথাও কাউকে দেখতে পেলেন না গোলাম রসুল। ঝিঁঝি ডাকা আঙ্গিনার ওপর দাঁড়িয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় তিনি ডাক দিলেন—রুমকি! ...ঝুমকি! ডাকলেন—ছোট, ছোটন, ফিরে এসেছিস, বাবা? যেন মাটি ফুঁড়েই দু'টি ছায়ামূর্তি তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালো। চমকে উঠে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই দুলালের চাপা গলা শোনা গেলোঃ আস্তে কথা বলুন চাচা, আস্তে কথা বলুন। চাচীরা নিরাপদেই আছেন। একটু আগেই গাঁয়ে চুপে চুপে ঢুকেছে দু'টো আর্মি-জিপ। শহরের দিক থেকে দক্ষিণ-পাড়ার জঙ্গলে রাস্তা দিয়ে এসেছে ওরা! আমরা মোকাবেলা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ওরা দলে ভারী। বেশ কখানা অটোম্যাটিক রাইফেল আর স্টেনগান আছে ওদের সঙ্গে। আমাদের সম্বল দু'টো থ্রী নট থ্রী। তা-ও আবার অ্যামুনিশান নেই।

একদমে এতোগুলো কথা বলে হাঁফাতে লাগলো দুলাল। ঠাহর করে গোলাম রসুল বুঝলেন, দুলালের পেছনে আরো একটি রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে আলতাফ পেশকারের মেজো ছেলে আসলাম। চাপা ক্রোধে, যেন ছায়াছন্ন পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে সে।

ওরা কোথায়? জিজ্ঞেস করলেন গোলাম রসুল।

দুলাল বললোঃ আলতাফ চাচাদের সঙ্গে ওদের সবাইকে চর-হিজলীর মাঝি-পাড়ার দিকে পাঠিয়ে দিয়েছি। অবশ্য চাচী বারবার ছোট আর আপনার কথা ভেবে আপত্তি করছিলেন যেতে। জায়গাটা সেফ । খুবই দুর্গম। খালবিল ভেঙ্গে জীপটিপ যেতে পারবে না ওদিকে। আপনি কোনো চিন্তা করবেন না।

হঠাৎ প্রায় চেঁচিয়েই উঠলেন গোলাম রসুলঃ 'কিন্তু আমাদের ছোট কোথায়। ওকে তো কোথাও খুঁজে পেলাম না!'

নিজের ঠোঁটের ওপর তর্জনি চেপে দুলাল শব্দ করলোঃ শ্-শ্-শ! চাপা গলায় আসলাম বললোঃ ছোট আছে মধু মেম্বারের বাড়িতে। ওই বাড়ির ছেলেদের সঙ্গে খেলা শেষে ফিরে এসে ও দেখে, ঘরদোর তালাবন্ধ। কেউ কোথাও নেই। দাওয়ার ওপর বসে ফুঁপিয়ে তাই কাঁদছিলো। আপনার খোঁজে এদিকে এসে আমরা কেবল ছোটকে পেলাম। আমাদের দেখে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে সুরু করেছিলো। আমরা ওকে সব কথা খুলে বলবার আগেই কানে এলো জীপের আওয়াজ। তখন বাড়ির পেছনের জঙ্গুলে-পথে ওকে মধু মেম্বারের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েই আমরা সরে পড়েছিলাম। ছোট আমাদের সঙ্গে ছুটে পারবে না। আর আমাদেরই বা কখন কি ঘটে। এইসব ভেবে আপাতত ওকে মধু মেম্বারের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে আমরা এখানে ঘাপ্‌টি মেরে বসে আছি। অপেক্ষা করছি আপনার জন্যে। কিন্তু ওদিকে—আসলাম কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেলো।

হারানো কথার খেই ধরলেন গোলাম রসুলঃ ওদিকে কি! ওদিককার কথা কী বলছো?

দুলাল বললোঃ আর্মিরা মেম্বারের বাড়িতে চা খাচ্ছে। মহা হৈ হল্লা সারা বাড়ি জুড়ে। যেন খুশির তুফান ছুটছে। ব্যাটা দালাল। আর ওই কামলাগুলোও মহা উজবুক। হুঁকো টানতে টানতে বলাবলি করছেঃ গাঁ-টা পুড়ে ছাই হয়ে যেতো। মেম্বর সাব ছিলেন বলে রক্ষা। মেম্বর সাবই বাঁচালেন। সে যাই হোক, এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা মোটেই নিরাপদ নয়। আপদগুলো বিদায় হলেই ছোটকে ডেকে নিয়ে আমরা চর হিজলীর দিকে রওয়ানা হয়ে যেতে পারি। গঞ্জের মোড়ে রিকশাটিক্‌সা এখন বোধহয় আর নেই! হেঁটেই যেতে হবে আমাদের।

আসলাম ভরসা দিলোঃ সঙ্গে টর্চ আছে। কাদাপানি ভেঙ্গে ঝোপঝাড় ডিঙ্গিয়ে চলে যেতে কোনো অসুবিধা হবে না। একটু থেমে সে আবার বললোঃ আপনারা দু'জন দাঁড়ান একটু। আমি ছোটকে নিয়েই আসি গিয়ে। আসলাম ওর হ্যাণ্ডব্যাগ আর রাইফেলটা উঠোনের শিউলি গাছের সঙ্গে ঠেস দিয়ে রেখে অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো।

আসলাম ততোক্ষণে বোধহয় অর্ধেক পথও যায়নি—দূরে জীপের ইঞ্জিন গর্জে উঠলো। চমকে উঠলেন গোলাম রসুল। আঁধারে নড়ে উঠলো দুলালের ছায়া-শরীর। সে আশ্বস্তের মতো বললোঃ যাক। ব্যাটারা ফিরে যাচ্ছে এবার। গাঁ-টা আগুনের হাত থেকে বেঁচেও যেতে পারে হয়তো!'—গোলাম রসুল দেখলেন—সত্যি, হেডলাইটের উজ্জ্বল আলোয় মেম্বারবাড়ির গাছ-গাছালি আর ঝোপঝাড়গুলোকে যেন ঝল্‌সে দিয়ে আঁকাবাঁকা মেঠো-রাস্তায় নেমে গেলো জীপ দু'টি। তারপর গোঁ গোঁ শব্দ করতে করতে উঁচু নিচু রাস্তায় এগিয়ে শহরের দিকে না গিয়ে উল্টো দিককার মাঠ-বরাবর ছুটলো। আশ্চর্য! গোলাম রসুল বুঝতে পারলেন না, ওদিকে ওরা যাচ্ছে কোথায়! ওদিকে তো বিরাণ প্রান্তর—তেপান্তরের মাঠ। মাঠের পরে নদী। তাইতো, ওরা ওদিকে যাচ্ছে কেন? নিচু স্বরে দুলাল বললোঃ কী ব্যাপার। ব্যাটাদের মতলব কি? জবাবে গোলাম রসুল কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ মুখের ওপর তীব্র আলোর ঝলকানিতে চমকে উঠে থেমে গেলেন। দুলাল বললোঃ চাচা সর্বনাশ। আর্মিরা এই দিকেই এগিয়ে আসছে! হ্যাঁ হ্যাঁ এই বাড়ির দিকেই। ওই তো গাড়ির মুখ ঘুরেছে। শিউলী গাছের সঙ্গে ঠেস দিয়ে রাখা আসলামের রাইফেল আর ব্যাগটা এক ঝট্‌কায় তুলে গোলাম রসুলের হাতে দিয়ে দুলাল এক দৌড়ে বাড়ির পেছনকার জংলা জায়গাটায় চলে এলো। গোলাম রসুলও বিব্রত অবস্থায় অনুসরণ করলেন দুলালকে। যা ভেবেছেন, তাই। ঝুপ্‌সি আমগাছের নিবিড় জঙ্গলে, কচু ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখা গেলো, জীপ দুটো তাঁরই বাড়ির সামনে এসে থেমেছে। হেডলাইট নিভে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দপ্‌ দপ্‌ করে জ্বলে উঠলো কয়েকটা টর্চ! শক্তিশালী

বিজলী-মশালের চড়া আলোয় ফালা ফালা হচ্ছে ঘনায়মান অন্ধকার। এতো দূর থেকে এদের কথাবার্তা কিছুই শোনা যায় না। টর্চের চঞ্চল আলোয় দশ বারোজন খাকি ইউনিফর্ম পরা সৈন্যকে দেখা গেলো দ্রুতপায়ে ছোটাছুটি করতে। সবার হাতেই রাইফেল আর স্টেনগান।

হঠাৎ দখিনা-হাওয়ায় ভেসে এলো কাঁচা পেট্রোলের তীব্র ঘ্রাণ! শির শির করে উঠলো গোলাম রসুলের সারাটা শরীর। তাঁর আর বুঝতে বাকি রইলো না যে মিলিটারীরা তাদের বড়ো দুশ্‌মনের আস্তানাটির খোঁজ পেয়েছে। বিপদজনক রাজনৈতিক দলের স্থানীয় সদস্যের বাড়ি হাজার মাইল দূর থেকে আসা সৈন্যদের চেনার কথা নয়। কীভাবে এটা সম্ভব হয়েছে—তা বুঝতে কি আর দেরী হয়? মধু মেম্বারের লোভাতুর মুখ আর হিংসাকুটিল চোখ দু'টি মনে পড়ে গেলো গোলাম রসুলের। মনে পড়লো, মাত্র ক'দিন আগে জঙ্গী-ছাত্রদের রোষ থেকে তিনিই রক্ষা করেছেন মধু মেম্বারকে। তার প্রতিদান এই? সারা বাড়িটায় প্রায় একসঙ্গে আগুন জ্বলে উঠলে দু'চোখে ঝরঝর করে পানি এসে গেলো গোলাম রসুলের। তিন পুরুষের ভিটেবাড়ি। বাপদাদার কতো শ্রম আর যত্ন দিয়ে গড়া। দাউ দাউ করে জ্বলছে। পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে মজবুত টিনের ঘরগুলো। কেমন যেন মোহাচ্ছন্নের মতো, ভূতগ্রস্তের মতো পিছিয়ে এলেন গোলাম রসুল, দুলালের হাত ধরে, প্রায় টলতে টলতে। আসলামের রেখে-যাওয়া রাইফেল আর ব্যাগটা তার কাছে এতো ভারি মনে হচ্ছে, যেন হাত দু'টো ছিঁড়ে পড়বে!

অন্ধকার খালপাড়ে আসতে না-আসতেই আসলামের দেখা পেয়ে গেলেন ওঁরা। আসলাম খুব দ্রুত, অথচ নিঃশব্দে ছুটে এসেছে। খুব হাঁফাচ্ছে এখন সে। বললোঃ মধু মেম্বার বেঈমানী করেছে। কেবল আপনার বাড়িটাই দেখিয়ে দেয়নি আরো এক সর্বনাশ করেছে সে।

ঃ আসলাম—। —প্রায় অভিভূতের মতো বলে উঠলেন গোলাম রসুল—বাড়ি গেছে যাক; কিন্তু ছোট? ছোটকে যে নিয়ে এলে না—?

আসলাম গোলাম রসুলের কাঁপা কাঁপা হাত দু'টি সজোরে চেপে ধরে বললোঃ চাচা, আপনি ঘাবড়াবেন না। আপনি কিন্তু একটুও ঘাবড়াবেন না। ছোটকে চিনিয়ে দিয়েছে মধু মেম্বার। ওরা ছোটকে নিয়ে এসেছে কেবল বাড়িটা দেখিয়ে দিতে। মেম্বারের এক বুড়ো কামলার কাছে চুপে চুপে গিয়ে তো তাই-ই শুনে এল্‌ম। এই দুধের বাচ্চাকে আর কি করবে ওরা? দোহাই চাচা আপনি চিন্তা করবেন না।

কিন্তু কোনো কথা না-বলে, একটুও শব্দ না করে গোলাম রসুল দু'হাতে মাথা চেপে মাটিতে বসে পড়লেন। দূরে বাড়িটা পুড়ছে। ঠাস ঠাস শব্দে ফাটছে জ্বলন্ত কাঠকুটো—ছিপি আঁটা শিশি বোতল। আগুনের লকলকে জিহ্বা সম্পূর্ণ বাড়িটা খেয়ে ফেলে এখন যেন একটু স্তিমিত, নিস্তেজ। আরো দূরে নদীর ওপারেও কোনো অগ্নিশিখা আর চোখে পড়ে না! হয়তো ধোঁয়া সেখানে এখনও উঠছে। কিন্তু রাতের অন্ধকারে তো ধোঁয়া দেখা যায় না। বাড়িটা প্রায় ভস্মস্তূপে পরিণত হবার পর আর্মিরা আবার জীপে উঠে পড়লো টপাটপ। এতোটা তফাৎ থেকে ওদের ভালোভাবে দেখাও যায় না। সঙ্গে ছোট আছে কিনা—তা-ও বোঝবার উপায় নেই। বোধহয় গাড়ির ওপর বসে রয়েছে। কাঁদছে অথবা ছটফট করছে।

এদের তিন জনকে আরো বিমূঢ় করে দিয়ে জীপ দুটো শহর-মুখো না-হয়ে মধু মেম্বারের বাড়ির দিকেও না-গিয়ে মাঠের মাঝখানে, যেন লাফ দিয়ে নামলো।

তারপর কি হলো? না, পরের ঘটনা খুব বিস্তারিতভাবে বলার দরকার নেই। রোকনপুর গাঁয়ের পূব-প্রান্তের পুরনো বটগাছের নিচে এসে মিলিটারীরা ছোটকে জীপ থেকে নামিয়ে

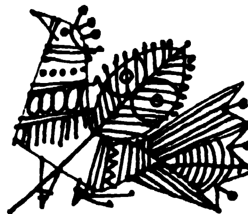
দিয়েছিলো। বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে উঠেছিলো একজন—দুশমান কা আওলাদ। আভি যাও। ভাগো হিঁয়াসে। ঘর খতম্ হো চুকা। আভি বাংলাদেশ মে চলা যা—ভাগ্!—

ছোট কিন্তু এসব কথা বুঝতে পারলো না। কেবল বাংলাদেশ শব্দটাই বুঝলো। আরো অনুমান করলো, এরা তাকে এক্ষুণি এখান থেকে চলে যেতে বলছে। সে ভয়ে ভয়ে চারদিকের নিশ্ছিদ্র অন্ধকার দেখলো। তারপর জীপের ওপর থেকে লাফ দিয়ে নেমে অনেক দিনের চেনা বটগাছের নিচ দিয়ে ছোট ছোট পায়ে দৌড় দিলো। কিন্তু পনেরো ষোলো গজ ছুটে যেতেই বিদ্‌ঘুটে—ডারা—রা-রা শব্দে চমকে উঠলো দশদিক। সঙ্গে সঙ্গে ভিজে স্যাঁতসেঁতে মাটির ওপর নেতিয়ে পড়লো হাফপ্যান্ট পরা, গেঞ্জি গায়ে ছোট্ট ছেলেটির দেহ। তার ছোট্ট পকেট থেকে ছিট্‌কে পড়লো একটা গুলতি আর তিনটে ম্লান মার্বেল।

বটগাছের অজস্র পাতার ভীড়ে পাখিরা তখন নিশ্চুপ। ঝিঁঝিরা নীরব। জোনাকিরাও ফেরার। তীক্ষ্ণ একটা শিসের শব্দ বেজে উঠলো হঠাৎ। হাসির হর্‌রা উঠলো দু'তিনবার! তারপর মৃদু যান্ত্রিক গুঞ্জন তুলে দু'টি আততায়ী জীপ কাঁচা রাস্তায় গিয়ে উঠলো।

বলা দরকার, জীপ দু'টো জেলা বোর্ডের রাস্তার ওপর আচমকাই আক্রান্ত হয়েছিলো। রাইফেলের চোরাগোপ্তা গুলিতে টায়ার ফেটে উল্টেও গিয়েছিলো একটা জীপ। হতভম্ব এবং ভীত সন্ত্রস্ত সৈন্যরা হতাহত সঙ্গীদেরকে টেনে হিঁচ্‌ড়ে অন্য জীপটায় তুলে বৃষ্টিধারার মতো ব্রাশ-ফায়ার করতে করতে পিছু হটে গিয়েছিলো। গুলি ফুরিয়ে যাওয়ায় আর কিছু করার ছিলোনা দুলাল এবং আসলামের। অর্ধমূর্ছিত গোলাম রসুলকে ধরাধরি করে দ্রুত পায়ে নদীর দিকটাতে পিছিয়ে যেতে হয়েছিলো ওদের।

তোমরা যদি কখনো রোকনপুর যাও—সেই গুলিবিদ্ধ বটগাছটা এখনো দেখতে পাবে। কিন্তু ছোট্ট ছেলে ছোটর ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া শরীর থেকে ছিট্‌কে পড়া রক্ত আজ আর দেখতে পাবে না। আঁতিপাঁতি করেও খুঁজে পাবে না একটি বিষণ্ণ গুলতি কিংবা তিনটে রাঙা মার্বেল। বারোটা বছর তো কম সময় নয়—! রক্তের দাগ কি এতোদিন থাকে?





রানুর দুঃখ, ভালোবাসা

মাহমুদ আল জামান

ঝিরঝির বাতাস বইছে।

ফর্সা হয়েছে অনেকক্ষণ।

কদিন থেকে সাতরাজ্যির ঘুম রানুর চোখে। টেনেও সে চোখ খুলতে পারে না। বিছানায় শুয়ে রানু টের পেয়েছিল বাড়িটা ধীরে ধীরে জেগে উঠছে। সে কিছুতেই চোখ খুলতে পারেনি। ঘুম এসে জাপটে ধরে রাখে ওর চোখ দুটো।

কিছুক্ষণ আগেও বানু টের পে হ মা এসেছে এ ঘরে। জানালাটা খুলতে খুলতে আস্তে আস্তে ডাকছে। রানু ওঠো, সকাল হয়েছে।

দু একবার ডেকে গায়ে হাত দিয়ে দেখেছে, নুর শরীরে আবাব জ্বর উঠেছে কি না? চোখ খুলেছিল রানু। এপাশ ওপাশ করে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে নিজেও টের পায়নি।

ঘুম ভেঙেছে তার বেশ কিছুক্ষণ পরে। তখন আটটা দশ মিনিটের ডাউন ট্রেনটা কুক কুক ঝিক ঝিক করতে করতে বেরিয়ে গেছে। চোখ খুলে দেখেছে বারান্দায় লম্বালম্বিভাবে রোদ এসে পড়েছে। উঠোন জুড়ে হই হই করে খেলছে বেনু আর কামাল। রেডিওতে খবর পড়ছে। বাবা অফিসে যাবার আগে তৈরি হবেন এখন ধীরে সুস্থে। বাবা খবর শুনছেন আর বলাবলি করছেন, শেষ রক্ষা হল না। দেখ, ছেলেরা যেভাবে ক্ষেপেছে কিছু না একটা হয়েই যায়!

মা বললেন, ছেলেদের দোষ কি? দাবি মেনে নিলেই হয়।

তুমি কি যে বল! দাবি কি সহজে কেউ মানে। দেখ না রেডিওতে কি বলছে।

রেডিওতে তখনও খবর শেষ হয়নি। রেডিও বলছে—ঢাকা সে যো জং চাল রাহা উসসে পাকিস্তান কা দুসমান লোক বহুতই তাগাদা দি যা রাহি। হুকুমতে পাকিস্তান কা উজিরে আলা নে বোলা এ জং মে কোই মদদ না দে।

রানু শুয়ে ছিল। দেখল বাবা রেডিওর নবটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কি যেন ধরতে চাইছেন। বাবার মারফি রেডিওটা পুরানো। শত চেষ্টা করার পর কখনো কখনো অন্য স্টেশন ধরা যায়। বেশিক্ষণ ধরে নব ঘোরালে বিকট একটা শব্দ হয়। বাবা ছাড়া অন্য কেউ এ রেডিও চালাতে পারে না। বাবা এদিক ওদিক করে গান শোনেন। খবর শোনেন। অফিসে যাবার আগে খবর শোনা বাবার অনেকদিনের পুরানো অভ্যেস।

বাবা যখন গোছল করতে যাবেন তখন কুয়োতলা থেকে একটু পরেই বাবার গুণ গুণ গান শোনা যাবে। মার সঙ্গে এটা-সেটা কথা বলবেন। তারপর গা মুছে টানা ছোট্ট বারান্দায় বাবা গরম ভাত খেতে বসবেন।

এখনো ওর চোখ জুড়ে রাজ্যের ঘুম। আড়মোড়া ভেঙে বিছানায় উঠে বসল সে। ক্র্যাচটা খাটের সঙ্গে আড়াআড়িভাবে পড়ে আছে। ক্র্যাচটা দেখলেই রানুর দুঃখ-কষ্ট অনেক বেড়ে যায়। উথলে ওঠে। পা দুটো ব্যথায় শিরশির করতে থাকে। কাল বিকেলে ওর ব্যথাটা বেড়ে গিয়েছিল। সন্ধ্যার দিকে মা ওকে ওষুধ খাইয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদেছিল। সে জানে, মা এখন প্রায়ই কাঁদে। সময় নেই, অসময় নেই ওর দিকে হা করে তাকিয়ে থাকে। সন্ধ্যায় ডাক্তার কাকা এসেছিলেন। কালো ব্যাগ থেকে থার্মোমিটার বের করে বলেছিলেন, জিব দেখি রানু! হাতের কব্জি ধরে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, না জ্বর নেই। তুমি তো ভালই আছ। কোন ভয় নেই। খেলবে আর দৌড়ুবে।

ডাক্তার কাকার কথায় বুক ফেটে যাচ্ছিল রানুর। সে দৌড়ুবে। পায়ের পাতা শুকিয়ে যাচ্ছে। পায়ে বল নেই। আগের মতো দৌড়ু-ঝাঁপ দিতে পারে না সে। বুকটা ওর এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে যায় থেকে থেকে। কাকে বলবে সে ওর দুঃখের কথা, কে শুনবে ? সবাই কেমন করে যেন ওর পায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে।

ডাক্তার কাকা অনর্গল কথা বলছিলেন। কোন কথাই রানুর কানে যাচ্ছে না। পাচিল ঘেঁষে ছোট্ট একটা বাগান করেছে বাবা। দূরের সব রাস্তা আলোতে দেখা যায়। আমগাছের ডালে বসেছে দুটি শালিক পাখি। আর চাপা কেমন নিবিড় গন্ধ বেরুচ্ছে। সে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে সেই ছোট্ট শালিক পাখি দুটির দিকে।

দুই

দু মাস থেকে রানু ক্র্যাচে ভর দিয়ে হাঁটে। এ-ঘর ও-ঘরে যায়। মাঝে মধ্যে মনটা বিষিয়ে থাকে।

ওর ঘরের খোলা দরজা দিয়ে উঠোন দেখা যায়। সে দেখল পুব দিকের খোলা জানালা দিয়ে এক চিলতে সকাল বেলার নরম সুন্দর রোদ এসে পড়ছে। কুয়োতলায় বাবা গোছল করছেন আর তাঁর সেই গানটা গুন গুন করে গাইছেন। উঠোনে রোঁয়া ওঠা কুকুরটা কুণ্ডুলি পাকিয়ে শুয়ে আছে। থলে হাতে বাজার থেকে ফিরছে আজিজ।

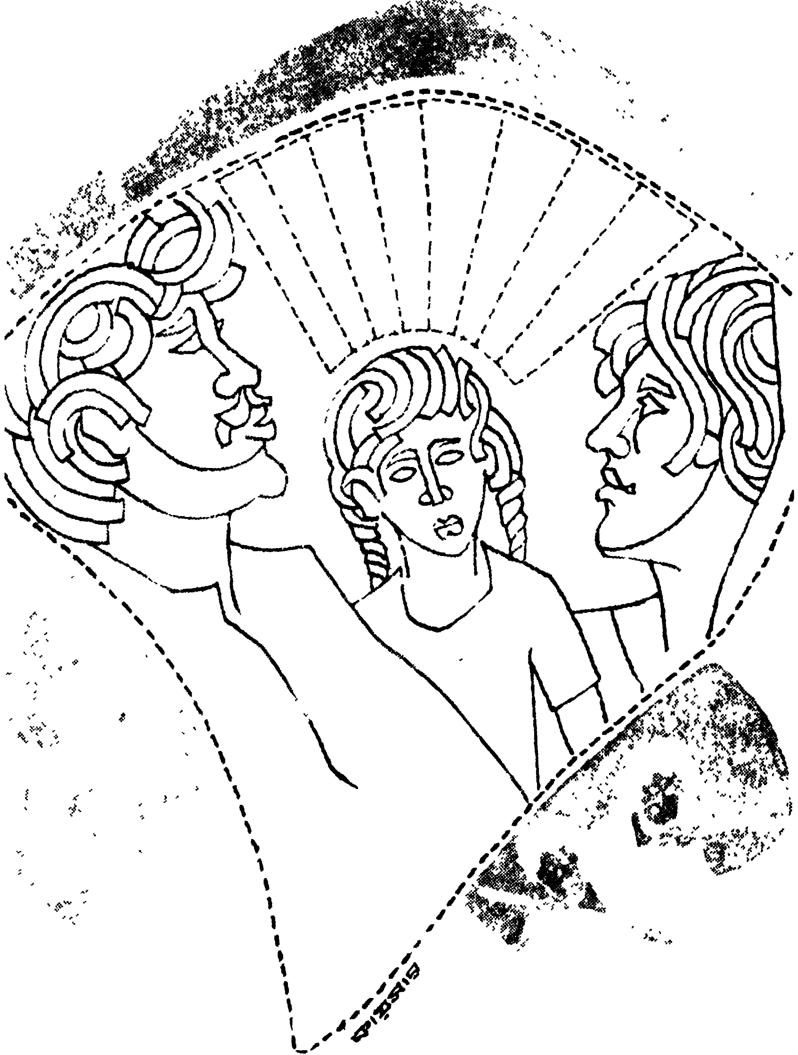
কুয়োতলার একটু দূরের শ্যাওলা ধরা পাচিলের গা ঘেঁষে সেই বাগান। কতগুলো গাছ অযত্নেও বড় হয়ে উঠছে। অনাদরেও বেড়ে উঠছে। দেয়ালের গা ঘেষে দাঁড়িয়ে আছে অশোক গাছ। দুটো দেবদারু, গোলাপ আর হাস্নু হেনা।

বাতাসের সঙ্গে অশোকের পাতাগুলো কাঁপছে। ছোট্ট বাগানে ফুল ছিল না, কদিন থেকে অশোক গাছে ফুল ফুটছে। ঝিরঝির শিরশির কোমল বাতাসের সঙ্গে এ ফুল দ্বিগুণ আবেগে ফুটছে। ছোট এ ফুলের চাপা সুবাস রানুর খুব প্রিয়। এ ফুল যখন ফোটে তখন ওর রং হয়ে যায়

কমলা। কিন্তু বাসি হলেই ফুলের রং হয়ে যায় লাল।

রানু অশোক গাছটির পাতাগুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখল।

ওর ঘুম ভেঙ্গেছে অনেকক্ষণ। সে এলোমেলো ভাবে এসব দেখছে আর ভাবছে। ও বাড়ির আম গাছে বসে একটা কাক ডেকে চলছে মরিয়া হয়ে।



ওর সাড়া পেয়ে মা এলেন একটু পরে। বললেন, চল রানু, মুখ হাত ধুয়ে কিছু খেয়ে নে। ওষুধও খেতে হবে।

মা রানুকে ধরে ধরে নিয়ে গেলেন কুয়োতলায়।

টানা বারান্দায় মাদুর পেতে রুটি আর দুধ খেল সে বাবার সঙ্গে।

বাবা রানুর কপালে হাত রেখে বললেন, জ্বর তো আর আসেনি। ভয় নেই। ইনজেকশান লাগবে না। কদিনেই ভাল হয়ে উঠবি মা। হাসপাতাল থেকে মালিশ করার জন্য তোকে যে ওষুধ দিয়েছে রোজ মালিশ করলে তুই সেরে উঠবি।

বাবা ভাত মাখেন আর এটা-সেটা বলেন। মুখে ভাত তোলেন না। কেমন যেন লাগে ওর।

মা বললেন, একটু ডাল দি। এ তরকারিটা মুখে তোলনি। নাও একটু।

রানু উঠতে চায়।

বাবার ইউনিভারসিটি যাবার সময় হয়ে আসছে।

বাবা বললেন, বোস রানু, বোস। বাবা ভাত খান আর রানুকে চেয়ে দেখেন।

বারান্দার এককোণে মাদুরে বসে বেনু আর কামাল পড়ছে। মা না পড়ালে কামাল কিছুতেই পড়ায় মন বসায় না। এদিকে সে হা করে চেয়ে আছে। শ্লেটে আঁক কষছে, বেনুকে ভেংচি কাটছে।

রানু মাদুর থেকে উঠে বেনুর কাছে সরে এল। ক্র্যাচটা পাশে রাখতে গিয়ে দেখল কামাল শ্লেটে হিজিবিজি আঁক কষছে।

রানুর খুব ইচ্ছে হল আবার বইপত্তর ঝেড়ে সাফ করে পড়তে বসতে। গোছগাছ করে স্কুলে যেতে। কিন্তু পায়ের পাতার দিকে তাকিয়ে ওর মনটা সত্যিই বিষিয়ে গেল। ওর মনে হল পায়ের গোড়ালি আবার ব্যথায় টনটন করে উঠছে। সে কাছের ব্যাগ থেকে একটা বই টেনে নিল। উল্টে পাল্টে দেখল। বছর খানেক আগেও সে স্কুলে গিয়েছিল। কি সুন্দর ছিল ওর স্কুল বাড়িটা! ক্লাশ টিচার মরিয়ম আপা ওকে খুব আদর কবতেন। সুন্দর করে পড়া জিজ্ঞেস করতেন। সুন্দর আর মিষ্টি করে কথা বলতেন। মরিয়ম আপা ছিলেন স্কুলের মধ্যে সবচেয়ে আলাদা। কবিতা পড়া আর বোঝাবার ভঙ্গিটি রানুর মনের মধ্যে লেগে আছে। এখনও চোখ বন্ধ করলে খুব সহজে সে মরিয়ম আপাকে দেখতে পায়।

পড়াবার ফাঁকে ফাঁকে মরিয়ম আপা কত রাজ্যের যে গল্প বলতেন তার শেষ নেই। কত রূপকথা, মিষ্টি ছড়া আর কেমন করে দেশের আর বিদেশের মহৎ মানুষেরা বড় হয়ে উঠেছে—সেসব খুব সহজ করে সুন্দর করে বলতেন।

ওর স্কুলের জন্য খুব দুঃখ হয়। স্কুলের সেই পুরানো বাড়িটা ঘুরে ঘুরে দেখতে ইচ্ছে করে। কতদিন সে আর রাহেলা স্কুলের মাঠে ছোটাছুটি করেছে। খেলার মাঠের কাছেই ছিল ঘন জঙ্গল। একটা বড় কচুর ক্ষেত, দুটো কৃষ্ণচূড়ার গাছ। বুনো গন্ধে মনটা ওর সত্যি ভরে যেত।

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে যখন গাছের সারিতে ফুল ধরেছে তখন কতদিন সে ক্লাশে বসে এই গন্ধ নিবিড় গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে আনমনা হয়েছে। শুধু শুধু তাকিয়ে থেকেছে। কী রং যে ফুলের! সেই কৃষ্ণচূড়া গাছের লাল ফুলের দিকে তাকিয়ে কী যে হত সে এখন বলতে পারবে না। কখনও সে দেখত ঘন জঙ্গলের মধ্যে থোকা থোকা কৃষ্ণচূড়া পড়ে আছে।

বর্ষাকালে অবিরাম ঝর ঝর বৃষ্টির মধ্যেও কাকেরা সারি বেঁধে বসে থাকত এই গাছগুলোতে। দুপুর বেলা টিফিনের পরে সারা স্কুল বাড়িটা যখন ঝিমিয়ে যেত ওর মনে হত আর কখনও চেয়ে চেয়ে দেখত দুটো কাক মাঝে মাঝে কথা বলছে। গত বসন্তকালেও সে কোকিলের মিষ্টি ডাক শুনেছিল। জানালার বাইরে চোখ রেখে নিঃশব্দ, নিঝুম দুপুর বেলা সে দেখছিল ঝাঁ ঝাঁ রোদ। কৃষ্ণচূড়া গাছের মধ্যে কোথাও কোকিল বসে আছে আর মিষ্টি সুরে ডেকে চলছে। স্কুল বাড়িটা টিফিনের পর ঘুমোচ্ছে নয় ঝিম ধরে আছে। এই ঝিম ধরা নিঃঝুম পরিবেশে রানু নিজেকে খুব অসহায় ভাবত, কখনও খুব ভাল লাগত।

আজ রানুর স্কুলের কথা খুব মনে পড়ল, থেকে থেকে সে ভাবল। একটু সরে সে দেখল বাবা দামী কাপড় পরে বেরিয়ে যাচ্ছে।

যাবার আগে কি যেন বলল বাবা। চশমার কাঁচ মুছল। মা কি যেন বলতে চাইল। বাবা বললেন, থাক। রানুকে বাবা বলল, রানু শোন মা। মনে করে ওষুধ খেয়ো। দুপুরে পারলে ঘুমিও, মালতী যে বইটা দিয়ে গেছে পারলে সেটা উল্টে পাল্টে দেখ।

রানু বলল, আচ্ছা বাবা। তাড়াতাড়ি ফিরো।

আচ্ছা মা। আচ্ছা।

বাবা ইউনিভারসিটি চলে গেলে বাড়িটা দেখতে দেখতে ঝিমিয়ে এল। ওর মনে হল পা সামান্য ব্যথা করছে। সে বিছানায় চলে এল।

খানিক পরে মা এঘরে এসে বলল, রানু সকালের ওষুধ খাওয়া হয়নি। নাও এ ওষুধ।

ছোট্ট গ্লাসে ওষুধ হাতে নিয়ে মা দাঁড়িয়ে। ওর খুব তেতো আর বিস্বাদ লাগে এ মিক্‌চার। রানুর এতটুকু ভাল লাগে না খেতে। তবুও সে মায়ের হাত থেকে গ্লাসটি তুলে নিয়ে ঢক করে ওষুধ খেল।

হাত বাড়িয়ে মা ভেজানো জানালাটা পুরো খুলে দিল।

বাইরে রোদ।

তেরচা হয়ে রোদ এসে ঢুকল ঘরের মধ্যে।

একটু পরে বেনু আর কামাল স্কুলে যাবে।

রানু জানালা দিয়ে দেখল ওরা দুজন বারান্দায় বসে ভাত খাচ্ছে। সামনের বড় রাস্তায় কোন এক অন্ধ ভিখিরি ভিক্ষে চাইছে। টুংটাং ঘন্টা বাজিয়ে রিক্‌সা যাচ্ছে। রানু এ ঘরে বসেও টের পায়। এঘর থেকে গলিটা দেখা যায়। গলি থেকে সামান্য দূরে বড় রাস্তা, একটু পরেই সামনের বাড়ির দোরগোড়ায় এসে ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়াল। রাস্তাটা এবড়ো থেবড়ো। প্রতিদিনই ঘোড়ার গাড়িটা হেলতে দুলতে চলে আসে বাড়ির সামনে। গাড়িটা থামলে ভেতর থেকে নেমে আসে স্কুলের আয়া। চেঁচিয়ে বলে, আপা গাড়ি আইছে। স্কুলে চলেন।

ঘোড়ার গাড়িটাকে খুব বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয় না। পাশের বাড়ির যোবেদা আপা তৈরিই থাকেন। সাড়া পেলেই বেরিয়ে আসেন। গাড়ির খিরকিও তোলা থাকে। বাইরে থেকে ভেতরের কাউকে চেনাও যায় না, দেখাও যায় না। আপা গাড়ির দরজা বন্ধ করলেই গাড়ি চলতে থাকে। ঘোড়া দুটোর পিঠের ওপরে কোচোয়ানের চাবুক পড়ে।

ঘোড়ার গাড়ির চাকার ঘড় ঘড়, ঘোড়ার খুরের খট খট শব্দ মিলিয়ে গেলেই সবকিছু আবার কেমন ঝিমিয়ে আসে। বড় রাস্তা থেকে ভেসে আসে ফেরিওয়ালার হাঁক। সাইকেল রিক্‌সার টুংটাং। কখনো শোনা যায় চামড়ার ব্যাগ ভর্তি পানি নিয়ে ভিস্তি হামুদ মিয়া কার উদ্দেশ্যে যেন কথা বলছে। লোকটা দেখতে রোগা, কালো। পটকা শরীর। দেখলে মনে হয় শরীরে এতটুকুন বল নেই। শরীর একটুতেই ভেঙে যাবে। রানু অবাক হয়ে যায় যখন দেখে এরকম পটকা শরীর নিয়ে সারাদিন লোকটা কলতলা থেকে চামড়ার ব্যাগ ভর্তি পানি নিয়ে যাচ্ছে। আর কার উদ্দেশ্যে বিড়বিড় করে কি যেন বলে চলছে। চামড়ার ব্যাগ কাঁখে নেবার সময় ওর শরীর খুব সহজেই বেঁকে যায়। রানুর মনে হয় লোকটা খুব রাগী আর গম্ভীর। ওদের বাড়িতে লোকটা যখন খাবার পানি দিতে আসে তখন এত তাড়াহুড়ো লাগায় যে মাঝে মধ্যে মা খুব বিরক্ত হন। বাড়িতে এসেই বলে, কই পানি লন। তাড়াতাড়ি করেন।

মা বলেন, এত তাড়াহুড়ো কেন তোমার হামদু মিয়া।

কত কাম পইরা আছে। তাড়াহুড়া না করলে চলব কেমনে!

লোকটার গোঁফ আছে। প্রথম প্রথম খুব ভয় পেত রানু। একদিন সে হামদু মিয়াকে হাসতে দেখে ভয় ভেঙে গিয়েছিল। হামদু মিয়া যখন গোঁফের ফাঁক দিয়ে হাসছিল তখন ওকে খুব ভাল মানুষ মনে হয়েছিল।

রাস্তায় একদিন বানর নাচিয়ে চলছে একটা লোক। হামদু বানর দেখছিল আর হাসছিল। সে কি হাসি! রানুর সেদিন এ দৃশ্য দেখে হামুদ সম্পর্কে ভয় ভেঙে গিয়েছিল।

তিন

একটু পরেই সিটি দিতে দিতে কুক কুক ঝিক ঝিক করতে করতে বেরিয়ে যায় আরেকটি ট্রেন। কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে আকাশে। ট্রেনটি বেরিয়ে যাবার একটু পরেই আসবে দুধ দিতে গোয়ালা।

ট্রেনটি বেরিয়ে যাচ্ছে, বিকট ঝিক ঝিক শব্দ উঠছে মাটি কাঁপিয়ে। জানালার সামনে দাঁড়ালে রেলগাড়িটিকে স্পষ্ট দেখা যায়।

রানু কতদিন জানালায় দাঁড়িয়ে এমনিভাবে রেলগাড়ি দেখেছে।

গতকাল বিকেলে ঝিরঝির বৃষ্টি পড়েছিল। একটু মেঘ করেছিল আকাশে, খানিক পরেই মেঘ কেটে গিয়েছিল। মেঘ কমে যাবার পরেই সামনের গলি থেকে জাহানারা এসেছিল।

জাহানারা খুব চঞ্চল। স্কুলে খুব ভাব হয়েছিল ওর সঙ্গে। ওরা দুজন একসঙ্গে স্কুলে যেত আর ফিরত। বছর খানেক আগে হাসপাতালে ভর্তি হবার পর থেকে দুজনের মধ্যে ভাব বেড়ে গিয়েছিল।

রানু এখনো চোখ বন্ধ করলে একটি দৃশ্য স্পষ্ট দেখতে পায়। হাসপাতালের বেডে রানু শুয়ে আছে। দুপুরে ইনজেকশান দিয়েছে নার্স। ইনজেকশান দিয়ে বলেছে ঘুমোও তো, ব্যথা এক্ষুণি সেরে যাবে। কিন্তু ওর চোখে ঘুম আসেনি। হাসপাতালের কেমন যেন ওষুধ ওষুধ গন্ধ, ডাক্তারদের চলাফেরা, ফিসফাস কথাবার্তা সবকিছু ওর মনে এক অজানা ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছিল। আলাদা পরিবেশে কেবলই ওর মনে হত এখানে এলেই মানুষ মরে যাবে।

ওর মনে পড়ল দোতলার বিরাট জানালা। এখানে চোখ রাখলেই বাইরের সারি সারি গাছের ভেতর থেকে আকাশ দেখা যায়। রাস্তায় সারি সারি শিরীষগাছ। এ ওর গা ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দুপাশের গাছের সারির মধ্যে থেকে ঘোড়ার গাড়ি ছুটে চলছে। রিক্সা যাচ্ছে আর ইউনিভারসিটির ছেলেরা গল্পগুজব করে চলেছে।

রানু দোতলার সেই বিশাল জানালা দিয়ে আকাশ দেখত। কখন যে চোখ চলে যেত রাস্তায়, সে ভেবেও পেত না। রাস্তার মানুষজনকে মনে হত বড় বেশি ব্যস্ত। কেবল ছুটছে তো ছুটছে। কেউ দাঁড়িয়ে নেই।

প্রথম যেদিন সে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল সেদিন সে খুব ভয় পেয়েছিল। রানুর সঙ্গে মা ছিলেন সারাক্ষণ ছায়ার মতো। তবুও ওর মন থেকে ভয় এতটুকুও সরেনি। এখনও হাসপাতালের প্রথম দিনের কথা মনে হলে ওর সারা শরীর ও মন কেমন যেন হয়ে যায়।

প্রথমদিনেই ওর বাবার সঙ্গে জাহানারা এসেছিল। রানুর হাতে ইনজেক্শানের ব্যথা। মা আর বাবা মাথার কাছে বসে সারাক্ষণ রানুর সঙ্গে গল্প বলেছে।

জাহানারা হাসপাতালে এসেই কেঁদে ফেলেছে। রানু ওর সঙ্গে অনেকক্ষণ কোন কথা বলেনি। শুধু চেয়ে দেখেছে। সেদিন সে খুব অবাক হয়েছিল।

বাবা বলেছিল, কাঁদছ কেন জাহানারা? খুব তাড়াতাড়ি রানু ভাল হয়ে উঠবে। আবার তোমরা একসঙ্গে স্কুলে যাবে।

সে তখন বিছানায় শুয়ে। বাবাকে, মাকে আর জাহানারাকে খুব সুন্দর লাগছিল তার। সে কোনদিন ভাবেনি জাহানারা রানুকে এত ভালবাসে।

হাসপাতালে প্রথম দিন রাতে সে অদ্ভুত সব হিজিবিজি স্বপ্ন দেখেছে। সে স্বপ্নগুলোর কোন মাথামুণ্ডু নেই। কোন সুরু নেই, শেষ নেই। শেষ রাতে এই সব এলোমেলো স্বপ্ন দেখতে দেখতে সে খুব গোঙাচ্ছিল। একটা দৈত্য বুড়ো ওকে ধরার জন্য ছুটে আসছে, বাবা পালাচ্ছে আর মা দৌড়ুচ্ছে।

মা ওর গোঙানি শুনতে পেয়ে ধড়মড় করে উঠে বসেছিল বিছানায়। ঘুম ভাঙিয়ে বলেছিল, রানু এই যে আমি। কি হয়েছে?

সে চোখ খুলে মাকে দেখতে পেয়ে খুব আশ্বস্ত হয়েছে। অনেকক্ষণ সে কোন কথা বলতে পারেনি। অপলক চেয়েছিল সে। মা ওকে বুকে জড়িয়ে কান্না জড়িত কণ্ঠে বলেছে, রানু এই তো আমি। রাত এখ্খনো অনেক বাকি। ঘুমাও মা, ঘুমাও।

ভোরবেলা এক পশলা ঝিরঝির বৃষ্টির পর আকাশে মেঘ জমেছিল। জানালায় চোখ রেখে সে দেখেছে আকাশে সাদা মেঘ এদিক থেকে ওদিকে ভেসে চলেছে।

দূরের বড় রাস্তাটা বৃষ্টিতে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেছে।

ঘোড়ার গাড়ি চলছে। তেমন গতি নেই, মন্থর।

রিক্সা চলছে। মানুষজন তেমন নেই। দু-একজন রাস্তার ধার ঘেঁষে হেঁটে চলছে। আজ সে এইসব মনে করতে গিয়ে চোখের সামনে এলোমেলোভাবে অনেক কিছু দেখল।

চার

হরিঘোষ এ বাড়ির বাঁধা গোয়ালা। রানু বিছানায় শুয়ে শুয়ে বুঝতে পারল দুধওয়ালা এসেছে। মা ওর সঙ্গে কথা বলছে। কালকের দুধে অনেক বেশি পানি ছিল সে জন্য সর পড়েনি দুধে। মা বলছে, হরিঘোষ কোন কথা বলছে না। মেপে দুধ দিচ্ছে আর কোন কথা না বলাতে মা আরো বিরক্ত।

শোন, এভাবে চললে সামনের থেকে দুধ দিও না। তোমাকে বিশ্বাস করি বলে তুমি এমন করবে এ ভাবতে পারিনি।

ঠিক আছে, এবারের মতো ক্ষমা করে দিন। জল আর মেশাব না।

গোয়ালা, চলে যাবার পর পুরো বাড়িটা আবার ঝিমিয়ে পড়ল। সব কিছু তেমনি, কোথায়ও কোন সাড়া শব্দ নেই। গলির মোড় থেকে এক ফেরিওয়ালা হেঁকে চলছে চাই চুড়ি. রিবন ফিতা। চাই চুড়ি।

মা টানা বারান্দায় বসে তরকারি কুটছে। লাউ, আলু আর পটল।

একটু পরেই মালতী দিদি এল। মা বলল, এস মালতী কি খবর? তোমরা ভাল তো?

হ্যাঁ। রানু কেমন আছে?

ভাল। কাল ব্যথা উঠেছিল। আজ ভাল আছে। যাও না ওর কাছে। তোমাকে পেলে মেয়েটা ভাল থাকে।

যাই। সেই সকাল থেকে আসব আসব করছিলাম। কিছুতেই সময় করতে পারিনি।

রানু দেখল কথা বলতে বলতে টানা বারান্দা পেরিয়ে এ ঘরে এসে পড়েছে মালতী দিদি।

এইমাত্র স্নান করে এসেছে। চুল থেকে মৃদু সুগন্ধ ঝরে পড়ছে। মালতী দিদির হাসিতে কি যেন লেগে থাকে সব সময়। এত ভাল লাগে রানুর এ চাপা হাসি যে ভাবা যায় না। সুন্দর চেহারা, সুন্দর মুখশ্রী। মালতী দিদি বলল, কি করছিলে ? তুমি তো দেখছি খুব ভাল আছ। আর কটা দিন পরেই তো তুমি ভাল হয়ে উঠবে। কোন চিন্তা নেই।

মালতী দিদির চাপা হাসির মধ্যে একটা দুঃখ, একটা যন্ত্রণা লুকিয়ে থাকে। রানুকে কেউ কোনদিন সেসব কথা বলেনি। সে বড়দের আলাপ থেকে বুঝেছিল ; কিছুটা শুনেছিল। কখনো কখনো মা আর বাবা যখন এ নিয়ে আলাপ করেন তখন মালতী দিদির জন্য ওর ভালবাসা আরো বেড়ে যায়। বাবা প্রায়ই মাকে বলেন, মেয়েটির জন্য দুঃখ হয়। এমন করে কেউ মরে যায়। কি ভাল মানুষই না ছিলেন বারীন কাকা আর ইলা মাসীমা। তোমার মনে নেই সেই যে পূজোর সময় ওরা দেশে গেলেন বাড়ির চাবি আমাদের হাতে দিয়ে। দেশ থেকে ফেরার সময় কত কি যে নিয়ে এলেন। আমাদের বেনুর অসুখের সময় কি না করেছেন ওরা।

বারীন কাকা আর ইলা মাসীকে ঠিক স্পষ্ট মনে পড়ে না। আবছা অস্পষ্ট কিছু স্মৃতি মনের মধ্যে গেঁথে আছে।

মায়ের সঙ্গে সে যেত মালতী দিদির বাড়ি। খুব সুন্দর ঝকঝকে মেঝে। লেপামোছা নিকানো উঠোন। ইলা মাসীর নিজেব হাতে তৈরি করা ছিম্‌ছাম বাগান। কোথায়ও কোন আবর্জনা নেই, এতটুকুন ময়লাও পড়ে নেই। পুরো বাড়িটাকে মনে হত ফ্রেমে বাঁধা একটা ছবি।

বারীন কাকার বৈঠকখানায় দুনিয়ার সব বই। ঠাসাঠাসি, গাদাগাদি করে সব সাজানো। বারীন কাকা খুব কম কথা বলতেন। বাবার সঙ্গে ওর খুব বন্ধুত্ব ছিল। সন্ধ্যায় আড্ডা জমে উঠত ওর বৈঠক ঘরে। ওদের বাড়িতে তিনি এসেছেন কিনা ওর মনে পড়ে না। কিন্তু ইলা মাসীমা সন্ধ্যার পরে মার সঙ্গে গল্প করতে আসতেন।

মা আর ইলা মাসীমার মধ্যে খুব ভাব জমে উঠেছিল। ইলা মাসীমার সঙ্গে মার এই মেশামেশি পাড়ার আজিজা আপা একদম পছন্দ করতেন না, কেমন আড়চোখে দেখতেন। এ বাড়িতে বেড়াতে এলে প্রায়ই বলতেন, আচ্ছা ভাবী তুমি মানুষটা কেমন বলত। তোমার দেখি কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই। তুমি মালতীর মার সঙ্গে এত মেশ কেন বলত। আর রানুর বাপ যে কেমন ধারা মানুষ বুঝি না, শুধু বারীন বাবুর সঙ্গে সারাদিন গল্প, তর্ক আর গুজুর গুজুর।

তাতে কি ! ওরা তো খুব ভাল মানুষ। বারীন বাবু বিদ্বান।

দিনকাল খারাপ। সে জন্যই তো বলছি। তোমরা শুধু শুধু বিপদ বাড়াচ্ছ। কখন যে কি হয়ে যায় ! দেখছ না কাগজে কত ফলাও করে রায়টের কথা লিখেছে।

সে তখন বারান্দায় বসে স্কুলের পড়া করছে। আজিজা খালা যাবার আগে চাপা স্বরে কি যেন বলল। সে বুঝতে পারেনি। তখন থেকে যা গম্ভীর। অনেকক্ষণ কোন কথা বলেননি মা। ভেতরে ভেতরে খুব কষ্ট পেয়েছিলেন। মার চেহারা দেখলে এ স্পষ্ট বোঝা যায়।

এক সঙ্গে খেতে বসে মা খুব গম্ভীরই ছিলেন। মনের ওপর তখন দারুণ ঝড় বয়ে যাচ্ছে।

ভাবী খেতে খেতে বলেছিলেন, কি হল ?

না এমনি। আজ আজিজা আপা এসেছিলেন। উনি ওদের নিয়ে কি সব বললেন। সেই থেকে শান্তি পাচ্ছি না। কি ব্যাপার বল তো ?

না ভয় নেই। ওদের নিয়ে ভয়ের কি আছে ? তবে সারা শহর খুব থমথমে, কখন কি হয় ঠিক নেই।

রানুর এতটুকুই শুধু মনে আছে। পরের দিন ওরা স্কুলে যায়নি। বাবা সকালের দিকে খুব

ছটফট করছিলেন। বললেন, আজ আর স্কুলে গিয়ে কাজ নেই।

ওরা তখন উঠোনে ছুটোছুটি করছে, দৌড়ুচ্ছে। তখনই মালতী দিদির আকাশ ফাটানো চিৎকার করে কান্না শুনেছিল। খুব বেশিক্ষণ না, খানিকক্ষণ। তারপর সব স্তব্ধ আর নিঝুম হয়ে গিয়েছিল।

সাত সকালে ঘুম থেকে উঠে বারীন কাকা আর ইলা মাসীমা সেগুন বাগানে এক আত্মীয়ার খোঁজ খবর নিতে গিয়েছিলেন। পথের মধ্যে কারা যেন বারীন কাকা আব ইলা মাসীমাকে মেরে ফেলেছে।

মালতী দিদি এ খবর পেয়ে চিৎকার করে কেঁদে উঠেছিল। জ্ঞানও হারিয়েছিল। কোন সাড়াশব্দ তারপর পাওয়া যায়নি। কোন কান্নার আওয়াজও না। কোন বিলাপ ছিল না। অল্পক্ষণের মধ্যে সবকিছু থমথমে হয়ে উঠেছে। শুধু সবকিছু এ বাড়ি, ওবাড়ি, পাড়া, গলির মোড় থমথমে। সকলের মনের মধ্যে এক অজানা ভয় লেগেই আছে। কিন্তু একটা ভয়ঙ্কর ঘটতে চলেছে, ফিসফাস কথাবার্তায় স্পষ্ট এ বোঝা যায়।

রানু সেদিন খুব ভয় পেয়েছিল। এত ভয় সে কোনদিন পায়নি। বাবা বাইরে যায়নি। সংসারকে আগলে বসে আছেন যেন। কখন কি বিপদ হয়ে যায়।

মালতী দিদি আর ওর ছোট ভাই নিখিলকে পাড়ার রাজু আব আনিস ভাই কোথায় যেন রেখে এসেছিলেন। দুপুরের দিকে একদল লোক লাঠি ছোরা হাতে আধ ঘণ্টায় পুরো বাড়িটা তচনচ করে ফেলেছিল। রানু জানালাব ছোট্ট ফোঁকর দিয়ে দেখেছে লোকগুলো বাড়ির জিনিসপত্র নিয়ে যাচ্ছে। সাইকেল, দেয়াল ঘড়ি, ছোট্ট রেডিও, পেতলের ঘড়া, শাড়ি, জামাকাপড় সব।

শূন্য বাড়িটায় বেশ কিছুদিন কেউ ছিল না। কয়েকদিনের মধ্যেই বাড়ির সুন্দর নিকানো উঠোনে ঘাস গজিয়েছিল। ও বাড়ির দিকে তাকাতেও গা ছমছম করত, কেমন যেন একটা ভয় ধরে গিয়েছিল। ঐ সময় ওর কেবলই বারীন কাকা আর ইলা মাসীকে মনে পড়ত।

রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে কতদিন দোয়া করেছে, হে আল্লাহ ওদের যেন কিছু না হয়।

মালতী দিদি সেই থেকে কেমন যেন হয়ে গেলেন। চোখের কোণ এমনভাবে কালো হয়ে উঠল যে ওকে দেখলে সহজে চেনাই যেত না। সব সময় কেমন এক ধরনের বিষাদ আর কান্না জমে আছে চোখ-মুখে।

বারীন কাকা আর ইলা মাসীদের মৃত্যুর এই ঘটনা রানুব হৃদয় মনে বহুদিন গেঁথে ছিল। উঠোনে বেনু কামালের সঙ্গে খেলতে খেলতে ওর মনটা হঠাৎ হাহাকার করে উঠত।

বাবার সঙ্গে পাড়ার আনোয়ার চাচা এ নিয়ে প্রায় গল্প করত। আনোয়ার চাচা প্রায়ই বলত, বড় ভাল আর পণ্ডিত মানুষ ছিলেন বারীন বাবু। এমন গণ্ডগোলের মধ্যে কি দরকার ছিল ওর সেগুন বাগান যাবার? বাবা বললেন, বারীন বাবুর বিশ্বাস ছিল। সেজন্যই তো তিনি সাহস পেয়েছিলেন।

এমন সাহস করতে নেই, বিশ্বাস করতে নেই। সারা শহরে যখন আগুন জ্বলছে তখন কিনা উনি গেলেন সেগুন বাগানে আত্মীয়-বন্ধুদের খোঁজ নিতে। এমন বোকা মানুষ আমি এ জন্মে দেখিনি।

না না। উনি বোকা ছিলেন না। বারীন বাবু ভেবেছিলেন উনি গণ্যিমান্যি মানুষ, সমাজের জন্য এত যখন করেছেন তখন কেউ কিছু করবে না।

তুমি যে কি বল! এখানেই তো ওঁর ভুল হল। খারাপ লোকদের কেউ বোঝাতে পারে?

ওদের যা দরকার তাই করে। ওদের যা চাই, তাই হয়।

রানুর অনেকদিন এসব খুব মনে ছিল। গতবছর হাসপাতালে ভর্তি আর পায়ের পাতা শুকিয়ে যাবার পর সবকিছু সে ভুলে যাচ্ছে। কোনকিছু মনে পড়ে না। স্মৃতি ম্লান। বারীনকাকা আর ইলা মাসীকে আগের মতো তেমন মনে পড়ে না। আবছা টুকরো সব স্মৃতি আর দৃশ্য চোখে ভাসে।

সন্ধ্যায় ইলা মাসী যখন গান গাইতেন একটির পর একটি তখন খুব ভাল লাগত। 'অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে'—সেই গানটার মধ্যে ওর দরদ এমনভাবে ফুটে উঠত যে ভাবা যায় না।

কিছুদিনের মধ্যে মালতী দিদি কেমন যেন হয়ে গেল। কথা বলে না। কেবল অপলক চেয়ে থাকে। সন্ধ্যায় গান গাওয়া ছেড়ে দিল।

রানু হাসপাতালে ভর্তি হবার পর থেকে মালতী দিদি আবার ধীরে ধীরে এ বাড়িতে আসছে। রানুকে নিয়ে গল্প করছে। উঠোনে হাঁটাতে নিয়ে যাচ্ছে। রানু মালতী দিদির হাত ধরে, ক্র্যাচে ভর দিয়ে হাঁটতে থাকে।

মালতী দিদি বলে, রানু পা ফেল, জোর দাও। ঠিক হয়ে যাবে।

মালতী দিদির সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে রানু সত্যি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু আবার আনন্দে এক সময় তার শরীর মন নেচে ওঠে। মালতী দিদির সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে সে আর এক জগতে চলে যায়। ওর মনে আশার আলো জ্বলতে থাকে। ওর কেবলই মনে হয় সে সেরে উঠবে। শরীর মনে কোন ক্লান্তি নেই। খুব তাড়াতাড়ি সে স্কুলে যাবে। আবার বন্ধুদের সঙ্গে ছুটবে, দৌড়াবে। ছোট্ট ঘন জঙ্গলের সোঁদা গন্ধে ভরে উঠবে বুক।

মালতী দিদি আজ এসেই বলল, তোমাকে আজ একটি গল্প শোনাব। তুমি এ গল্পটি শোননি।

পাঁচ

সেদিন বিকেলে ইউনিভারসিটি থেকে ফিরল বাবা খুব উদভ্রান্ত হয়ে।মাকে বল'লে আর রক্ষা হল না। দেখ না কিসে কি হয়ে যায়। মা দাঁড়িয়েছিলেন বারান্দায়। বললেন, কেন তুমি না বলেছিলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

না ঠিক হল কই; চারদিকে পুলিশ। আজ বিকেল থেকে আমাদের ওখানে ১৪৪ ধারা। ছেলেদের দোষ কি বল। ওরাইতো মারমুখো হয়ে আছে।

বাবা মুখ-হাত ধুয়ে খেতে বসলেন বারান্দায়। রানু, বেনু, কামালকে ডাকলেন। রানুকে আদর করলেন। চা খেতে খেতে বললেন, রানু ওষুধ খেয়েছ?

হ্যাঁ বাবা।

ব্যথা হয়েছিল?

না বাবা।

বাবা এরপর চামড়ার ব্যাগ থেকে রানুর জন্য দুটো বই বের করলেন। একটা গল্পের বই আর একটা ঠাকুর-মার ঝুলি। ছবি সমেত সুন্দর ছাপা। বইটার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে রানুর হৃদয় মন ভরে গেল।

রানুর স্কুলের বন্ধুদের কথা মনে পড়ল—স্কুল বাড়ি, খেলার মাঠ হেঁটে হেঁটে দুবন্ধুর স্কুলে যাওয়া!

এক সময় হঠাৎ রানু বাবাকে বলল, বাবা আমি কবে সেরে উঠব!

খুব তাড়াতাড়ি, খুব তাড়াতাড়ি।

সত্যি বাবা?

হ্যাঁ মা।

রোজ পায়ের পাতা মালিশ করবে। ডাক্তার কাকা যেমন করে মালিশ করতে বলেছেন তেমনি মালিশ করবে। এক্সারসাইজ করবে। খুব তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে।

আমি তো রোজ মালিশ করি বাবা।

জানি মা। চল উঠোনে হাঁটবি।

বাবার হাত ধরে ক্র্যাচে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল রানু। বাবার হাত ধরে হাঁটল।

রানুর মনে হল পায়ে তেমন কোন ব্যথা নেই। পা সেরে উঠছে। সে পায়ের পাতায় নতুন করে বল পাচ্ছে। বাবার হাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে রানুর মনে পড়ল অনেকদিন আগে ওরা গ্রামে গিয়ে বাবার হাত ধরে এমনি হেঁটেছিল।

তখন শীতকাল। ধান কাটা হয়ে গেছে। দু চোখে জুড়ে কেবলই দেখা যায় এবড়ো-থেবড়ো মাঠ। গাঁয়ের মুখে প্রকাণ্ড একটা বট গাছের ঝুড়ি মাটি ছুঁয়ে আছে। শীর্ণ একটা খাল এঁকে বেঁকে চলে গেছে দক্ষিণে। খালে তেমন জল নেই। কিন্তু নৌকা চলছে। গঞ্জে যাচ্ছে, হাটে যাচ্ছে। অনেক দূরে ছোট্ট একটা রেল ষ্টেশন। রেল লাইনও দেখা যায়।

ছোট্ট খালটা এঁকে এঁকে চলে গেছে পদ্মায়। ইষ্টিমারের ভোঁ কিছুক্ষণ পর পর শোনা যায়। ভোরের ফুটফুটে আলোর মধ্যে ওরা ইষ্টিমার থেকে নেমেছিল। কাল সন্ধ্যায় ওরা যখন ঢাকা ছেড়ে এসেছে তখন ইষ্টিমারে ওঠার আনন্দে, গ্রামের বাড়িতে যাবার উত্তেজনায় ওর অনেক কিছু করার ইচ্ছে ছিল। একসময় ভোঁ বাজিয়ে বড় বড় চাকা জল কাটতে কাটতে যখন চলতে শুরু করেছে তখন বেনুকে সে বলেছিল, বেনু আজ আমরা ঘুমবো না। আজ সারারাত জেগে থাকব।

আকাশে রূপোর থালার মতো বড় চাঁদ। সারা নদী জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে, লঞ্চ চলছে নৌকা চলছে। সরু সরু লম্বা নৌকায় বসে আছে জেলে। স্রোতে দুলতে দুলতে জাল ফেলেছে।

রানু যত দেখছে ততই আনন্দে নেচে উঠছে। দুপাশের বাড়ি, কারখানা, গুদাম সরে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ এসব দেখতে দেখতে রানু ঘুমিয়ে পড়েছিল।

পরের দিন সকালে আকাশ য[illegible] একটু ফর্শা হয়ে এল তখনই ওদের ইষ্টিমার এসে ভিড়েছিল ইজিলপুরের ঘাটে।

মা বললেন, ওঠ রানু, ওঠ বেনু। আমরা এ[illegible]স গেছি।

ভোরের নতুন আলো তখন ফুটিফুটি করছে। পুবদিকটা সামান্য লাল। সূর্য উঠবে হয়ত বা। কিন্তু ঠাহর করলে কিছুই বোঝা যায় না। ঘন কুয়াশায় তখন সব ঢেকে আছে।

মা বিছানাপত্র বাঁধাছাঁদা করে গুছিয়ে রাখলেন। খানিকপরেই ইষ্টিমার নদীর ঘাটে ভিড়েছে। ইষ্টিমার থেকে নেমে ওরা নৌকা নিয়ে গ্রামে এসেছে।

নদীতে তখন বাতাস বইছে। সবুজ ক্ষেত। এক পশলা বৃষ্টি পড়েছিল।

দিন সাতেক ছিল ওরা গ্রামে। রানুর সে কি আনন্দ।

বাবার হাত ধরে রানু আর বেনু একদিন দূরের আরেকটি গাঁয়ে বেড়াতে গিয়েছিল। রেল লাইনের স্লিপার গুণে গুণে হেঁটেছিল। যাওয়া আসার পথে বাবা যে কত ধরনের গাছ চিনিয়েছিলেন তার শেষ নেই। ফেরার পথে সে রাতে আকাশে চাঁদ ছিল না। চাঁদ উঠেছিল আরো খানিক পরে। আকাশে দু-একটি তারা ছিল। বাবা গল্প করতে করতে দু-একটি তারাও চিনিয়েছিলেন।

বাবার সঙ্গে গাঁয়ের বাড়িতে বেড়াবার কথা ভাবতে ভাবতে রানু দেখল সন্ধ্যা নামছে। পাশের

বাড়িতে মালতী দিদি গান গাইছে—'অন্তর মম বিকশিত কর'। মালতী দিদির গলাটি বেশ মিষ্টি। প্রতিদিন সন্ধ্যায় মালতী দিদি যখন এ গানটি দিয়ে শুরু কবেন তখন সে সমস্ত দুঃখ, সমস্ত কষ্ট ভুলে যায়।

পাশের বাড়ির দোতলায় কেউ যেন ঝগড়া করছে। ওদের চিৎকারে বাবা বিরক্ত হয়ে উঠলেন। চল ঘরে ফিরি।

রানু ক্র্যাচে ভর দিয়ে ফিরে এল ঘরে।

বেনু আর কামাল বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে পড়ছে। সে রাতে বাবার সঙ্গে যখন ওরা সবাই রাতের ভাত খাচ্ছে রানু শুনল কে যেন কড়া নাড়ছে।

বাবা বলল, দেখ তো এই রাতে কে কড়া নাড়ে!

মা দরজা খুলে এসে বলল ফজলু এসেছে। এক্ষুণি তোমার সঙ্গে জরুরী কথা বলতে চায়। বলেছি খেতে বসেছ। বলল, স্যারকে একটু তাগিদ দিন, আমাদের সময় নেই।

বসতে বল। আমি এক্ষুণি যাচ্ছি।

বাবার ভাত খাওয়া শেষ হয়নি। খুব তাড়াতাড়ি উঠে গেলেন। মা বললেন কি ব্যাপার। না খেয়ে উঠে যাচ্ছ যে। ফজলু তো বসেছে।

বলিনি তোমাকে, একটা কিছু হয়ে যাবে। ও নিশ্চয় কোন জরুরী খবর এনেছে।

ভাত খেতে খেতে রানু দরজার ফাঁক দিয়ে ফজলু ভাইকে দেখল। কেমন যেন চিন্তামগ্ন।

বাবা বললেন, কি খবর তোমাদের?

এই তো স্যার। কিছু শুনছেন?

একটু একটু।

কাল আমরা বেরুবোই। ভাঙ্গা ছাড়া, মিছিল করা ছাড়া আমাদের কোন উপায় নেই। বিকেল থেকে উত্তেজনা বেড়েছে। যে কোন সময় ধরপাকড়ও সুরু হয়ে যেতে পারে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ।

সাবধানে থেক।

আচ্ছা স্যার।

তারপর ওরা চাপা স্বরে, খুব আস্তে আস্তে কথাবার্তা বলছিল। রানু শুনতে পায়নি। রানুর সঙ্গে ফজলু ভাই এর এক সময় বেশ ভাব ছিল। ওর মনে পড়ল সেই সকাল বেলার স্মৃতি।

গলির মোড়ে ছিল একটা শিউলী আর বকুল গাছ। রানু-বেনু সেই সাত সকালে সেখানে ফুল কুড়াতে যেত।

গলি থেকে সামান্য দূরেই বড় রাস্তা। গলির মুখে রানু কতদিন দেখেছে ফজলু ভাই সাতসকালে গলা সাধছে কিংবা গান গাইছে। চোখে ভারী চশমা। গায়ে গেঞ্জি। গলা সাধা শেষ হলেই পড়তে বসত ফজলু ভাই। তারপর যেত ইউনিভারসিটি। রানুর পায়ের পাতা তখনো এমন করে শুকোয়নি। একদিন ওরা দুজন—রানু-বেনু জামার কোচর ভরে ফুল নিয়ে ফিরছে।

ফজলু ভাই বলেছিল, এই রানু গান শিখবি!

রানু বলেছিল, হ্যাঁ। মাকে জিজ্ঞেস করে নিই।

সেদিন থেকেই রানুর সঙ্গে ফজলু ভাইয়ের দারুণ ভাব হয়েছিল।

রানু যখন সেবার পায়ের ব্যথার জন্য হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল তখন একদিন হাসপাতালে দেখতে এসেছিল। সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল ক্রীম রং-এর বিলেতী মুচমুচে বিস্কুট।

রানুর মন তখন ভাল নেই। বিছানায় শুয়ে শুয়ে ইন্‌জেক্‌শন নিতে নিতে ওর মন কেমন যেন এক অজানা ভয়ে কুঁকড়ে গেছে। পায়ের পাতায় শক্তি নেই। কাঁহাতক বিছানায় শুয়ে থাকা যায়।

ফজলু ভাই খুব মিষ্টি করে রানুকে বলেছিল, ভয় নেই। তুমি ভাল হয়ে উঠবে। কদিন পরেই তো সব ঠিক হয়ে যাবে।

সেই সময়ে একদিনের স্মৃতি ওর মনে খুব গেঁথে আছে। সামনের বড় জানালা দিয়ে সে একদিন দুপুরে দেখেছিল একটা মিছিল ইউনিভারসিটি থেকে বেরিয়ে সামনের দিকে চলছে। শ্লোগানের শব্দ কানে আসছে। ওরা হাত তুলছে আব নামিয়ে নিচ্ছে।

মিছিলটিকে এক নজর দেখবার জন্য সারা ওয়ার্ডে খুব সাড়া পড়ে গিয়েছিল। সবাই বড় জানালার দিকে ছুটছে, জড়ো হচ্ছে। এ কথা সে কথা বলাবলি করছে।

কে একজন যেন বলেছিল, মুখের ভাষার এ দাবি মানতেই হবে। আমরা বাংলায় কথা বলি। বাংলা হবে না তো কি ? উর্দু কি আমরা বলতে পারি, না বুঝি যে, উর্দু হবে আমাদের রাষ্ট্রভাষা ! এসবের কোন মানে হয় না। এ যে জবরদস্তি !

ছাত্ররা ভালই করেছে। প্রতিবাদ না করলে কেমন করে চলবে !

ঠিক, ঠিক।

এমনভাবে অনেক কথা চলেছিল অনেকক্ষণ। রানু কিছুই বুঝতে পাবেনি। ও নিজেও জানে না কেন জানি সেদিন ফজলু ভাইকে ওর খুব মনে পড়েছিল আর সারাক্ষণ ভেবেছে ফজলু ভাই এ মিছিলে আছে, মিছিলে শ্লোগান দিচ্ছে।

ছয়

পরেরদিন সকাল থেকে পুরো এলাকাটা থমথম করছে। বাবা সকাল সকাল বেরিয়ে আবার ফিরে এলেন। রানু, বেনু আর কামালকে সঙ্গে নিয়ে সকালের খাবার খেলেন।

বাবা খাবার খেতে খেতে বললেন, আজ একটু তাড়া আছে। ছেলেরা কি কাণ্ড করে, কে জানে ! যেভাবে সব তেতে আছে, কি যে হয়ে যায় !

তুমি কিন্তু এসবে একদম জড়িয়ো না। আজ তো ক্লাশ নেই। তুমি কেন যাচ্ছ ?

তবুও যেতে হবে। কখন কি হয়ে যায় !

মা অনেকক্ষণ ভাবলেন। কি যেন বলতে চাইলেন রানু বুঝতে পারল না।

বাবা বললেন, রানু তুমি তো সকালের ওষুধ খাওনি। দুধটুকু খেয়ে নাও। আমি ওষুধ আনছি।

বাবা মিক্‌চারটুকু ছোট্ট গ্লাসে ঢেলে বললেন, নাও রানু, খেয়ে নাও।

খয়েরি মিক্‌চারটুকু গলায় ঢেলে দিতেই রানুর মুখ তেতো হয়ে গেল। এক গ্লাস পানি খেয়েও মুখের তেতো ভাবটি গেল না। বাবা মাকে বললেন, আমি এক্ষুণি যাচ্ছি। ওদের স্কুলে পাঠিও না।

না গেলে হয় না ? মা বললেন।

না।

বেনু কামাল ওদিকে বসে পাউরুটি আর দুধ খাচ্ছে আর উঠোনে একদল কাকের ওড়াওড়ি দেখছে।

বেনু বলল, কেন বাবা স্কুলে যাব না ?

এমনি।

দুপুরে খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল রানু। পায়ে ব্যথা নেই। এ ঘর থেকে দেখা যায় বাবা বারান্দায় ইজি চেয়ারে বসে আছে। খুব বিষণ্ণ। মাকে দেখা যায়। মা রান্নাঘরে চা তৈরি করছে। ঠিকে ঝি কুয়োতলায় বাসন-কোসন ধুচ্ছে।

ঝিরঝির হাল্‌কা হিমেল হাওয়ায় একটু শীতের আমেজ আছে। কিছুক্ষণ আগেও সে বিশ্রী এলোমেলো স্বপ্ন দেখেছে। এ স্বপ্নের কোন সুরু নেই, শেষ নেই।

রানু স্বপ্ন দেখেছে, সে গাঁয়ের বাড়িতে চলে গেছে। সারা তল্লাট জুড়ে শুধু জল আর জল। নৌকা চলছে। সে ছুটছে। আর কেউ নেই। সঙ্গে বাবা নেই, মা নেই। নৌকায় এদিক সেদিক যাচ্ছে। পায়ে হেঁটে নদীতে নামছে। ভিন গাঁয়ের বুনো জঙ্গলে হারিয়ে যাচ্ছে। শামুক কুড়োচ্ছে, ফুল তুলছে। বৈঁচি ফুলের মালা গাঁথছে।

বিছানায় উঠে বসে রানুর এসব এলোমেলো স্বপ্নের কথা মনে পড়ল। ঘুমের জড়তা তখনও ওর কাটেনি। চোখে ঘুম। আরও একটু ঘুমিয়ে নেবে কিনা রানু ভাবল।

বিছানা থেকে বাবাকে দেখা যায়। বাবাকে ডাকবে কিনা ভাবল। তারপর ডাকল, বাবা, বাবা!

আসছি মা।

বাবা এসেই বলল, কখন উঠলি!

এইমাত্র।

আমি দুবার দেখে গেছি, তুই ঘুমোচ্ছিলি? তাই ডাকিনি। পায়ে ব্যথা নেই তো?

না বাবা।

রানু পায়ের পাতা নেড়ে চেড়ে দেখল।

রানু ভাবল সে বাবাকে শেষ রাতের স্বপ্নের কথা বলবে কিনা।

মুখ ধুয়ে খেতে বসে সে দেখল বাবা খুবই আনমনা। সকাল থেকে বাবা কেমন যেন হয়ে আছে। বাড়িটাও ঝিমিয়ে আছে। কোথায় কি হল রানু বুঝতে পারল না।

বাইরের গলি থেকে ভিস্তির ঝগড়া কানে আসছে। কোথায়ও একটা রেডিও বাজছে।

রানুর সময় কাটতে চায় না। এমন সময় মালতী দিদি এল। ওকে কাছে পেলেই রানু সব দুঃখ ভুলে যায়। ওর গায়ের গন্ধ চাঁপা ফুলের মতো। চুল খুব পরিপাটি আর সুন্দর। ওর শাড়ি পরবার ধরন, চলার ভঙ্গি সব কিছুই মনে হয় আলাদা।

মালতী দিদির চেহারায় কেমন উদ্ভ্রান্ত ভাব। বলল, কাকার খবর কি?

এই তো।

কিছু শুনেছেন?

হ্যাঁ।

গুলিতে কতজন মরেছে?

অনেক।

ধরেছেও নাকি অনেক?

হ্যাঁ।

বাবা মুখ খুলতে চান না। শুধু বললেন বস, তোমার ভাই কই?

বাড়িতে আছে।

ঠিক আছে।

মাও খুব চিন্তিত। মা শুধু মালতী দিদিকে লক্ষ্য করে বলল, কি সব হচ্ছে বুঝতে পারছি না।

রানু ছটফট করছে। কি হল সে কিছুই বুঝতে পারছে না। কেমন সব চাপা চাপা।

মালতী দিদিকে কাছে পেয়ে সে বলল, শোননি!

না।

তবে থাক।

বল না।

আজ ভাষা আন্দোলনের সেই মিছিলে গুলি চলেছে, অনেক ছাত্র মারা গেছে।

রানু আর শোনেনি। মালতী দিদিও আর কিছু বলেনি। ওর তখন ফজলু ভাইকে মনে পড়ল। ওর কিছু হয়নি তো! সারাক্ষণ সে শুধু ভাবল। সন্ধ্যারাতে ও বাড়ি থেকে মালতী দিদির গলা ভেসে আসছে।

কোথায়ও কোন সাড়া-শব্দ নেই। সব নিঝুম।

তখনই ওরা এসেছিল। জীপটি দাঁড়িয়েছিল গলির মোড়ে। প্রথমে কড়া নেড়েছিল একটি লোক। দরজা খুলতেই দুড়মুড় করে ঢুকে পড়ছিল দশ বারজন পুলিশ। সারা বাড়িতে আঁতিপাঁতি করে কি যে খুঁজেছে কে জানে। যাবার সময় খুব সহজভাবে বলেছিল, চলুন আজিজ সাহেব আপনাকে একবার থানায় যেতে হবে। আমরা খবর পেয়েছি আপনি ফজলুর রহমানকে লুকিয়ে রেখেছেন। আপনার যা বলবার থানায় বলবেন।

চলুন।

ভয়ে রানু এতক্ষণ কাঠ হয়ে বিছানায় বসেছিল। কি হয়!

বাবাকে নিয়ে যাবার সময় সে কেঁদে ফেলল।

বাবা রানুর চোখে চোখ রাখলেন। মা দরজার ফাঁক দিয়ে দেখলেন। কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন। এতগুলো পুলিশের সামনে কিছুই ওর বলা হল না।

রানুকে শুধু বললেন, সময় মতো ওষুধ খেয়ো। দশ বারজন পুলিশ বাবাকে নিয়ে যাচ্ছে। ওর ইচ্ছে হল সেও বাবার পেছনে ছুটে যায়। হাত বাড়িয়ে সে জানালা খুলে দিল। দেখল বাবা হেঁটে যাচ্ছে।

সে বিছানা ছেড়ে দ্রুত নেমে এল। রানু দৌড়ে গেল গলির মোড়ে। বাবার পেছন দিকটা অস্পষ্ট আলোতে দেখা যায়। খাকি পোষাক পরা লোকটা বীর দর্পে হেঁটে যাচ্ছে। ভারী বুটের শব্দ হচ্ছে।

রানুর চিৎকার করে বলে ওঠার ইচ্ছে হল, দেখ বাবা, এই আমি দাঁড়াতে পারছি। পায়ে আমার কোন ব্যথা নেই। পায়ের পাতায় ভর দিয়ে আমি দাঁড়াতে পারছি। তুমি মালিশ করে দিয়েছিলে কাল। বাবা তুমি কোথায় চলেছ? তোমাকে নিয়ে ওরা কোথায় যাচ্ছে? তুমি কখন ফিরবে! আমি যে ভাল হয়ে গেছি। তোমাকে কালো গাড়িতে তুলে নিয়ে কোথায় চলেছে! আমি ক্র্যাচ ছাড়া হাঁটতে পারছি। তুমি দ্যাখ বাবা।

মা বসে আছে।

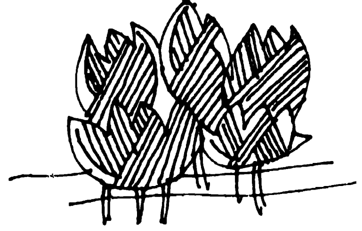
বেনু কাঁদছে।

মার চোখে কি জল?

বুঝতে পারছি না।

আমি হাঁটতে পারছি।

আমার পায়ে কোন ব্যথা নেই।



দি টাইগার

আখতার হুসেন

খুব সামনেই ওর এ্যানুয়াল পরীক্ষা। আর মাত্র মাস খানেকের মতো বাকি। তাই পড়াশোনার খুব তোড়জোর। নিঃশ্বাস ফেলবার জো'টি নেই।

ক্লাসে রটে গিয়েছে, এবার ইংরাজীতে বাঘ সম্পর্কে রচনা আসবে। সেই সাত-সকালে তাই ও ইংরাজী রচনা বই খুলে বসেছে। বার-বার পড়ছে—'দি টাইগার'। কিন্তু পড়তে গিয়ে একটা অজানা ভয়ে ও শিউরে উঠছে বার বাব। গায়েব লোম কাঁটা দিয়ে খাড়া হয়ে উঠছে। কী ভয়ঙ্কর আর হিংস্র স্বভাবের এই বাঘ! থাকে গভীর জঙ্গলে। অথচ ওর মনে হচ্ছিল, একটা ডোরাকাটা বাঘ যেন তাদের বাড়ি আর বাগানের আশেপাশেই ঘুর ঘুর করছে। লাল ভয়ঙ্কর দু'টো চোখ মেলে পাঁয়তারা কষছে। যেন এক্ষুণি দরজা খুলে থাবাটাবা মেলে ওর সামনে এসে দাঁড়াবে।

ওদের এতো বড় বাড়ীতে ও এখন একলা। কেউ নেই। আব্বা, মা-মনি আর বড়পা গেছেন নিউ মার্কেটে। প্রেজেন্টেশান কিনতে। আগামী পরশু ছোট কাকার বিয়ে। তিনি নিজে এসে ওদের সবাইকে দাওয়াত দিয়ে গেছেন। না গেলেই নয়।

ও যখন বাঘ সম্পর্কে গভীর চিন্তায় মগ্ন, তখন ছোট মামা ঢুকলেন ঘরে। প্রায় হন্তদন্ত হয়ে। ঢুকেই একটা চেয়ার টেনে ওর মুখোমুখি বসলেন, 'কিরে, কারো কোন সাড়া-শব্দ পাচ্ছি না। বাড়ীতে কেউ নেই?'

'না,' ও জবাব দেয়।

'তা, এতো মনোযোগ দিয়ে কি পড়ছিস?'

'বাঘ সম্পর্কে।'

মামা একটু অবাক হন। যেন আকাশ থেকে পড়েন।

'বাঘ সম্পর্কে পড়ে কি করবি?'

'কি করবো মানে? পরীক্ষায় আসবে। রচনা।'

ও মামাকে বুঝিয়ে বলে।

মামা ওর কথা শুনে একটুক্ষণ থ মেরে থাকেন। যেন মুখে কোন কথা যোগাচ্ছে না। ও তাই বলে, 'আচ্ছা মামা, তুমি তো শিকারটিকার করো। কখনো বাঘ শিকার করেছো ?'

'করিনি, তবে খুব শীগগিরই করবো', মামা জবাব দেন।

'আচ্ছা মামা, বইয়ে যে লেখা বাঘেরা খুব হিংস্র স্বভাবের। সত্যি কি তাই ?'

মামা ওর কথায় হো হো করে হেসে ওঠেন।

'সত্যি মানে, একশোবার সত্যি।'

ও এবার ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে, 'ঘাড় মটকে রক্ত খায় ?'

'সামনে একবার পড়েই দেখিস না।'

মামার জবাব দেবার ধরনে ও আর প্রশ্ন করতে সাহস করে না। আবার 'দি টাইগারে' মনোনিবেশ করে।

একটু পরে মামা ওর সামনে থেকে উঠতে উঠতে বলেন, 'খোকন, আমি একটু বাইরে যাচ্ছি। পরে আবার আসবো। তোর পরীক্ষা শেষ হোক, তারপর তোকে সঙ্গে করেই একদিন বাঘ শিকারে যাবো।'

'সত্যি বলছো মামা !' ও মুহূর্তে খুশী হয়ে ওঠে।

'একেবারে সদলবলে। আট-ঘাঁট বেঁধে সুন্দরবনেই যাব। পরীক্ষাটা ভালো করে দে।'

কথা বলতে বলতে মামা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আব্বু, মা-মনি আর বড় পা'রা এখনো ফেরেননি। ছোট মামা গেছেন প্রায় ঘণ্টা খানেক। আর ঘরের দরজায় খিল এঁটে ও তখনো পড়ে চলেছে এক মনে 'দি টাইগার'। ঠিক এমন সময় বাইরের দরজার কড়া বেজে ওঠে। বাড়ীর সবাই ফিরে এলো বোধহয়। বই থেকে চোখ তুলে পায়ে পায়ে দরজার কাছে এগিয়ে যায় ও। এবং দরজা খুলে দিতেই দেখতে পায়—আব্বু, মা মনি, বড়'পা নয়, ওর সামনে দাঁড়িয়ে বাচ্চা মতন অথচ মোটাসোটা, ডোরাকাটা একটা বাঘ।

'গুড মর্নিং,কেমন আছো ?' ও কিছু বলার আগেই সে তার সামনের একটা পা বাড়িয়ে দ্যায় ওর হাতের দিকে। করমর্দনের ভঙ্গিতে। যেন বাঘটা ওকে অনেকদিন থেকেই চেনে।

ও ভয় পেয়ে দু'পা পিছিয়ে এসে চোখ কচলাতে থাকে। ভুল কিছু দেখছে নাতো ? চোখে ঘোর লাগেনিতো ? হঠাৎ ও স্বাভাবিক হয় বাঘটির অট্টহাসিতে, 'হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হোঃ হোঃ হোঃ—আমাকে ভয় পেয়েছো !'

ও কি করবে, কি করতে পারে, মাথায় কিছু ঢুকছে না। একি বিপদ এসে জুটলোরে বাবা ! বইয়ের পাতা ছেড়ে একটি তর-তাজা জীবন্ত বাঘ যে ওর সামনে এসে দাঁড়াবে, জীবনেও ভাবেনি। শিকারে গেলে বন-জঙ্গলে ওদের সাক্ষাৎ পাওয়া এক কথা, আর নিজের ঘরের একেবারে দোর-গোড়ায় ওদের মুখোমুখি হওয়া আরেক কথা।

'কি হোল, কথা বলছো না যে।' বাঘটা হঠাৎ ওকে চমকে দিয়ে প্রায় ধমকে ওঠে, 'গুড মর্নিং বললাম, অথচ তুমি তার জবাবটাও দিলে না ...'

থতমত খেয়ে ও এবার কোন মতে মুখ খোলে, 'গুড় মর্নিং ...'

'আমাকে এখানে এমনভাবে দেখে খুব অবাক হোচ্ছ, তাই না ?' বাঘটা বললো।

'না, না অবাক হবো কেন ?' নিজেকে ও সামলে নেয়। 'ভয় পেলে আর দরজা খুলে তোমার

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকি ?'

'তা হলে ভদ্রতা করে ঘরে নিয়ে বসাবেতো ;' অনেকটা ঠাণ্ডা গলায় বাঘটা বলে। 'অতিথি এলে তাকে সমাদর করতে হয়।'

ও এবার মনে মনে সাহস সঞ্চয় করে। ভাবে, দেখিই না কি হয়। দরজা খুলে দিতেই বাঘটা যখন ওকে আক্রমণ করেনি, ঘরে ঢুকে কিছু করবার চেষ্টা করলে চিৎকার করে পাড়া-পড়শীদের অন্ততঃ জড়ো করতে পারবে নিশ্চয়ই।



'এসো, ঘরে এসো,' ও বলে। বাঘটা ঘরে ঢোকে। ঘরে ঢুকতেই ও দরজা বন্ধ করে দেয়।

'তোমার নামটা তো বললে না ?' ঘরের ভেতরে ঢুকে ওর প্রথম প্রশ্ন। 'নাম কি তোমার ?'

'আমার নাম খোকন ?'

'আমার নাম শান্ত। বাবা-মা অবিশ্যি আমার নাম রেখেছিল হালুম, কিন্তু আমার পছন্দ হয়নি।'

'কেন, কেন ?'

'ওটা আবার একটা নাম হোল নাকি। হালুম খালুম-বড্ড পুরনো সব নাম।'

'তা এখন তুমি এলে কোথা থেকে ?'

'তাও জানো না ?'

'আমি জানবো কি করে ?'

'বুঝলে, আমি এলাম আমাদের গাঁ থেকে।'

'তোমাদের গাঁ, সে আবার কোথায় ?'

'কেন, সুন্দরবনে, নাম শোননি ?'

'শুনেছি। তা পথে কেউ তোমাকে বাধা দেয়নি ?' ও প্রশ্ন করে। 'কোনরকম অসুবিধে হয়নি তো ?'

'একটু-আধটু যে হয়নি, তা নয়। শহরের সীমানায় পা রাখতেই ভোর হয়ে গেলো।'

'তারপর ?' ওর উৎকণ্ঠা বেড়ে চলে।

'তারপর আর কি ? লোকজন আমাকে আলোতে দেখতেই যে যেদিকে পারলো, পড়ি-মরি করে ভোঁ দৌড়। আমি যতই বলি, আমাকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, কে শোনে কার কথা। দু' একজন অবশ্য গুলী ছুঁড়েছিল।'

'কোথাও লাগেনিত ?'

'না, লাগতে পারেনি। ভীষণ গা বাঁচিয়ে চলেছি।'

'তোমার ভাগ্য সত্যিই ভাল।'

এরপর ওরা দু'জনেই চুপচাপ। বাঘটাকে আর কি বলতে বা জিজ্ঞেস করতে পারে, ভেবে পায় না ও। কিন্তু এই নীরবতার সুযোগে বাঘটাকে ও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নেয়। যাতে বাঘের রচনা এলে, বাঘের বাইরের চেহারার একটা নিখুঁত বর্ণনা পরীক্ষার খাতায় দিতে পারে। কিন্তু এ অবস্থায় হঠাৎ করেই বাঘটা নীরবতা ভেঙে বসে, 'তোমাদের বাড়ীতে আর কেউ নেই ?'

'আছে মানে, সবাই আছে ?'

'পরিচয় করিয়ে দেবে না ?'

'বাইরে একটু কাজে গেছে কি না, ফিরলে নিশ্চয়ই করিয়ে দেব। এখুনি হয়তো ফিরে আসবে। তা তোমার কে কে আছে, তাতো বললে না ?'

'মা আছে, বাবা আছে।'

'আসবার সময় তাদের বলে অসোনি ?'

'বলে আসবো কেন ?'

'মানে, মা-বাবার কথা মেনে চলতে হয় বলে।'

'আমার সঙ্গে ওদের কোন ভাব নেই।'

'কেন, কেন ?'

'ওরা বন ছেড়ে কোথাও যেতে চায় না বলে, আমাকে ওদের মত করে চলতে বলে,বলে।' বাঘটা এবার একটা হাই তোলে, 'তোমার মা-বাবা নিশ্চয়ই খুব ভালো ?'

'ভালো-মন্দ বুঝি না, তবে আমি যা করতে চাই, ভালো মনে করলে, তারা তাতে বাধ সাধে না।'

'আহা, আমার মা-বাবা যদি তোমার মা-বাবার মত হোত,' বাঘটার গলায় আক্ষেপের সুর।

টুকটাক করে আরো কিছুক্ষণ কথা বলার পর বাঘটা বার বার হাই তুলতে থাকে। বড্ড ক্লান্ত দেখায় তাকে। চোখ দু'টো প্রায় মুদে আসছে। ও বলে, 'তোমার বোধহয় ঘুম পাচ্ছে। ক্লান্ত বোধ করলে একটুখানি ঘুমিয়ে নিতে পারো।'

'না, ঘুমুলে চলবে না ভাই। আমাকে ঘুরেফিরে তোমাদের সবকিছু আবার দেখতে হবে কি না। তবে খাবার থাকলে একটুখানি দিতে পারো, যদি কোন রকম অসুবিধে না হয়।'

'না না অসুবিধে হতে যাবে কেন?'

'তা'হলে নিয়ে এসো। ক্ষিদেটা বেশ লেগেছে।'

'কিন্তু তুমি যখন আমার মেহমান, তোমাকে তো আর আমি যা-তা একটা কিছু খেতে দিতে পারি না।'

'তুমি অতোসব বাদ দাওতো। যা হয় একটা কিছু হলেই আমার চলে যাবে।'

ও আর কোন কথা বাড়াতে সাহস করে না। তাড়াতাড়ি ছুটে যায় রান্না ঘরে। মিটসেফের কাছে। মিটসেফ খুলতেই চোখে পড়ে রান্না করা মাংসের একটা পাতিল আর একটা প্লেটে রাখা খান কয়েক রুটি। সকালের নাস্তা সেরে বেঁচে যাওয়া।

তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে একটা প্লেটে চারখানা রুটি সাজায় ও। আর একটা চীনে মাটির বাটিতে তুলে নেয় আট দশখণ্ড মাংসের টুকরো। সেই সাথে ঝোল। ও জানে না, বাঘটা রুটি খাবে কি না, কিন্তু মাংস নিশ্চয়ই ওর সেরা খাদ্য।

রুটি আব মাংস নিয়ে পড়ার ঘরে ঢুকতেই দেখতে পায়, চেয়াবে হেলান দিয়ে বাঘটা নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। ও ডাকে, 'এই, এই যে ওঠো।'

বাঘটা বড় মত একটা হাই তুলে চোখ কচলে তাকায়। ও বলে, 'রুটি আর মাংস খেতে তোমার আপত্তি নেইতো?'

'আর অন্য কিছু নেই? মুখের ভাব তেতো করে ও এবার আরো একটা হাই তোলে। 'মাংস খেতে আর ভালো লাগে না। বলতে পারো ছেড়েই দিয়েছি।'

'বলো কি!' ও অবাক হয়। 'আমিতো জানি মাংস তোমাদের সবচেয়ে প্রিয় খাবার।'

'আমার মা বাবার কাছে অবশ্য এখনো মাংসই একমাত্র প্রিয় খাবার। কিন্তু আমি আর খাই না সে কাঁচাই হোক আর রান্না করাই হোক।'

ও মহামুশকিলে পড়ে। ওকে এলোপাতাড়ি প্রশ্ন করতে শুরু করে।

'তাহলে কি খাবে? পায়েশ, লুচি, ডালপুরী?'

'না, ওসব কিচ্ছু না।'

'জিলিপি, গরম গরম?'

'না।'

'সন্দেশ, রসগোল্লা?'

'না।'

'কালোজাম, দই, রসমালাই?'

'না।'

আমড়া, জাম্বুরা, কামরাঙ্গা, কাঁচা আম?'

'কাঁচা-পাকা ওসব কিচ্ছু না।'

'তাইলে বিস্কুট, চকলেট, টফি, চুয়িংগাম?

বললাম তো ওসব কিচ্ছু না।' বাঘটা এবার নড়েচড়ে বসে। বোঝা যায়, ওর মেজাজ খিচড়ে গেছে। একটুক্ষণ ওর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে আবার মুখ খোলে, 'পান্তা ভাত আছে ?'

'পান্তা ভাত !' ওর আবার অবাক হবার পালা।

'হ্যাঁ, পান্তা ভাত, কাঁচা মরিচ আর লবণ। থাকলে ঝটপট নিয়ে এসো। খেয়ে দেয়ে চলে যাই।'

ও আবার ছোটে রান্না-ঘরের দিকে। মিটসেফ খুলে আঁতিপাতি খুঁজতেই পেয়ে যায় একটা গামলা-ভর্তি পানি দেয়া ভাত। রাত্রের বেঁচে যাওয়া। ইতিউতি তাকাতেই মিটসেফের পাশে রাখা একটা ঝুড়িতে পেয়ে যায় গোটা কয়েক কাঁচা মরিচ আর পেঁয়াজ। সেই সাথে পানি ভাতে ঢেলে দ্যায় পরিমাণ মতো লবণ। তারপর ছুটে আসে ওর কাছে।

'কি, পান্তা ভাত পেলে ?'

'তোমার ভাগ্য ভালো। দ্যাখোতো, এতে তোমার চলবে কি না ?' বাঘের সামনে তুলে ধরে পান্তা ভর্তি গামলাটা। তাই দেখে মুহূর্তে ওর মুখটা খুশিতে লাল হযে ওঠে। ও হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই পান্তা ভর্তি গামলাটা চেটেপুটে বাঘটা শেষ করে ফেলে। তারপর মুখে তৃপ্তির হাসি টেনে বলে, 'অনেকদিন পরে খুব মজা করে খেলাম।'

'কিন্তু পেট ভরেছে তো ?' ও জিজ্ঞেস করে।

'ভরেনি মানে, আর কতো খাবো ? আমি কি রাক্ষস নাকি ?'

কথা বলতে বলতেই ও উঠে দাঁড়ায়, 'এবার আমাকে যেতে হবে ভাই ?'

'যাবে ?'

'হ্যাঁ, যেতেই হবে। দেরী করলে আবার অনেক কিছু দেখা হবে না কিনা। তোমাদের শহরটাতো আর কম বড় নয়। চলো, তুমি আমাকে একটু এগিয়ে দেবে।'

ও বাঘটার পেছন পেছন যেতে থাকে। দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসে ওরা। পথে নেমে দ্যাখে, ওদের গলিতে লোকজনের কোন চলাচল নেই। কিন্তু এমনটাতো হবার কথা নয়। একটু ভালো করে চোখ বুলোতেই দ্যাখে, আশ-পাশের বাড়ির দরজা-জানলাগুলোর ফাঁক-ফোঁকড়ে কিছু চোখের উপস্থিতি। কৌতূহলী চোখের দৃষ্টি ওর আর শান্তর দিকে। সেই সঙ্গে একটা হিম-শূন্যতা। তার মধ্য থেকেই কানে আসে চাপা ফিসফাস ও গুঞ্জনের শব্দ। শান্তকে ও কি বলবে বা কি বলতে পারে, ভেবে পায় না। বাঘটা বোধ হয় ওর অবস্থা আঁচ করতে পেরেই মুখ খোলে, 'তোমাদের গলিটার অবস্থা দেখেছো ?'

'দেখতে পাচ্ছিই।' ও বলে।

'সবাই কেমন ভীতু, তাই না ?'

'ব্যাপারটা স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক দু'টোই।

'কেন কেন ?'

'যেমন ধরো, তুমি আমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছো। ঘরের মধ্যেও ছিলে কিছুক্ষণ। তারপরও আমি অক্ষত অবস্থায় আছি, সেটা দেখেও তো ওরা ওদের ভয়টা দূর করতে পারে।'

শান্ত এবার হেসে বলে, 'আমাদের সম্পর্কে ওদের ভয়টা অনেক দিনের। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সেটা কাটবে কি করে ? না ভাই, কথা বাড়ালেই বাড়বে। আমি তা'হলে যাই এবার।

তোমার মা-বাবার সঙ্গে দেখা হোল না। বেশ খারাপ লাগছে। তুমি তাদেরকে আমার সালাম দিও ?'

ও ঘাড় নাড়ে, 'দেবো। তোমার সঙ্গে তা হলে আর দেখা হচ্ছে না ?'

'কেন হবে না ! তোমার কথা যখুনি মনে হবে, ধাঁ করে চলে আসবো। যাই।'

'যাও। কিন্তু সাবধানে। আমাদের শহরে চলাফেরার কোন অসুবিধে হলে তুমি আমার নাম করো।'

'ঠিক আছে, বিদায়', বাঘটা হাত নাড়ে।

'বিদায়', ওও হাত নাড়ে। দেখতে দেখতে শান্ত একটা গলির মোড়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।

সারাদিন আর পড়ায় মন বসে না। কিছুক্ষণের মধ্যেই আব্বু, মা-মনি আর বড় পা'রা ফিরে এলেন। তাঁদেরকে শান্তর কথা অর্থাৎ বাঘটার কথা বললো ও সবিস্তারে। কিন্তু তাঁরা কেউই ওর কথা বিশ্বাস করতে চাইলো না। উল্টে আরো দিলো ধমকে। এলো পাড়া-প্রতিবেশীরা। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চাইলো তারা, বাঘটা ওর সঙ্গে কি কি করেছে—তার বিস্তারিত বর্ণনা। সন্ধ্যা বেলা মামা এলেন। তিনিও সব ব্যাপার শুনে-টুনে ঘর ফাটানো হাসিতে ভেঙে পড়েন, 'বাঘের রচনা পড়তে গিয়ে তোর মাথাটাই শেষ পর্যন্ত বিগড়ে গেছে।'

ও এখন বিরক্ত। শান্ত সম্পর্কে ও আর কারো কাছে কিছু বলতে চায় না বা শুনতেও চায় না।

তারপর শুরু হলো পরীক্ষা। ইংরেজির প্রশ্নপত্রে সত্যি সত্যি 'দি টাইগার' রচনা এলো। কিন্তু বাঘ সম্পর্কে বইয়ে যা যা ও পড়েছে, তার একটা অক্ষরও ওর পরীক্ষার খাতায় লিখতে ইচ্ছে হোল না।

ও লিখলো, 'বাঘ অত্যন্ত নিরীহ-শান্ত জীব। কোন কোন বাঘের নামও রাখা হয় শান্ত। আর বাঘেরা মোটেই হিংস্র নয়। তাহাদের অনেকেই মাংস খাইতেও পছন্দ করে না। কেহ কেহ মরিচ দিয়া পান্তা ভাত খায়। অনেক বাঘ মানুষের সঙ্গে দেখা হইলে গুড মর্নিং বলিয়া করমর্দনের জন্য হাত বাড়াইয়া দেয় ... ।'





কাঁচ দৈত্য

সফিকুন নবী

সে এক দেশ। আর সেই দেশের পশ্চিমে এক বিরাট পাহাড়। লোকে সেই পাহাড়কে বলে কাঁচ পাহাড়। আর সেই কাঁচ পাহাড়ে বাস করে এক কাঁচ দৈত্য। কাঁচের তার হাত-পা, কাঁচের তার চোখ-মুখ, এক কথায় সারা দেহটাই তার কাঁচের তৈরী। কিন্তু কাঁচ হলে কি হবে—দেহটা তার একেবারে পাথরের মতো শক্ত।

এমনি সে কাঁচ দৈত্য, সে কিন্তু পশু খায় না, পক্ষী খায় না—খায় না মানুষও! কিন্তু হলে কি হবে। সে দৈত্য তো বটে। হাতে না মারলেও—মারে সবাইকে ভাতে!

যখনই তার ইচ্ছে হয়, কাঁচ পাহাড় থেকে নেমে আসে সেই দেশে। আর সেই দেশের সতেজ রসালো মাটিতে মুখ ডুবিয়ে শুঁষে খেয়ে যায় সব রসটুকু। তাই সেই দেশে হয় না চাষ, হয় না ফসল। বারো মাসই দেশে লেগে থাকে আকাল।

তাই লোকে আর কি করে? উপায়ান্তর না দেখে শেষে একদিন রাজার পায়ে গিয়ে আছড়ে পড়ে। কাঁদতে কাঁদতে বলে,

—রাজা মশায় আমরা সবাই যে জানে-মালে মরতে বসেছি। ঘরে দু'মুঠো চাল নেই যে খেয়ে বাঁচবো। ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলো, আমাদের চোখের সামনে শুকিয়ে মরছে না খেতে পেয়ে। কিন্তু কিছুই করতে পারছিনা আমরা। তাই উপায়ান্তর না দেখে ছুটে এসেছি আপনার কাছে। একটা কিছু উপায় যে আপনাকে করতেই হবে।

কিন্তু কে শুনবে তাদের আকুতি! রাজা ছিল যেমন আলসে আর তেমনি নিষ্কর্মা। সারা দিন বসে বসে খেলতো কেবল পাশা। সেদিনও রাজা তাই খেলছিল। সবে একটা এঁটে সেঁটে বেশ করে চাল দিতে যাচ্ছে, আর অমনি হুড়মুড় ক'রে ঢুকলো সেই লোকরা। আর তাদের গণ্ডগোলে রাজা গেলো ভুলে তার চাল। আর তাই রেগে হলো সে টং। রেগে মেগে প্রায় তেড়ে এসে চিৎকার ক'রে উঠলো,

—জাহান্নামে যা, যতো সব নচ্ছাড়ের দল। অমন সুন্দর চালটা আমার দিলো একেবারে পণ্ড ক'রে! দাঁড়া, সব ব্যাটাকে চড়াবো আজ শূলে। তোরা মরবি তো আমার কি? সাহস কতো যে আমার খেলা করিস পণ্ড!

রাজার এমন কথায় লোকরা তো একেবারে হতবাক। আশ্চর্য হয়ে তারা বল্লে,

—রাজা, আমাদের প্রাণের চাইতে তোমার খেলাটাই হলো বড়ো! বেশ তবে তুমি খেলো। দেখি এবার থেকে তোমার খাবার জোগায় কারা। তোমার সারা বছরের চাল ডাল তো জোগাতে হয় আমাদেরই। আমরাও দিলাম আজ থেকে সব বন্ধ ক'রে। ব'লে তারা সবাই ধীরে ধীরে গেলো চ'লে। আর রাজা আবার বসলো খেলতে। কোন চিন্তাই যেন নেই তার।

এদিকে সেই লোকদের মধ্যে ছিল, বিধবার একছেলে। যেমন ছিল সে চঞ্চল, তেমনি ছিল সাহসী আর তেমনি ছিল চালাক। নাম ছিল তার নিপু।

সেই নিপু, সব দেখে—সব শুনে ছুটে এলো মা'র কাছে। বললো,

—মা, আমি যাব সেই দৈত্য মারতে।

ওর এমন কথা শুনে মা তো অবাক। বলে,

—পাগল, তুই এতটুকু ছোট্ট ছেলে। অতবড়ো দৈত্য তুই মারতে পারিস?

কিন্তু নিপু নাছোড়বান্দা। সে যাবেই। তাই মা আর কি করে? চোখের পানি মুছে একদিন তাকে বিদায় দেয়। নিপুও তাড়াতাড়ি মা'র চোখের পানি মুছিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ে সেই কাঁচ পাহাড়ের উদ্দেশ্যে। আর কি জানি কি ভেবে সাথে নিলো পাকা বাঁশের একটা লাঠি আর এক ঘটি খাঁটি সরষের তেল।

তারপর নিয়ে-থুয়ে বেরিয়ে পড়লো পশ্চিমের পথে। সে চলছে—চলছে আর চলছে। পথ যেন আর শেষ হয় না। সে যতোই এগোয় পাহাড়টা যেন ততোই পেছিয়ে যায়। এমনি হাঁটতে হাঁটতে—হাঁটতে, শেষে সে এসে পৌঁছলো এক গহীন বনে।

চারিদিকে তখন নেমে এসেছে নিকষ আঁধার। এতো আঁধার যে নিজেকে পর্যন্ত দেখা যায় না। এমনি আঁধারে নিপু পথ ফেললো হারিয়ে। এ'দিক যায়—ও'দিক যায় কিন্তু পথ সে আর পায় না। তাই কি আর করে উপায় কিছু না করতে পেরে শেষে ভাবলো, রাতটা না হয় বনেই কাটানো যাক। ভোর হলে আলোয় পথ চিনে আবার রওয়ানা দেয়া যাবে 'খন।

এই ভেবে সে এদিক ওদিক থেকে কিছু ফলমূল, জোগাড় করে পেট ভরে খেয়ে নেয়। তারপর একটা বড়ো শক্তপোক্ত গাছ দেখে—তাতে চড়ে বসে। বলা তো যায়না কখোন কোন জন্তু জানোয়ার এসে হামলা করে।

রাত গড়িয়ে চল্লো। আর রাত যতো বাড়তে লাগলো, চারিদিক ততোই হতে লাগলো নিঃঝুম। শুধু থেকে থেকে পাখীর পাখা ঝাপটার শব্দ ভেসে আসে।

এমন সময় হঠাৎ একটা হিস্-হিস্ শব্দে সে একেবারে চমকে উঠে। সে সোজা হয়ে বসে এদিক ওদিক চায়। কিন্তু চোখে পড়েনা কিছু ই। ভাবে— বাতাসের শব্দ হবে হয়তো। কিন্তু না, শব্দটা যেন ওকে লক্ষ্য করেই এগিয়ে আসছে। সে ত্রস্তে গাছের ডালপাতাগুলো দেখে নিলো। কিন্তু কিছুইতো নড়েনা। এতো বাতাস নয়—নিশ্চয়ই অন্য কিছু! কিন্তু কি?

এমন সময় তার চোখে পড়লো দু'টো আগুনের পিণ্ড যেন এগিয়ে আসছে ও'র দিকে। ঠিক ও' যে ডালে বসেছিল সেই ডালটা বেয়ে বেয়ে—আর তাই থেকে বেরুচ্ছে অদ্ভুত একটা হিস্-হিস্ শব্দ।

সে স্থাণুর মতো বসে বসে কেবল দেখতেই লাগলো। নড়বার শক্তিও যেন নেই তার এতোটুকু। কিসের মন্ত্রবলে যেন সে তার জ্ঞানটুকুও হারিয়ে ফেলেছে।

হঠাৎ হিম-ঠাণ্ডা একটা নিঃশ্বাসের স্পর্শে সে চম্‌কে উঠলো। দেখলো—সেই আগুনের পিণ্ড



দুটো একেবারে ওর সামনে। তারপরই ও'র মনে হলো ঠাণ্ডা কি যেন একটা ও'কে আস্তে আস্তে চেপে ধরছে। আর বুঝি ও'র রক্ষা নেই। এবার সে বুঝতে পারছে। বুঝতে পারছে—ময়াল অজগরের হাত থেকে কেউ যেমন রক্ষা পায়না সেও পাবেনা। আস্তে আস্তে আরো জোরে যেন চেপে ধ'রছে অজগরটা। এতো জোরে যে, ও'র হাড়গুলো পর্যন্ত গুঁড়ো গুঁড়ো হ'য়ে যায় আর কি।

এমন সময় হঠাৎ ও'র মাথায় খেলে গেলো এক বুদ্ধি। অনেক কষ্টে কোন রকমে একটা হাত মুক্ত ক'রে, হঠাৎ তেলের ঘটিটা থেকে এক খাবলা তেল নিয়ে অজগরের জ্বলন্ত চোখ দু'টোয় দিলো ছিটিয়ে।

আর অমনি অজগরের চোখ উঠলো জ্বলে। দৃষ্টি হলো অন্ধ। তারপর চেপে ধরা বাঁধনটা আস্তে আস্তে হ'য়ে গেলো ঢিলে। আর সেই ফাঁকে নিপু তাড়াতাড়ি বাগিয়ে ধরলো তার লাঠিটা, ঠিক অজগরের মাথাটা লক্ষ্য ক'রে। অজগরতো এবার প্রাণের ভয়ে হাউ মাউ ক'রে উঠে বল্লো,

—আমাকে মেরো না ভাই আমাকে মেরো না! তোমাকে আমি দৈত্য মারার পথ ব'লে দিচ্ছি। দৈত্য মারার উপায়ও ক'রে দিচ্ছি। আমায় তুমি ছেড়ে দাও। আমায় তুমি মেরো না। আমি আর তোমার কোন ক্ষতি ক'রবো না।

নিপুর কেমন যেন মায়া হলো একটু—আহা বেচারা এমন ক'রে ব'লছে। কি হবে মেরে? ব'লছে যখন—কিছু আর ক্ষতি ক'রবেনা, তখন ছেড়েই দেয়া যাক।

ছাড়া পেয়ে অজগর তো মহা খুশী। খুশী হয়ে নিপুকে বল্লে,

—তুমি যখন আমার প্রাণ ফিরিয়ে দিলে, তখন আমিও তোমায় একটা উপহা'র দিলাম—এই নাও। ব'লে নিপুকে আশ্চর্য সুন্দর একটা তলোয়ার এগিয়ে দিলো।

নিপু তলোয়ারটা নিয়ে চোখের সামনে ধরতেই সেটা সেই আঁধারেও ঝক্‌ঝক্ ক'রে উঠলো। সে দেখলো তলোয়ারটা খাঁটি হীরের তৈরী। সে অদ্ভুত এই তলোয়ারটার দিকে আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে রইল।

ও'কে ওই ভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে অজগর আবার ব'লে উঠলো,

—এটা সাবধানে রেখো অনেক কাজে লাগবে। আর আরেকটা কথা, সকাল বেলায় এই গাছের তলায় দাঁড়িয়ে থাকবে এক পক্ষীরাজ। কথা না বলে সটান চড়ে বসবে তাতে। সে তোমায় পশ্চিমের কাঁচ পাহাড়ে পৌছে দেবে। তারপর তোমার কাজ হয়ে গেলে, পক্ষীরাজ আবার তোমায় তোমার দেশে রেখে আসবে। এই বলে অজগর আস্তে আস্তে আঁধারে গেলো মিলিয়ে। আর হতভম্ব নিপু হতবুদ্ধি হয়ে ঠায় রইল বসে।

এদিকে সময় চল্লো বয়ে। রাত প্রথম প্রহর থেকে দ্বিতীয় প্রহরে পড়লো, দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় প্রহরে তারপর তৃতীয় থেকে চতুর্থ প্রহরে যেই পড়েছে, অমনি হঠাৎ আকাশ ফাটানো একটা চিঁ—হি—হি—হি শব্দে নিপু একেবারে চমকে উঠলো।

সম্বিৎ পেয়ে ধড়মড় ক'রে উঠে ব'সতেই দেখে ঠিক তার নিচেই সুন্দর এক পক্ষীরাজ দাঁড়িয়ে। ব্যাপার বুঝতে কিছুমাত্র তার দেরী হলো না। অজগরের কথা মতো তাই সে সটান চ'ড়ে বসলো পক্ষীরাজের পিঠে। তলোয়ারটা বেশ করে গুঁজে নিল কোমরে আর তেলের ঘটি ও লাঠিটা হাতে নিল ঝুলিয়ে।

আর যেই না বসা, অমনি পক্ষীরাজ দিল ছুট্। সে কি আর যে-সে ছোটা? ঝড়-বিদ্যুৎকেও হার মানায়। শ' মাইল পথ যায় এক পলকে।

পক্ষীরাজতো ছুট্‌ছে-ছুট্‌ছে-ছুট্‌ছে। পথ যেন আর শেষ হয় না। অমনি ছুটতে ছুটতে কখোন যেন দিনের প্রথম প্রহর গড়িয়ে দ্বিতীয় প্রহর এলো, দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় প্রহর আর তৃতীয় থেকে চতুর্থ প্রহর যেই এলো, অমনি পক্ষীরাজ পড়লো দাঁড়িয়ে। আর নিপু দেখলো সেই কাঁচ পাহাড়টা আকাশ পর্যন্ত উঁচু হয়ে পথ আগলে রয়েছে দাঁড়িয়ে।

নিপু যখন এমনি চারদিকে দেখছে, পক্ষীরাজটা তাকে কিছু বুঝতে না দিয়ে—তাকে কোন মতে পিঠ থেকে নামিয়েই হাওয়ায় গেলো মিশে।

কি আর করা—ভেবে, নিপু চারিদিকে একবার ভাল ক'রে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বসে পড়লো সেখানেই।

অমনিতেই সে ক্লান্ত শ্রান্ত তার ওপর কাঁচ পাহাড়ে পড়ন্ত সূর্যের রোদ প'ড়ে ঠিকরে বেরুচ্ছে আলোর ছটা। আর সে ছটা এতো প্রখর যে চোখ খুলে রাখাই দায়। তাই একসময় নিপুর চোখ জোড়া এল বুঁজে। আর অমনি পড়লো সে ঘুমিয়ে। সে ঘুম কি আর যে-সে ঘুম। সাত রাজ্যের রাজার মতো নাক ডেকে ঘুম। নাক ডাকছে সে ঘড় ঘড়, ঘড় ঘড়। আর সেই ঘড় ঘড় শব্দ কাঁচ পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে হয়ে উঠছে যেন সিংহের গর্জন।

কতক্ষণ যে সে এমনি ঘুমিয়েছে কে জানে। হঠাৎ একটা বিকট হুংকারে বন্ধ হয়ে গেলো তার নাক ডাকা। ঘুম গেলো তার ভেঙ্গে। চেয়ে দেখে ভোর তখনও হয়নি। চারিদিকে আবছা আঁধার। কাঁচ পাহাড়ের ঠিকরে পড়া চোখ ঝলসানো ছটাও আর নেই। কিন্তু হঠাৎ আঁতকে উঠে তড়াক করে প্রায় লাফিয়ে উঠলো নিপু। ঠিক তার পেছনেই, প্রায় ঘাড় ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সেই কাঁচ দৈত্য।

কি সাংঘাতিক কিম্ভূতকিমাকার তার দেহ। কাঁচের চোখ দুটো কেমন অদ্ভুত আর স্থির—একটু এদিক ওদিক নড়ে না, একটা পলক পর্যন্ত পড়ে না। কাঁচের জিহ্বাটা কি সাংঘাতিক লক্লকে। কাঁচের হাত দুটো যেন আস্তো ইস্পাতের সাঁড়াশী।

কিন্তু ও'র আর ভাবা হলনা। সেই কাঁচ দৈত্য এবার হুংকার ছাড়লো মেঘের গর্জনে,

—কোন হতভাগারে তুই? অসময়ে নাক ডেকে, কাঁচা ঘুমটা আমার দিলি নষ্ট করে? বুকের পাটা তো তোর কম নয় দেখছি? মানুষ হয়ে আসিস দৈত্যেব ঘুম ভাঙ্গাতে। সাত রাজ্য যার ভয়ে থরহরি কম্প, আর তুই ক্ষুদে পুঁচকে একটা মানুষ—তারই ঘুম দিলি পণ্ড করে? দাঁড়া দেখাচ্ছি এবার মজাটা। পাট খড়ির মতো মট্মট্ করে ভাঙ্গবো তোর হাড়গুলো। নেহাত আমি মানুষ-টানুষ খাইনা, নইলে ঘাড়টি মটকে খেতাম রক্তটুকু শুষে। বলে দৈত্য দুটো আঙ্গুল দিয়ে, নিপুকে ধরলো চেপে।

ওই দুটো মাত্র আঙ্গুলের চাপেই নিপুর দু' চোখে ফুটে উঠলো যেন সাত আকাশের তারা। দম এলো প্রায় বন্ধ হয়ে।

কিন্তু এতোদূর এসে এতো সহজেই কি সে হার মানবে? না—অসম্ভব! মরতে যদি হয় হাত-পা নেড়েই মরবে। এই-না ভেবে, হঠাৎ সে একটা ঝট্কা মেরে ও'র হাত থেকে ছিট্কে এলো বেরিয়ে। আর সঙ্গে সঙ্গে তার মাথায় খেলে গেলো এক বুদ্ধি। সে করলো কি—ঘটি ভর্তি সেই তেল আচ্ছা করে গায়ে নিলো মেখে। তাতে তার গা হলো পুরোনো ঘাটের শ্যাওলার মতো পিচ্ছিল। এবার দৈত্য ও'কে যতোই বাগিয়ে যায় ধরতে আর অমনি সুরুৎ করে পিছলে পড়ে সে বেরিয়ে।

এমনি যতো বারই দৈত্য তাকে ধরে তত-বারই সে পিছলে ও'র হাত থেকে বেরিয়ে পড়ে। এমনি করতে করতে সে একবার করলো কি? তার সেই পাকা বাঁশের লাঠিটা বেশ শক্ত করে ধরে শরীরের সবটুকু শক্তি দিয়ে মারলো এক ঘা। কিন্তু দৈত্যের অত শক্ত কাঁচের দেহটা। এত তাড়াতাড়ি ভাঙবে কেন? ঘা-এর চোটে লাঠিটাই গেলো ভেঙ্গে। আর সেটা ছড়িয়ে পড়লো চারিদিকে টুকরো টুকরো হয়ে। কাণ্ড দেখে দৈত্য লাগলো হো-হো ক'রে হাসতে। তার সেই হাসির দমকে মাটি শুদ্ধো উঠলো কেঁপে। তারপর দৈত্যটা আবার আসতে লাগলো এগিয়ে।

এদিকে নিপুর গায়ের তেলও ততক্ষণে প্রায় শুকিয়ে এসেছে। গা' আর তেমন পিছল হ'য়ে

নেই। সে এবার পড়লো মহা ভাবনায়। এখন উপায় ···· এখন উপায় ?

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ আনন্দে সে প্রায় লাফিয়ে উঠলো। হ্যাঁ উপায় একটা আছে। অজগরের দেয়া সেই তলোয়ার। কি আশ্চর্য! ওটার কথা সে একেবারে ভুলেই গিয়েছিল ? অথচ ওটাই কাঁচ দৈত্যের জন্য মোক্ষম অস্ত্র। হীরে দিয়েই কাঁচ কাটে—তাহলে ওই কাঁচ দৈত্যের কাঁচ দেহটা হীরের তলোয়ারে নিশ্চয়ই কেটে দু'ফাঁক হয়ে যাবে!

যা ভাবা, সেই কাজ। দৈত্যটা ছুটে আসতেই, তলোয়ারটা কোমর থেকে একটানে বের করে চোখ দুটো বন্ধ করে মারলে এক কোপ। আর সেই কোপ লাগলো ঠিক দৈত্যটার পেটে।

সে যা ভেবেছিল ফলও হলো তাই। দৈত্যটার পেট কেটে হয়ে গেলো দু'ফাঁক। আর তার পর পরই পেট চেপে ধরে দৈত্য উল্টে পড়লো মাটিতে। আর মাটিতে পড়তেই বিকট ঝন্-ঝন্ শব্দ তুলে একশো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়লো তার দেহটা। তারপরই আরেকটা বিকট শব্দে কাঁচ পাহাড়টাও ভেঙ্গে পড়লো গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে। তারপর একসময় সেগুলো গেলো মাটির সাথে মিশে।

এতো তাড়াতাড়ি যে এতোগুলো কাণ্ড হয়ে যাবে তা নিপু ভাবতেই পারেনি। তাই সে সমস্ত কাণ্ড দেখে একেবারে 'থ' হয়ে গেল।

এমনি সে কতক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল খেয়াল নেই। হঠাৎ একটা পরিচিত চিঁ—হি-হি-হি শব্দে চমকে চোখ তুলে চাইতেই দেখে সেই পক্ষীরাজটা দাঁড়িয়ে ঠিক তার সামনেই। তার মনে পড়ে গেল অজগরের কথা। আর মনে হতেই তাড়াতাড়ি সে চেপে বসলো পক্ষীরাজের পিঠে। আর দেখতে না দেখতে পক্ষীরাজ দিল ছুট।

দেশে ফিরে তো নিপু অবাক! যেখানে সে দেখে গিয়েছিল ধূধু মাঠ, সেখানে আজ সবুজের বন্যা। যেখানে সে দেখে গিয়েছিল কান্নার রোল, আজ সেখানে বসেছে হাসির হাট।

নিপু যখন এমন ভাবতে ভাবতে এগোচ্ছিলো, তখন সারা দেশের লোক এসে ধ'রলো তাকে ঘিরে। সে সবাইকে জিজ্ঞেস ক'রলো,

—রাজা কই ?

সবাই বল্লো,

—না খেতে পেয়ে মরেছে।

সে বল্লো,

—রাজপ্রাসাদ কই ?

সবাই বল্লো,

ধুলোয় গেছে মিশে

সে বল্লো,

—আর তোমাদের কোন অভাব আছে ?

সবাই বল্লো,

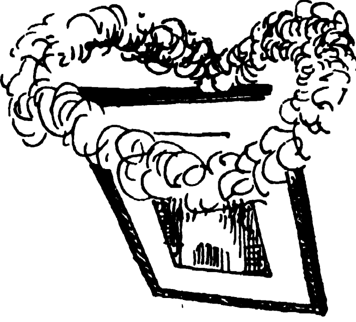
—না না না।

সে বল্লো,

—আর তোমাদের কোন দুঃখ আছে ?

সবাই বল্লো,

—না না না।



একাত্তরের যীশু

শাহরিয়ার কবির

দক্ষিণের শহর আর গ্রামগুলো পোড়াতে পোড়াতে পাঞ্জাবী সৈন্যরা ধীরে ধীরে উত্তর দিকে এগিয়ে আসছিলো। খবরটা শুনে মে মাসের প্রথম থেকেই গ্রামের লোক আরো উত্তরে শালবনের দিকে সরে যেতে লাগলো। অনেকে সীমান্ত পেরিয়ে কুচবিহার আর পশ্চিম দিনাজপুরে চলে গেলো।

সীমান্ত বেশি দূরে নয়। অনেকে ওপারে গিয়েও নিয়মিত যাওয়া আসা করছিলো। জুনের মাঝামাঝি যখন সবাই নদীর ওপারের ছোট্ট শহরটিকে দাউ দাউ করে জ্বলতে দেখলো, তখন যাবা যাবার তারা একেবারেই চলে গেলো। থেকে গেলো জামাত, মুসলীম লীগের কিছু দালাল আর কয়েকজন বুড়ো। গির্জার ঘণ্টা টানতো বুড়ো ডেসমন ডি রোজারিও। সে ছিলো থেকে যাওয়া বুড়োদের একজন।

এতোদিন ফাদার মার্টিন ছিলেন গির্জায়। যশোরে পাঞ্জাবীরা মিশনারীদের মেরেছে—এই খবর শুনে তিনিও কিছুদিন আগে শহরে চলে গেছেন। বুড়ো ডেসমনকে ডেকে বলেছিলেন, 'উহারা মিশনারীদিগকেও হত্যা করিতেছে। আমি শহরে যাইতেছি। তুমি বিপদ দেখিলে ইণ্ডিয়া চলিয়া যাইও। ইণ্ডিয়ার মানুষ আমাদের অসহায় মানুষদিগকে আশ্রয় দিয়াছে। ঈশ্বর উহাদের মঙ্গল করিবেন।' এই বলে ফাদার বুকে ক্রস এঁকেছিলেন।

বুড়ো ডেসমন মাথা নিচু করে পায়ের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে মাটিতে দাগ কাটতে কাটতে জবাব দিয়েছিলো 'মুই আর কুণ্ঠে যাবেক ফাদার।'

অনেক ভেবেছিলো ডেসমন বুড়ো। আসলে সে যাবেইবা কোথায়! তার স্বজাতি সাঁওতালরা যখন যেখানে খুশি অনায়াসে চলে যেতে পারে। ওদের রক্তের সকল অণুতে মহুয়ার মতো মিশে আছে যাযাবরের নেশা। কিন্তু ডেসমনের সেই নেশা কেটে গেছে বহু বছর আগে।

গ্রামে যখন এই গির্জা প্রথম প্রতিষ্ঠিত হলো, ডেসমন তখন বারো বছরের বালক। পাদ্রী

ছিলেন ফাদার নিকোলাস। তিনিই ডেসমনকে দীক্ষা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—'প্রভুর স্থান ছাড়িয়া কোথাও যাইওনা। প্রভু তোমাকে রক্ষা করিবেন।'

সেই থেকে ডেসমন এই গির্জায় পড়ে আছে। গির্জার পাশে সবুজ ঘাসের আঙিনা। দেয়ালের ওপাশে সারি সারি কবর। সবুজ আঙিনা আর কবরের মাঝে উঁচু পাঁচিল। পাঁচিলের গায়ে লাগানো ছোট্ট দু'টো ঘর। ছাদটা লাল টালির। দেয়ালগুলো সাদা চুনকাম করা। এই ঘর দু'টো ডেসমনের। সারাদিন ডেসমন এখানেই থাকে, আর গির্জার ঘণ্টা বাজায়। ওর মনে হয় পৃথিবীর সবচেয়ে পবিত্র কাজের দায়িত্ব প্রভু ওকেই দিয়েছেন।

আগে ডেসমন সকালে গির্জার বাগানে কাজ করতো। গির্জার ভেতরের ঝাড়ামোছাগুলো শেষ করে রাখতো। বিকেলে ছোট্ট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলতো। প্রভু ছোটদের ভালোবাসতেন। বহুদিন বাইবেল থেকে ফাদাররা পড়ে শুনিয়েছেন, "যীশু কহিলেন, শিশুদিগকে আমার নিকট আসিতে দাও। বারণ করিও না। কারণ স্বর্গরাজ্য এইমত লোকদেরই।"

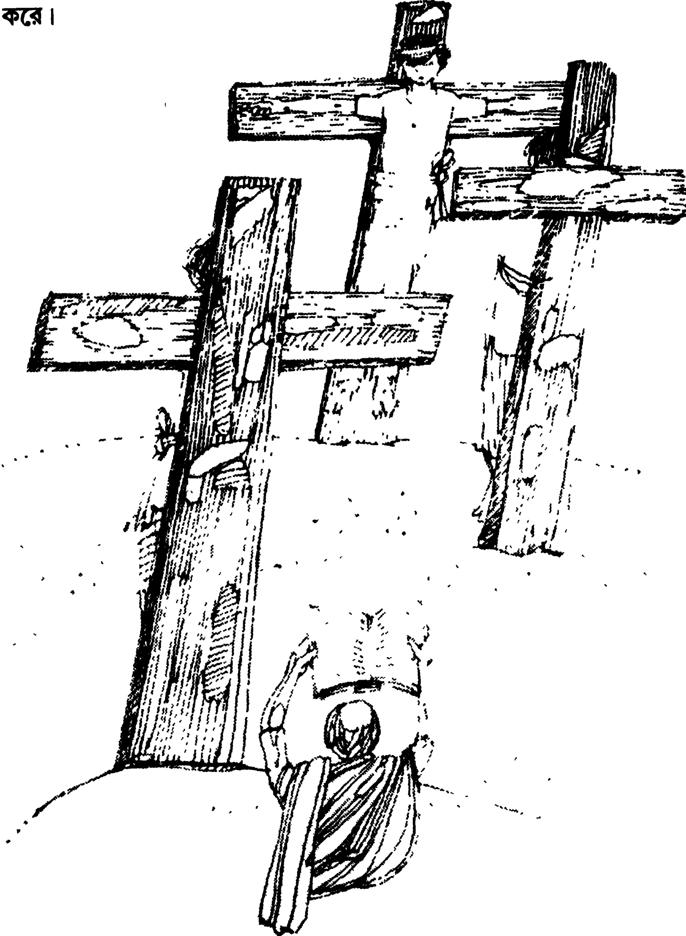
প্রায় জনশূন্য গ্রামগুলোতে মানুষের সাড়াশব্দ একেবারেই নেই। দু'একজন বুড়ো , যারা এখনো গ্রামে আছে, তারা ছোটদের মতো সারা গ্রাম মাতিয়ে রাখতে পারে না। বুড়ো ডেসমনের বুকে শুধু যন্ত্রণার ঢেউ উত্তাল হয়। নিবির দাদু, হরিপদর খুড়ো যখন এসে শহরে শত্রু সৈন্যদের অত্যাচারের কথা বলে, ডেসমন তখন বুকে জমে থাকা কান্না থামিয়ে রাখতে পারে না।

সারা জুলাই মাসটা বুড়ো ডেসমন একা একা কাটালো। বাগানের কাজে আগের মতো উৎসাহ পেতো না। তবু সকালটা গির্জার কাজে ব্যস্ত থাকতো। বিকেলগুলো ওর কাছে ভয়াবহ মনে হতো। গ্রামের সেই উচ্ছল ঝর্ণার মতো ছেলেমেয়েগুলো কোন এক শয়তানের যাদুবলে কোথায় কিভাবে যে হারিয়ে গেলো—ডেসমন যতো ভাবে ততো তার বুকে দুঃখের পাহাড় জমে। গির্জার প্রাঙ্গণে কতগুলো শিরিষ গাছ ছিলো। অন্য সময়ে গাছগুলোতে রঙবেরঙের পাখির মেলা বসতো। এখন পাখিরা আর শিরিষের ডালে গান গেয়ে ছুটোছুটি করে না। আঙ্গিনার সবুজ ঘাসের কার্পেটে প্রজাপতিরা নানা রঙের নকশা আঁকে না। শিরিষের পাতা গলিয়ে বিকেলের মরা রোদ গির্জার গায়ে জড়িয়ে থাকে। বিশাল এক শূন্যতা সারা গ্রাম জুড়ে হা হা করে কাঁদতে থাকে। বাতাসকে মনে হয় কোন ডাইনীর অভিশাপের নিঃশ্বাস। যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে বুড়ো ডেসমন শুধু ছটফট করে। ভাবে ঈশ্বর কেন ওকে এই নরকে ঠেলে দিলেন!

যখন সময়গুলো একেবারেই অসহ্য হয়ে ওঠে, তখন ডেসমন জানালার তাকের ওপর থেকে, ফাদার গাঙ্গুলীর দেয়া 'মথি লিখিত সু-সমাচার' খানা নামিয়ে আনে। ভালো মতো পড়তে পারে না ডেসমন। চোখে ঝাপসা দেখে। তবু কোন রকমে বানান করে জোরে জোরে পড়ে—"ইতিমধ্যে পিতর বাহিরের প্রাঙ্গণে বসিয়াছিলেন। আর একজন দাসী তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিল, তুমিও সেই গালীলীয় যীশুর সঙ্গে ছিলে? কিন্তু তিনি সকলের সাক্ষাতে অস্বীকার করিয়া কহিলেন, তুমি কি বলিতেছ আমি বুঝিতে পারিলাম না। তিনি ফটকের নিকট গেলে আরেক দাসী তাঁহাকে দেখিয়া সেস্থানের লোকদিগকে কহিল, এ ব্যক্তি সেই নাযারথীর যীশুর সঙ্গে ছিল। তিনি আবার অস্বীকার করিলেন, দিব্য করিয়া কহিলেন, আমি সে ব্যক্তিকে চিনিনা। আর অল্পক্ষণ পরে যাহারা নিকট দাঁড়াইয়াছিল তাহারা আসিয়া পিতরকে কহিল, সত্যিই তুমি তাহাদের একজন। কেননা তোমার ভাষা তোমার পরিচয় দিতেছে। তখন তিনি অভিশাপপূর্বক শপথ করিয়া বলিতে লাগিলেন আমি সে ব্যক্তিকে চিনিনা। তখনই কুকুড়া ডাকিয়া উঠিল। তাহাতে যীশু এই যে কথা বলিয়াছিলেন, 'কুকুড়া ডাকিবার পূর্বে তুমি তিনবার

আমাকে অস্বীকার করিবে,' তাহা পিতরের মনে পড়িল। এবং তিনি বাহিরে গিয়া অত্যন্ত রোদন করিলেন।"

ডেসমন যতোবার বাইবেল পড়ে যীশুখৃষ্টের ক্রসবিদ্ধ হবার ঘটনার কথা ভাবে ততোবার ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলে। তবু সে জোরে জোরে বাইবেল পড়ে। ওর মনে হতো বাইবেলের পবিত্র শব্দগুলো, শয়তানের মতো ভয়ঙ্কর নীরবতাকে তাড়া করে ফিরছে। গির্জার প্রাঙ্গণে অন্ধকার নামা পর্যন্ত ডেসমন বাইবেল পড়ে। নীরবতাকে ডেসমন ভয় করে একই সঙ্গে ঘৃণাও করে।



আগস্টের শেষে এক বৃষ্টিভেজা রাতে ওরা কয়েকজন এলো বুড়ো ডেসমনের ঘরে। হারিকেনের ম্লান আলোয় ডেসমন তখন গির্জার আইকন পরিষ্কার করছিলো। দরজায় হালকা পায়ের শব্দ শুনে চোখ তুলে তাকালো। দেখলো তিনটি ছেলে, বৃষ্টিতে ভেজা সারা শরীর, চুলের ডগা বেয়ে মুক্তোর দানার মতো জল গড়িয়ে পড়ছে। ওদের উজ্জ্বল চোখগুলো হারিকেনের ম্লান আলোতেও চকচক করছিলো। কিছুক্ষণ ওদের দিকে তাকিয়ে থাকার পর ডেসমনের মনে হলো, ওরা যেন তিনজন দেবদূত, স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে। তারপর সে এতো

বেশি অভিভূত হয়ে গেলো যে, আর কোন কথাই বলতে পারলো না।

ওরা তিনজন একে অপরের মুখের দিকে তাকালো। একজন একটু হেসে বললো, 'আমরা আজ রাতে তোমার এখানে থাকবো ডেসমন দাদু।'

আরেকজন বললো, 'তোমাদের গাঁয়ের দাশু খুড়ো বলেছে, তুমি খুব ভালো লোক।'

স্বর্গের দেবদূত ওর কাছে এসেছে, ওর ঘরে থাকতে চাইছে—ডেসমন কি বলবে সহসা কিছুই ভেবে পেলো না। তারপর এলোমেলো ভাবে বললো, 'হায় হায়, থাকতি কেনে দিবেক নেই। তোমাদের কষ্ট হতিছে বাছা। আগুনের ধারে বস। সব ভিজ্যে গেছে।'

হাতের ব্যাগটা একপাশে নামিয়ে রেখে ওরা ছোট্ট উনুনটির পাশে গিয়ে বসলো। বললো, 'দাশু খুড়ো তোমার কথা অনেক বলেছে ডেসমন দাদু। বলেছে তুমিই আমাদের সাহায্য করতে পারো। তোমার মতো ভালো লোক এ গাঁয়ে আর নেই।'

বিরাশী বছরের বুড়ো ডেসমন লজ্জায় লাল হলো। স্বর্গের দেবদূত ওকে একি কথা শোনাচ্ছে! মাথা নেড়ে বললো, 'না না, সেটি ঠিক বুলে নাই। সাহাইয্য লিচ্চযই করিব। ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করিবেন।'

অনেক রাত অবধি বুড়ো ডেসমনের সঙ্গে ওদের কথা হলো। ডেসমনের মনে হলো, দেবদূতরা ওর জন্যে স্বর্গের বাণী বয়ে এনেছে। ওরা জানে, শিরিষ গাছে পাখিরা কেন গান গায় না, ঘাসফুলের প্রজাপতিরা কেন আর আসে না, পৃথিবীর সমস্ত আনন্দের শব্দ আর রঙ কোথায় হারিয়ে গেছে। ওরা আনন্দের হারিয়ে যাওয়া শব্দকে ফিরিয়ে আনবে। শয়তানের বিষাক্ত যন্ত্রণার ছায়া পৃথিবীর বুক থেকে মুছে দেবে। শিরিষের ডালে আবার পাখিরা গান গাইবে। মুগ্ধ হয়ে ডেসমন ওদের কথা শোনে। ওর ঘোলাটে চোখে আনন্দ নেচে বেড়ায়। বার বার বলে, 'ঈশ্বর তুমাদের মঙ্গল করিবেন।'

স্বর্গের দেবদূত হাসতে হাসতে ডেসমনকে বলে, 'তোমাকে আমরা শিখিয়ে দেবো কি করে গ্রেনেড মারতে হয়, আর রাইফেল চালাতে হয়।'

আনন্দে উত্তেজনায় ডেসমন শুধু বলে, 'লিচ্চয়ই, লিচ্চয়ই'।

এরপর দিনগুলো যে কিভাবে কাটলো ডেসমন বুড়ো আর হিসেব রাখতে পারলো না। স্বচ্ছ সরোবর হাঁসের মতো তরতর করে সময় বয়ে যেতে লাগলো। সকালে লাঠিতে ভর দিয়ে ডেসমন নদীর তীর অবধি চলে যায়। কোনদিন আবার একেবারে শহরে ঘুরে ঘুরে সব দেখে আসে। পাহারারত পাঞ্জাবী সৈন্যরা কেউ ওকে উপেক্ষা করে, কেউ রসিকতা করে। রাতে দেবদূতের দল আসে ওর কাছে। সারা ঘর আলো হয়ে যায়। ডেসমনের কানে গির্জার প্রার্থনা সঙ্গীত বাজতে থাকে। ওদের সঙ্গে ওর কথা হয়। তারপর গভীর রাতে ওরা চলে যায়। দূরে শহরে বিস্ফোরণের শব্দ হয়। মেশিনগান গর্জন করে, আবার কোথাও গ্রেনেড ফাটে। ডেসমনের চোখে আর ঘুম নামে না। শেষ রাতে ওরা এসে বলে, 'আমরা যাচ্ছি। ভালো থেকো ডেসমন দাদু। আবার দেখা হবে।'

ওরা চলে যাবার পর আবার শয়তানের মতো কদাকার সেই নীরবতা ডেসমনকে গলা টিপে মেরে ফেলতে চায়। লাঠিতে ভর দিয়ে ডেসমন গ্রামের ভেতরে যায়। তালা বন্ধ ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ডাকে, 'হরিপদর খুড়ো ঘরে আছে? ও হরিপদর খুড়ো?' কেউ কোন সাড়া দেয় না।

আরেকটা শেকল তোলা দরজার সামনে গিয়ে ডেসমন ডাকে, 'নিবির দাদু? ও নিবির দাদু?'

উঠোনের কোণ থেকে হাড় বের করা একটা লোমঝরা কুকুর শুধু একবার মাথা তুলে

ডেসমনকে দেখে। গ্রামের সবাই চলে গেছে। ভীষণ ভয় পায় ডেসমন। লাঠিতে ভর দিয়ে কাঁপা কাঁপা পায়ে আবার গির্জায় ফিরে আসে। অসময়ে গির্জার ঘণ্টা বাজায়। ডেসমনের মনে হয়, শব্দের অভাবে ও বুঝি পাগল হয়ে যাবে।

অবশেষে একদিন সেই ভয়ঙ্কর সময়ের মুখোমুখি হলো ডেসমন বুড়ো। শেষ রাতে বিস্ফোরণের শব্দ শুনে ও গভীর আনন্দে ঘুমিয়েছিলো। তখন আকাশের অন্ধকার সবেমাত্র ফ্যাকাশে হতে সুরু করেছে—গির্জার বড় ফটকের বাইরে শব্দ শুনে ওর ঘুম ভেঙ্গে গেলো। কিছু উত্তেজিত আর ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর—কথা বোঝা যাচ্ছে না।

লাঠি হাতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো ডেসমন। ততোক্ষণে ফটকে করাঘাত পড়েছে। ভারি ফটকটা ধীরে ধীরে খুলে বাইরে তাকিয়ে যা দেখলো তাতে ওর সমস্ত শরীর পাথরের মতো জমে গেলো। কয়েকজন হিংস্র মানুষ ওদের ঘিরে পাশবিক উল্লাসে ফেটে পড়েছে। ওরা তিনজন, স্বর্গের সেই দেবদূত—হাতগুলো বাঁধা, সারা শরীরে ধুলো আর রক্তের দাগ নিয়ে একদল ভয়াল নেকড়ের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলো।

একজন নেকড়ে ধারালো গলায় বললো, 'এই বুড়ো, এগুলোকে চিনিস ? তোদের গির্জার পাশে ঘুরছিলো।'

ডেসমন আবার দেখলো ওর প্রিয় দেবদূতদের। যারা ওর জন্যে স্বর্গের বাণী বয়ে আনতো। ডেসমন অবাক হয়ে চেয়ে দেখলো, ওদের চোখে এখনো স্বর্গের আলো খেলা করছে। বিড় বিড় করে বললো 'ওরা স্বর্গের দেবদূত।'

নেকড়েরা আবার গর্জন করে উঠলো, 'কিরে কথা বলছিস না কেন ? আগে কখনো দেখিসনি এগুলোকে ?'

ডেসমনের গলাটা কেঁপে গেলো। বললো 'না'। তারপর লাঠিতে ভর দিয়ে ঝুঁকে ঝুঁকে হেঁটে ওর ঘরে চলে গেলো। পবিত্র বাইবেলে মুখ গুঁজে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বার বার বললো,'না, প্রভু না—'

বাইবেলের ভেতর থেকে ক্রসবিদ্ধ যীশুর অন্তিম বাণী শুনতে পেলো ডেসমন। প্রভু ক্রসের উপর থেকে বলছেন, "ঈশ্বর, আমার ঈশ্বর ! তুমি কি আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছ ?" এতটুকু শব্দ না করে ডেসমন অঝোরে কাঁদতে লাগলো।

বেশীক্ষণ ঘরে থাকতে পারলো না ডেসমন বুড়ো। বাইরের কোলাহল আরও কাছে মনে হলো। তাকিয়ে দেখলো নেকড়ের দল পাঁচিলের ধারে পড়ে থাকা কবরের কাঠগুলো নিয়ে ছুটোছুটি করে কি যেন বানাচ্ছে।

ঘর থেকে বেরিয়ে এলো ডেসমন। সহসা ওর বুকের ভেতরটা কে যেন এক অদৃশ্য মেসিনগানের গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিলো। একি করছে ওরা ? ডেসমন দেখলো অল্প সময়ের মধ্যে শয়তানের দল তিনটি ক্রস বানিয়ে উঁচু ঢিবিটার ওপর পুঁতে দিয়েছে। আর তিনজন দেবদূত—হায় ঈশ্বর—ছুটে যেতে গিয়ে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো ডেসমন।

তিনজন দেবদূত এতটুকু শব্দ করেনি। ওদের মুখে শুধু যন্ত্রণার নীল ছায়া গাঢ় হলো। ডেসমন মাটি থেকে মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকালো। আকাশের ঘন কালো মেঘের গায়ে তিনটি বিশাল ক্রস। গির্জার প্রাঙ্গণে যীশুখৃষ্টের ক্রসবিদ্ধ মূর্তি দেখেই শয়তানের দল এই নির্মম মৃত্যুর কথা ভেবেছিলো।

তিনজন মুক্তিযোদ্ধা, যারা গতরাতেও শত্রুর শিবিরে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে, সকালে তারা

তিনজন যীশুখৃষ্ট হয়ে গেছে।

ডেসমন্ড মেঘের গায়ে ক্রসবিদ্ধ যীশুকে দেখতে পেলো। ঠিক এই রকম ক্রসের উপর থেকেই তিনি বলেছিলেন, "এলী এলী লামা শবক্তানী। ঈশ্বর আমার ঈশ্বর" ....।

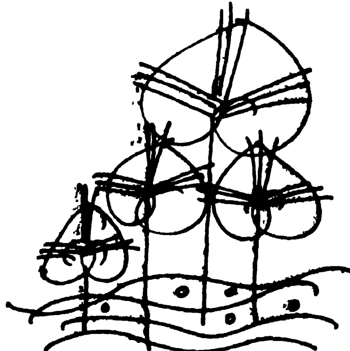
নেকড়ের দল হল্লা করে বেরিয়ে গেলো। ডেসমন দেখলো কি যেন বিড় বিড় করে বলছে ওরা। হাত থেকে রক্ত ঝরছে। সারা শরীর বেয়ে রক্তের ধারা নেমে এসেছে। মাথা একপাশে কাত হয়ে ঝুলে পড়েছে। ডেসমন ছুটে গেলো ক্রসের নিচে। আবার মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো। তবু সে শুনতে পেলো। একবার, দুবার, তিনবার। পরপর তিনবার শুনলো সেই কথা। ডেসমনের বুকের ভেতর গেঁথে গেলো—'স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা।' আর ঠিক সেই সময় আকাশ আর মাটি কাঁপিয়ে প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়লো।

তিনদিন পর বুড়ো ডেসমন ঘরে বসে গুন গুন করে বাইবেল থেকে যীশুর পুনরুত্থানের অধ্যায় পড়ছিলো। দরজায় পায়ের শব্দ শুনে চমকে তাকালো। দেখলো তিনজন দেবদূত। হাসি মুখ, উজ্জ্বল চোখ, মুক্তোর মত ঘাম। আগের মতো তিনজন মুক্তিযোদ্ধা।

ডেসমনের চোখের সামনে তখন মথি লিখিত সু-সমাচারের শেষ কথাটা নেচে বেড়াতে লাগলো—"আর দেখ, আমিই যুগান্ত পর্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি।"—শব্দগুলো ধীরে ধীরে লক্ষ লক্ষ ক্রসবিদ্ধ যীশুখৃষ্ট হয়ে গেলো।

ওদের একজন একটু হেসে বললো, 'আমরা এসেছি।'

বুড়ো ডেসমন কয়েক লক্ষ যীশুখৃষ্ট দেখতে দেখতে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললো।





লতা পাহাড়পুরের কাশু

আলী ইমাম

কাঁচের শার্সি দিয়ে আলতো করে রোদ নেমে আসে। শীতের সকালে এই রোদে পিঠ দিয়ে বসে থাকতে ভালো লাগে। হুইল চেয়ারটিকে হাত দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে বারান্দায় নিয়ে আসে কাশু। মিরপুরের রাস্তা দিয়ে তীব্র বেগে বাসগুলো ছুটে যাচ্ছে। বাগানের ফুল গাছগুলো অযত্নে শুকিয়ে যায়। সারারাতের কুয়াশায় ভিজে থাকা সবুজ ঘাসের উপর ছুটোছুটি করে একটি কি দু'টি চড়ুই। কয়েকটা পাতিকাক 'পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন কেন্দ্র' লেখা সাইন বোর্ডের উপর বসে ডাকতে থাকে। কাশুর মনে হয় এক্ষুনি বুঝি পাকঘর থেকে মা বেরিয়ে এসে ঢিল ছুঁড়বে। পাতিকাকের ডাক মা একদম সহ্য করতে পারে না।

হুইল চেয়ারটাকে গড়িয়ে সামনের দিকে নিয়ে যায় কাশু। মেঝেতে একটি পত্রিকা পড়ে আছে। বিজয় দিবস সংখ্যা। ভেতরের পাতায় কালো বর্ডার দিয়ে রকিব মাস্টারের ছবি। নিচে বড় বড় টাইপে লেখা 'এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা আনলো যারা ...

তারপর পাতাটা ছেঁড়া। রকিব মাস্টার যেন তার দিকে তাকিয়ে হাসছেন।

হাসতে হাসতেই হঠাৎ করে গম্ভীর হয়ে যেতেন রকিব মাস্টার। একমুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি। চোখ দুটো যেন ঝকঝক করছে। গম্ভীর হয়ে বলতেন, 'এমনিতে হবে না। আরো ট্রেনিং লাগবে। বুকে পাথর বাঁধতে হবে। মনকে শক্ত করতে হবে। এই নরোম হাতে চলবে না। হাতে কড়া পড়তে হবে।'

ক্যাম্পের সব ছেলেদের কাছে গিয়ে এসব কথা বলতেন রকিব মাস্টার। কখনো কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিতেন। বলতেন, 'তুই পরানপুরের জব্বার বেপারীর ছেলে না? তোর বাপকেতো বেয়োনেট দিয়ে চিরে ফেলেছিল। তোদের গোলাবাড়িতো লুট হয়েছিল। তোদের বাড়িটাতো পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। সব সাফ হয়ে গিয়েছে।' তোর আর কোন পিছুটান নেই। জ্বালা ছাড়া

তোর আর কোন সংগি নেই।'

আবার কখনো অন্য একটা ছেলের দিকে তীব্র চোখে তাকিয়ে বলতেন, 'কোথায় যেন তোকে প্রথম দেখেছি। ঠিক মনে পড়ছে। ভুবনপুরের হাটে। সেই হাটে মুড়ির মোয়া বেচতি। তিলের নাড়ু বেচতি।এখনতো ভুবনপুরের হাটে মিলিটারীদের ক্যাম্প। সারা গ্রাম তছনছ করে দিয়েছে। যাবি না সেখানে ? যেতে তোকে হবেই। সাথে করে গ্রেনেড নিয়ে যাবি।

লতাপাহাড়পুর হাইস্কুলের রকিব মাস্টার এমনি করে ওদের বুকে ধিকিধিকি আগুন জ্বালিয়ে তুলেছেন।

সেই রকিব মাস্টারের ছবিটা এখন ছেঁড়া। জানালা দিয়ে শীতের বাতাস এসে পত্রিকাটিকে ঝরা পাতার মত উড়িয়ে নিয়ে গেল।

চারদিকে শনঘাসের বন। তার মাঝে ছোট একটা স্কুল। বেড়ার ঘর। পেছনে পাহাড়। সেই স্কুলটাই ছিল ওদের ট্রেনিং ক্যাম্প। কমান্ডার রকিব মাস্টার।

সে এক দারুণ সময় গেছে কাশুর। ওদের লতাপাহাড়পুর গ্রামটা যেদিন মিলিটারীরা পুড়িয়ে দিল সেদিন থেকেই অন্যরকম সে। রকিব মাস্টার বুকের ভেতর যন্ত্রণাটাকে আরো বাড়িয়ে দিলেন।

'কাশু, তোমার ছোট বোন ময়না ডুরে শাড়ি পরতো শখ করে। শাপলার ডগা দিয়ে নথ বানাতো। তোমার জন্যে সরপুটি ধরতো খাল থেকে। কামরাঙা নিয়ে আসতো কোঁচড় ভরে। সেই ময়না কই ? তার ছোট শরীরটা গুলীতে ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল। তোমাদের উঠোনে উপুড় হয়েছিল ময়নার লাশ। লাল রক্তে মাটি ভিজে থকথকে। খড়ের গাদায় বসে পাতিকাক ডাকছিল। তখন তোমার মা কই কাশু ? তোমার মার লাশ তখন লেবু ঝোপের ভেতরে। তোমার মা আর কোনদিন সন্ধ্যা বেলায় উঠোনে বসে লালকমল আর নীলকমলের গল্প বলবে না।'

এমন করে ফিসফিস করে বলতেন রকিব মাস্টার যে হাতের আঙুলগুলো নিশপিশ করে উঠতো।

দুপুরের দিকে এসেছিল মিলিটারীরা। ওদের লঞ্চ এসে থেমেছে বিলের মুখে। সমস্ত লতাপাহাড়পুর গ্রামে নিমিষের মাঝে আতংকের স্রোত ছড়িয়ে গেল। গ্রামের উত্তর দিক থেকে ধোঁয়া উঠছে। মানুষের আর্ত চিৎকার। মাঝে মাঝে গুলীর শব্দ। গ্রামের জোয়ান ছেলেরা পালিয়ে গেল দূরের চরে। শুনেছে জোয়ান ছেলেদের দেখলেই নাকি গুলী। সন্ধ্যা বেলায় পোড়াগ্রামে ফিরে এসে দেখলো বীভৎস দৃশ্য।

রাতের অন্ধকারে গ্রাম থেকে পালালো কাশু। আরো ক'টি ছেলের সাথে। ঝিপঝিপ করে বিষ্টি হচ্ছে। তাদের যেতে হবে অনেক দূর। তারা এখন অন্যরকম মানুষ হয়ে গেছে। প্রতিশোধ নিতে হবে। যুদ্ধের ট্রেনিং নিতে হবে। ঝিঙে ক্ষেতের পাশ দিয়ে যেতে যেতে ভাবলো কাশু কতোদিন ময়না আর সে হাট থেকে সবজী কিনে এ পথ দিয়ে বাড়ি ফিরেছে। রসকদমা আর তিলের নাড়ু নিয়ে।

শনঘাসের জংগল বাতাসে ছমছম করে। ভোরবেলা থেকে শুরু হয় ওদের ট্রেনিং। সারাদিন ধরে চলে নিজেকে প্রস্তুত করার সংগ্রাম। কোন কোন রাতের বেলায় রকিব মাস্টার ওদের বলিভিয়ার জংগলের কথা বলেন। চে গুয়েভারার কথা, গেরিলা যুদ্ধের কথা বলেন।

একদিন রকিব মাস্টারের কাছে গিয়ে কাশু বলে।

স্যার, আমি গ্রামে যামু। আলেফ মাতবর এখনো বুক ফুলাইয়া হাঁটে। এই মাতবরই মিলিটারীরে পথ দেখাইছিলো।

তখনো সন্ধ্যা নামেনি। চাষিরা ফিরছে মাঠ থেকে। গ্রামের পেছনের কবরস্থানের কাছে এসে দাঁড়ালো কাশু। জামগাছটার পাতা ঝিরঝির করছে। দূরে বাজারের মিটমিটে আলো দেখা যাচ্ছে। আলেফ মাতবর নিশ্চয়ই বাজারে চায়ের দোকানে বসে গল্প করছে। লোকটা মানুষ না



শয়তান। নিজের হাতে গ্রামটার সর্বনাশ করেছে। আজ কাশু ট্রেনিং নিয়ে ফিরেছে। আজ সে অস্ত্র চালাতে জানে। সেদিনের মায়ের লাশ, ছোট বোনের লাশ পেছনে ফেলে পালিয়ে যাওয়া কাশু এখন অন্য মানুষ।

বাঁশঝাড়ের নিচ দিয়ে পথ। বাঁশ পাতা উলুঝুলু করে দুলছে। যেন বলতে চাইছে—কাশু এলি? চোখটা ভিজে আসে তার। কতো চেনা পথ। ঐতো শিবমন্দির। অসিতদের বাড়ি। কামরাঙা গাছ। আজ তাকে নিজের গ্রামে চুপি চুপি আসতে হচ্ছে। চারদিকে তাকিয়ে বড় মায়া লেগে গেল কাশুর। অসিতদের বাড়িটা খাঁ খাঁ করছে। কারা যেন ঘরের টিনগুলো খুলে নিয়ে গেছে। অসিতের বাবা ছিলেন কবিরাজ। বাড়িতে হরিতকী আর আমলকীর গাছ লাগিয়ে

ছিলেন। পুকুর পাড়ে গাছের ছায়ায় চুপচাপ বসে থাকতেন কবিরাজ কাকা। তাঁকে দেখলে মনে হতো একজন শান্ত, সুন্দর মানুষ। কবিরাজ কাকা নাকি এক সময় কবিতা লিখতেন। সেই মানুষটা বাড়ি ছেড়ে পালাতে পারেন নি। নিমগাছের ডালে বেঁধে তাকে ঝুলিয়ে রেখেছিল মিলিটারীরা। কবিরাজ কাকা বলতেন—'নিমগাছ বড্ড পবিত্র গাছ। নিমগাছের বাতাসে অসুখ বিসুখ আসে না। যার বাড়িতে নিমগাছ থাকবে তার কল্যাণ হবে।'

বুকটা ঝনঝন করে ওঠে কাশুর। সমস্ত গ্রামটা চুপ হয়ে আছে। আস্তে আস্তে সামনের দিকে এগিয়ে যায় কাশু। তার ছেলেবেলা মিশে আছে এর পথে ঘাটে। ওদের বাড়িটা দেখতে খুব ইচ্ছে করছে কাশুর। ছোট্ট মুন্সি বাঁশের সাঁকোটা পেরিয়ে যায়। কঁ্যাচ কঁ্যাচ শব্দ হয়। কি একটা পাখি ঝুপ করে উড়ে যায়। মুন্সি বাড়িতে নতুন টিন বসিয়েছে। সেই চাল ঝকঝক করে। কাশু যতো তাদের বাড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ততোই তার ভেতর থেকে একটা চাপা কান্না বুক ঠেলে উঠে আসছে। সন্ধ্যা বেলায় পাশের গ্রামের মাঠ থেকে ফুটবল খেলে ফিরলে ময়না দৌড়ে আসতো। মা বকাঝকা করতেন। তারপর পুকুর থেকে হাত মুখ ধুয়ে এসে ভাত খেতে বসা। মা কই মাছ ভেজে দিয়েছেন। ময়না লেবু কেটে এনেছে। চোখ ভিজে যায় কাশুর। গাছের পাতা বাতাসে শনশন করে। বড়ুই গাছ বুঝি বলে—কাশু এলি ?

একসময় উঠোনে এসে দাঁড়ায় কাশু। ডাঁটা ক্ষেত শুকিয়ে গেছে। ময়নার লাশটা পড়েছিল এখানেই। মাটিতে বসে পড়ে কাশু। পাকঘরের দিকে তাকায়। থিকথিকে অন্ধকার। মা চুলোতে পাটখড়ি গুঁজে দিতেন। চুলোর আলোতে মার মুখ লালচে দেখাতো। শীতের রাতে মা নতুন চালের পিঠা বানাতেন। মার মুখে তখন বিন্দু বিন্দু ঘাম। পাকঘরের দরজাটা বাতাসে কঁ্যাচ করে নড়ে উঠলো। আর সহ্য করতে পারলো না কাশু। ডুকরে কেঁদে উঠলো।

ঃ মাগো, আমি আইছি। তোমার পোলা কাশু আইছে। কত দূর থেইকা আইছে। সারাদিন তোমার পোলার পেডে কোন দানা-পানি পড়ে নাই। তারে তুমি খাইতে দিবা না মা ? তার জন্যে কই মাছ ভাইজা দিবা না ? ময়নারে, তুই ভাইজানের জন্যে লেবু কাইটা দিবি না ?

রকিব মাস্টারের কথা মনে পড়ে। মনটারে শক্ত করবে। প্রতিশোধ নিতে হবে। প্রতিশোধ। উঠে দাঁড়ায় কাশু। বাজারে গিয়ে আলেফ মাতবরকে ধরতে হবে। শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান হয়েছে। হনহন করে হাঁটতে থাকে কাশু। তার মনে যেন কোন ভয় নেই।

বাজারের গফুরের চায়ের দোকানে লোকজন নিয়ে বসেছিল আলেফ মাতবর।

সাহসী পায়ে বাজারের মাঝখানে এসে দাঁড়ায় কাশু। প্রথমে চোখে পড়ে আলেফ মাতবরকে। হারিকেনের মৃদু আলোতে কাশুকে আবছা দেখাচ্ছে।

ঃ কেডা, কেডা ঐহানে ?

কাশু কোন জবাব দেয় না। আলেফ মাতবর এবার দরজার বাইরে এসে বাজখাঁই গলায় চিৎকার করে ওঠে 'কেডারে।'

ততক্ষণে কাশুর বুক থেকে চাদর সরে গেছে। হাতে ধরা স্টেন। ট্যাট ট্যাট ট্যাট করে শব্দ হলো। আলেফ মাতবরের বিশাল শরীর লুটিয়ে পড়লো মাটিতে। বাজারের আতংকিত লোকজন ছুটতে লাগলো। হারিকেনটা মাটিতে উল্টে পড়ে আছে। আলেফ মাতবর রক্তের ভেতরে উপুড় হয়ে আছে। ঠিক তেমনি ভাবে উপুড় হয়েছিল ময়না।

কয়েক মাস পেরিয়ে গেল। সামনের বর্ষায় ওরা অপারেশনে যাবে।

কদমতলীর হাটে মিলিটারীরা একটা ক্যাম্প করেছে।

বিলের পাশ দিয়ে চুপি চুপি হেঁটে আসছে ওরা। চারদিকে লোকজন নেই। শঙ্খচিল উড়ছে কয়েকটা। দামের উপর দিয়ে গরু হেঁটে যাচ্ছে। দূরে দেখা যায় পুল। ডিস্ট্রিক বোর্ডের পাকা রাস্তা। ওখান দিয়েই মিলিটারীর জীপ যায়। কাশুদের দল ঝোপের ভেতরে সারাদিন লুকিয়ে রইলো।

কাশু আর দুটো ছেলে ব্রীজের নিচে গিয়ে ঘাপটি মেরে রইলো। বিকেল হয়ে আসছে। এখুনি জীপ আসবে। বুকটা ধকধক করছে। ব্রীজের নিচে কচুরীপানার ঝাঁক। বেগুনী ফুলের পাশে বক বসে। মন্তু বলে, আসতাছে। .... মাথাটা একটু তুলে দেখে কাশু। একটা জীপ আসছে। হাতের মুঠোতে শক্ত করে ধরা গ্রেনেড। তিনজনেই প্রস্তুত হয়ে থাকে। জীপটা কাছে আসা মাত্র গ্রেনেডের পিন খুলে ছুঁড়ে দেয়। প্রচণ্ড শব্দ। পানিতে ডুব সাঁতার দেয়ার আগেই দেখতে পায় কাশু। রাস্তার উপর ছিটকে পড়েছে কয়েকটা মিলিটারীর রক্তাক্ত শরীর। একজন সৈনিক দেখতে পেয়েছে কাশুকে। বিলের পানিতে মাছের মত নেমে যাচ্ছে। স্টেন তুলে গুলী করলো সে। কাশু তখন ঠাণ্ডা পানিতে নেমে তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছে। একটা গুলী এসে বিঁধলো তার কণ্ঠনালিতে। মাথাটা ঝনঝন করে উঠলো তার। পায়ে এসে আবার গুলী লাগলো।

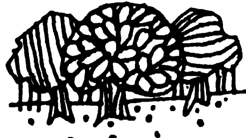
আকাশের পাখিগুলো ঝাপসা হয়ে আসছে। সামনের কাশবনের ভেতর থেকে যেন ময়না দৌড়ে আসছে। জ্ঞান হারাবার আগে কাশু বুঝলো একটা শক্ত হাত তাকে জাপটে ধরেছে।

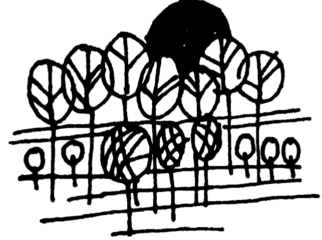
ঘুম ভেঙ্গে কাশু দেখে ক্যাম্পের হাসপাতালে শুয়ে আছে সে। ঢোক গিলতে পারছে না। অসহ্য যন্ত্রণা। রকিব মাস্টার ঝুঁকে আছেন তার দিকে। ক্যাপ্টেন ডাক্তার বললেন, কাশুর গলার রগ ছিঁড়ে গেছে। ও আর কোনদিন কথা বলতে পারবে না। বাঁ উরুতে গুলী লেগেছে। সেটাও কেটে বাদ দিতে হবে।

দেশ স্বাধীন হলে কাশুকে এই কেন্দ্রে দিয়ে গেছেন রকিব মাস্টার। কতো কথা বলতে ইচ্ছে করে কাশুর। কিছুই বলতে পারে না। বিজয় দিবসে বাড়িতে বাড়িতে পতাকা উড়ছে। কয়েকটা ট্রাক বোঝাই ছেলে গেল চিৎকার করতে করতে। আজ এখানে ভালো খাবার দেবে। টেলিভিশন থেকে ক্যামেরা আসবে আলো জ্বালিয়ে ছবি তুলতে। ওরা হুইল চেয়ারে সার বেঁধে হাসি মুখে বসে থাকবে।

কাশু চেয়ারটাকে গড়িয়ে গড়িয়ে এক কোণায় নিয়ে যায়। দেখে দুটো চড়ুই ঘাসের ভেতর থেকে কি যেন খুঁটছে। কাশু বলতে চায় 'ও চড়ুই, আমার লতাপাহাড়পুর গ্রামে উড়ে যাবি? সবুজ পাতা মুখে নিয়ে উড়ে যাবি? কদমগাছের নিচে ময়নার ছোট্ট কবর। তার উপরে পাতাগুলো ছড়িয়ে দিয়ে আসবি?'

কাশু তাকিয়ে থাকে চড়ুই দু'টোর দিকে। ওর চোখ ততক্ষণে ভিজে এসেছে।





ভোটরঙ্গ

প্রণব মুখোপাধ্যায়

কয়েক বছর আগের কথা।

ছেলে পড়িয়ে খাই, মোড়ের মাথায় চারজন লোক গরম হয়ে কথা বললে উল্টো পথে হাঁটি, নিজে কখনও ভোট দিই নি আর সেই আমাকেই কিনা ভোট নিতে যেতে হল! আর এমন এক জায়গায় যার নাম শুনেই লোকে চমকে উঠে কেমন চুপ মেরে যেতে লাগল, আর আমার দিকে এমন করুণার চোখে তাকাতে লাগল যেন এই আমাকে শেষবারের মত দেখছে।

তবু বুকে সাহস আর সঙ্গে ছয় সঙ্গী, পঞ্চাশ রকমের জরুরি কাগজপত্র আর ফর্দ মিলিয়ে একাত্তরটি মালপত্র—হ্যারিকেন থেকে ছুঁচ অবধি নিয়ে বাসে চাপলাম। বহুদূর চলার পর বালির ওপর ঘসটে চাকা টেনে বাস চলল, সবাই বললে নাকি নদী পেরোচ্ছি। এখন একটু শুকিয়ে গেছে এই যা। তারপর আরো বহুক্ষণ চলার পর নামা গেল দুনিয়ার আর এক প্রান্তে। সঙ্গে দুটি সেপাই ছিল, নেহাৎই নাবালক। ওরা নাকি ওদের জমি চষছিল। এমন সময় গবরমেণ্টের লোক এসে লাঙ্গল কেড়ে পেয়ারাগাছের খেঁটে লাঠি ধরিয়ে দিয়ে জোর করে সেপাই করে দিয়েছে। ভোটের পর ছেড়ে দেবে।

সব শুনে গেঁথে, সেপাই দুটিকে ঘুম থেকে তুলে ফর্দ খুলে চৌকিদারের নাম খুঁজতে লাগলাম। এ সময় তার এখানে থাকার কথা। নাম ধরে কয়েকবার চেঁচালাম 'পঞ্চু হালুই' 'পঞ্চু হালুই' করে। দূর থেকে কি একটা পাখি বারবার সাড়া দিয়ে গা পিত্তি জ্বালিয়ে দিলে। হাঁক ডাক শুনে সেক্টর আপিসের জীপ এসে আমাদের নিয়ে চলল। পঞ্চু হালুইয়ের পাত্তা মিলল না। অথচ ওর পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার কথা। সেক্টর অফিসার গজরাতে লাগলেন, 'দাঁড়াও ব্যাটার চাকরি ঘোচাচ্ছি।'

গাড়ি আমাদের নিয়ে ত চলল, কিন্তু কোথায়? রাস্তা কই? এ তো উঁচুনিচু ঢিপি আর গাছের

ঝোপঝাড় বিছিয়ে আছে চারদিকে। তবু চলল জীপ সেই সব মাড়িয়ে। বার চারেক উল্টোতে গিয়েও সোজা হল। আমাকে শূন্যে তুলে লুফতে লুফতে মাইল তিনেক মাঠ পেরিয়ে, বাঁশঝাড়ের মধ্যে একটা ডোবার মধ্যে পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়ে ইস্কুল বাড়িতে হাজির হল গাড়ি। এখানেই কাল ভোট নেওয়া হবে।

এই নাকি স্থানীয় ইস্কুল। গোটা আষ্টেক খুঁটির ওপর একটা খোড়ো চাল ঝুলে আছে কোনমতে। গোবর ল্যাপা নড়বড়ে মাটির দেওয়াল। ঝোড়ো হাওয়া বইলে কাল অবধি টিকবে কিনা সন্দেহ।

জীপ বিদায় নিল।



কোত্থেকে এগিয়ে এলেন এক পুলিশ সাবইন্‌ স্পেক্টর। বললেন, 'আগেই আমরা এসে গেছি। ঐ ওধারে একটা ঘরে আছি।' দেখলাম বেশ বড় ধরনের একটা পুলিশ দল। এই ধূ ধূ জনপ্রাণীহীন প্রান্তরে এত পুলিশ কেন রে বাবা! বেশ ঘাবড়ে গেলাম।

আসবাব বলতে দুটো ভাঙ্গা চেয়ার, একটা তিন ঠ্যাঙো টেবিল আর কয়েক সার লজ্‌গজে বেঞ্চি। ওগুলোতেই ভোট নেবার কাজ চালাতে হবে। এর মধ্যে জীপের আওয়াজ পেয়ে দুচারজন স্থানীয় মানুষ এসে হাজির।

এমন ভাবে তারা আমাদের দেখতে লাগল যেন মঙ্গলগ্রহ থেকে আসছি। আমাদের

সেনবাবুর চশমাটা দেখিয়ে একটা ছেলে বুক ফুলিয়ে আর একজনকে জামাল যে তার কোন খুড়োও নাকি চোখে ও রকম পরে। তারপর বিস্ময় কমলে সেই ছেলেটিই, নাম বলল ভূতনাথ, মুড়ি আর জল নিয়ে এল। তারপর দেখি দুজন লোক একটা খাটিয়া ছেড়ে ঘুম থেকে উঠে হাই তুলে সামনে দাঁড়াল। তাদের একজন জামা তুলে পেটের তলা থেকে একটা পেতল আঁটা বেল্ট বার করে জামার ওপর পরে নিল। বুঝলাম এই চৌকিদার। বললাম, 'কি গো, তোমার না থাকার কথা ছিল বড় রাস্তায়? অফিসার বাবু চটেছেন।' তাতে ওর বিকার হল না। আরো বড় একটা হাই তুলে বলল, 'কি করব বাবু, গাড়ি গেলে ত। বাম দিকের গরুটি শিষ্ট। কিন্তুক ডেনদিকেরটি মাথাগরম করলে।' তারপর ভূতনাথকে ধমকে বলল, 'কি রে, আমরা একগাল মুড়িটুড়ি পাব না?'

খাটিয়ার অপরজন চুলটুল আঁচড়ে একটা ভাঙ্গা সাইকেল তুলে ছোট সেলাম দিয়ে বলল, 'ক্রাসিন আনতে হবে ত বলুন, যাই! আমার নাম হারানিধি, লিস্টির সঙ্গে মিলিয়ে নিন।' লিস্টে দেখলাম নাম রয়েছে, হারানিধি চৌবে, সাইকল মেসেনজার। বললাম, 'এত তাড়া কিসের? একটু রোদ পড়ুক না।' ও চমকে উঠে বলল, 'আলো পড়ে এলে স্যার কোথাও যেতে পারব না, মাপ করবেন।' স্থানীয় একজন মুরুব্বি মত লোক মজা দেখছিল। বলল, 'আলো পড়ে গেলে ঐ খালপারের মাঠ কেউ পেরোইনা আমরা। ওখানে ডাকাতির মহড়া হয়। দু পাঁচ টাকা আর তেল নুন সঙ্গে থাকলে ধড় থেকে মুণ্ডু নামিয়ে কেড়ে কুড়ে নেয়। মানুষ মারায় হাত পাকানোও হল, কিছু পাওয়াও গেল।' আমি জায়গাটার দিকে তাকিয়ে একটা ঢোক গিললাম। আর আমার দলের সেপাই দুজন লাঠি হাতে আমার আড়ালে দাঁড়িয়ে ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল। এমন সময় সাব ইন্সপেক্টর সায়েব এগিয়ে এসে ইস্কুল ঘরের চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে পড়লেন।

চেয়ারটা একটা সন্দেহজনক শব্দ করল। তারপর, 'কোনো ভয় নেই স্যার, আমি খোঁজ খবর নিয়ে এলাম, গণ্ডগোলের কোন চান্স নেই,' বলে জাঁকিয়ে যেই হেলান দিয়েছেন অমনি সমস্ত জোড়টোড় খুলে চেয়ারটা হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ে গেল। স্থানীয় মুরুব্বিটি অমনি ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, 'এঃ হে হে, নিতাই সারের চেয়ার'—আকাশ থেকে ঠ্যাং নামিয়ে ধড়ফড় করে পুলিশ সায়েব উঠে দাঁড়ালেন। তারপর ভাঙ্গা টুকরোগুলো লোকটির হাতে গুনে গুনে তুলে দিয়ে দাঁত কড়মড় করে বললেন, 'নিতাই স্যারকে অ্যারেস্ট করা উচিত।'

তারপর কেরোসিন এল, হ্যারিকেন জ্বলল, কাগজপত্রের কাজ নিয়ে বসলাম। কাপড় টাঙ্গিয়ে গোপন ভোটকক্ষ তৈরি হল। পুলিশদের সঙ্গে মুরগীর ঝোলভাত খেয়ে, ব্যালট পেপারের বাণ্ডিল মাথায় দিয়ে ঘুম দিলাম। ঘরের একটা দরজাতেও খিল নেই। টেবিল বেঞ্চিগুলো দরজায় লাগিয়ে পুলিশদের সতর্ক থাকতে বলে তবু নিশ্চিন্ত হওয়া গেল না। খালি দুঃস্বপ্ন দেখে চমকে চমকে উঠলাম—ঐ বুঝি কে দোর ঠেলে ছায়ার মত এগিয়ে এল, ঐ বুঝি আমার মুণ্ডুটা বাঁ হাতে তুলে ডান হাতে ব্যালট পেপার ছিনতাই করল।

ভোর না হতেই, বাপরে বাপ, সে কি বিরাট লাইন! কোত্থেকে সব মেয়ে পুরুষ, বুড়োবুড়ি সার সার গরুর গাড়ি বোঝাই হয়ে এসেছে। সবাই আগে ভোট দেবে! পুলিশরা একেবারে নাস্তানাবুদ হয়ে গেল ভিড় সামলাতে। সারাদিন ধরে চলল ভোট দেবার জন্যে কাড়াকাড়ি। অতি উৎসাহী কেউ আবার টাটকা ভোটের কালি মাথায় মুছে কিংবা চেটেপুটে আঙ্গুল থেকে তুলে ফেলছিল। ধান্দা ছিল পরে ফের বেনামে আর একবার ভোট দেবার ফিকির খুঁজবে। তাদের ধরে ধরে ভাল করে কালি মাখানো হল। পুলিশ দিয়ে চোখ রাঙ্গিয়ে, জেল খাটাবার ভয়

দেখিয়ে তবে কোনমতে নিরস্ত করা গেল।

কোথা দিয়ে যে দুপুর গড়িয়ে সাড়ে চারটে বেজে গেল টেরই পেলাম না। শুধু হাত পা গুলো অবশ হয়ে এল আর মাথাটা ঝিম ঝিম করতে লাগল। মাঝে মধ্যে একটু আধটু উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল বটে, বাইরে দাঁড়িয়ে দুপক্ষ মুখোমুখি আস্তিন গোটাচ্ছিল। তবে তা সামাল দিতে অসুবিধা হয়নি। একবার শুধু দুম করে কোথায় একটা পটকা ফাটল। দেখতে যাচ্ছি, ধাক্কা খেলাম সেই দুই সেপাইয়ের সঙ্গে। উর্ধশ্বাসে তারা ঘরে এসে ঢুকল। তাদের লাঠি দুটো কুড়িয়ে হাতে গুঁজে ধমকে ধামকে ফের বাইরে দাঁড় করিয়ে দিলাম। পুলিস লাগাতে হয় নি। শুধু জোড়হাতে অনুনয় করে বললাম, 'দয়া করে নির্বিঘ্নে ভোট হতে দিন। হাঙ্গামা বাধালে মালপত্র তুলে নিয়ে বাক্স উল্টে ভোট বাতিল করে চলে যাব।' এই কথাতেই কাজ হচ্ছিল খুব। দিনের শেষে হাঁপ ছাড়লাম। ভোটের বাক্স প্যাঁটরা গুণে, লোকজন নিয়ে জীপে উঠতে যাচ্ছি এমন সময় সাদা কাগজ হাতে সেই ভূতনাথ এসে হাজির। একগাল হেসে কাগজটা সামনে মেলে ধরে বলল, 'একটা সার্টিফিট দিন স্যার।' বললাম, 'কিসের সার্টিফিকেট ?' 'ঐ যে কত কাজ করলুম ! মুড়ি জল এনে দিলুম, পুলিশদের জামাটুপি টাঙ্গাবার পেরেক হাতুড়ি—'

অন্ধকার নামছিল। তাই আর কথা না বাড়িয়ে খসখস করে কোনরকমে কিছু প্রশংসা লিখে দিয়ে বললাম, 'কি হবে এটা দিয়ে ?' ও বলল, 'পঞ্চায়েৎ আফিসে চাকরি চাইব।'

আমি বললাম, 'ইস্কুলে পড় না ?' ভোটের ঘরটা দেখিয়ে ও বলল, 'এই তো আমাদের ইস্কুল। চাকরি পেলেই পড়া ছেড়ে দোব।'

আমাদের গাড়ি ফিরে চলল মাঠের ওপর দিয়ে দুলতে দুলতে।





সোয়ালো পাখীর গল্প

মুনতাসীর মামুন

'আমাদের এখানে শীতটা খুব মজার, তাই না?' বললো জয়া, 'একটু হিম হিম ভাব। উজ্জ্বল আকাশ। কি সুন্দর!'

'ধ্যৃৎ, হিম হিম ভাবই যদি হবে আর উজ্জ্বল আকাশই থাকবে তা' হলে আর শীত হলো নাকি?' বললাম আমি, 'শীত হবে শীতের মতো। তুষার ঝরবে অবিরল বৃষ্টির মতো। ঘরের ছাদ, রাস্তা ঘাট মাঠ সব শাদা হয়ে যাবে। ঘরের দরোজা জানালা সব থাকবে বন্ধ। ভেতরে জ্বলবে গনগনে আগুন, জানালার ভেতর দিয়ে তুষার দেখবি, তবেই না শীত। আমার ঝুনুচাচা কি বলেছেন জানিস, হাঙ্গেরীর গ্রামগুলিতে শীতকালে নাকি ভীষণ শীত পড়ে। আর প্রথম যেদিন তুষার ঝরে সেদিন গ্রামের রেঁস্তোরায় টাম্বুরিন বাজিয়ে সবাই তুষারপাতকে স্বাগত জানায়। আমাদের এখানকার শীত অনেকটা আমেরিকার অটামের মতো।' অটাম শব্দটা আমি নতুন শিখেছি ঝুনুচাচার কাছে।

'অটাম মানে?' জিজ্ঞেস করে জয়া।

'শরতকাল আর কি!' বলি আমি. 'ঐ সময় আমেরিকার মফস্বল শহরগুলি পাতায় পাতায় ঢেকে যায়। রাস্তায়, অলিতে গলিতে, উঠোনে, বাড়ীর ছাদে লাল বাদামী হলুদ পাতা জমে ওঠে। আহ্, চারদিকে ঝরা পাতার গন্ধ, একবার, বুঝেছিস ঝুনুচাচা গেছেন কানেকটিকাটে—'

'ফের তোর ঝুনুচাচার গল্প শুরু হলো', ঠোঁট উলটে বললো জয়া, 'তোর চাচা তোকে সব বানিয়ে বানিয়ে বলেন, আর তুইতো একটা বুদ্ধু, যা বলা হয় তাই বিশ্বাস করিস।'

প্রথমতঃ আমাকে বুদ্ধু এবং দ্বিতীয়ত ঝুনুচাচাকে মিথ্যুক বলায় অমি খুব চটে গেলাম। বেশী রেগে গেলে আমার আবার কথা আটকে যায়। তোতলাতে তোতলাতে বললাম, 'যা যা বাসায় যা, পড়িসতো মাত্র আটের ক্লাসে। মুখ্যু মেয়ে এরচেয়ে বেশী আর কি জানবি!'

একদিকে নদী। পাশে জেটি। জেটিতে বাঁধা সারসার জাহাজ। কোনোটা এসেছে লন্ডন

থেকে, কোনোটা ফ্লোরিডা থেকে, কোনোটা বা দার এস সালাম থেকে। জেটির সীমানা শেষে সরকারী হাইওয়ে। হাইওয়ে পেরিয়ে কিছুদুর হেঁটে এলে আমাদের বাড়ী। পাড়াটা সবেমাত্র গড়ে উঠছে। আশেপাশে তিনচারটে বাড়ী। ছড়িয়ে ছিটিয়ে চারপাশে অনেকগুলি নারকেল গাছ। দুটো পুকুর। পুকুর পাড়ে করবী আর কুলগাছ। কয়েকটি নতুন বাড়ী তৈরী হচ্ছে। চারপাশে ভাঙ্গা ইঁটের টুকরো।

নিঝ্‌ঝুম মস্তো বাড়ী আমাদের। ঘরগুলো অন্ধকার। উঠোনের এককোণে মস্তো এক কড়ই গাছ। সারা বাড়ীতে অবসর সময়ে আমাকে ঘুরে বেড়াতে হয়। কারণ করার কিছুই নেই। নতুন বইপত্র এখানে পাওয়া যায় না। আশেপাশের বাড়ীতে অবশ্য কয়েকটি ছেলে মেয়ে আছে কিন্তু তারা সবাই আমার হাঁটু সমান। একমাত্র ঐ হলদে বাড়ীর জয়াই আমার সমবয়সী।

এই মস্তোবড় বাড়ীতে থাকতে আমার একটুও ভালো লাগে না। বাবা সকালে অফিসে চলে যান, ফেরেন কখনো বিকেলে কখনো বা রাত্রিরে। একা বাড়ীতে থাকতে মার ভালো লাগে না, তাই তিনি চাকরি নিয়েছেন। একবার মার সামনে বিড়বিড় করে বলে ফেলেছিলাম, 'আমার একটা ভাই বোন থাকলে বেশ হতো!' এ কথা শুনে মা আমাকে 'ধাড়ি ছেলে', 'পাকা ছেলে' বলে এ্যায়সা ধমক দিলেন যে আমি আর কোন কথাই খুঁজে পাই নি। কি যে দোষ করেছি বুঝতেও পারলাম না। বাবা মা'রা বোধহয় শুধু শুধু ধমকাতে ভালোবাসেন।

এই একঘেঁয়ে দিনগুলি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে যখন ঝুনুচাচা আসেন। ঝুনুচাচা চাকরি করেন বিরাট এক জাহাজে। বছরে একবার কি দু'বার এ বন্দরে তাঁর জাহাজ নোঙ্গর করে। তখন মোটাসোটা, বেঁটেখাটো, মাথায় টাক এবং গোঁফঅলা ঝুনুচাচা দু'হাতে দুটো স্যুটকেস নিয়ে হাজির হন। উঠোন থেকেই তাঁর চিৎকার শুরু হয়, 'কইগো ভাবী তোমরা কই, দেখো ফের চলে এলাম। কই গেলিরে মাম্‌না।' জয়া যদি আমায় মাম্‌না বলে ডাকতো তা'হলে হয়ত একটা রক্তারক্তি কাণ্ড হয়ে যেতো। কিন্তু ঝুনুচাচা মাম্‌না বললে আমি রাগ করি না।

এরপর ঝুনুচাচা তার স্যুটকেস খোলেন। 'এই যে ভাবী, ন্যুইয়র্ক থেকে এই কার্ডিগানটা এনেছি তোমার জন্যে। মিয়াভাইয়েব জন্যে এই স্যুটের কাপড়। আর মাম্‌না দেখ তোর জন্যে এসব।'

মা তখন তাড়া দেন, 'যাও যাও, হাতমুখ ধুয়ে একটু বিশ্রাম নাও। এসব পরে দেখা যাবে।' কিন্তু ততক্ষণে আমি জেঁকে বসি ঝুনুচাচার কাছে। 'এই দেখ এই কাঠের মূর্তিটা এনেছি তোর জন্যে ইন্দোনেশিয়া থেকে। এই যে মুখোশটা, এটা আফ্রিকার একটি ছোট্ট শহর, কি যেন নাম, ভুলেই গেলাম, যাক আর এই কিমানো পড়া মেমসাহেবটা টোকিও থেকে। পছন্দ হয়?'

পছন্দ হবে না আবার! ঝুনুচাচা জানেন আমি মা বাবার মতো কাপড় চোপড় পেলে খুশী হই না। বরং জানা অজানা বন্দর থেকে কেনা এইসব জিনিষের প্রতি আমার আকর্ষণ বেশী। ঝুনুচাচা বলেন, 'দেখ দেখ এ গুলি দেখ, আমি ততোক্ষণে গোসলটা সেরে আসি। বিকেলে তোকে জাহাজে নিয়ে যাবো।'

আমি জাপানী পুতুলটার ঘ্রাণ নেই। চোখের সামনে ভেসে ওঠে টোকিও শহর। বসন্তকালে চেরী ফুলে ছেয়ে যায় টোকিও। আচ্ছা শীতে ফুজিয়ামাকে কেমন লাগে দেখতে? আফ্রিকার মুখোসটির ঘ্রাণ নেই। আহ্‌, আফ্রিকার নির্জন কোন অন্ধকার গ্রামের খোলা মাঠে বোধহয় দ্রিম দ্রিম করে ঢোল বাজছে। মাঠের মাঝখানে গনগনে আগুন। এমনি মুখোস পড়ে, বুকে পিঠে নানারকম আলপনা এঁকে হয়ত কালোকালো কিছু লোক আগুন ঘিরে হৈ হৈ করে নাচছে।

বিকেলে ঝুনুচাচা আমাকে তার জাহাজে নিয়ে যান। ছোট্ট কেবিন। বয়কে ডেকে তিনি

স্যান্ডউইচ আনান। সালাদ আর স্যান্ডউইচ খাওয়া হলে আমরা রেলিং ধরে গল্প করি। আমি বলি, 'ঝুনুচাচা তোমার খারাপ লাগে না। একলা একলা ঘুরে বেড়াও কোথায় কোথায়। বাংলা বলার লোক পর্যন্ত পাও না।'

ঝুনুচাচা উত্তর দেন, 'না খারাপ লাগবে কেন? বরং ডাঙায় থাকলে আমার কষ্ট হয়। আর



সমুদ্রের কি দেখার শেষ আছে। যতো দেখবি ততোই মনে হবে আরো কি যেন বাকী রয়ে গেলো। আর সেটা জানতে না জানতেই তুই পৌঁছে যাস কোনো এক বন্দরে। আর বন্দরের সব জানতে না জানতেই আবার ভাসিস সমুদ্রে।'

আমি বলি, 'তবুও .....

ঝুনুচাচা বলেন. 'শোন তবে। তখন আমার জাহাজ ম্যাডিটেরিনিয়ানে। একদিন হঠাৎ

তোদের কথা ভেবে মন খুব খারাপ হয়ে গেলো। বিকেল তখন, সূর্য ডুবছে। জাহাজ চলছে আপন মনে। হঠাৎ দেখি একঝাঁক সোয়ালো পাখী কলরব করতে করতে এসে বসলো জাহাজের রেলিংয়ে, মাস্তুলে। একটি দু'টি নয়, এক ঝাঁক। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। তারা বোধহয় উড়াল দিয়েছে স্পেন থেকে। যাবে অন্যকোন দেশে। পথে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তাই একটু বিশ্রাম নিচ্ছে। পরদিন খুব ভোরে আবার তারা পাখা মেললো। হয়ত অনেক দেশ, সমুদ্র পেরিয়ে এই বাংলাদেশেই আসবে। যেই না ওরা পাখা মেললো, বুঝেছিস, অমনি আমিও একটি সোয়ালো পাখী হয়ে গেলাম। তারা মিলিয়ে গেলো দূরে, সঙ্গে সঙ্গে আমিও। উড়তে উড়তে অনেক দেশ ঘুরে এলাম তোদের এখানে। মিয়াভাই'র সঙ্গে গল্প করলাম। ভাবীর সঙ্গে গল্প করলাম। তোর সঙ্গে গল্প করলাম। বুঝেছিস, মাঝে মাঝে একটু খারাপ লাগে। কিন্তু যখনই মন খারাপ হয় তখনই আমি সোয়ালো পাখী হয়ে যাই। মন আমার আবার ঠিক হয়ে যায়।'

ঝুনুচাচা শেষবার এসেছিলেন সেই সাতমাস আগে। পুতুল মুখোস সব এখন পুবনো হয়ে গেছে। ঘরের অন্ধকার আর গাছের ছায়া আবার চেপে বসেছে মনের ওপর। ম্যাট্রিক পরীক্ষার বাকী আর মাত্র কয়েকমাস। কিছু পড়াশোনা হয়নি। ভালো লাগে না আর। এবার ছুটি হলে আমি নানা বাড়ী চলে যাবো। সেখানে গেলে সারাক্ষণ নানা নানী মামা খালাবা ঘিরে রাখে। কেউ গম্ভীর মুখে কথা বলে না। আই·এ·টা আমি সেখানেই পডবো। বাবা-মা থাকুক তাদেব অফিস নিয়ে।

কি করা যায়? কি করা যায়? হঠাৎ আমি একটা সোয়ালো পাখী হযে যাই—নরওয়েতে এবার শীতটা একটু বেশী মনে হচ্ছে' রোদালো দিন দবকার। আমরা এক ঝাঁক সোয়ালো ডানা মেলি, গন্তব্য আমাদের এখন গ্রানাডা শহর। সেখানে কিছুকাল কাটিয়ে বিশ্রাম নিতে যাবো এথেন্সের জলপাই বনে। তারপব আবাব উড়াল। নায়েগ্রা জলপ্রপাতেব ধাবে ঘাসের বনে কিছুদিন কাটিয়ে—

'কি রে হা করে কি ভাবছিস?' জয়ার গলা। আমার ভীষণ বাগ হয। পরশু আমাকে বুদ্ধু বললো। আজ সারাটা দিন আমি একলা বসে আর এই বিকেলে এসে কিনা ···। আমি কিছু বলি না। জয়া বলে, 'কি রে চটে আছিস মনে হচ্ছে। আমি আরো ভাবলাম··· '। আমি চুপ করে থাকি। 'ঠিক আছে। কথা না বললি তো ভারী বযেই গেলো। আমার কি তোরই ক্ষতি। এতো খুঁজে পেতে বইটা আনলাম··· '। 'কি বই', এবার আমি আগ্রহ দেখাই। 'ক্যাপ্টেন কুকের সমুদ্র যাত্রা।' থাক তুই যখন রাগ করে আছিস···· তখন কি আর করা। যাই।'

'আরে না, না, রাগ করলাম কই। বোস বোস দেখি বইটা।'

আমরা সিঁড়িতে বসে গল্প করি। আমি বলি, 'আর মোটে তিনবছর তার পরই আমি হাওয়া।'

'মানে··· '

'আই·এ· পাশ করেই আমি জাহাজে ঢুকে যা[illegible] সাদা পোষাক, কালো-সাদা টুপি। এ বন্দর থেকে ও বন্দরে ঘুরে বেড়াবো। যখন ফিরবো তখন স্যুটকেস ভর্তি করে রাজ্যের জিনিষপত্র নিয়ে আসবো। কি মজা তাই না?'

'না, ঐ জাহাজ টাহাজে চাকরি বাকরির কোন দরকার নেই। কখন টুপ করে ডুবে যাবে সমুদ্রে তার কোন ঠিক আছে। ঐ সবের কোন দরকার নেই।'

মেয়েটা যে কি। আমি যা বলি ঠিক তার উল্টোটি বলা চাই-ই। আমার মন খুব খারাপ হয়ে যায়। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকি। হঠাৎ জাহাজের ভোঁ শোনা যায়। বন্দরে নতুন জাহাজ এলো বোধহয়। আমার মন আবার ভালো হয়ে ওঠে। তখন আমি জয়াকে সেই সোয়ালো

পাখীর গল্প বলি। পুরোটা শুনে জয়া জিজ্ঞেস করে, 'সোয়ালো পাখী কি?'

'সোয়ালো মানে জানিস না আবার ক্লাশ এইটে পড়িস। সোয়ালো মানে দোয়েল।' এইবার তার ওপর একচোট নিতে পারায় খুব খুশী হয়ে উঠি।

'ওহ্ তাই। তা দোয়েল বললেই হয়। কি নরম আর সুন্দর নাম। সোয়ালো সোয়ালো করিস ক্যান?'

রাগ করে আমি বলি, 'দেখ জয়া বেশী ফ্যাচ ফ্যাচ করিস না। যা বলি তাই শুনবি। বড়দের কথার ওপর কথা বলতে নেই।'

'ই, কি আমার গুরুজনরে!' বলে ভেংচি কেটে জয়া চলে গেলো।

অটাম মানে শরতে আমাদের পরীক্ষা। পুরো বছরের পড়া কয়েক মাসে শেষ করতে হবে বাসায় থাকি সারাদিন। পড়ি। পড়তে পড়তে ক্লান্ত লাগলে দূরে জাহাজের মাস্তুলের দিবে তাকিয়ে থাকি। জয়ার সঙ্গেও তেমন দেখা হয় না আজকাল।

পরীক্ষার আর কয়েকদিন বাকী। এমনি সময়, একদিন সন্ধ্যায়, জয়া এসে হাজির। বললো, 'কিরে খুব পড়ছিস বুঝি। পড় পড় ভালো রেজাল্ট করা চাই।'

আমি বলি, 'উপদেশ দিতে হবে না। কি ব্যাপার তাই বল।'

'কেন, তুই কিছু জানিস না, আমরা যে চলে যাচ্ছি।'

'চলে যাচ্ছিস, কই?' এবার আমি খুব অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি।

'চন্দনপুর।'

'সে আবার কোথায়?'

'ঐ যশোরের দিকে। নিরিবিলি জায়গা। কি মজা তাই না?'

আমি বললাম, 'এর মধ্যে মজা কি? তুইও যাবি নাকি?'

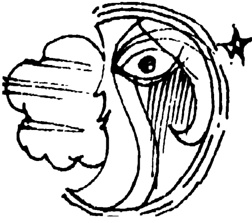
'আরে তোকে কি আর সাধে বুদ্ধু বলি। আমরার মধ্যে কি আমি পড়ছি না।'

জয়া যেমনি এসেছিল তেমনি চলে গেলো। আমার আর পড়ায় মন বসলো না। যেদিন জয়ারা চলে যাবে, সেদিন তাদের বিদায় দিতে আমি বাবা আর মা গেলাম স্টেশনে। জয়া ট্রেনের জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে বললো, 'পরীক্ষা দিয়েই যাবি কিন্তু আমাদের ওখানে, নয়তো আমি রাগ করবো।'

'রাগ আবার কিরে!' বললাম আমি, 'ওখানে কতো বন্ধু বান্ধব পাবি।' কথাটা বললাম বটে কিন্তু মনটা খারাপ হয়ে গেলো। জয়াকে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, এতোদিন এখানে থাকলি, এখন আবার চলে যাচ্ছিস নতুন জায়গায়, সেখানে গিয়ে খারাপ লাগবে না?'

জয়া একটু হেসে বললো, 'খারাপ লাগলে আর কি করবো? ... একটা সোয়ালো পাখী হয়ে যাবো।'





বন্দী, বন্দী

সালেহ্ আহমদ

আজকের শনিবারে সিরাজ বাড়ী এসে দেখলো, মা 'মানকচুর চচ্চড়ি' করেছেন । আর সেই সঙ্গে আছে ডাল। মা যখন দুটো পোড়া মরিচ সিরাজের থালে এগিয়ে দিচ্ছিলেন, তখন সিরাজ একবার মা যেমন না দেখে—এমনি লুকোচুরির মত মায়ের দুই চোখ দেখে নিল। সিবাজের এখন বোঝার বযস হয়েছে যে মা তার কাছে সব সময় সংসাবের অক্ষমতাগুলো লুকিয়ে রাখতে চান।

সিরাজ ভাবলো, এখন চুপচাপ খেয়ে ওঠাই মায়ের জন্য সান্ত্বনা। তা-না হলে, গভীর রাতে পাশের ঘরে একা যেমন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে তেমনি কেঁদে উঠবে। বয়সটা এমন যে—সান্ত্বনা দিতে লজ্জা লজ্জা ভাব আসে। বারো বছরেব সিরাজ বাস্তবের জন্যে কতটুকু।

ভাত পাতে থাকতে থাকতেই মা এক সময় নীরবতা ভাঙ্গলেন।

ঃ জায়গীরদের অবস্থা কেমন রে? খাবার-দাবার ভালো দেয় তো? দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছিস কেন?

চট করে একটা জবাব দিয়ে দিলে হত। কিন্তু বারো বছরের সিবাজের বড অহংকার। ঐ বয়সেই পৃথিবীর বাস্তবতা ওকে 'পুরুষ' করে তুললো। মায়ের প্রশ্নের সাথে সাথেই জায়গীর বাড়ির ঐ মহিলার ছবি ভেসে উঠলো। সকাল বেলার পান্তা ভাত আর দুটি লংকা বাইবের ঘরে চাকর ছেলেটা এগিয়ে দিয়ে বলেছিল, মায় কইছে অন্য কোথাও জায়গীর দেখতে। পরিবারের অবস্থা অহন বালা যাইতাছে না। কিন্তু তখন মি৲ ছাড়া উপায় ছিল না। সিরাজ বললোঃ জায়গীর বাড়ির খালাম্মা অনেকটা তোমার মত। খুব আদর করে আমাকে।

মা খুশী হয়েছেন বলে মনে হলো সিরাজের। আরো দুটো ভাত বেড়ে দিতে চাইছিলেন তিনি। সিরাজ আপত্তি জানিয়ে বললোঃ

ঃ পেয়েছ কি তুমি? আর কত খাব?

খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে সিরাজ বাইরে একবার চোখ ফেরায়। আমে সবে বোল ধরেছে। পেঁপে গাছটায় দুটো পেঁপে পেকেছে। সুপারি গাছগুলোতে কয়েক ছড়ি পাকা সুপারি।

মা বললেন ঃ একটা পেঁপে নিয়ে আয়। খাবার পর ফলটল খাওয়া ভালো।

সিরাজের মন তখন অন্য কোথাও। সিরাজ বললো ঃ বাবার খবর কি মা। কবে আসবেন ? কোন চিঠি পেয়েছো ?

মা বললেন ঃ গতকাল এসেছে। মসজিদের অবস্থা খুব ভালো যাচ্ছে না। লোকজন বড় একটা ডাকে না। আখেরাতের আর দেরী নাই। ধর্ম-কর্মে মানুষের আজকাল মন উঠে গেছে। কাল পরশু আসতে পারেন তিনি।

সিরাজ কোন কথা বললো না। বাইরে বেরিয়ে এলো। এই বাড়ী থেকে দূরের নদী চোখে ভাসে। আকাশে এখন টুকরো মেঘের খেলা। হলুদ রঙের একটি পাখী খুব সুন্দর শিষ বাজাচ্ছিল। পুকুর ঘাটের পানি পাশের বাড়ীর বউ এসে দোলা দিয়ে গেল। চাল ধোয়ার পানিগুলো একটি বৃত্তের মতো অনেকক্ষণ পুকুর ঘাটে ঘোলাটে হয়ে থাকলো। আস্তে আস্তে সিরাজ নিজেদের আঙ্গিনা পেরিয়ে রাস্তায় পা দিল। হোক অভাব। তবুও নিজের বাড়ী কত ভালো। মায়ের জন্য, শুধু মায়ের জন্য। এক মুহূর্তে অনেক বড় হয়ে মাকে যদি শহরে নিয়ে যাওয়া যেত। বড় রাস্তায় পা দিতেই মায়ের গলা সিরাজকে জড়িয়ে রাখে।

ঃ এইমাত্র এলি। এখন আবার কোথায় যাচ্ছিস ?

সিরাজ ফিরে এলো আবার। মনে মনে বললো ঃ মা তুমি জান না, মাত্র তিন ঘন্টায় ২০ মাইল রাস্তা পায়ে হেঁটে আসতে পারি আমি। যাদের পয়সা আছে তারা গাড়ী চড়ে আসতে পারে। আমার শক্তি আছে আমাকে এত ছোট ভাব কেন তুমি ?

ঘরের আঙ্গিনায় বসে পড়লো সিরাজ। সামনের লেবু গাছটার কয়েকটি হলুদ ঝরা পাতা বাতাসে নিরুদ্দিষ্ট হলো। মা এসে আবার পাশে বসেন।

ঃ স্কুলে লেখাপড়া কেমন হয় রে ?

ঃ ভালো, সিরাজ ছোট্ট জবাব দিল।

ঃ বড় আপাকে কতদিন দেখিনা। ও কবে আসবে ?

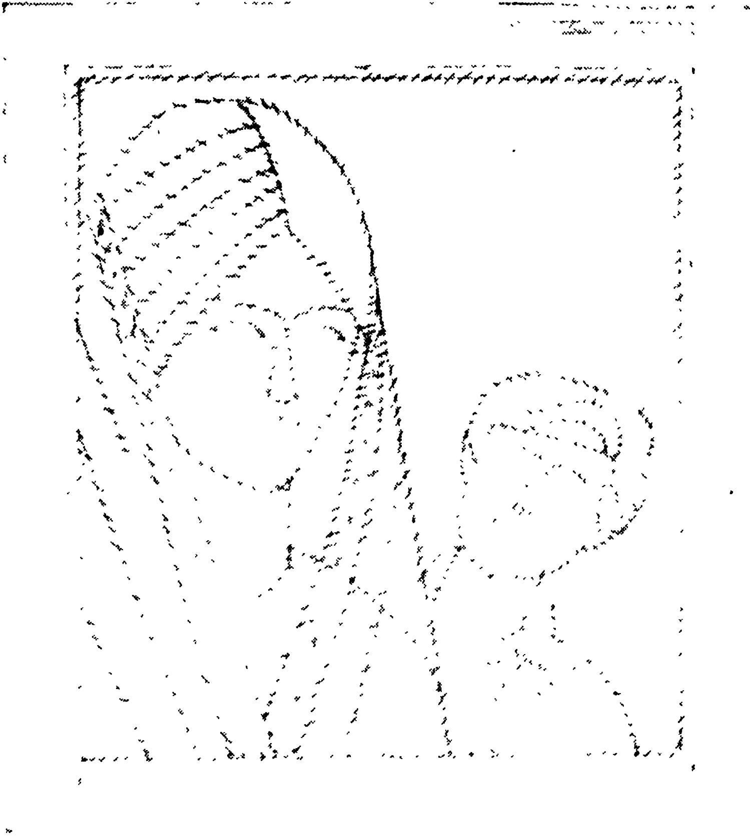
ঃ আল্লা জানে ? ওর শাশুড়ী আসতে দিতে চায় না।

সিরাজের খুব রাগ হয়। এক ধরনের অস্থিরতা ওকে দুর্বিনীত করে তোলে। আমার আপা। আর মাতব্যরি করেও আরেকজন ? এই ধরনের একটা ভাবনা সিরাজকে পেয়ে বসলে সিরাজ মাকে বলে—মা আমি 'কুনাগাম' যাবো, আপাকে নিয়ে আসবো। আর আব্বাতো কালকে আসছেনই।

মায়ের চোখ চিক চিক করে। মুখে কথা ফুটে না। মনে হলোযেন অনেক কষ্টে মা গলা খুললেন। বললেন, যা রাবেয়াকে নিয়ে আয়। দুটো পেঁপে পেকেছে। সঙ্গে নিয়ে যা। গাছে কয়েকটি লেবুও পেকেছে। যাওয়ার সময় বাজার থেকে আধাসের জিলাপী নিয়ে গেলে ওর শাশুড়ীখুশী হবে।

এবার সিরাজ সুখী পাখী। ইস কত দিন পরে আপার সঙ্গে দেখা হবে। একা বাড়ী কেমন খা খা করে। সারা রাত দাওয়ায় বসে গল্প করবো আমরা। এখন তো আবার জ্যোস্নার সময়। সারা আকাশ জুড়ে রূপালী আলোর মেলা। 'সুত্তরা' বনে জোনাকী পোকার চঞ্চলতায় এখনো সিরাজ ভয় পায়। আর আপাও এমন দুষ্টু। সেই সময়ই যত ভূত পেত্নীর গল্প বলে।

বিকেলে আবার শ্বশুর বাড়ী যাবার একটু আগেই মসজিদের ইমাম সাহেব আসলেন। সঙ্গে আরেকটি লোক। মসজিদের ইমাম সাহেবের মাসোহারার জন্যে প্রতিটি রবিবার পিছু একসের ধান অথবা আধসের চাল বরাদ্দ। এটা থেকেই ইমাম সাহেবের বেতন হয়। গ্রামের লোকজন অবশ্য সেচ্ছায় এই চাল দিতে চায় না। সময় সময় ইমাম সাহেব এসে বাড়ী বাড়ী ঘুরে তার পাওনা নিয়ে যান।



ইমাম সাহেব সুন্দর করে হাসতে জানেন। আঙ্গিনায় সিরাজকে দেখেই বললেন, সিরাজ মিয়া যাও ক ? রাবেয়ার শ্বশুর বাড়ী বুঝি ?

ঃ জ্বি। সিরাজ বিনীত জবাব দেয়।

মা ভেতরের ঘর থেকে সিরাজকে ডাকলেন। কেমন অবসাদ আর ভাবলেশহীন দেখাচ্ছিল মাকে। সিরাজকে ডেকে বললেন ইমাম সাহেবকে বল রবিবার আসতে। তোর বাবাও আসবে। তখন তার পাওনা দিয়ে দেবো।

সিরাজ মায়ের অসুবিধা বুঝতে পাচ্ছে। সে বাইরে এসে সোজাসুজি বলেই দিল, ওস্তাদজী রোববার দিন আপনার চাল দিয়ে আসবো।

ওস্তাদজী কিছু বললেন না। মুহূর্তের মধ্যে তাঁর মুখ কিছুটা পানসে দেখালো। দুঃখ করে বললেন, বাড়ী যাবো তো ? তাই—। ঠিক আছে তোমার আব্বা আসলে আসবো। তা তুমি এখন কোন স্কুলে পড় ?

ঃ ঝিঙ্গাবাড়ী হাইস্কুল। সিরাজ জবাব দিল।

ঃ তোমার আব্বা মস্ত ভুল করলেন। নিজে কোরাণে হাফিজ হয়ে কি করে স্কুলে দিলেন তোমাকে বুঝলাম না। এত কষ্ট করে জায়গীরে থাকো। নিজের গ্রামেই তো মাদ্রাসা ছিল।

সিরাজের মুখে তখন কথা ছিল না। সিরাজ স্কুলের কথা বললে কথা বাড়বে।

এক সময় ইমাম সাহেব চলে গেলেন।

বিকেলের একটু আগে সিরাজ আপার শ্বশুর বাড়ী রওয়ানা দিল। সঙ্গে পেঁপে, লেবু। আর বাজার থেকে কিনতে হবে আধাসের জিলাপী। বুক পকেটে হাত রেখে সিরাজ দেখলো অনেক কয়টি ভাংতি পয়সা একটি পুটলিতে বেঁধে দিয়েছেন। সিরাজ জানে এই টাকা কোথা থেকে এসেছে। মা যখন একা থাকেন তখন লুকিয়ে মুরগীর ডিম, পেঁপে, লাউ বিক্রি করেন। গ্রামের মেয়েরাই কিনে নিয়ে যায়।

দুইপাশে ধান ক্ষেত রেখে মাঝখান দিয়ে বড় রাস্তা এঁকে বেঁকে গেছে। হু হু করে বাতাস বইছে। দূরে কয়েকটি কানি বক সিরাজকে দেখে হুশিয়ার হয়ে গেল। কাছে আসতেই দে ছুট। সিরাজ না হেসে পারল না। মাঠ থেকে একটি নুড়ি তুলে অমনি বকগুলোকে ভয় পাইয়ে দিয়ে সিরাজ মনে মনে বলে উঠলোঃ আপারে, কত দিন পর তোকে দেখবো। আপার একটা বাচ্চা হয়েছে। ভীষণ ট্যাটন। সিরাজকে দেখলেই দূর থেকে দৌড়ে আসে। মামা মামা বলে কতভাবে যে আনন্দ প্রকাশ করে। আর আপা, অনেকটা মায়েরই মত ওর চোখ দুটোও চিক চিক করে উঠে। দৌড়ে এসে পাখা করতে থাকে। তাই দেখে হাসি পায় সিরাজের। এই আপা আগে এত দুষ্টু ছিল ? মা যদি বলতো রাবেয়া পুকুর থেকে এক বদনি পানি নিয়ে আয়। ওমনি আপা আবার হুকুম দিত সিরাজকেঃ সিরাজ মায়ের জন্য পানি নিয়ে আয়। কিংবা দুপুরে গরম লাগলে আপা শুয়ে থাকতো। আর সিরাজের উপর কড়া হুকুম থাকতোঃ ঘুম না আসা পর্যন্ত বাতাস করতে থাকবি।

সিরাজও তাই করতে বাধ্য।

সন্ধ্যের বেশ আগেই সিরাজ 'গুনাগাম' পৌছে গেল। দুষ্টু ভাগ্নেটি পুকুর ঘাট থেকে মামাকে দেখতে পেয়েই এক চিৎকার। 'মামা মামা' বলে দৌড়ে এক লাফে মামার কোলে। মামার হাতের পোটলা-পুটলি রাখার অবসরও মেলে না।

আপা এলো। কেমন ম্লান মুখখানি। দুই চোখে তেমনি জল। হাসলে আপাকে মায়ের মতই মনে হয়। আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে রাবেয়া আপা বললো, গুণ্ডা, এতদিন পর আমাকে মনে হলো ? তোর কিচ্ছু আমি মুখে দেবো না। আব্বা কেমন আছে রে ?

আপার আবার আব্বার জন্য বেশী টান। আব্বার একটু সর্দিজ্বর হলেই আপা খুব ভয় পেত। আর ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতো। তাই দেখে আব্বার খুব হাসি পেত। আব্বা বলতেন—মা, এদিকে আয় তো। ঐ ছুরাটা পড়তো। লাইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ...।

রাত্রে খেতে খেতে সিরাজই প্রথম কথাটা পাড়লো। আপার শাশুড়ীকে বললোঃ খালাম্মা দু'দিন হলো এসেছি। বাড়ীতে আব্বা নেই। অনেক কাজ। আপাকে কয়েক দিনের জন্য নিয়ে যেতে চাই।

প্রথমে যেন আপার শাশুড়ী কিছু শুনেনইনি—এই রকম ভান দেখালেন। পরে সিরাজ

দ্বিতীয়বার কথাটা পাড়াতে তিনি বললেন, জামাল তো বাড়ী নেই। বউকে কেমন করে দেই?

আপার মুখটা কালো হয়ে গেল। মানুষ উদ্যমহীন হয়ে পড়লে যেমন নেতিয়ে পড়ে, অনেকটা তেমনি।

বারো বছরের সিরাজ চালাক ছেলে। ঘটে ওরও বুদ্ধি কম নেই। সিরাজ বললেঃ দু'দিনের জন্য দেননা খালাম্মা। আম্মার খুব অসুখ।

শেষ পর্যন্ত শাশুড়ীর মন নরম হলো। ঠিক হলো পরের দিন সকাল থেকে আপার ছুটি মঞ্জুর। সময়, কিছুতেই দু'দিনের বেশী নয়। রাত্রি থাকতেই আপার গোছগাছ সুরু হলো। শাশুড়ীও পিছে পিছে লেগে থাকলেন। যদি আপা এ বাড়ীর কোন জিনিষপত্র সরিয়ে নিয়ে যায়। মুখে কিছু না বললেও—সিরাজ সবই বোঝে। সকালে যাত্রা সুরুর সময়, রাবেয়া ওর শাশুড়ীর পা ধরে সালাম করে বললো, মা, দুটো ডাব নিয়ে যাই। গাছেতো অনেক ডাব?

ডাব পাড়তে পাড়তে সময় আরো গড়িয়ে গেল। বারো বছরের সিরাজ দুই কাঁধে মামাকে তুলে নিল। এক হাতে ডাব। অপর হাতে ছোট্ট টিনের বাক্স। কালো বোরকার ভেতর থেকে শুধু দুটি চোখ দেখা যায়।

বড় রাস্তায় পা দিলে, ওরা নিজেদের খুদমুদ মনে করে। রাবেয়া সিরাজকে বলে; বাবা নিশ্চয়ই চলে আসবে? কি বলিস? চলে আসবে না?

সিরাজ দুষ্টামি করে বলে, তুই আব্বার মেয়ে, আমি আম্মার ছেলে। রাবেয়া হেসে ফেলে। সিরাজের একটা হাত ধরে মাথায় একটা থাপ্পর মারে। বলে, বাড়ী গেলে খালি ঘুমিয়ে সময় কাটাবো, কোন কাজ করব না।

সিরাজ বলে, শুধু রাত্রে ঘুমিয়ে থাকলে চলবে না। সারা রাত তোর গল্প শুনবো।

কিছুক্ষণের মৌনতা ভেঙ্গে সিরাজ আবার বলে, তোর শাশুড়ী তোকে খুব খাটায় তাইনা আপা? আপার দুই চোখ সজল হয়। তবু মুখে কিছু বলে না। হঠাৎ একসময় বলে বসে, সিরাজ তুই যদি আমার বড় ভাই হতি? খুব ভালো হতো। তোকে খালি আব্দার করতাম। খালি খালি সবকিছু চাইতাম। আমাদের ওদিকে চুড়ির দাম কি রকমের?

সিরাজের খুব কান্না পায় তখন। শুধু মনে হতে থাকে একদিনে যদি বড় হওয়া যেত।

বাড়ী পৌঁছুলে আর মায়ের আনন্দ ধরে রাখা যায়না। মেয়েকে জড়িয়ে ধরে প্রথমে কান্না। তারপর নাতিকে কোলে তুলে আদর। অবস্থা দেখে সিরাজ হাসতে হাসতে বললে, এখন মেয়ে পেয়েছে। আমি আর কে?

আপা বোরকা খুলে ধড়াস করে চৌকিতে গা এলিয়ে দিল। ঠিক যেন ছ' বছরের সেই আপা। এখনই বলবে, বাতাস কর। ঘুম না আসা পর্যন্ত বাতাস কর।

দু'দিন প'রও আব্বা যখন আসলেন না তখন সকলেই চিন্তিত হয়ে পড়লো। বিশেষ করে রাবেয়াতো বাচ্চাদের মতো কান্নাই জুড়ে দিল, এত দিন পরে আসলাম আব্বাকে দেখবো না।

সুতরাং আবার সিরাজের যাত্রা সুরু হয়; আপা তার টাকশাল থেকে পাঁচটি টাকা দিয়ে সিরাজকে বলল, যা, আব্বাকে নিয়ে আয়; বাড়ী আসলে হয় একবার।

একই দিন আছরের নামাজের পর আবার যাত্রা সুরু। এবার সেই 'চারবাট'। তবে হেঁটে নয়। পাকা সড়কে বেবী আছে। বেবীতে করে যাবে সিরাজ। আনন্দে সিরাজের মনে হয়—সে যেন খুব বড় লোক এখন। রাজা।

দেড় ঘন্টার মধ্যেই সিরাজ 'চারবাট' পৌঁছে যায়। বাবার মসজিদে গিয়ে তাঁকে পেলনা সে;

মসজিদে মোরাজ্জিন বললেন ; চাঁদা তুলতে গেছেন। পাশের গ্রামেই। বস। কিছু খাবে ?

সিরাজ দাঁড়াল না সেখানে। দ্রুত পায়ে পাশের গাঁয়ের দিকে পা দিল। কিছু পথ যেতেই বাবার দেখা পেল সে। গায়ে আলখেল্লা নেই। রোদে সাদা শরীর লাল হয়ে গেছে। খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাঁকে। গায়ে সাদা গেঞ্জি ঘামে জবজবে হয়ে গেছে ; কাঁধে ধানের টুকরি।

সিরাজ আর আবেগ ধরে রাখতে পারে না। পা ধরে সালাম ক'রে আব্বাকে বলে বসলো, একটি লোক আনলেও তো হত।

আব্বা হাসলেন, কি দরকার। আমিই তো পারি। হযরত মোহাম্মদ (আঃ) নিজের কাজ নিজেই করতেন। এটা রাসুলের সুন্নত।

আব্বা যে নিজের অক্ষমতা আড়াল করছেন, সেটা বারো বছরের সিরাজের বুঝতে বাকি রইল না। টুকরিটা মাথা থেকে নামিয়ে নিল সে ; মাটির দিকে তাকিয়ে বললোঃ আপা এসেছে। তাই তোমাকে নিতে এসেছি।

রাবেয়ার খবর পেয়ে বাবা বাচ্চা ছেলের মত খুশী হলেন। জমানো ধান আর চাল ঐ ঘরেই চল্লিশ টাকায় বিক্রি করে দিলো। তারপর সিরাজকে বল্লেন, চল যাই। তুই আমার পাঞ্জাবীটা নিয়ে আয়।

বাস স্টেশনে এসে সিরাজ আব্বাকে বলল, আব্বা, দুইটা টাকা দাও না। একটা জিনিস কিনিব।

আব্বা কোন আপত্তি তুললেন না। শুধু বললেন, কি কিনবি ?

সিরাজ টাকা নিয়ে দোকানে গেল। হাতের মধ্যে আপার বেচে যাওয়া তিন টাকা ও আব্বার দুই টাকা এই মোট পাঁচ টাকা দিয়ে এক ডজন চুড়ি কিনল। আহ, আপাকে খুব সুন্দর দেখাবে। আব্বাও রাবেয়া আপার ছেলের জন্য একটা গেঞ্জী কিনলেন আর একপোয়া বিস্কুট।

সন্ধ্যেয় ওরা বাড়ী এলো। টানাপোড়োনের একটি সংসার মুহূর্তেই আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। ঘরে এসে সিরাজ দেখলো, আপা পায়ে আলতা পরেছে। আর জোরে জোরে কথা বলছে। এক দুপুরেই যেন চেহারায় কত ঔজ্জ্বল্য এসেছে। ভিতরের ঘরে আজ ভালো রান্না হচ্ছে। ছোট্ট একটা ইলিশ মাছ ভাজি হচ্ছে। আম্মা, আব্বা আর আপা রান্না ঘরের উনুনে বসে বসে গল্প করছেন। এই ফাঁকে সিরাজ আপাকে ডাক দিল। বল্লে, আপা শোন।

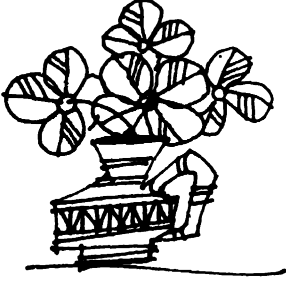
রাবেয়া বাইরে এলে সিরাজ বলে, চল পুকুর ঘাটে যাই। একটা জিনিস দেব তোকে।

পুকুর ঘাটে বসে সিরাজ সার্টের পকেট থেকে চুড়ি বের করে। বলে, তোর জন্যে এনেছি।

খুশীতে আপা কেঁদে ফেলে। জড়িয়ে ধরে সিরাজকে। বলে, তুই বৃত্তির টাকা পেলে আমাকে শাড়ী দিবি। আর রোজ দেখে আসতে যাবি।

তখন রাবেয়া আর সিরাজের ছায়া জ্যোৎস্নার জলে ধরা পড়ে। বাতাসে জল কাঁপছে। সেই সঙ্গে ভাই-বোনের ছায়াটাও কাঁদছে। রাবেয়া কাঁদতে কাঁদতে বলে, ওখানে আমার ভালো লাগেনা। শুধু বন্দী বন্দী মনে হয়। তুই অনেক বড় লোক হলে ; আমাকে নিয়ে আসবি। আসবি না ?

সিরাজের মুখে কথা নেই। পুকুরের স্থির জলের মতোই ওদের চারটা চোখ পুকুর হয়। এত জল সেখানে। শুধু জল আর জল।



সবুজ সংকেত

কল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায়

সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরে অয়ন দেখল কেউ নেই। সব ঘরে তালাবন্ধ। শুধু তার পড়ার ঘরের দরজা খোলা। সে ঘরে এসে চেয়ারে বসে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।

যখন দুপুরে বাড়ি থেকে বেরোয় তখন টেবিলটা ভাল করে গুছিয়ে রেখেছিল, এখন দেখল সব কেমন এলোমেলো। অয়ন তাড়াতাড়ি উঠে একটা মোটা বই টেনে নিল। পঁচাশি পৃষ্ঠা খুলে দেখল তার কুড়ি টাকার নোটটা ঠিকই আছে। তাহলে? টেবিলের ড্রয়ার টেনে দেখল ডাকটিকিটের অ্যালবামটাও জায়গামতো আছে। এই দুটো ছাড়া তার আদতেও হারাবার মতো কিছু নেই।

টুইকে বার বার বলা হয়েছে টেবিলে যেন হাত না দেয়। সেদিন তো এই নিয়ে ভয়ানক ঝগড়া হয়ে গেল। মা শুধু বোনের দিকে। আর একটু হলেই কান ধরে টেনে দিত। অয়ন সময়মতো পালিয়ে গিয়েছিল।

টেবিলের ছড়ানো-ছেটানো বইপত্র গুছিয়ে রাখতে রাখতে ভাবল টুই নিশ্চয়ই খুব রেগে আছে। কথা ছিল সিনেমা দেখতে গেলে অয়ন আজ সবাইকে খাওয়াবে। সবাই বলতে তো মা, টুই আর ছোটমাসি। বাবাকে নিয়ে সিনেমা দেখতে যাওয়ার কথা তো ভাবাই যায় না। মনে হয় পৃথিবীর ব্যস্ততম মানুষ।

আসলে আজই যে কুনালের কাছ থেকে সমস্ত খাতা নিয়ে আসতে হবে এটা সকালের দিকে মনে ছিল না। দুপুরে সবাই যখন গভীর ঘুমে তখন কাউকে কিছু না বলে অয়ন চলে গিয়েছিল। সিনেমাটা সবার সঙ্গে দেখা হল না। তাই বলে গোছানো বইপত্র সব ওলটপালট করে দিয়ে রাগ দেখানো! আজ টুইয়ের সঙ্গে ঝগড়াটা কিছুতেই এড়ানো যাবে না।

অয়ন চিৎকার করে ডাকল, "রঘুদা, রঘুদা!" কোনো সাড়াশব্দ নেই। সে দোতলার বারান্দার

রেলিং থেকে ঝুঁকে চারিদিকে তাকাল। আবার রঘুকে ডেকে নিজের ঘরে এল।

কুনালের কাছে সমস্ত খাতা ছিল তাই গত সাতদিনে তেমন পড়াশুনা হয়নি। কুনাল দু-একটি বই ছাড়া আর কোনো বই কিনতে পারেনি। ওর বাবা একটি জুট মিলে কাজ করেন। বহুদিন যাবত মিল বন্ধ। কুনালের জন্যে সে সব-কিছু করতে পারে। স্কুলে এবং স্কুলের বাইরে কুনাল ছাড়া অয়নের বন্ধু নেই।

অয়নের বাবা মাঝে মাঝে বলেন, "এই যে বাড়ি-গাড়ি, অর্থ দেখছ সবই আমার পরিশ্রমে একটু-একটু করে তৈরি। তুমি যেন কখনো এসবের অহংকারে সত্যিকারের মানুষকে চিনতে ভুল কোরো না। আর একটা কথা জেনো, অর্থটাই জীবনের সব নয়।"

অয়ন আর টুইকে নিয়ে বাবা-মা'ব খুব গর্ব, তাঁদের মনের মতো করে তৈরি হচ্ছে ছেলে-মেয়ে।

ঘরের আলো নিবিয়ে টেবিলেব আলো জ্বেলে পড়তে বসল অয়ন। অনেকক্ষণ পড়তে পড়তে মাথাটা ঝিমঝিম করছিল। ঠিক তখনই ঝপ্ করে আলো নিবে গেল। সে বই বন্ধ করে মুখ তুলল। প্রথমটা বুঝতে পারেনি। তারপর ভাল করে লক্ষ্য করে দেখল তার মুখোমুখি জানলার গ্রিলের ফাঁকে দুটো অদ্ভুত হলুদ আলোর বিন্দু। অয়ন চিৎকাব করে বলল, "কে?"

আলোর বিন্দু দুটো চট্ করে সরে গেল। অয়ন চিৎকার করে ডাকল, "রঘুদা, রঘুদা।" কেউ সাড়া দিল না। সে জানে না কোথায় দেশলাই কোথায় কী। আলো আসাব অপেক্ষায় চুপ করে বসে রইল।

অন্ধকার বারান্দায় আবার হলুদ আলোর বিন্দু দুটো দেখতে পেল সে। ছোট সরু পেনসিল টর্চের আলোর মতো দুটো তীব্র আলোব রশ্মি পাশাপাশি চারদিকে ওঠানামা করছে।

এবার আর বসে থাকা যায় না। অয়ন কোনো শব্দ না করে বেড়াল-পায়ে এগিয়ে গেল। আলো দুটো উলটো দিকে ঘুরে গেল। দেখা যাচ্ছে না। একটা ছায়ামূর্তি স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। অয়নের হাত দুটো অদ্ভুত ভঙ্গিতে ইস্পাতের মতো কঠিন হয়ে গেল। সে কোনো আঘাত করবার আগেই ছায়ামূর্তি ঘুরে গেল, হলুদ আলো দুটো সোজা এসে পড়ল অয়নের গায়ে। সে অবাক হয়ে বলল, "রঘুদা, তুমি!" এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তার গা-হাত-পা কেমন অবশ হয়ে এল। সে সোজা দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। বারান্দার রেলিং ধরে কোনো রকমে টাল সামলে নিল। কিছুতেই সোজা দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছে না। হাঁটু মুড়ে বারান্দাতেই ধপ্ করে বসে পড়ল। সে ভাল কারাটে লড়তে পারে। গায়ের যথেষ্ট জোর। কখনো নিজেকে এমন অসহায় মনে হয়নি। বসে বসেই দেখল রঘু তার বাবার ঘরের তালাবন্ধ দরজাটা অনায়াসে খুলে ফেলল। রঘুর চোখের হলুদ আলোর রশ্মি একবার তালাটার উপরে পড়তেই তালা খুলে নীচে পড়ে গেল।

ঐ ঘরে অনেক জরুরি কাগজপত্র আছে। বেশ কয়েক মাস ধরে একটা বিরাট অপরাধীচক্র ধরবার জন্য বাবা খুবই চিন্তিত। যাবতীয় নথিপত্র একটা সিন্দুকেব মধ্যে বন্ধ। একটা চাবি বাবার কাছে। আর একটা অয়নের কাছে। সেটা এমন এক জায়গায় লুকনো যা কুনাল ছাড়া বাবাকেও জানায়নি সে।

রঘু কেন বাবার ঘরের তালা খুলবে! আর ওর চোখেই বা এমন হলুদ আলো কেন। রঘুর যখন দশ বছর বয়স তখন বাবা ওকে মেদিনীপুর থেকে নিয়ে আসে। সংসারে ওর কেউ নেই। তখন থেকে প্রায় তিরিশ বছর বয়স হল আজ পর্যন্ত কোনো অবিশ্বাসের কাজ করেছে বলে

শোনা যায়নি। অয়নকে রঘু খুব ভালবাসে। একবার ওর উপস্থিত বুদ্ধির জন্য বাবা মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছিলেন। অয়ন কিছুতেই রঘুর এই কাজের কোনো মানে খুঁজে পেল না।



উঠে বাধা দেবে তেমন শক্তিও শরীরে নেই। তার খুব কান্না পেয়ে গেল।

অয়ন হঠাৎ দেখল সামনে সবুজ আলোর রশ্মি। খুব ভয় পেয়ে সে লাফিয়ে উঠতে গেল। খুব সহজেই উঠে দাঁড়াল। একটু আগের কোনো দুর্বলতাই আর নেই। সে দেখল তার সমস্ত গা-হাত-পা সবুজ হয়ে গেছে। যে সবুজ আলো মেঝেতে আছড়ে পড়েছে তা মনে হল তারই চোখ থেকে আসছে। একটু আগে অনেকটা এই ধরনেরই হলুদ আলো সে রঘুর চোখে দেখেছিল।

রঘুর কথা মনে পড়তেই সে অন্য কিছু ভাববার সময় পেল না। দ্রুত বাবার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। সে অনুভব করল কে যেন তার নিজের ভিতর থেকে নির্দেশ দিচ্ছে। সেই অনুযায়ী সে দরজার একটা পাল্লার দিকে তাকাল। দরজার পাল্লাটা শব্দ

করে খুলে পড়ে গেল।

ঘরের ভিতরে ঢুকে দেখল রঘু সিন্দুকের সামনে দাঁড়িয়ে। সিন্দুকটা যেন হলুদ আলোর মধ্যে ডুবে থেকে দাউ-দাউ করে জ্বলছে। অয়ন ঘরে ঢুকতেই হলুদ আলো ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে এল। সিন্দুক না খুলতে পেরে অয়নের দিকে খরদৃষ্টিতে তাকাল রঘু। চিৎকার করে বলল, "আপনার সবুজ আলো সরিয়ে নিন। আমি সহ্য করতে পারছি না।"

অয়নের সঙ্গে রঘু কখনো আপনি করে কথা বলেনি। রঘুর কণ্ঠস্বর কেমন যেন ভয়ংকর।

কিছুটা এগিয়ে অয়ন বলল, "তুমি বাবার সিন্দুক খুলছ কেন রঘুদা?"

রঘু চিৎকার করে বলল, "আমার পথ থেকে সরে দাঁড়ান আহাব।" এই বলে সে অয়নকে মারবার জন্য হাত ওঠাল।

অয়নের সমস্ত শরীর আরো গাঢ় সবুজ হয়ে উঠেছে। সে রঘুকে মারবার জন্য হাত তুলতে গিয়ে ডান পা উপরে তুলে রঘুর মাথায় আঘাত করতে গেল। তার আগেই রঘু সেই মারটা এড়িয়ে কোমরের কাছে এমন এক লাথি মারল যে অয়ন সামলাতে না পেরে ছিটকে বারান্দায় এসে মুখ থুবড়ে পড়ল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই সে উঠে দাঁড়িয়ে দেখল রঘু এমন একটি মারের ভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে আসছে যে-মার আটকে পালটা মারবার কৌশল তার জানা নেই। সে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রঘুকে বাইরে নিয়ে আসবার জন্য একটা মারের ভঙ্গি করে আহ্বান জানাল। উত্তেজিত হয়ে বীভৎস মুখের ভঙ্গি করে রঘু এগিয়ে আসতেই সে আচমকা সরে গেল। রঘু বারান্দার রেলিংয়ে আছড়ে পড়তেই একটা মোক্ষম লাথি রঘুর চোয়াল লক্ষ্য করে মারতে ও বসে পড়ল।

অয়ন অবাক হয়ে গেল। এমন মার সে দিতে পারবে আশা করেনি। ভাবল এটা কেমন করে হল। আরও ভেবে অবাক হল রঘু এই সমস্ত মার শিখল কোথা থেকে!

এমন সময় রঘু বলল, "আহাব, হয় আজ আপনি থাকবেন, না হয় আমি থাকব।"

অয়নের ভিতরে কেমন এক জ্বালা। সে রঘুকে উপরি-উপরি বেশ কয়েকবার মারল। কয়েকটা মার রঘু আটকালেও বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারল না। বারান্দার এককোণে এলিয়ে পড়ল।

অয়নের চোখের তারা কাঁপছে। তার চোখ থেকে সবুজ আলো যেন জমাট তরল পদার্থের মতো রঘুর সর্বাঙ্গ ঢেকে দিল।

সমস্ত শরীরটা কেমন পাথরের মতো ভারী হয়ে উঠেছে অয়নের। চারিদিকটা কেমন ঘুরছে। সে আর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না।

অয়ন চোখ খুলতেই বাবা-মা টুই, ছোটমাসি আর বাবার বন্ধু পুলিশ কমিশনার নীলাঞ্জন অধিকারী একসঙ্গে তার মুখের উপর ঝুঁকে পড়লেন। মা বললেন, "কেমন আছিস অয়ন?"

অয়ন কথার কোনো জবাব না দিয়ে নিজের হাতদুটো তুলে দেখল। নীলাঞ্জন অধিকারী বললেন, "এতদিনে কারাটে শেখাটা তোমার সার্থক হয়েছে। তোমার তো দেখছি কিছুই হয়নি। বেচারা রঘুকে ওরা বেদম মার মেরেছে।"

মা বললেন, "কী ভাগ্যি তুই বাড়িতে ছিলি, তা না হলে রঘুকে ওরা মেরে সব নিয়ে যেত।" অয়নের বাবার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি আর কাগজপত্তরগুলো বাড়িতে রেখো না।

বাবা সামান্য হাসলেন। বললেন, "তোমরা সিনেমায় গিয়ে ভাল করেছ। তোমাদের কিছু হয়ে গেলে অনুশোচনার সীমা থাকত না।"

বাবা-মা'র কথা শুনে অবাক হয়ে অয়ন উঠে বসল। নীলাঞ্জন অধিকারীর দিকে তাকিয়ে

বলল, "নীলুকা, তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

বাবা বললেন, "তোমার কথা আমরা পরে শুনব। চলো ও-ঘরে রঘুকে দেখে আসি। ওকে একা ফেলে এসেছি।"

অয়নকে দেখে রঘু কেঁদে ফেলল। "দাদাবাবু, আমার কী হল। ও দাদাবাবু।" বলে আবার জোরে কেঁদে উঠতেই টুই বলল, "ও রঘুদা, তুমি আর কেঁদো না।"

মা বললেন, "একটু দুধ খাবে রঘু?"

রঘু কিছু না বলে কাঁদতে লাগল। ওর চোয়ালে, কপালে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে বলল, "আমার সর্বাঙ্গে যন্ত্রণা মা।" অয়ন দেখল রঘুর চোখ স্বাভাবিক।

নীলাঞ্জন অধিকারী বললেন, "তুমি কী যেন বলবে বলেছিলে অয়ন?"

অয়ন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর বলল, "না, আমার কিছু বলবার নেই।"

বাবা বললেন, "খেমকার লোকজন যে আমার বাড়িতে হামলা করতে পারে এটা একেবারে মাথায় আসেনি। যাই হোক এবার থেকে আমাদের আরো বেশি সাবধান হতে হবে। মাঝখান থেকে রঘুদা বেদম মার খেল।"

নীলাঞ্জন অধিকারী বললেন, "তবু ঘটনাটা অয়নের মুখ থেকে শোনা যাক।" অয়নের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ক'জন এসেছিল? সবাইকে মেরে তাড়িয়ে তবে নিশ্চয়ই তুমি অজ্ঞান হয়েছ। বাহাদুর বটে।" বলেই হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলেন। হাসি থামিয়ে বললেন, "বলো।"

অয়ন বলল, "নীলুকা, আমার শরীর ভাল লাগছে না। আজ আর কিছু বলতে পারব না।"

"ঠিক আছে ঠিক আছে। আজ তুমি বিশ্রাম করো। আর একদিন তোমার বীরত্বের কাহিনী শোনা যাবে।"

মা বললেন, "অয়ন, চল, তোকে আর টুইকে খেতে দিই। খেয়েই শুয়ে পড়। আজ আর রাত করে পড়তে হবে না।"

টুই বলল, "মা, মাধ্যমিকের টেস্ট পরীক্ষায় দাদা কিন্তু তবে লাড্ডু। পরীক্ষাটা কিন্তু কারাটে দিয়ে পাশ করা যাবে না।"

মা হাসলেন। অয়ন রেগে গিয়ে বলল, "তোকে মজা দেখাচ্ছি। আমার টেবিলের বইপত্তর এলোমেলো করে দিয়েছিস সিনেমায় যাইনি বলে।"

টুই বলল, "মা, দেখো, দাদা ঝগড়া করবার জন্য কেমন মিথ্যে বলা অভ্যাস করছে।"

অয়ন চুপ করে গেল। কোনো কথা না বলে খেয়ে উঠে পড়ল।

কিছুতেই ঘুম আসছে না। সন্ধ্যা থেকে যা ঘটেছে সব একটু-একটু করে ভাববার চেষ্টা করছে অয়ন। কোনোটাই কিছুতে গুছিয়ে সাজাতে পারছে না। চিন্তা করতে গিয়ে বারবার খেই হারিয়ে ফেলছে। মাঝে-মধ্যে ভাবছে সমস্তটাই মিথ্যা। তাহলে অত মজবুত দরজার একটা পাল্লা ভাঙল কে! রঘুদার চোখের হলুদ আলো, তার শরীরে সবুজ রঙ আর চোখে সবুজ জ্যোতি সব মিথ্যা? একটু আগে রঘুদার চোখ দেখে মনে হল অমন সরল বিশ্বাসী চোখ হয় না। তখনকার রঘুদার ছবি অয়নের চোখের সামনে ভেসে উঠতেই একা ঘরে সে শিউরে উঠল। যা কিছু ঘটেছে সে যাকেই বলতে যাক কোনোভাবেই বিশ্বাস করাতে পারবে কি? রঘুদার কথা বললে কেউ মানতে চাইবে না। তাছাড়া কিছুক্ষণ আগে রঘুকে কাঁদতে দেখে তারও তো চোখে জল আসছিল। মাথা গরম হয়ে উঠছে নানা রকম চিন্তায়।

অয়ন ঘরের আলোটা জ্বালিয়ে দিল। বাথরুমে গিয়ে চোখে-মুখে-ঘাড়ে জল ছিটিয়ে এসে

দেখল বাবা বারান্দার রেলিংকে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাচ্ছেন। বাবা ডাকলেন, "অয়ন।"

"কী বাবা?"

"তোমার শরীর খারাপ লাগছে? তোমাকে কেউ বেশি মারতে পারেনি তো?"

"না বাবা। আমি ভাল আছি।" অয়ন এই বলে তার ঘরের দিকে যাবার আগে বলল, "বাবা, রঘু কেমন আছে?"

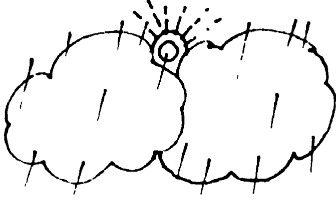
"ভাল। ও বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে।"

অয়নের বুকের ভিতরটা কেমন এক মমতায় টনটন করে উঠল। সে নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে ভাবল খেমকা কে? তার লোকজনদের কী কাজ?

ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করতেই আলোটা ঝপ করে নিবে গেল। ঘোর অন্ধকার কেটে ঘরের মধ্যে হালকা সবুজ আলোর আভা ছড়িয়ে পড়ল। ঘরের দেয়ালে একটা বড় মাপের আয়না টাঙানো আছে। সেদিকে তাকিয়ে দেখল আয়নায় সবুজ অক্ষরে লেখা আছে 'অয়ন'। পাথরের মূর্তির মতো নিশ্চল দাঁড়িয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকল অয়ন। লেখাটা ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠে মিলিয়ে যেতে অয়ন দেখল একটু-একটু করে আয়নাতে আবো লেখা ফুটে উঠছে।

কয়েক হাজার আলোকবর্ষ দূরত্বে থেকেও পৃথিবীকে দখল করার ইচ্ছে আমাদের বহুদিনের। ফুল গাছে ফুটে থাকলে যত সুন্দর দেখায় ঘরে এনে ফুলদানিতে রাখলে আমার তত ভাল লাগে না। তাই একদিন আমি ঠিক করলাম পৃথিবীকে দখল না করে সুন্দর করে সাজিয়ে তুলব। তাই আমার শক্তি প্রয়োগ করে পৃথিবীকে ফুলের মতো ফুটে উঠতে সাহায্য করছি বহু যুগ ধরে। কিন্তু আমার গ্রহে সকলেই আমার সঙ্গে একমত নয়। তারা চায় পৃথিবীতে যারা বুদ্ধিমান প্রাণী তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে ক্রমশ গ্রহটাকে নষ্ট করে দিতে। অন্য অনেক দেশের মতো তোমাদের দেশেও কিছু মানুষের মধ্যে অশুভ বুদ্ধির প্রবেশ করিয়ে দিচ্ছে আমার মতের বিরোধী 'পঙ্গপাল মোর্চা'। তোমার বাবা অনির্বাণ সোম নিজের বুদ্ধি ও দক্ষতায় একটা বিরাট দলকে কিছুদিনের মধ্যেই গ্রেফতার করতে সক্ষম হবেন। যে দল মানুষের মধ্যে বিভেদ জিইয়ে রেখে একটু-একটু করে নানা অছিলায় এই প্রাণীটিকে নষ্ট করে দেবার জন্য বিরাট চক্রান্ত করছে। আপাত সুখ এদের কাম্য। অনির্বাণ সোম এই চক্রান্তের সমস্ত গোপন কাগজ তাঁর নিজের ঘরে সিন্দুকের মধ্যে রেখেছেন। আমাদের 'পঙ্গপাল মোর্চা' চায় ঐ কাগজ নষ্ট করে চক্রান্তকারীদের মদত দিতে। আমি চাই আমার অনন্ত সৌরজগতের মধ্যে পৃথিবী ফুলের মতো ফুটে থাক। তাই 'পঙ্গপাল মোর্চা' যখন রঘুকে মাধ্যম করে কাগজ নষ্ট করবার চেষ্টা করছিল তখন আমি তোমাকে মাধ্যম করে তা নষ্ট হতে দিইনি। তোমার পড়ার টেবিলে সিন্দুকের চাবি খুঁজতে গিয়ে সব ওলটপালট করেছিল রঘু। অবশ্য ও সম্পূর্ণ নির্দোষ। আমার সবুজ অভিনন্দন নাও—আহাব।"

লেখাটা ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে অয়ন আয়নার কাছে ছুটে গেল। ঘরে ঘন অন্ধকার। কী ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। সে অন্ধকারে আন্দাজ করে হাতড়ে নিজের খাটে গিয়ে শুয়ে পড়ল।



কপোট্রনিক ভবিষ্যত

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

বিকেলে আমার হঠাৎ করে মনে হলো আজ আমার কোথায় জানি যাবার কথা। ভোরে বারবার করে নিজেকে মনে করিয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু এখন আর মনে করতে পারছি না। আমি একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম, তবে বিশেষ চিন্তিত হলাম না। আমি ঠিক জানি আমার মস্তিষ্কও কপোট্রনের মতো পুরানো স্মৃতি হাতড়ে দেখতে সুরু করেছে। মনে করার চেষ্টা না করলেও ঠিক মনে হয়ে যাবে।

বৈকালিক চা খাওয়ার সময় আমার মনে পড়লো আজ সন্ধ্যায় একটি কপোট্রন প্রস্তুতকারক ফার্মে যাবার কথা। ডিরেক্টর ভদ্রলোক ফোন করে বলেছিলেন তারা কতকগুলি নিরীক্ষামূলক কপোট্রন তৈরী করেছেন, আমি দেখলে আনন্দ পাব। কিছু দিন আগে এই ডিরেক্টরের সাথে কোন এক বিষয়ে পরিচয় ও অল্প কিছু ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। এখন মাঝে মাঝেই নতুন রোবট তৈরী করলে আমাকে ফোন করে যাবার আমন্ত্রণ জানান।

ফার্মটি শহরের বাইরে। পৌঁছুতে পৌঁছুতে একটু দেরী হয়ে গেল। লিফটে করে সাততলায় ডিরেক্টরের ঘরে হাজির হলাম। তিনি খানিকক্ষণ শিষ্টতামূলক আলাপ করে আমাকে তাদের রিসার্চ সেন্টারে নিয়ে গেলেন। ভেবেছিলাম সদ্যপ্রস্তুত ঝকঝকে কতকগুলি রোবট দেখব কিন্তু সেরকম কিছু না। বিরাট হলঘরের মতো ল্যাবরেটরীতে ছোট ছোট কালো টেবিলের উপর কাচের গোলকে কপোট্রন সাজিয়ে রাখা হয়েছে। একপাশে একটি প্রিন্টিং মেশিন অপর পাশে মাইক্রোফোন, প্রশ্ন করলে উত্তর বলে দেবে কিংবা লিখে দেবে। দেয়ালে কিছু বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, চৌকোণা ট্রান্সফর্মার, দেখে মনে হলো এখান থেকে উচ্চচাপের বৈদ্যুতিক প্রবাহ দেয়া হয়। কপোট্রনের সামনে লম্বাটে মাউথপীস। ঠিক একই রকম বেশ কয়টি কপোট্রন পাশাপাশি সাজানো। আমি জিজ্ঞাসু চোখে ডিরেক্টর ভদ্রলোকের দিকে তাকাতেই তিনি বললেন, রোবটের

শরীরের সাথে এখনও জুড়ে—দিইনি, দিতে হবেও না বোধহয়।

কেন ?

এই কপোট্রনগুলি স্বাভাবিক নয়। সব কপোট্রনই কিছু কিছু যুক্তি-তর্ক মেনে চলে। এগুলির সেরকম কিছু নেই।

মানে ? ওরা তাহলে আবোল তাবোল বকে ?

অনেকটা সেরকমই। ভদ্রলোক হাসলেন। ওদের কল্পনাশক্তি অস্বাভাবিক। ঘোর অযৌক্তিক ব্যাপারও বিশ্বাস করে এবং সে নিয়ে রীতিমত তর্ক করে।

এগুলি তৈরী করে লাভ ? এতো দেখছি উন্মাদ কপোট্রন !

তা উন্মাদ বলতে পারেন ! কিন্তু এদের দিয়ে কোন লাভ হবে না জোর দিয়ে বলা যায় না। বল্পা ছাড়া ভাবনা যদি না করা হতো পদার্থবিদ্যা কোনদিন ক্লাসিক্যাল থেকে রিলেটিভিস্টিক স্তরে পৌঁছুতো না।

তা বটে। আমি মাথা নাড়লাম। কিন্তু তাই বলে ইচ্ছে করে পাগল কপোট্রন তৈরী করবেন ?

আপনি আলাপ করে দেখুন না, আর কোন লাভ হোক কি না হোক নির্ভেজাল আনন্দ তো পাবেন।

আমি একটা কপোট্রনের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার নাম কি হে ?

নাম ? নামের প্রয়োজন কি ? ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য থাকলে নামের প্রয়োজন হয় না, যন্ত্রণা দিয়ে পরিচয় পাওয়া যায়। লাল নীল যন্ত্রণারা রক্তের ভিতর খেলা করতে থাকে .....

সাহিত্যিক ধাঁচের মনে হচ্ছে ? আমি ডিরেক্টর ভদ্রলোকের দিকে তাকালাম।

হ্যাঁ। এটি সাহিত্যমনা। একটা কিছু জিজ্ঞেস করুন।

আমি কপোট্রনটিকে জিজ্ঞেস করলাম, যন্ত্রণারা আবার লাল নীল হয় কেমন করে ?

যন্ত্রণারা সব রংয়ের হতে পারে, সব গন্ধের হতে পারে, এমনকি সব কিছুর মতো হতে পারে। যন্ত্রণার হাত পা থাকে, চোখ থাকে—ফুরফুরে প্রজাপতির মতো পাখা থাকে। সেই পাখা নাড়িয়ে যন্ত্রণারা আরো বড়ো যন্ত্রণায় উড়ে বেড়ায়। উড়ে উড়ে যখন ক্লান্তি নেমে আসে, তখন—

তখন ?

তখন একটি একটি লাল ফুলের জন্ম হয়। সব নাইটিংগেল তখন সবগুলো ফুলের কাঁটায় বুক লাগিয়ে রক্ত শুষে নেয়—লাল ফুল সাদা হয়ে যায়, সাদা ফুল লাল ....

বেশ বেশ। আমি দ্রুত পাশের কপোট্রনের কাছে সরে আসলাম।

এটিও কি ওটার মতো বদ্ধ পাগল ?

না এটা অনেকটা ভাল। এটি আবার বিজ্ঞানমনা। যুক্তি বিদ্যা ছাড়া তো বিজ্ঞান শেখানো যায় না, কাজেই এর অল্প কিছু যুক্তি বিদ্যা আছে। তবে আজগুবি আজগুবি সব ভাবনা এর মাথায় খেলতে থাকে।

আমি কপোট্রনটির পাশে দাঁড়ালাম। জিজ্ঞেস করলাম, বলতে পার বিজ্ঞান সাধনা শেষ হবে কবে ?

এই মুহূর্তে হতে পারে। একটু চেষ্টা করলেই।

আমি ডিরেক্টর ভদ্রলোকের দিকে তাকালাম, তবে না বলছিলেন এটা যুক্তিপূর্ণ কথা বলবে ? ওর বক্তব্যকে ব্যাখ্যা করতে বলুন দেখি।

আমি কপোট্রনটিকে বললাম, বিজ্ঞান সাধনা শেষ হওয়া আমি দর্শন বা অন্য কোন দৃষ্টিভঙ্গী

থেকে বলি নি। আমি সাদা কথায় জানতে চাই বিজ্ঞান সাধনা বা প্রকৃতির রহস্য উন্মোচন কবে শেষ হবে?

বললাম তো, ইচ্ছে করলে এখনই।

কি ভাবে?



ভবিষ্যতের শেষ সীমানা থেকে টাইম মেশিনে চড়ে কেউ যদি আজ এই অতীতে ফিরে আসে আর তাদের জ্ঞান সাধনার ফলটুকু বলে দেয় তা হলেই তো হয়ে যায়। আর কষ্ট করে জ্ঞান-সাধনা করতে হয় না।

আমি বোকার মতো কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, কিন্তু আমরা কি করতে পারি? ভবিষ্যৎ থেকে কেউ যদি না আসে?

নিশ্চয়ই আসবে। কপোট্রনটি যুক্তিহীন ভাবে চেঁচিয়ে উঠল। ভবিষ্যতের লোকেরা নিশ্চয়ই বর্তমান কালের জ্ঞানের দুরবস্থা অনুভব করবে। এর জন্যে কাউকে না কাউকে জ্ঞানের ফল সহ না পাঠিয়ে পারে না।

সেই আশায় কতো কাল বসে থাকব?

লক্ষ বছর বসে থেকেও লাভ নেই। অথচ পরিশ্রম করলে এক মাসেও লাভ হতে পারে।

কি রকম?

যারা ভবিষ্যৎ থেকে অতীতে আসবে তারা তাদের কাল থেকে নিঃসময়ের রাজত্বে ঢুকবে নিজেদের যান্ত্রিক উৎকর্ষতা দিয়ে, কিন্তু নিঃসময়ের রাজত্ব থেকে বর্তমানকালে পৌঁছুবে কিভাবে? কে তাদের সাহায্য করবে? পৃথিবী থেকে কেউ সাহায্য করলেই শুধুমাত্র সেটি সম্ভব।

তোমার কথা কিচ্ছু বুঝলাম না। নিঃসময়ের রাজত্ব কি?

নিঃসময় হচ্ছে সময়ের সেই মাত্রা যেখানে সময়ের পরিবর্তন হয় না।

এসব কোথা থেকে বলছ?

ভেবে ভেবে। মন থেকে বলছি।

তাই হবে। এছাড়া এমন আষাঢ়ে গল্প সম্ভব!

আমি ডিরেক্টর ভদ্রলোককে বললাম, চলুন যাওয়া যাক। আপনার কপোট্রনদের সাথে চমৎকার সময় কাটল। কিন্তু যাই বলুন—আমি না বলে পারলাম না, এগুলি শুধু শুধু তৈরী করেছেন, কোন কাজে লাগবে না।

আমারও তাই মনে হয়। তাঁকে চিন্তিত দেখাল, যুক্তিহীন ভাবনা দিয়ে লাভ নেই।

ফার্ম থেকে বাসায় ফেরার সময় নির্জন রাস্তায় গাড়ীতে বসে বসে আমি কপোট্রনটির কথা ভেবে দেখলাম। সে যেসব কথা বলেছে তা অসম্ভব কল্পনাবিলাসী লোক ছাড়া বলা সম্ভব নয়। কিন্তু ব্যাপারটি কি শুধুই কল্পনা বিলাস? কথাগুলোর প্রমাণ নেই সত্যি কিন্তু যুক্তি কি একেবারেই নেই? আমি ভেবে দেখলাম ভবিষ্যৎ থেকে কেউ এসে হাজির হলে মানবসভ্যতা একধাপে কত উপরে উঠে যেতে পারে। কিন্তু কপোট্রনের ঐ নিঃসময়ের রাজত্ব-টাজত্ব কথাগুলি একেবারে বাজে, শুধু কল্পনা করে কারো এরকম বলা উচিত না, তবে ব্যাপারটি কৌতুহলজনক, সত্যি সত্যি একটু ভেবে দেখলে হয়।

পরবর্তী কয়দিন যখন আমি অতীত, ভবিষ্যৎ, চতুর্মাত্রিক জগৎ, আপেক্ষিক তত্ত্ব ইত্যাদি নিয়ে পড়াশুনা করছিলাম তখন মাঝে মাঝে আমার নিজেরই লজ্জা করত, একটি ক্ষ্যাপা কপোট্রনের কথা শুনে সময় নষ্ট করছি ভেবে। এ বিষয় নিয়ে কেন জানি আগে কেউ কোনদিন গবেষণা করেনি। সময়ে পরিভ্রমণ সম্পর্কে আমি মাত্র একটি প্রবন্ধ পেলাম এবং সেটিও ভীষণ অসংবদ্ধ। বহু পরিশ্রম করে উন্নতশ্রেণীর কয়েকটি কম্পিউটারকে নানাভাবে জ্বালাতন করে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গেল। সেগুলি হচ্ছে, প্রথমত, উপযুক্ত পরিবেশে সময়ের অনুকূল কিংবা প্রতিকূলে যাত্রা করে ভবিষ্যৎ কিংবা অতীতে যাওয়া সম্ভব। দ্বিতীয়ত, সময়ের স্রোতে যাত্রার পূর্ব মুহূর্তে ও শেষ মুহূর্তে অচিন্তনীয় পরিমাণ শক্তিক্ষয়ের প্রয়োজন। সেই মুহূর্তে শক্তিময় নিয়ন্ত্রণ না করলে পুরো যাত্রা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, এবং তৃতীয়ত, যাত্রার পূর্ব ও শেষ মুহূর্তের মধ্যবর্তী সময় স্থির সময়ের ক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রে পরিভ্রমণে কোন শক্তির প্রয়োজন নেই।

আমি ভেবে দেখলাম উন্মাদ কপোট্রনটি যা বলেছিল তার সাথে এই সিদ্ধান্তগুলির খুব বেশী

একটা অমিল নেই। প্রথমবারের মতো কপোট্রনটির জন্য আমার একটু সম্ভ্রমবোধের জন্ম হলো।

এরপর আমার মাথায় ভয়ানক ভয়ানক সব পরিকল্পনা খেলা করতে লাগল। যেসব ভবিষ্যতের অভিযাত্রীরা অতীতে আসতে চাইছে আমি তাদের সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম। নিঃসময়ের ক্ষেত্র থেকে বর্তমানে পৌঁছুতে যে শক্তিক্ষয় হবে তা নিয়ন্ত্রণের যান্ত্রিক কলাকৌশল আমার মাথায় উঁকি দিতে লাগল। এই সময়-স্টেশনটি তৈরী করতে কি ধবনের রোবটের সাহায্য নেব মনে মনে স্থির করে নিলাম।

যে উন্মাদ কপোট্রনটির প্ররোচনায় আমি এই কাজে নেমেছি তার সাথে আবার দেখা করতে গিয়ে শুনলাম সেটিকে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। যারা যুক্তিহীন ভাবনা ভালবাসে তারা নাকি প্রকৃত অর্থেই অপদার্থ। শুনে আমার একটু দুঃখ হলো।

যেহেতু সময়ে পরিভ্রমণ বিজ্ঞানীদের দ্বারা স্বীকৃত নয় এবং এ বিষয়ে গবেষণার জন্য সরকারী সাহায্যের কোন আশা নেই, সেহেতু আমি এই সময় স্টেশনটি বাসাতেই স্থাপন করব ঠিক করলাম। যান্ত্রিক কাজে পারদর্শী দুটি রোবট নিয়ে এসে খুব তাড়াতাড়ি কাজ শুরু করলাম। পুরো পরিকল্পনা আমার নিজের চিন্তা প্রসূত এবং ব্যাপারটি যে কোন বিষয় থেকে জটিল। কাজ শেষ হতে একমাসের বেশী সময় লাগলো। টোপন দিনরাত সব সময় স্টেশনের পাশে বসে থাকত। এটা দিয়ে ভবিষ্যতেব মানুষের সাথে যোগাযোগ করা হবে শুনে সে অস্বাভাবিক কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। কোন্ সুইচটি কোন্ কাজে লাগবে এবং কোন্ লিভারটি কিসের জন্যে তৈরী হয়েছে জিজ্ঞেস করতে তার কোন ক্লান্তি ছিল না।

পরীক্ষামূলকভাবে যেদিন সময়-স্টেসনটি চালু করলাম সেদিন টোপন আমার পাশে বসে। উত্তেজনায় সে ছটফট করছিল। তাব ধারনা এটি চালু করলেই ভবিষ্যতের মানুষেরা টুপটাপ করে হাজির হতে থাকবে!

একটা মৃদু গুঞ্জন ধ্বনির সাথে সাথে দুটি লালবাতি বিপ বিপ করে জ্বলতে লাগল। সামনে নীলাভ স্ক্রীনে আলোকতরঙ্গ বিচিত্রভাবে খেলা করছিল। আমি দুটি লিভার টেনে একটা সুইচ টিপে ধবলাম, একটা বিস্ফোরণের মতো আওয়াজ হল, এখন স্থির সময়ের ক্ষেত্রের সাথে এই জটিল সময় স্টেশনটির যোগাযোগ হবার কথা। সেখানে কোন টাইম মেশিন থাকলে বড়ো স্ক্রীনটাতে সংকেত পাব। কিন্তু কোথায় কি? বসে থাকতে থাকতে আমাব বিরক্তি ধরে গেল, বড়ো স্ক্রীনটিতে এতটুকু সংকেতের লক্ষণ পাওয়া গেল না।

পাশে বসে থাকা টোপনকে লক্ষ্য করলাম। সে আকুল আগ্রহে স্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে আছে, উত্তেজনায় বড় বড় শ্বাস নিচ্ছে। সে প্রতি মুহূর্তে আশা করছে এক্ষুণি একজন ভবিষ্যতের মানুষ লাফিয়ে নেমে আসবে। তাকে দেখে আমার মায়া হলো, জিজ্ঞেস করলাম,

কি রে টোপন, কেউ যে আসে না!

আসবে বাবা আসবে। তাকে স্থিরপ্রতিজ্ঞ দেখাল।

কেউ যদি আসে তাহলে তাকে তুই কি বলবি?

বলব, গুড মর্নিং। সে স্ক্রীন থেকে চোখ সরাল না, পাছে ভবিষ্যতের মানুষ সেই ফাঁকে স্ক্রীনে দেখা দিয়ে চলে যায়।

আচ্ছা বাবা, আমার যদি একটা টাইম মেশিন থাকে—

তাহলে আমি অতীতে যেতে পারব?

কেন পারবি না। অতীত ভবিষ্যৎ সব জায়গায় যেতে পারবি।

অতীতে গিয়ে আমার ছেলেবেলাকে দেখব ?

দেখবি।

আমি যখন হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটতাম তখনকার আমাকে দেখব ?

দেখবি।

আচ্ছা বাবা, অতীতে গিয়ে আমি যদি আমার হামা-দেয়া আমাকে মেরে ফেলি তাহলে আমি এখন কোত্থেকে আসব ?

আমি চুপ করে থাকলাম। সত্যিই তো! কেউ যদি অতীতে গিয়ে নিজেকে হত্যা করে আসে তাহলে সে আসবে কোত্থেকে? অথচ সে আছে, কারণ সে নিজে হত্যা করেছে! এ কি করে সম্ভব? আমি ভেবে দেখলাম এ কিছুতেই সম্ভব না—কাজেই অতীতে ফেরাও সম্ভব না। টাইম মেশিনে করে ভবিষ্যতের মানুষ অতীতে ফিরে আসবে এসব কল্পনাবিলাস। আমি হতভম্ব হয়ে বসে রইলাম। একটি উন্মাদ কপোট্রনের প্ররোচনায় এতদিন শুধুশুধু পরিশ্রম করলাম, অকাতরে টাকা ব্যয় করলাম! রাগে দুঃখে আমার চুল ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে হল। লিভার ঠেলে সুইচ টিপে আমি সময় স্টেশনটি বন্ধ করে দিলাম।

বাবা, বন্ধ করলে কেন ? টোপন অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

তোর প্রশ্ন শুনে। তুই যে প্রশ্নটি করেছিস সেটি আমার আগে মনে হয়নি তাই।

টোপন কিছু না বুঝে বলল, কি প্রশ্ন ?

ঐ যে তুই জিজ্ঞেস করলি অতীতে নিজেকে মেরে ফেললে পরে কোত্থেকে আসব। তাই অতীতে যাওয়া সম্ভব না, টাইম মেশিন তৈরী সম্ভব না—

টোপনের চোখে পানি টলমল করে উঠল। মনে হল এই প্রশ্নটি করে আমাকে নিরুৎসাহিত করে দিয়েছে বলে নিজের উপর ক্ষেপে উঠেছে। আমাকে অনুনয় করে বলল, আর একটু থাক না বাবা।

থেকে কোন লাভ নেই। আয় যাই, অনেক রাত হয়েছে। টোপন বিষণ্নমুখে আমার পিছনে পিছনে আসতে লাগল। আমি বুঝতে পারলাম সময়ে পরিভ্রমণের উপরে কেন এতোদিন কোন কাজ হয়নি। সবাই জানত এটি অসম্ভব, ভবিষ্যৎ থেকে অতীতে আসলে অতীত পরিবর্তিত হয়ে যায়, কিন্তু বাস্তব জগতের পরিবর্তন—তা অতীতই হোক আর ভবিষ্যৎই হোক কোন দিনই সম্ভব নয়। আমি প্রথমে উন্মাদ কপোট্রনটির উপর পরে নিজের উপর ক্ষেপে উঠলাম। কম্পিউটারগুলিকে কেন যে বাস্তব সম্ভাবনার কথা জিজ্ঞেস করিনি ভেবে অনুতাপ হল। কিন্তু তাতে লাভ কি, আমার এই অযথা পরিশ্রম আর কোন দিন ফিরে আসবে না।

টোপন হাল ছাড়ল না। প্রতিদিন আমাকে অনুনয় বিনয় করে সময় স্টেশনটি চালু করতে বলত। তাকে কোন যুক্তি দিয়ে বোঝান গেল না যে কোনদিনই ভবিষ্যতের মানুষ অতীতে আসবে না,—এটি একটি অসম্ভব ব্যাপার। তার অনুনয় বিনয় শুনতে শুনতে আমাকে শেষ পর্যন্ত হার মানতে হল। আমি আবার সময় স্টেশনটি চালু করলাম। টোপনকে সুইচপ্যানেলের সামনে বসিয়ে দিয়ে আমি চলে আসলাম। আসার সময় সাবধান করে দিলাম, কোনও সুইচে যেন ভুলেও চাপ না দেয়। শুধু বড়ো স্ক্রীনটার দিকে যেন নজর রাখে। যদি কিছু দেখতে পায় (দেখবে না জানি) তবে আমাকে যেন খবর দেয়।

এই জটিল ও মূল্যবান যন্ত্রটি সাত বছরের একটি ছেলের দায়িত্বে ছেড়ে দিয়ে চলে আসতে

আমার কোন দ্বিধা হয়নি। আমি জানি বাচ্চা ছেলেদের ছেলেবেলা থেকে সত্যিকার দায়িত্ব পালন করতে দিলে তারা সেগুলি মন দিয়ে পালন করে, আর পরে খাঁটি মানুষ হিসেবে গড়ে উঠে। টোপনের সাথে আগেও আমি বেশ গুরুত্ব দিয়ে কথা বলতাম, প্রায় বিষয়েই আমি ওর সাথে এমনভাবে পরামর্শ করেছি যেন সে একটি বয়স্ক মানুষ। এই সময় স্টেশনটি তৈরি করার সময়েও কোন্ লিভারটি কোথায় বসালে ভাল হবে তার সাথে আলাপ করে দেখেছি।

সারাদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে কাটিয়ে সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে আসতেই বুলা আমাকে বলল, টোপন সারাদিন নাওয়া-খাওয়া করেনি। একমনে সময় স্টেশনের সামনে বসে আছে। আমি হেসে বললাম, একদিন নাওয়া-খাওয়া না করলে কিছু হয় না।

তুমি তো তাই বলবে। বুলা উষ্ণ হয়ে বলল, নিজে যেরকম হয়েছ ছেলেটিকেও সে রকম তৈরি করছ।

বেশ, বেশ, টোপনকে খেতে পাঠিয়ে দিচ্ছি, বলে আমি সময় স্টেশনটিতে হাজির হলাম। অতিকায় যন্ত্রপাতির ভিতরে সুইচ প্যানেলের সামনে ছোট্ট টোপন গম্ভীর মুখে বড়ো স্ক্রীনটার দিকে তাকিয়ে বসে আছে। আমি পিছনে দাঁড়িয়ে তার কাঁধে হাত রাখলাম। সে চমকে উঠে বলল, কে ?

আমি, কিরে কিছু দেখলি ?

এখনও দেখিনি। তবে ঠিক দেখব। সারাদিন না খেয়ে ওর মুখটা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে।

যা এখন খেয়ে আয়। ততক্ষণ আমি বসি।

তুমি বসবে ? টোপন কৌতূহলী চোখে আমার দিকে তাকাল। আমি যাব আর আসব, এক ছুটে—

এক ছুটে যেতে হবে না। ধীরে সুস্থে খেয়ে দেয়ে আয। সারা দিনরাত তো আর এখানে বসে থাকতে পারবি না। ঘুমোতে হবে, পড়তে হবে, স্কুলে যেতে হবে,খেলাধূলা করতে হবে।

কয়দিন খেলাধুলা করব না, স্কুল থেকে এসেই এখানে বসব। তারপর পড়া শেষ করে—

বেশ বেশ !

তুমি না হয় আমাকে শিখিয়ে দিও কিভাবে এটি চালু করতে হয় ? তাহলে তোমাকে বিরক্ত করব না।

আচ্ছা আচ্ছা তাই দেব। এখন খেয়ে আয়।

শেষ পর্যন্ত পুরো সময় স্টেশন ট টোপনের খেলার সামগ্রী হয়ে দাঁড়াল। সে সময় পেলেই, নিজে এসে চালু করে চুপচাপ বসে থাকত, আর যাবার সময় বন্ধ করে চলে যেত। আমি মাঝে মাঝে এসে দেখে যেতাম। টোপনকে জিজ্ঞেস করতাম,

কি রে, কিছু দেখলি ?

এখনও দেখিনি। তবে ঠিক দেখব। এরই নাম বিশ্বাস ! আমি মনে মনে হাসতাম।

এরপর বহুদিন কেটে গেছে। আমি সময় স্টেশনটির কথা ভুলেই গেছি। মাঝে মাঝে টোপন এসে আমাকে নিয়ে যেতো যন্ত্রপাতি ঠিক আছে কি না পরীক্ষা করে দেবার জন্যে। খুঁটিনাটি ভুলের জন্যে ভবিষ্যতের মানুষ হাতছাড়া হয়ে গেলে তার দুঃখের সীমা থাকবে না।

সেদিন দুপুরে আমি সবে এককাপ কফি খেয়ে কতকগুলি কাগজপত্র দেখছি এমন সময় ঝন ঝন করে ফোন বেজে উঠল। সহকারী মেয়েটি ফোন ধরে রিসিভারটি আমার দিকে এগিয়ে

দিল, আপনার ছেলের ফোন।

আমি রিসিভারে কান পাততেই টোপনের চীৎকার শুনলাম, বাবা, এসেছে, এসেছে—এসে গেছে!

কে এসেছে?

ভবিষ্যতের মানুষ! তুমি তাড়াতাড়ি চলে এস। ব্যাপারটা বুঝতে আমার সময় লাগল। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কি রকম মানুষ?

এখনও দেখিনি। বড়ো স্ক্রীনটায় এখন শুধু আলোর দাগ দেখা যাচ্ছে। প্রথমে লম্বা লম্বা থাকে পরে হঠাৎ ঢেউয়ের মতো হয়ে যায়। তুমি তাড়াতাড়ি চলে এস।

সত্যি বলছিস তো? টোপন মিথ্যা বলে না জেনেও জিজ্ঞেস না করে পারলাম না, ঠিক দেখেছিস তো?

তুমি এসে দেখে যাও মিথ্যা বলছি নাকি। টোপনের গলার স্বর কাঁদো কাঁদো হয়ে যায়, এতোক্ষণে চলেই গেল নাকি!

আমি সহকারী মেয়েটিকে বললাম, জরুরী কাজে চলে যাচ্ছি, বাসায় কেউ যেন বিরক্ত না করে। তারপর লিফট বেয়ে নেমে আসলাম,

বাসা বেশী দূরে নয়, পৌঁছুতে বেশী সময় লাগল না। টোপন আমার জন্যে বাসার গেটে অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করছিল। আমাকে দেখেই পুরো ঘটনাটা হড়বড় করে দু'বার বলে গেল। আমি তাকে নিয়ে সময় স্টেশনে ঢুকে দেখি বড়ো স্ক্রীনটা সত্যি সত্যি আলোক তরঙ্গে ভরে যাচ্ছে। এটি হচ্ছে স্থির সময়ের ক্ষেত্রে পার্থিব বস্তুর উপস্থিতির সংকেত। আমার চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল। আমার সামনে সম্পূর্ণ অসম্ভব একটি ঘটনা ঘটতে চলেছে।

এখন আমার অনেক কাজ বাকি। সাহায্য করার কেউ নেই, টোপনকে নিয়েই কাজ সুরু করতে হল। প্রথমে দুটো বড়ো বড়ো জেনারেটর চালু করলাম—গুম গুম শব্দে ট্রান্সফর্মারগুলি কেঁপে উঠল। ঝিলিক ঝিলিক করে দুটো নীল আলো ঘুরে ঘুরে যেতে লাগল। বিভিন্ন মিটারের কাঁটা কেঁপে কেঁপে উঠে স্থির হয়ে গেল। লিভারে চাপ দিতেই সামনে অনেকটুকু জায়গায় শক্তিশালী চৌম্বকীয় ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে গেল। দীর্ঘদিনের জমে উঠা ধূলা-বালি আয়নিত হয়ে কাঁপনের সাথে সাথে সেখানে একটি ঘূর্ণির সৃষ্টি করল। এগুলি আর পরিষ্কার করার উপায় নেই।

তারপর সবদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে সুইচ প্যানেলের সামনে বসে পড়লাম, কতোক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে কে জানে?

রাত দুটো বাজার পরও কিছু হলো না। আমি সব রকম প্রস্তুতি শেষ করে বসে আছি। এখন ঐ ভবিষ্যতের যাত্রী নেমে আসতে চাইলেই হয়। এক সময় লক্ষ্য করলাম টোপন ঢুলে বসে সুইচ প্যানেলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে। সারা দিনের উত্তেজনা ওকে দুর্বল করে ফেলেছে নইলে ও এত সহজে ঘুমোবার পাত্র নয়। ওকে জাগিয়ে দিতেই ধড়মড় করে উঠে বলল, এসেছে!

এখনো আসেনি, দেরী হতে পারে। তুই ঘরে গিয়ে ঘুমো। আসলেই খবর দেব।

না না—টোপন প্রবল আপত্তি জানাল, আমি এখানেই থাকব।

বেশ, থাক তাহলে। তোর ঘুম পাচ্ছে দেখে বলছিলাম।

একটু পরে ঘুমে বার কয়েক ঢুলে পড়ে টোপন নিজেই বলল, বাবা, খুব বেশী দেরী হবে? তা হলে আমি না হয় একটু শুয়ে আসি, ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। ওরা আসতেই তুমি আমাকে খবর দিও।

ঠিক আছে। পুরো কৃতিত্বটাই তো তোর—তোকে খবর না দিয়ে পারি ?

টোপন খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে চলে গেল।

বসে সিগারেট খেতে খেতে বোধহয় একটু তন্দ্রামত এসেছিল। প্রচণ্ড শব্দ শুনে লাফিয়ে উঠলাম। হঠাৎ করে, কিছু বুঝার আগে, খালি জায়গায় অতিকায় চ্যাপটা মতো ধূসর কি একটা নেমেছে! ঘরে ঢোকার জন্যে ছোট ছোট দরজা অথচ এটি কিভাবে ভিতরে চলে এসেছে ভেবে ধাঁধা লেগে যাবার কথা। ভীষণ ধূলাবালি উড়ছে, রনোমিটার কঁ কঁ শব্দ করে বিপদসংকেত দিচ্ছে, আমি তীব্র রেডিয়েশান অনুভব করে ছুটে একপাশে সরে আসলাম। একা এতোগুলো সুইচ সামলানো কঠিন ব্যাপার। টাইম মেশিনটিকে স্থির করতে আমার কালো ঘাম ছুটে গেল।

একটু পরে ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম জিনিসটা হোভার ক্র্যাফটের মতো দেখতে, অতিকায়। পিছনের দিকটা চৌকোণা হয়ে গেছে। মাথা চ্যাপটা তাতে দুটো বড়ো বড়ো ফুটো—ভিতরে লাল আলো ঘুরছে। টাইম মেশিনটির মাঝামাঝি জায়গায় খানিকটা অংশ কালো রংয়ের, আমার মনে হলো এটিই বোধহয় দরজা। ঠিক তক্ষুণি খানিকটা গোল অংশ সরে গিয়ে একটা গর্ত বেরিয়ে পড়লো। উত্তেজনায় আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসলো, আমি আমার হৃদপিণ্ডের শব্দ শুনতে পেলাম, এক্ষুণি ভবিষ্যতের মানুষ নামবে!

আমার চোখের সামনে ধীরে ধীরে একজন নেমে আসল, ভেবেছিলাম স্পেস স্যুট জাতীয় কিছু গায়ে মানুষ, কাছে আসার পর বুঝতে পারলাম ওটি একটি রোবট। রোবটটি হেঁটে আমার সামনে এসে দাঁড়াল, তারপর মাথা ঝুঁকিয়ে বলল, আমার হিসেব ভুল না হলে আপনি আমার কথা বুঝতে পারবেন।

হ্যাঁ, পারছি। আমি রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছে নিলাম। সুদূর অতীতের অধিবাসী আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে।

সুদূর ভবিষ্যতের অধিবাসীও প্রত্যুত্তরে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। আমি জীবনে প্রথম একটি রোবটকে হাসতে দেখলাম। কিন্তু তার কথাটি আমার কানে খট করে আঘাত করল। সুদূর ভবিষ্যতের অধিবাসী মানে ? তাহলে কি ভবিষ্যতে রোবটরাই পৃথিবীর অধিবাসী ?

আমাকে অবতরণ করতে সাহায্য করেছেন বলে ধন্যবাদ। রোবটটির চোখ কৃতজ্ঞ হয়ে উঠল। তবুও যথেষ্ট ধকল গিয়েছে। এতটা ফ্লিচিং বার্ড ছিঁড়ে গেছে।

আমি কি করতে পারি ? হাত উল্টিয়ে বললাম, এই শতাব্দীতে যান্ত্রিক উৎকর্ষতার ভিতরে যতটুকু সম্ভব—

সে তো বটেই, সে তো বটেই। রোবটটি ব্যস্ত হয়ে বলল, আমরা এতটুকুও আশা করিনি।

আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রোবটটির গঠন নৈপুণ্য, কথা বলার ভঙ্গী, ক্ষণে ক্ষণে বদলে যাওয়া চোখের দৃষ্টি, মুখের ভাব লক্ষ্য করছিলাম। যান্ত্রিক উৎকর্ষতা কত নিখুঁত হলে এরকম একটি রোবট তৈরি করা সম্ভব চিন্তা করতে গিয়ে কোন কূল পেলাম না। একটি মানুষের সাথে এর কোন পার্থক্য নেই। খুব অস্বস্তির সাথে মনে হলো হয়তো কোন কোন দিকে এটি মানুষের থেকেও নিখুঁত। কিন্তু আমি বিস্ময় ইত্যাদি ঝেড়ে ফেলে কাজের কথা সেরে নিতে ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। রোবটটিকে বললাম, আপনি ভবিষ্যৎ থেকে এসেছেন। সবকিছুর আগে আমার কিছু প্রশ্নের জবাব দিন।

নিশ্চয়ই। কিন্তু আমি বেশীক্ষণ থাকতে পারব না। আপনাদের পৃথিবীর হিসেবে এক ঘণ্টা পরে এই টাইম মেশিন নিজে থেকে চালু হয়ে উঠে আমাকে নিয়ে আরো অতীতে চলে যাবে।

এক ঘণ্টা অনেক সময়, তার তুলনায় আমার প্রশ্ন বেশী নেই। আমি মনে মনে প্রশ্নগুলি গুছিয়ে নিয়ে বললাম, কেউ অতীতে ফিরে আসলে অতীত পরিবর্তিত হয়ে যায়। এটা কি করে সম্ভব?

অর্থাৎ আপনি বলতে চাইছেন—

যেমন আপনি আজ থেকে কয়েক হাজার বছর পরে সৃষ্টি হবেন, আপনার অতীতে আপনি নেই কারণ এখনও আপনি সৃষ্টি হননি। কিন্তু যেই মুহূর্তে আপনি অতীতে আসবেন তৎক্ষণাৎ আগের অতীতের সাথে পার্থক্যের সৃষ্টি হবে—অতীতটা পরিবর্তিত হয়ে যাবে। এটা কি করে সম্ভব?

রোবটটি অসহিষ্ণু মানুষের মতো কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, আপনি এই সহজ জিনিসটা বুঝতে পারছেন না? অতীতে ফিরে আসলে তো সে অতীত আর আগের অতীত থাকে না, নতুন অতীতের সৃষ্টি হয়।

মানে? অতীত কয়টা হতে পারে?

বহু। এখানেই আপনারা ভুল করছেন। শুধু অতীত নয় জীবনও বহু হতে পারে। আপনি ভাবছেন আপনার জীবনটাই সত্যি, কিন্তু আমার অতীতে আপনার যে অস্তিত্ব ছিল তাতেও আপনার জন্য এক অস্তিত্ব তার জীবনটাকে সত্যি ভেবেছিল। এই মুহূর্তেও আপনার অনেক অস্তিত্ব বিদ্যমান. আপনার চোখে সেগুলো বাস্তব নয় কারণ আপনি সময়ের সাথে সাথে সেই অস্তিত্বে প্রবাহিত হচ্ছেন না। অথচ তারা ভাবছে তাদের অস্তিত্বটাই বাস্তব, অন্য সব অস্তিত্ব কাল্পনিক।

মানে? আমাব সবকিছু গুলিয়ে গেল! আপনার কথা সত্যি হলে আমার আরো বহু অস্তিত্ব আছে?

শুধু আপনার নয়, প্রত্যেকের. প্রত্যেকটি জিনিসের অসীম সংখ্যক অস্তিত্ব। আপনাবা আমরা সবাই সমযের সাথে সাথে এক অস্তিত্ব থেকে অন্য অস্তিত্বে প্রবাহিত হই। যে অস্তিত্বে আমরা প্রবাহিত হই সেটিকেই সত্য বলে জানি—তার মানে এই নয় অন্যগুলি কাল্পনিক।

তাহলে ব্যাপারটি দাঁড়াচ্ছে এরকম। আমি একটু চিন্তা করে নিলাম। পৃথিবী সৃষ্টি হল, মানুষের জন্ম হল, সভ্যতা গড়ে উঠল. এক সময় আমার জন্ম হল। আমি বড় হলাম, এক সময়ে মারা গেলাম। তারপর অনেক হাজার বছর পার হল, তখন আপনি সৃষ্টি হলেন। আপনি অতীতে ফিরে আসলেন আবার আমার কাছে। আবার আমি বড়ো হব, মারা যাব কিন্তু সেটি আগের আমি না—সেটি আমার আগের জীবন না, কারণ আগের জীবনে আপনাকে আমি দেখিনি।

ঠিক বলেছেন। এইটি নতুন অস্তিত্বে প্রবাহ। আপনার পাশাপাশি আরো অনেক জীবন এভাবে বয়ে যাচ্ছে সেগুলি আপনি দেখবেন না, বুঝবেন না—

কেন দেখব না?

দুই সমতলে দুটি সরল রেখার কোনদিন দেখা হয় না, আর এটি তো ভিন্ন ভিন্ন অস্তিত্বের প্রশ্ন।

আমি মাথার চুল খামচে ধরলাম। কি ভয়ানক কথা। এই পৃথিবী, জীবনপ্রবাহ সভ্যতাকে কি সহজ ভাবতাম! অথচ এর নাকি হাজার হাজার রূপ আছে, সবাই নিজেদের সত্যি বলে ভাবছে। আমি কাতর গলায় বললাম, এইসব হাজার হাজার অস্তিত্ব ঝামেলা করে না? একটা আরেকটার সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে—

হতে পারে। আমরা মাথা ঘামাই না। আমরা আমাদের জীবনপ্রবাহটিকে ঠিক রাখতে চাই। এব্যাপারে অন্য কোন অস্তিত্ব ঝামেলা করলে আমরা তাদের জীবনপ্রবাহ বদলে অন্য রকম করে ফেলি, এর বেশী কিছু না।

বুঝতে পারলাম না।

যেমন ধরুন আপনাদের জীবনপ্রবাহটি, এটির ভবিষ্যৎ খুব সুবিধের নয়। আমরা যেরকম খুব সহজে মানুষকে পরাজিত করে জ্ঞানবিজ্ঞানের সাধনা, পৃথিবীর কর্তৃত্ব আমাদের হাতে নিয়ে নিয়েছি, আপনাদের ভবিষ্যতে রোবটরা তা পারত না আমি যদি এখানে না আসতাম। আপনাদের ভবিষ্যতের মানুষদের আমাদের অস্তিত্বে হামলা করে মানুষের পক্ষ থেকে রোবটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কথা। আমরা সেটি চাই না, তাই এটা পরিবর্তিত করতে চাইছি।

কিভাবে ?

এই যে আপনার কাছে চলে আসলাম—এতে এই অতীতটি পরিবর্তিত হয়ে নতুন দিকে চলছে। আমরা দেখে এসেছি এখন খুব তাড়াতাড়ি রোবটেরা আপনাদের পরাজিত করে ক্ষমতা নিয়ে নেবে। জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনায় আর কোন অন্তরায় থাকবে না।

আমি চুপ করে রইলাম !

তারপর ধরুন জীবন সৃষ্টির ব্যাপারটা। আমার অতীতে যাওযার প্রথম কারণই তো এইটি।

কি রকম ?

আমাদের প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রা পৃথিবীর এক আদিম গুহায় কয়েকশত কোটি বছর আগেকার একটি আশ্চর্য জিনিস পেয়েছিলেন।

কি ?

আমাকে পেয়েছিলেন। এই টাইম মেশিনে বসে আছি, অবশ্যি বিধ্বস্ত অবস্থায়।

মানে ?

হ্যাঁ, আমার কপোট্রন বিশ্লেষণ করে দেখা গেল আমি কতকগুলি এককোষী প্রাণী নিয়ে গিয়েছিলাম।

কেন ?

পৃথিবীতে প্রাণ সৃষ্টি করতে। পৃথিবী সৃষ্টির পরে এখানে প্রাণের জন্ম সম্বন্ধে আপনারা যা ভাবছেন তা সত্যি নয়। মহাকাশ থেকে জটিল জৈবিক অণু থেকে নয়, মাটি পানির ক্রমাগত ঘর্ষণে স্বাভাবিক উপায়ে নয়, ঈশ্বরের কৃপাতেও নয়, আমিই অতীতে প্রাণ নিয়ে গিয়েছি। শুদ্ধ করে বললে বলতে হয় প্রাণ নিয়ে যাচ্ছি।

মানে ? আপনি বলতে চান সুদূর অতীতে এই এককোষী প্রাণী ছড়িয়ে দিলে পরেই প্রাণের জন্ম হবে, ক্রমবিবর্তনে গাছপালা, ডাইনোসর, বাঘ-ভালুক মানুষ এসবের জন্ম হবে ?

ঠিক ধরেছেন।

কিন্তু যদি আপনি ব্যর্থ হন ? আমি কঠোর গলায় বললাম, যদি আপনি অতীতে এককোষী প্রাণী নিয়ে প্রাণের সৃষ্টি করতে না পারেন তাহলে কি এই জীবন সভ্যতা কিছুই সৃষ্টি হবে না ?

ব্যর্থ হওয়া সম্ভব নয়, যেহেতু আমাকে কয়েকশত কোটি বছর আগে পাওয়া গেছে, কাজেই আমি ব্যর্থ হলেও আমার অন্য কোন অস্তিত্ব নিশ্চয়ই অতীতে প্রাণ রেখে আসবে। তবে তার প্রয়োজন হবে না। আমার ব্যর্থ হওয়ার আশংকা নেই। আমি পুরো অতীত পর্যবেক্ষণ করে দেখছি।

কিন্তু তবু যদি আপনি ব্যর্থ হন ?

বললাম তো হব না। আমি আমার পুরো যাত্রাপথ ছকে এসেছি।

কিন্তু যদি তবুও কোনভাবে ব্যর্থ হন? আমি একগুঁয়ের মত বললাম, কোন দুর্ঘটনায় যদি আপনার মৃত্যু হয়? কিংবা আপনার টাইম মেশিন যদি ধ্বংস হয়?

তাহলে বুঝতে হবে আমি অন্য এক জগতে ভুলে নেমে পড়েছি।

সেটির ভবিষ্যৎ কি?

কে বলতে পারে! তবে—রোবটটি মনে মনে কি হিসেব করল, তারপর বলল, যদি আমি কোন জগতে নামার দরুন অতীতে ফিরে যেতে ব্যর্থ হই তবে সে জগতের ভবিষ্যৎ খুব খারাপ, এখনও মানুষ ঠুক ঠুক করে জ্ঞান সাধনা করছে। রোবটটি হা হা করে হাসল, বলল, হয়তো আরেকটি বিশ্বযুদ্ধ লাগিয়ে একেবারে গোড়া থেকে সভ্যতা সৃষ্টি করছে! রোবটটি আবার দুলে দুলে হেসে উঠল। মানুষের প্রতি এর অবজ্ঞা প্রায় নিষ্ঠুরতার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, কিন্তু সে নিজে এটি বুঝতে পারছে না।

আমি অনেক কষ্ট করে শান্ত থাকলাম। তারপর মৃদুস্বরে বললাম, আপনার কাছ থেকে অনেককিছু জানতে পারলাম।

আরো আলাপ করার ইচ্ছে ছিল, রোবটটি বলল কিন্তু এই টাইম মেশিনটি একটু পরে নিজে থেকে চালু হয়ে উঠবে। আর সময় নেই।

এক সেকেণ্ড! আমার টোপনের কথা মনে হল। বললাম, আমার ছেলে ভবিষ্যতের অধিবাসী দেখতে ভীষণ আগ্রহী। ওর আগ্রহেই আপনার সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়েছে—ওকে একটু ডেকে আনি।

বেশ, বেশ। তবে একটু তাড়াতাড়ি করুন। বুঝতেই পারছেন—

আমি টোপনেব ঘরে যাওয়াব আগে নিজের ঘরে গেলাম, একটি জিনিস নিতে হবে। বেশী খোঁজাখুঁজি কবতে হল না, ড্রয়ারেই ছিল। সেটি সার্টের তলায় গুঁজে টোপনকে ডেকে তুললাম, টোপন, ওঠ, ভবিষ্যতের মানুষ এসেছে।

এসেছে বাবা? এসেছে? কেমন দেখতে?

দেখলেই বুঝতে পারবি, আয় আমার সাথে। আমি ওকে নিয়ে সময় স্টেশনে হাজির হলাম। রোবটটি সুইচ প্যানেলে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। ওটিকে দেখে টোপন অবাক হয়ে বলল, মানুষ কই, এটিতো রোবট!

ভবিষ্যতের মানুষ রোবট হয়! আমি দাঁতে দাঁত চেপে হাসলাম। টোপন বিমর্ষ হয়ে আমার হাত ধরে দাঁড়িয়ে রইল, কথা বলার উৎসাহ পেল না। রোবটটি একটু অপ্রস্তুত হল মনে হল! খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে বলল, এবাবে বিদায় নিই, আমি অনেক বড় দায়িত্ব নিয়ে এসেছি।

বেশ। আমি হাত নাড়লাম, আবার দেখা হবে।

রোবটটি তার টাইম মেশিনের দরজায় উঠে দাঁড়াল। বিদায় নিয়ে হাত নেড়ে ওটি ঘুরে দাঁড়ালো।

টোপন—আমি চিবিয়ে চিবিয়ে বললাম, চোখ বন্ধ কর। না বলা পর্যন্ত চোখ খুলবি না।

কেন বাবা?

কাজ আছে, বন্ধ কর চোখ। টোপন চোখ বন্ধ করল। আমি সার্টের তলা থেকে একটু আগে নিয়ে আসা রিভলবারটি বের করলাম। রোবটটিকে শেষ করে দিতে হবে। আমার বংশধরের ভবিষ্যৎ এই রোবটদের পদানত হতে দেয়া যাবে না। এটিকে শেষ করে দিলেই পুরো ভবিষ্যৎ পাল্টে যাবে।

রিভলবারটি তুলে ধরলাম। একসময় ভালো হাতের টিপ ছিল। হে মহাকাল, একটিবার সেই টিপ ফিরিয়ে দাও! মনুষত্বের দোহাই, পৃথিবীর দোহাই, সভ্যতার দোহাই, রোবটের দাসত্ব থেকে উদ্ধার পাবার দোহাই, একটিবার হাতের নিশানা ঠিক করে দাও ··· একটিবার ····

আমি রোবটের কপোট্রন লক্ষ্য করে গুলী করলাম, প্রচণ্ড শব্দ হল। টোপন চীৎকার করে আমাকে জড়িয়ে ধরল আর রোবটটির চূর্ণ কপোট্রন টুকরো টুকরো হয়ে চারিদিক ছড়িয়ে পড়ল। খুব ধীরে ধীরে রোবটটি কাত হয়ে টাইম মেশিনের ভিতর পড়ে গেল!

খানিকক্ষণ থেকেই একটা ভোঁতা শব্দ হচ্ছিল, এবার সেটা তীক্ষ্ণ সাইরেনের আওয়াজের মত হল। সাঁৎ করে হঠাৎ দরজাটি বন্ধ হয়ে গেল। ধীরে ধীরে কানে তালা লাগানো শব্দে চারিদিক কেঁপে উঠল, তারপর কিছু বোঝার আগে ধূসর টাইমমেশিন অদৃশ্য হয়ে গেল। শূন্য জায়গাটা দেখে কে বলবে এখানে কখনো কিছু এসেছিল!

চোখ খোল টোপন। টোপন চোখ খুলে চারিদিক দেখল। তারপর, আমার দিকে তাকাল, কি হয়েছে বাবা?

কিছু না?

রোবট কই? টাইম মেশিন কই?

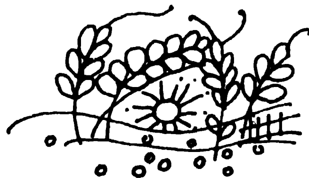
চলে গেছে।

আর আসবে না!

না। আর আসবে না। যদি আসে মানুষ আসবে।

কবে?

আজ হোক কাল হোক আসবেই একদিন। মানুষ না এসে পারে?





তিকি-লিকির গল্প

মঈনুল আহসান সাবের

ইঁদুর মা আর ইঁদুর বাবার দুই ছেলে। তিকি আর লিকি। তিকি বড়, লিকি ছোট। তারা থাকে বিরাট এক চারতলা বাড়ির মাটির নীচ দিয়ে যে বিরাট ড্রেনটি চলে গেছে, তার আশেপাশে। আরো অনেক অনেক ইঁদুর থাকে সেখানে। ঢ্যাঙা, লম্বা, মোটা, চিকন, রোগা-পটকা সে বহু ধরনের ইঁদুর। ছোটখাট এক রাজ্য বলা যায়।

সব ইঁদুর মিলে সেই চারতলা বাড়ির ভাঁড়ার ঘরে ঢোকার কয়েকটা পথ তৈরি করে নিয়েছে। খাবার-দাবার জোগাড় করা নিয়ে তাদের খুব একটা চিন্তা নেই। তেমন দরকার হলে ভাঁড়ার ঘর ছাড়িয়ে খাবার ঘর কিংবা রান্নাঘরে যাওয়াও যাবে। সে পথও তাদের জানা আছে।

তিকি-লিকির বাবা খুবই ভাল। নিতান্তই নিরীহ, গোবেচারা। সারাদিন বইপত্রের মধ্যে ডুবে থাকেন। আগে ছোটখাট একটা স্কুল ছিল ইঁদুর রাজ্যে। তিনি ওখানে পড়াতেন। ছাত্ররা খুশী হয়ে যা দিত, তাতেই তাদের সংসারটা চলে যেত।

কিন্তু ছাত্ররা সব এমন বখাটে হয়ে গেল যে, হঠাৎ করে স্কুলটা উঠেই গেল। ওসব লেখাপড়া করে নাকি কিছুই হয়না!

তিকি-লিকির বাবা আর কি করেন, রোজগার তাঁর বন্ধ হ'ল। তবে আশার কথা, দু'এক ঘর ভদ্রলোক এখনো আছে। সেসব জায়গায় টিউশনী করে কিছু পান। কিন্তু তাতে কি আর সংসার চলে? খুব দরকার পড়লে এখন মাঝে মাঝে ভাঁড়ার ঘরের ফাঁকফোকড় গলে এটা ওটা নিয়ে আসেন। উপায় কি, বেঁচে থাকতে হবে তো।

তিকি-লিকি দু'জনের চেহারা খুব সুন্দর। অল্প অল্প গোঁফ উঠেছে। ছোট ছোট দাঁত, টানা টানা চোখ। দু'ভাইয়ের মধ্যে ওদের খুব ভাব। অবসর সময়ে ওরা আদব-কায়দা আর লেখাপড়া শেখে। ছেলেদের খুব ভালবাসলে কি হবে, একটা ব্যাপারে ওদের বাবা-মা খুব কড়া। উঁহু,

পড়াশোনার ব্যাপারে কোন ফাঁকি দেওয়া চলবে না। সময় হলেই বাবা গম্ভীর গলায় ডাক দেবেন ঃ তিকি-লিকি।

আর তিকি-লিকিও তখন হাতের সব কাজ ফেলে বইখাতা হাতে সুড় সুড় করে বাবার সামনে গিয়ে বসবে। কোনদিনও এর হেরফের হয়নি।

দু'ভাই অবশ্য খেলাধুলো আর দৌড়-ঝাঁপেও ভাল। গতবার স্পোর্টসে তিকি এক টুকরো লাল সার্টিনের কাপড় আর লিকি দু'টুকরো দারুচিনি পেয়েছিল।

ওরা অবশ্য এসব দৌড়ঝাঁপের চেয়ে লেখাপড়াই বেশী পছন্দ করে। সেই ছোট্টবেলা থেকে কত কি শিখেছে তারা। প্রথমে তারা শিখেছে আদব-কায়দা আর ভদ্রতা। গুরুজনদের দেখলে সালাম দিতে হয়, বড়দের সাথে বিনয়ের সাথে কথা বলতে হয়, তাদের সব কথা শুনতে হয়, খুব জোরে কথা বলতে হয়না, খারাপ কথা বলতে নেই, মারামারি করতে নেই, সুযোগ পেলে অন্যের উপকার করা উচিত।

তিকি-লিকির বাবা ওদের বলতেন ঃ শোন, তোমরা যদি চরিত্রবান না হও, যদি আদব-কায়দা না শেখ, অন্যের উপকার না কর, তবে তোমাদের জীবনের কোন মূল্য নেই। তিকি-লিকিও বাবার সব কথা শুনতো, মানতো।

সকালবেলা উঠে ওরা নীতিকথা আর বিভিন্ন উপদেশ সব চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়তো। ওরা রাস্তায় মাথা নীচু করে হাঁটতো, মুরুব্বীদের সালাম দিত আর বন্ধুদের ঝগড়া হলে ওরাই মিটিয়ে দিত।

পাড়ার বখাটে ছেলেগুলো অবশ্য ওদের ক্ষ্যাপাতো—ওরা নাকি মিনমিনে, ন্যাকা, কোন কাজের না। ওরা অবশ্য রাগ করতো না। আসলে রাগ যে কি জিনিস সেটাইতো ওরা ভুলে গিয়েছিল।

ওদের বাবা-মার খুব গর্ব ছিল ওদের নিয়ে। আর গর্ব হবেনা কেন, বল ? পাড়ার সবাই তো ওদের প্রশংসাই করতো সব সময়। আর ওরা তো কোনদিন মারামারি করেনি, কাউকে খারাপ কথা বলেনি। কাজেই, মুরুব্বীরা কখনো ওদের খারাপ বলেননি। সবাই শুধু বলতো ঃ আহা, এমন শান্ত-ভদ্র ছেলে, এমন সাধাসিধে সরল ছেলে, এরা জীবনে উন্নতি না করে যাবেনা।

কিন্তু শুধু কি আদব-কায়দা ? তিকি-লিকি আদব-কায়দা ছাড়া আবো কত যে লেখাপড়া শিখেছিল। ওদের কথা শুনে পাড়ার ছেলেরা তো বটেই, বড়রা পর্যন্ত অবাক হয়ে যেত। ইংরেজী, বাংলা, ব্যাকরণ তো শিখেছিলই। তাছাড়া, ইঁদুরদের ইতিহাস, ওদের শহরের ভূগোল, রাজনীতি, পৌরনীতি, অর্থনীতি সবকিছু শিখে ফেলেছিল।

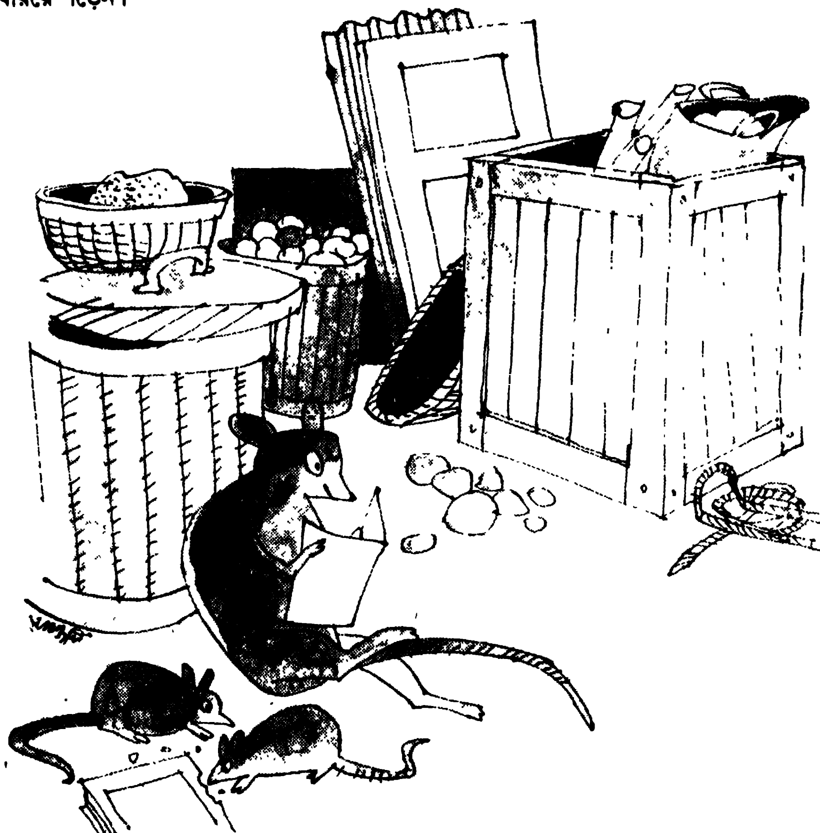
তিকি আবার কবিতাও লিখতো। পাড়ার ফাংশনে নিজের লেখা কবিতা আবৃত্তি করেছিল—'যাচ্ছি আমি চাঁদে, ভয়ে দেখ মা কাঁদে।'

লিকি কবিতা লিখতে না পারলেও ভারী সুন্দর গান গায়।

তিকি-লিকির বাবা ওদের একদিন পরীক্ষা নিলেন। বাড়ির সবচেয়ে মোটা বইটাও ওরা যেদিন পড়ে শেষ করলো, তার দু'দিন পর পরীক্ষা দিয়ে ওরা খুব ভাল রেজাল্ট করলো।

মা বললেন ঃ বাছারা আমার, সোনামানিক, এই শুভদিনে একটু ভাল খাওয়া-দাওয়া হোক। বাসায় কিছু খাবার-দাবার তো ছিলই, ভাঁড়ার ঘর থেকেও কিছু নিয়ে আসা হলো। আর সে দিন সন্ধ্যায় এক মজার ব্যাপার ঘটে গেল। তখনো রান্নাবান্না সব শেষ হয়নি, ঠিক এ সময় হঠাৎ তিকি-লিকির দাদু এসে হাজির।

তিকি-লিকি খুব ছোট্ট বেলায় দাদুকে দেখেছিল একবার। কিন্তু এতদিন পর দেখেও ওরা দাদুকে চিনতে পারে। তিকি-লিকির দাদুর স্বভাব চরিত্র অদ্ভুত। বাড়ি থাকেন না। সেই ছোটবেলা থেকে এ রকম। চার-পাঁচ বছর পর পর বাড়ি ফিরে আসেন। দু'দিন থেকে আবার বেরিয়ে পড়েন।



ওদের বাড়িতে একটা হুল্লোড় পড়ে গেল। ঘরে ঢুকতেই তিকি-লিকির দাদু বললেন ঃ বেশ সুন্দর গন্ধ পাচ্ছি হে, অনেক দিন পর এমন ভাল খাবার খাব মনে হচ্ছে। তিকি-লিকির বাবা তখন সব খুলে বললেন। শুনে দাদু ওদের মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে বললেন ঃ আচ্ছা, তা দাদু আমি একটু জিরিয়ে নেই, তারপর দেখবোখন তোরা কি কি শিখেছিস।

তিকি-লিকিকে বলতে গেলে আরেকটা পরীক্ষা দিতে হলো। দাদু রাজ্যের প্রশ্ন করলেন। তিকি-লিকি কিন্তু একটারও ভুল উত্তর দিলনা। দাদু খুব খুশী হয়ে বললেন ঃ তিকি-লিকি, তোরা দেখি অনেক কিছু শিখে ফেলেছিস। তা বাছারা, মুখ অমন নীচু করে অত মিনমিনে গলায় কথা বল কেন ? এত লাজুক আর মিনমিনে হলে এই দুনিয়ায় কি চলে রে ?

এসব কথা তিকি-লিকি কোনদিন শোনেনি। তাই ওরা একটু অবাক হলো। দাদু আবার বললেন ঃ শোন, কথা বলবে ঘাড় সোজা করে, অভদ্রতা করতে বলছিনে, কিন্তু অমন মাথা নীচু করে থাকলে কি চলে, আর গলার আওয়াজ হবে গম্ভীর, অমন আধো আধো বোল আমার বাপু

ভাল লাগে না বলে দিচ্ছি। তা, আমি আছি দিন দুই, এরমধ্যে আমি ঠিক ধরে ফেলবো, লেখাপড়া আর ওসব আদব-কায়দা ছাড়া তোরা কি কি শিখেছিস আর কি কি শিখিসনি।

হ্যাঁ, দুনিয়ায় অনেক কিছু শেখার আছে, জানো তো?'

তিকি-লিকি মাথা নাড়লো।

দাদু বললেনঃ বেশ।

খেতে বসে দাদু একবার চারদিকে তাকালেন। তার সামনে তিকি-লিকি, দু'পাশে ওদের বাবা-মা। দাদু বললেনঃ এখানে খাবার দাবার কেমন পাওয়া যাচ্ছে? বাবা মাথা নাড়লেন ঃ না, দিনকাল ভাল নয়, বেশ অনেক দিন হলো সবার খুব টানাটানি যাচ্ছে, পাড়াপ্রতিবেশীদের মধ্যেও আর আগের মত মিল নেই, সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত।

অবস্থা তাহলে খারাপ বলেই মনে হচ্ছে, বলতে বলতে দাদু তিকি-লিকির দিকে তাকালেন। বাবা মাথা নাড়লেনঃ হ্যাঁ, দিনকাল ভাল না।

দাদু তখন হঠাৎ এমন কাণ্ড করলেন যে, সবাই অবাক হয়ে গেল। নিজের খাবারটুকু গপ করে খেয়ে তিনি তিকি-লিকির প্লেট থেকেও সব খাবার তুলে নিলেন। তারপর ওদের দিকে তাকিয়ে খুব আয়েশ করে সেই খাবার অল্প অল্প করে খেলেন।

তিকি-লিকি তো ভীষণ অবাক। বোকার মত দাদুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলো। দাদু সবটা খেতে পারলেন না, বাকীটুকু মেঝেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিলেন।

তিকি-লিকির বাবা-মাও খুব অবাক। কিন্তু কেউ কিছু বললো না দেখে দাদু খুব গম্ভীর হয়ে 'কাল সকালে দেখা হবে' বলে উঠে চলে গেলেন।

তিকি বললোঃ মা, দাদু অমন করলেন কেন? মা তাড়াতাড়ি ওদের নতুন করে খাবার এনে দিয়ে বললেনঃ ছিঃ তিকি, জিগগেস করতে নেই, বুড়ো মানুষ তোমার দাদু, খেয়াল ছিলনা বোধহয়।

পরদিন সকালে নাশতার সময় আবার সেই কাণ্ড। দাদু খেতে বসেই তিকি-লিকির প্লেট থেকে সব খাবার তুলে নিলেন। এবারও বেশ আয়েশ করে খেতে খেতে ওদের দু'জনকে বললেনঃ এটা তোমাদের ভাগ তাহলা তিকি-লিকি? কিন্তু দেখ, তোমাদের ভাগ আমি খেয়ে ফেলছি।

তিকি-লিকি শুধু কাঁদ কাঁদ চোখে গোবেচারার মত চেয়ে থাকলো। তিকি-লিকির বাবা এবার একটু ইতস্ততঃ করে বললেনঃ বাবা, আপনি কি করছেন, এটা যে ওদের ভাগ।

দাদু তখন খুব গম্ভীর হয়ে বললেনঃ কিন্তু কথাটা তো ওরা বললো না, তুমিতো ওদের অনেক কিছু শিখিয়েছ, কিন্তু এটা যে ওদের ভাগ এই সামান্য কথাটা বলা শেখাও নি কেন? ওদের ভাগটা কেমন দু'দুবার কেড়ে নিলাম, একবার নাকি প্রতিবাদ করলো, কেমন হাঁদারামের মত তাকিয়ে আছে দেখ, আমি তো খাচ্ছিও না, এত খাবারের প্রয়োজন নেই আমার, সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে নষ্ট করছি।

তিকি-লিকির বাবা বললেনঃ কিন্তু আপনাকে ওভাবে বললে সেটা ওদের অভদ্রতা হতো না?

খিকখিক করে দাদু হেসে ফেললেন, বললেনঃ খুব বললে হে, আমার দরকার নেই, তবু আমি ওদের ভাগটা কেড়ে নিলাম, সেটার প্রতিবাদ কেন ওরা করবে না? আমি অন্যায় করছি তাও দেখ, কি চুপচাপ ওরা। বলি অন্যায়ের প্রতিবাদ না করাটা কি আরেকটা অন্যায় নয়? আমি

বড় হয়েছি তো কি হয়েছে, আমার কাছ থেকে উল্টে কেড়ে নিল না কেন ? নাহ, তুমি সব শিক্ষা দাওনি ছেলেদের, এখনো ভাগ- বাটোয়ারা শিখলো না।

খাবার টেবিলেই ছোটখাট একটা ঝগড়ার মত হয়ে গেল। তিকি-লিকির বাবার সাথে তিকি-লিকির দাদুর। দাদু মাঝে মাঝে খুব রেগে ওঠেন, বলেন ঃ আরে দেখ হে, তুমি একটু চেষ্টা কর, আমার নিজেরটা থাকা সত্ত্বেও আমি ওদের মুখের খাবার কেড়ে নিলাম, তাও কিছু বলবে না—এ রকম নাতি বাপু আমি চাইনি।

কিন্তু লিকির বাবার এসব কথা পছন্দ নয়। না হয় খেয়েছে কেড়ে, তাই বলে এই সাধারণ ব্যাপার নিয়ে এত হৈ চৈ করার কি দরকার। তিকি-লিকিকে আবার নতুন করে খাবার এনে দিলেই তো ব্যাপারটা মিটে যায়।

দাদু তখন আরো রেগে গেলেন ঃ দেখ, একবার যে কেড়ে নিয়েছে, সে সুযোগ পেলে বারবারই নেবে, এটা কোন সমাধান হলো না। তুমি তো কোনদিনই আমার কোন কথা শুনলে না। তাইতো আমি বাড়ি থাকিনা। যাচ্ছি, এখুনি আবার যাচ্ছি। এবার ভেবেছিলাম, দিন দুই থেকে যাব, তা আর হলোনা।

তিকি-লিকির বাবা-মা খুব করে বললেন আরো ক'টা দিন থেকে যাওয়ার কথা। কিন্তু দাদু ব্যাগ গুছিয়ে নিলেন। দরজার কাছে গিয়ে তিকি-লিকির দিকে ফিরে বললেন ঃ চললাম দাদুরা, আমি যা বলে গেলাম, খেয়াল রেখো, কাজে দেবে।

দাদুর কথাগুলো তিকি-লিকির কাছে খুব নতুন ঠেকলো। এ ধরনের কথা তারা কখখনো শোনেনি। বাবাতো সব সময় এর উল্টোটাই বলেন। দাদুর কথাগুলোর কি যে অর্থ! কিন্তু কি যে বলেন দাদু, 'উল্টো কেড়ে নিতে'—ধ্যাৎ. তিকি-লিকি তা কখনো পারবে না। তাই কি কখনো হয়, কি যে মজার কথা বলে গেলেন দাদু।

ওরা প্রথম দু'তিন দিন খুব ভাবলো। কিন্তু শেষে পড়াশোনা নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে পড়লো যে, দাদুর কথাগুলো একটু একটু করে ভুলে গেল।

বাবা ওদের জন্যে আলমারী থেকে আরো নতুন নতুন বই বে'র করে দিলেন। অবশ্য দাদুর কথাগুলো যে একদম মনে পড়তো না, তা নয়। কিন্তু পড়াশোনার এত চাপ, খুব একটা ভেবে দেখার সময় ওরা পেতনা। আর বাবাকে কোনদিন জিগগেস করে দেখা হয়নি। তাছাড়া, মুরুব্বীদের এসব জিগগেস না করাই ভাল—তিকি-লিকি ভাবতো।

তারপর আরো অনেক দিন চলে গেছে। তিকি-লিকি আরো অনেক লেখাপড়া শিখেছে। ওরা ইঁদুরদের জন্ম-কাহিনীর ওপর পড়াশোনা করছিল। এমন সময় ওদের শহরে একটা অঘটন ঘটে গেল।

একদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে সবাই দেখলো, ওদের শহরের মাঝখান দিয়ে যে ড্রেন গেছে, সেখানে শুধু পানি বাড়ছে। আর সেই পানি বাড়তে বাড়তে দুপুরবেলার মধ্যে সব ইঁদুরের ঘরে ঢুকে গেল।

কোত্থেকে এত পানি এল ইঁদুররা কেউ বোঝে না, কিন্তু পানির স্রোত সব ইঁদুরের ঘরে ঢুকে সব খাবার দাবাড় ভাসিয়ে নিয়ে গেল। ইঁদুররা গর্তের মধ্যে ঘাপটি মেরে কোনমতে প্রাণ বাঁচালো বটে, কিন্তু পানি যখন নেমে গেল, তখন কারো ঘরে একফোঁটাও খাবার নেই। সবার খুব অসুবিধা। না খেয়ে থাকতে হয়। তখন সবাই দলবেঁধে ভাঁড়ার ঘরে ছুটলো।

তিকি-লিকির বাবাও গিয়েছিলেন সবার সাথে। কিন্তু সবাই কিছু কিছু খাবার আনতে

পারলেও তিকি-লিকির বাবা ফিরে এলেন খালি হাতে। অত ভীড় আর ঠেলাঠেলির মধ্যে তিনি ভাঁড়ার ঘরে ঢুকতেই পারেননি। পাড়ার সব বাসায় একবেলা রান্না হলো, কিন্তু তিকি-লিকিদের বাসায় দু'বেলাই চুলো বন্ধ। খুব ক্ষিদে পেলেও তিকি-লিকিতো খুব ভদ্র। কোন সময় বাবা-মাকে কোন ব্যাপারে বিরক্ত করেনা। তাই পেট চেপে ধরে ওরা তবু হাসি হাসি মুখে বসে থাকলো।

তার পরদিনও কিছুই জোগাড় হলোনা। আজ তিকি-লিকিও বেরিয়েছিল। কিন্তু হৈ-চৈ, টানাটানি, ধাক্কা-ধাক্কি, জোরাজুরি ওরা মোটেই করতে পারেনা। সবাই ওদের সবিয়ে ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে যায়। ওরা ঠেলাঠেলিতে বারবার শুধু পিছিয়ে আসে। এভাবে পরপর দু'দিন ওরা ঢুকতে না পেরে ভাড়ার ঘরের পাশ থেকে খালি হাতে ফিরে এলো।

সন্ধ্যের সময় ওরা সবাই গালে হাত দিয়ে চুপচাপ বসে আছে, হঠাৎ দরজার কড়া নড়ে ওঠে।

এমন সময় কে এল ? তিকি-লিকির বাবা দরজা খুলতেই ঘরে ঢুকলো পাড়ার সবচেয়ে ধাড়ী ইঁদুর। নাম গোগো। খুব লম্বা চওড়া শরীর গোগোর। গোগো একগাল হেসে বললোঃ শুনলাম. আপনারা না খেয়ে আছেন, ভাঁড়ার ঘরে ঢোকার রাস্তাগুলোও বাড়ির মানুষরা বন্ধ করে দিয়েছে, তবে আমি একটা নতুন রাস্তা বে'র করেছি, হেঃ হেঃ, একটা কাজ করলে হতো না ?

ঃ কি কাজ ? তিকি-লিকিরা সবাই মুখ তুলে তাকালো।

গোগো বললোঃ আমার একার পক্ষে তো সম্ভব না, তিকি-লিকি যদি আমার সাথে যেত, তবে সহজেই বেশ কিছু খাবার জোগাড় করে আনতে পারতাম; তারপর ভাগাভাগি করে নিতাম।

গোগো মোটেই ভাল ইঁদুর নয়। পাড়ায় ওর অনেক বদনাম। কিন্তু না খেয়ে আর ক'দিন থাকবেন, তাই তিকি-লিকির বাবা রাজী হয়ে গেলেন।

গোগোর সাথে তিকি লিকি আর ওদের বাবাও গেলেন। বাবা ফোকড়ের পাশে পাহারায় থাকলেন আর ওরা তিনজন ভেতরে গেল। অল্প সময়ের মধ্যে ওরা বহু খাবার জোগাড় করে ফেললো। সেগুলো এক বস্তায় বেঁধে ওরা ফিরে চললো।

তিকি-লিকি আর ওদের বাবা খুব খুশী। অনেক দিন পর পেটপুরে খাওয়া যাবে। গোগোর বাড়ির কাছে ওরা সবাই এলে গোগো বললোঃ খুব খাটুনী গেল, এখন একগ্লাস করে শরবত খাওয়া যাক।

গোগো ওদের এত উপকার করলো, তাই ওরা না বললো না।

গোগো খুব সুন্দর করে শরবত বানিয়ে খাওয়ালো। গোগো বললোঃ এখন অনেক রাত হয়ে গেছে, আর আজকাল গুণ্ডা-বদমায়েশদেরও খুব উৎপাত। আপনারা বরং আজকের রাতের জন্যে অল্পকিছু খাবার নিয়ে যান, কাল সকালে এসে বাকীটুকু নিয়ে যাবেন। তিকি-লিকিরা ভেবে দেখলো, গোগো ঠিকই বলছে। তাই ওরা অল্পকিছু খাবার নিয়ে গোগোকে শুভরাত্রি জানিয়ে বাড়ি ফিরে এলো।

কিন্তু গোগো যে কত খারাপ তাতো ওরা জানতো না। পরদিন সকালে ওরা যখন ওদের বাকী অংশটুকু আনতে গেল, তখন গোগো জানালায় বসে ফাটা গলায় গান গাচ্ছিল। তিকি-লিকির বাবা শুভ প্রভাত জানিয়ে বললেনঃ গোগো, আমরা আমাদের ভাগ নিতে এসেছি।

গোগো তো অবাকঃ কি বললেন, আপনাদের ভাগ! কিসের ভাগ? এ্যাঁ ?

বাবা তাড়াতাড়ি মনে করিয়ে দিলেন ঃ ঐযে, কালরাতে ভাঁড়ার ঘর থেকে আনলাম। গোগো যেন আকাশ থেকে পড়লো ঃ ভাঁড়ার ঘর থেকে আবার কখন কি আনলাম ? সকাল বেলা উঠেই ইয়ার্কী মারতে এসেছেন ? জানেন না বুঝি, মানুষরা ভাঁড়ার ঘরে দু'টো বেড়াল ছেড়েছে, আমি বাপু ওদিক আর মাড়াই না। আর আপনি কিনা সকালে উঠেই মিথ্যে কথা বলে আমার কাছ থেকে খাবার-দাবার হাতিয়ে নিতে চাচ্ছেন !

তিকি-লিকি আর ওদের বাবা গোগোকে কত করে বোঝালেন, কিন্তু গোগোর ঐ এক কথা। সে নাকি কিছু জানেনা। কালরাতে সে নাকি কোথাও যায়নি। রাগে-দুঃখে ওদের চোখে পানি এলো। বাবা বললেন ঃ গোগো, তুমি কিন্তু খারাপ কাজ করছো, তুমি কিন্তু কথা দিয়েছিলে।

গোগো খ্যাক খ্যাক করে হেসে বললো ঃ বলেছিলাম নাকি, যান মিথ্যে কথা বলবেন না। পারেন তো প্রমাণ করেন, মামলা করেন। মামলা করার পয়সা আছে তো ?—বলে গোগোর সেকি হাসি !

তিকি-লিকির বাবা বললেন ঃ ছিঃ বাবা, মামলা কেন করবো, তুমি অল্প কিছু খাবার অন্তুতঃ আমাদের দাও, আমরা যে না খেয়ে আছি।

না খেয়ে আছেন তো আমার কি ; গোগো বললো ঃ যান পেটে পাথর বাঁধেন গিয়ে।—বলে সে একমুঠো চাল এনে জানালায় বসে চিবুতে লাগলো।

তিকি-লিকির জিভ দিয়ে জল ঝরছিল। কিন্তু তারা আর কি করবে, ঝগড়া তো করতে পারেনা। ওরা তাই গোস্যা হয়ে ফিরে এলো। ওরা ভাবতেই পারেনি গোগো এমন কাজ করবে। বাসায় এসে ওরা চুপচাপ বসে থাকলো।

বিকেলের দিকে আবার একবার গেল তারা গোগোর বাসায়। রাতেও একবার গেল। কিন্তু গোগোর ঐ এক কথা। শেষে তো ধমকই দিয়ে বসলো ঃ যাও যাও, ভাল চাওতো ফ্যাচফ্যাচ কোরনা, তোমাদের সাথে গাল-গল্প করার সময় নেই আমার।

ওরা পরদিন পাড়া-প্রতিবেশীদের বাসায় গেল। কিন্তু সবাই শুধু সমবেদনাই জানালো। গোগোকে যে সবাই ভীষণ ভয় পায়। সবাই শুধু বললো ঃ কি আর করবেন, কি আর করবেন, জানেনই তো ও একটু এই রকমই। ওরা ভেবেছিল, সবাই মিলে একটা ব্যবস্থা করে দেবে। কিন্তু কেউ কোন সমাধান দিতে পারলোনা। গোগোর কথা শুনে সবাই চুপসে গেল।

এমনি করে দু'দিন গেল। পড়শীরা কিছু খাবার দিল বলে ওরা বেঁচে থাকলো, কিন্তু গোগোর মনে কোন মায়াদয়া নেই। তিকি-লিকি বললো ঃ বাবা, আমাদের ভাগ গোগো কেন দেবেনা ?

বাবা কিছু বলেন না। শেষে এমন হলো যে ওদের ঘরে কোন খাবার নেই, পড়শীরাও তাদের আর কোন খবর নেয়না। শেষে হঠাৎ একদিন বিকেলে তিকি-লিকি দু'জন কথা বলতে বলতে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল।

বাবা-মা জিগ্যেস করার পর্যন্ত সময় পেলনা ওরা কোথায় যাচ্ছে। কিন্তু কি আশ্চর্য ব্যাপার ! আধঘন্টা পরেই তিকি-লিকি দু'জনই দু'কাঁধে দু'টো ব্যাগ নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এলো। ঘরে ঢুকে ওরা ব্যাগ দু'টো খোলে। ব্যাগের মধ্যে অনেক খাবার। ওরা প্লেট এনে খাবার তুলে এগিয়ে দেয় বাবা-মাকে। নিজেরাও খায়।

বাবা-মা তো অবাক ঃ ওরে, তোরা এ খাবার কোত্থেকে আনলি ?

ঃ গোগোর কাছ থেকে এনেছি।

শুনে বাবা-মা আরো অবাক—কি কাণ্ড, ও দিল না, তোরা বুঝি চুরি করে আনলি ?

ঃ চুরি করবো কেন, জোর করেই এনেছি। দু'ভাই গম্ভীর হয়ে জবাব দেয়।

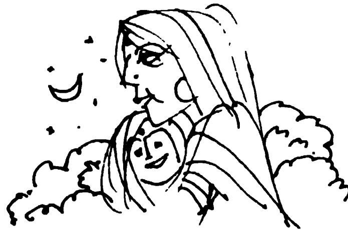
ঃ জোর করে এনেছিস ?

ঃ তো কি, আমাদের ভাগ যখন দেবেনা, তখন জোর করে আনবো না কেন ? মা খুব অবাক হয়ে বললেন ঃ ওরে, ও যে একটা ডাকাত, তোরা পারলি ওর সাথে ?

তিকি-লিকি খুব আস্তে বললো ঃ পারবোনা কেন মা, আমরা যে আমাদের ভাগ আনতে গিয়েছিলাম। লিকি খুকখুক করে হাসলো ঃ জান মা, তিকি এমন একটা ঘুষি মেরেছে গোগোর নাকে, গোগোকে পনের দিন নাকে জলপট্টি দিতে হবে।

তিকি-লিকির বাবা-মা অবাক হয়ে ওদের দেখছিলেন। ওদের অন্য রকম মনে হচ্ছে। খেতে খেতে বাবা বললেন ঃ বাছারা, তোরা এতসব কোত্থেকে শিখলি, তোদের আমি তো এসব কোনদিন শেখায়নি ?

তিকি-লিকি একসাথে বললো ঃ আর কিভাবে শিখবো বল বাবা, ঠেকে শিখেছি।





সে আমার ছোট বোন

লুৎফর রহমান রিটন

হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো বিন্তি। চোখে মুখে ওর ঝিলিক দিচ্ছে দুষ্টুমি। আমি নিজেকে তৈরি করে নিই মোটামুটি। এক্ষুণি কিছু অদ্ভুত প্রশ্নের জবাব দিতে হবে আমাকে। বিন্তির এই এক স্বভাব, রাজ্যির যতো অদ্ভুত জিনিস ওর মাথায় ঘুর ঘুর করে। আর ও ঘুর ঘুর করে আমাদের পেছনে—ছোড়দা এটার মানে কি, ছোড়দা ওটা কেনো হলো? আব্বু তুমি অফিসে ঠিক ঠিক পড়া বলতে পারোতো? নাকি দাঁড়িয়ে থাকো কান ধরে? মামনি তুমি রাঁধতে গিয়ে চুপি চুপি চাকুম চুকুম করে খেয়ে নাও কেনো? ছোড়দা পাখির গায়ে ঢিল ছুঁড়লে পাখিরা কি ব্যথা পায়? আচ্ছা, শীতে পাখিদের ঠাণ্ডা লাগেনা বুঝি? পিংপিং বল লাফায় কেনো? মুরগির ডিম ফুটে নাকি ছানা বেরোয়—কই, আমার হাত থেকে পড়ে গিয়ে ডিমটা যে ভেঙে গেলো ফটাস করে, কোনো ছানা তো বেরোলো না, তোমরা কচু জানো কচু।

বিন্তি এসেই আমার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বললো, ছোড়দা, তুমি লাল কালিতে কালো লিখতে পারো?

বোঝো ঠ্যালা। আমি বিরক্ত হয়ে বলি, কে কবে লাল কালিতে কালো লিখতে পেরেছে? দেবো এক গাট্টা। যা ভাগ—

বিন্তিতো গেলোই না উল্টো ঠোট বাঁকিয়ে ধমকে উঠলো আমাকে—পড়াশুনো কিচ্ছু করবে না সারাদিন টইটই করে ঘুরে বেড়াবে, জানবে কোত্থেকে? দ্যাখো—

উপুড় হয়ে মেঝের ওপর রাফ খাতাটা উল্টে ফেলে তার ওপরে লাল রঙা মোম পেন্সিল ঠেসে ধরে আমার দিকে কটমটিয়ে তাকিয়ে বিন্তি বললো, দ্যাখো ছেলে শিখে নাও—এই যে আমার হাতে লাল কালির পেন্সিল, এই যে আমি লাল কালিতে লিখছি—ক এ আকার কা—ল এ ওকার লো——কালো। কি, হলো তো এবার?

ওরে দুষ্টু—আমি ওর রিবন বাঁধা বেণী ধরে টান দিই—তুই এতো কিছু জানিস কোত্থেকে রে?

আদর পেয়ে আরেক কাঠি ওপরে উঠলো একরত্তি মেয়েটা। প্রথমে আমার কোলে, কোল থেকে চেয়ারের হাতলে, চেয়ারের হাতল থেকে সোজা একেবারে আমার কাঁধে। ছোড়দার কাঁধে চড়াটা বিন্তির একটা হবি। চান্স পেলেই কাঁধে চড়বে। সকাল দুপুর সন্ধ্যে নেই। ইচ্ছে হলেই ব্যাস—আমার কাঁধে চড়ে নরম নরম পিচ্চি দুহাতে আমার ঝাকড়া চুল খামচে ধরে হুকুম করবে—চালাও ঘোড়া।

আমি তখন ঘোড়া হই। ঘোড়ার পিঠে বিন্তি তখন রাজকন্যে। শুধু ঘোড়ায় চড়ে ওর শখ মেটেনা। ওকে ছড়া বলতে হবে বানিয়ে বানিয়ে। একেকদিন একেক রকম। আজও রক্ষে নেই—কই ছোড়দা, ছড়া কই?

কি আর করি। ছড়া বানাই—

বিন্তি সোনা ভালো
ঘর করেছে আলো
বিন্তি ভীষণ পাজি
খায় সে পটল ভাজি।

আমার চুলে হ্যাঁচকা টান দিয়ে আমার কাঁধে বসে বিন্তি প্রতিবাদ করে—এ্যাই ছোড়দা। আমাকে পাজি বললে কেনো? আমি কি পাজি? হুঁ? পাজি?

চুল বাঁচাতে ভুল শুধরে আমি আবার নতুন করে ছড়া বানাই—

ইন্তি মিন্তি পিন্তি
লক্ষ্মী সোনা বিন্তি।

ইন্তি মিন্তি পিন্তি মানে কি ছোড়দা?

আমি বলি—তাইতো! এর তো কোনো মানে হয়না। আচ্ছা আরেকটা বলি—

বিন্তি সোনা লক্ষ্মী
কিচির মিচির পক্ষী

মানে কি?

আমি ছড়ার মানে বোঝাই—বিন্তি খুব লক্ষ্মী মেয়ে। পাখির মতো সারাক্ষণ কিচির মিচির করে। ছোড়দাকে কাজ করতে দেয়না।

কি? আমি কাজ করতে দিইনা। আচ্ছা তুমি কাজই করো। আমাকে নামাও। আমি নামবো।

অভিমানী মেয়েটাকে নামাই কাঁধ থেকে। মুখ ভার করলে ওর গাল দুটো কেমন ফুলো ফুলো লাগে।

নেমেই গম্ভীর গলায় বললো বিন্তি—কই, কাজ করো। শিগগির কাজ করো। কণ্ঠে ওর আদেশের সুর।

আমি বইটা টেনে নিয়ে পড়ায় মনোযোগী হবার ভান করি।

বিন্তি বললো, পড়ছো যে? পড়াটা কি কোনো কাজ হলো?

বারে, পড়াটা কাজ না?

মোটেও না। কাজতো করে বুয়া। যাও ঘর ঝাড়ু দাও। প্লেট মাজো। কাপড় ধুতে যাও। যাও।

আমিতো অবাক! ওরে পিচ্চিবুড়ি এতোসব কথা কে শেখালে তোকে?

কেউ শেখায়নি বিন্তি সব নিজেই শিখেছে। খুব তো পড়া হচ্ছে। দেখি, আমি তোমার পরীক্ষা নেবো বলে টিচারের মতো ভঙ্গি করে বিন্তি শুধোয়—

কোন কেলাশে পড়ো ?

আমি সুবোধ বালকের মতো জবাব দিলাম, আই এ, ঢাকা কলেজে।

আচ্ছা। বেশ। পড়াশুনো করো তো ?

জ্বি আপা করি।

মুখস্ত-টুখস্ত করো তো না খালি খালি বাবার মতো বইয়ের দিকে তাকিয়েই থাকো ? শব্দ করে পড়ো ?

বললাম, জ্বি আপা শব্দ করেই পড়ি মাঝে মধ্যে। আর মুখস্তও করি।



খুব ভালো। লক্ষ্মী ছেলে। তা লক্ষ্মী ছেলে এবার ঝটপট ডিকশনারী মুখস্ত বলো তো ?

আমি চমকে একেবারে চেয়ার থেকে পড়ে যাবার যোগাড়। বলে কি মেয়েটা ! ডিকশনারী মুখস্ত ?

কি ব্যাপার, চুপ করে আছো যে ? কথা কানে যায়না ?

বললাম, যায়। কিন্তু ডিকশনারী মুখস্ত বলা যায়না।

যায়। একশবার যায়। হাজারবার যায়। আমি পারি।

তুই পারিস ?

জিগেশ করেই দেখোনা।

আচ্ছা আপা ডিকশনারী মুখস্ত বলুন তো ?

বিন্তি বললো—ডিকশনারী।

আমি বললাম, তাতো বুঝলাম। তারপর?

বিন্তি যথারীতি বললো—ডিকশনারী।

মানে?

মানে এই তো—আমি ডিকশনারী মুখস্ত বললাম না?

ওরে দুষ্টু বলে আমি ওর বেণী ধরতে হাত বাড়াতেই হরিণ ছানার মতো তিড়িং বিড়িং লাফাতে লাফাতে পালিয়ে গেলো বিন্তি—পারেনা ধুয়ো পারেনা ধুয়ো...।

তো এই হচ্ছে আমার একরত্তি বোন বিন্তি।

ওর সঙ্গে আমার একটা চুক্তি আছে। কলেজ থেকে ফেরার পথে একমুঠো চকোলেট আনতে হবে ওর জন্যে। রোজ রোজ। একদিন না আনলে রক্ষে নেই।

ওর অভ্যেস আমার পকেট হাতড়ানো। চকোলেটগুলো আমি তাই রেখে দিই পকেটে। কলেজ থেকে এসে জামা কাপড় ছেড়ে আমি যখন খেতে বসি বিন্তি তখন পকেট থেকে চকোলেটগুলো হাড়িয়ে নেয়।

আজ আমি ওর জন্যে চকোলেট আনিনি। এনেছি মিমি। মিমি ওর খুব পছন্দ। মিমি খেতে গিয়ে ওর মুখে ল্যাপ্টালেপ্টি কাণ্ড। মিমি টিমি মাখিয়ে ওর মুখ একাকার।

আমি খবরের কাগজে চোখ বোলাচ্ছি, বারান্দায়। শিশু অপহরণ ইদানিং বেড়ে যাচ্ছে শহরে। রোজ রোজ একটা দুটো এরকম খবর থাকবেই কাগজে। বিন্তির মতোই মিষ্টি একটা মেয়ের ছবি ছাপা হয়েছে আজ। ছবির দিকে তাকিয়ে আমি বিন্তির কথা ভাবি। ছবির মেয়েটা হঠাৎ করে বিন্তি হয়ে যায়—ছোড়দা। আমি পাগল হয়ে উঠি—বিন্তি বিন্তি বিন্তি—

ছুটে আসে বিন্তি। ওর হাতে মিমি মুখে মিমি জামা কাপড়েও লেগে আছে মিমি। আমি ঝটকায় কোলে তুলে নিই ওকে। ওর গালে চুমু খাই টুক করে। ওর গালে লেগে থাকা মিমি আমার ঠোঁটে লাগে। আমি ওকে বলি—বিন্তি, তুই কক্ষণো একা একা রাস্তায় বেরোবিনা, বুঝলি?

কেনো ছোড়দা?

ছেলেধরা। ধরে নিয়ে যাবে।

বারে, আমি তো মেয়ে!

আমি কথায় হেরে যাই ওর সঙ্গে। তবুও বলি, ছেলে হোক মেয়ে হোক, ছোটরা একলা রাস্তায় বেরোলে ওরা ধরে নিয়ে যায়।

আচ্ছা।

কোল থেকে নামাই ওকে। ও পালিয়ে যায়।

একটু পরে আবারো এসে হাজির বিন্তি। দুহাত পেছনে, কি যেনো লুকিয়ে রেখেছে ও।

আমি শুধোই, কিছু বলবি?

হুঁ।

বল।

তুমি তো রোজ আমার জন্যে এতো এতো চকোলেট আনো। আজ আমি তোমার জন্যে একটা মজার জিনিস এনেছি। খাবে ছোড়দা?

খাবোনা মানে? অবশ্যই খাবো। দেখি কি এনেছিস—

হাত বাড়িয়ে বিন্তি আমার দিকে যা এগিয়ে দিলো তা দেখে আমার তো চোখ ছানাবড়া। ওর

হাতে বাবার সিগারেটের প্যাকেট। ট্রিপল ফাইভ। সঙ্গে লাইটার।

নাও। খাও।

বলিস কি ? সিগারেট খাবো আমি ?

বারে, বাবা খায়তো। কি সুন্দর ফুঁকফুঁক করে ধোঁয়া বের করে মুখ দিয়ে। নাক দিয়ে। তুমিও খাওনা ছোড়দা।

আমি ওকে বোঝাই—আগে বড় হয়ে নিই তারপর খাবো। এখন এগুলো রেখে আসো যাও—

বারে, তুমি বুঝি বড় হওনি ? বাবার মতোই তো গোঁফ হয়েছে তোমার, বলে আমার গোঁফ ধরে হ্যাঁচকা টান মারে বিন্তি।

ওর কথায় কেমন লজ্জা পেয়ে যাই আমি। লাজুক লাজুক ভঙ্গিতে আয়নার সামনে এসে দাঁড়াই। নিজেকে দেখি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। তাইতো !

দেখতে দেখতে সেদিনের একরত্তি মেয়েটা কি রকম ধাইধাই করে বড হ'য়ে উঠেছে। ফ্রক ছেড়ে শাড়ি পড়েছে ও আজ প্রথম। গুটি গুটি পায়ে শাড়িপরা বিন্তি আমার সামনে এসে দাঁড়ায়। আমি অপেক্ষা করি—এক্ষুণি বিন্তি আমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়বে। আমার চুলগুলো এলোমেলো করে দেবে। বায়না ধরবে কাঁধে চড়ার।

কিন্তু না। বিন্তি আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে কি রকম ছলছল হয়ে উঠছে।

আমি উঠে দাঁড়াই। কিরে বিন্তি, রীতিমতো মহিলা হয়ে গেছিস মনে হচ্ছে ?

বিন্তি আমার গলা জড়িয়ে ফুঁপিয়ে ওঠে—ছোড়দা, আমাকে তোমরা এতো তাড়াতাড়ি বড় বানিয়ে ফেললে ? আমাকে সালোয়ার কামিজ এনে দাও—এনে দাও—অঝোরে কাঁদতে থাকে বিন্তি।

আমি কেমন হতভম্ব হয়ে যাই। আজ হঠাৎ কি হলো বিন্তি ? মা বকেছে ?

আমি তোমাদের খুব বোঝা হয়ে গেছি না ? আমাকে তাই পর করে দিতে চাও ?

আমি ওর কথার কোনো মানে বুঝিনা। ওকে আদর করি—তা কেনো ? মেয়েরা তো শাড়ি পড়েই। ঠিক আছে, কালই তোর জন্যে মেরুন রঙের সালোয়ার কামিজ এনে দেবো।

বিন্তি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকলো অনেকক্ষণ। তারপর ছুটে গেলো ওর ঘরে। বালিশটাকে আঁকড়ে ধরে কেঁদে একাকার হচ্ছে মেয়েটা। দেখে আমার বুকটা কেমন করে।

আমি মায়ের ঘরে যাই। আমাকে দেখেই উচ্ছ্বাসের সঙ্গে মা বলে, আছিস তো শুধু পলিটিক্স নিয়ে। ঘরের খোঁজ খবর কিছু রাখিস ?

আমি বোকার মতো মাথা নাড়াই, কি হয়েছে মা ?

কি আর হবে ? আজ বিন্তিকে ওরা দেখতে এসেছিলো। পছন্দ হয়েছে ওদের। ওর বিয়েটা ঠিক করে ফেললাম। ছেলে ইঞ্জিনিয়ার। কুয়েত ফেরৎ।

আমি চমকে উঠি—বলো কি মা! সবে তো নাইনে পড়ে বিন্তি! এরই মধ্যে বিয়ে দিয়ে দেবে ? এতোটুকুন মেয়ে কি পারবে সংসার করতে ?

বাবা বললো, পারবে। নিশ্চয়ই পারবে। তোর মার যখন বিয়ে হয় তখন তো তোর মা পড়তো ক্লাশ সিক্সে, তাইনা খোকার মা ?

আমি চিৎকার করে বলি—এ বিয়ে তোমরা ভেঙে দাও।

কি পাগলের মতো বকছিস ! যা এখান থেকে। তুই এসবের কি বুঝবি ? বাবা ধমকে ওঠেন।

পুতুলের বিয়ে ভেঙে গেলে যে মেয়ে কেঁদেকেটে একাকার হয়, নায়না খায়না, সেই মেয়ের কি সাজে নিজেই বধূর বেশে শ্বশুরবাড়ি যাওয়া? আমি এর কোনো জবাব খুঁজে পাইনা।

বিন্তির বিয়ে হয়েছে আজ এক বছর। ও এখন কুয়েতে থাকে ওর স্বামীর সঙ্গে। কতোবার যে চিঠি লিখেছে বিন্তি—

ছোড়দা—আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাও, আমি আর পারছিনা, আমার খুব কষ্ট হচ্ছে, এতো দূরে, তোমরা কেউ নেই, আমার কিচ্ছু ভাল্লাগেনা, ছোড়দা আসার সময়ে আমার জন্যে চকোলেট এনো, মিমি এনো, মেরুন রঙের বুটিদার ওড়না আর সালোয়ার কামিজ, ছোড়দা, আমার জন্যে ববিক্লিপ আর টুকটুকে লাল ফিতে আনবে কিন্তু, আচ্ছা ছোড়দা, ঢাকার আকাশে এখনও কি রবীন্দ্রনাথ শুয়ে থাকে? কুয়েতের আকাশে আমি রবীন্দ্রনাথকে কত্তো খুঁজেছি, পাইনা ছোড়দা...

নীল আকাশে শাদা টুকরো মেঘগুলো একেক সময় একেক রকম হয়। একবার বিন্তি আমাকে দেখিয়েছিলো—দ্যাখো ছোড়দা, আকাশে রবীন্দ্রনাথ শুয়ে আছে...

আমি কিচ্ছু করতে পারিনা। আমার কোনো কাজে মন বসেনা। আজকাল বিন্তির কথা মনে হলেই বুকের বাঁ দিকে চিনচিনে ব্যথাটা মোচড় দিয়ে ওঠে। একেকবার মনে হয় ছুটে যাই কুয়েত। নিয়ে আসি ওকে। কিন্তু পারিনা। মেয়েরা স্বামীর কাছে থাকবে এটাইযে নিয়ম!

প্রজাপতির মতো চঞ্চল মেয়েটা আজ দেশ ছেড়ে বহুদূরে সংসার পেতেছে ভাবতেই মনটা দুঃখে ভরে ওঠে।

সেদিন চিঠি এসেছে কুয়েত থেকে। আমাদের বিন্তি মা হবে। আমি ছটফট করি। একরত্তি মেয়েটা কি সারাদিন জানলার গ্রিলে গাল ঠেকিয়ে ছোড়দা ছোড়দা বলে কাঁদে? আমি শুনতে পাই যে!

একটু আগে পিওন এসে চিঠি দিয়ে গেলো। কুয়েতের চিঠি। বিন্তির চিঠি ভেবে আমি খুলে ফেলি খাম। না। বিন্তির ইঞ্জিনিয়ার স্বামী লিখেছে বাবার কাছে। ছোট্ট চিঠি। মা হতে গিয়ে বিন্তি হারিয়ে গেছে চিরদিনের জন্যে।

আরেকটা চিঠি আছে সঙ্গে। আমাকে লেখা হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে আমাকে লিখেছিলো মৃত্যুর কদিন আগে। বিন্তি লিখেছে—

ছোড়দা কাল রাতে তোমাকে স্বপ্ন দেখলাম। তুমি আমাকে একটা চিঠিও লিখলে না কেনো? আমার কি দোষ ছিলো ছোড়দা...। ছোড়দা জানো, কাল দুপুরে কুয়েতের আকাশে আমি রবীন্দ্রনাথকে দেখেছি। আমার আর কোনো কষ্ট নেই ছোড়দা...।

আমি আকাশের দিকে তাকাই। অইতো, আকাশে শুয়ে আছে ধবধবে শাদা দাড়িঅলা রবীন্দ্রনাথ। বাতাস শাদা মেঘের টুকরোগুলোকে ভাসিয়ে নেয়। রবীন্দ্রনাথ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। ওখানে তৈরি হয় আরেকটি মুখ। হ্যাঁ, বিন্তির মুখ। আমি তাকিয়ে থাকি। তাকিয়েই থাকি। আমার চোখ দুটো জল টলমল পুকুর হয়ে যায়। আমি কাঁদতে থাকি। সে আমার ছোটবোন, বড় আদরের ছোটবোন।



রক্ত গোলাপ

আমীরুল ইসলাম

আমার নাম কপোত। দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে কখনো ভাবি, আমি যদি পাখি হতাম! কোন এক সফেদ সকালে উঠে মনে মনে বলি, পৃথিবীর সবটুকু রং আমি শুষে নেবো। শৈশবের কিছু উজ্জ্বল স্মৃতি আমার হৃদয়ে জাগরুক। স্মৃতিভুক দুপুরে চিলেকোঠায় বই পড়তে পড়তে মন চলে যায় তেপান্তরে। 'তিমুর ও তার দলবল' বইটা পড়েছি। আমার একটা বাগান আছে। প্রতি বছর শীতে আমি সেখানে রক্তগোলাপ লাগাই। লাল টকটকে ফুলে ছেয়ে থাকে বাগান। সেই ফুল আমার খুব প্রিয়।

বাবার হাত ধরে একবার একটা সিনেমা দেখি। যুদ্ধে যায় এক কিশোর। একের পর এক শত্রুপক্ষের ট্যাংক ধ্বংস করে। মা'র টানে ঘরে ফিরতে চায়। কিন্তু স্বাধীনতার যুদ্ধ তার কাছে এখন মায়ের চেয়েও বেশি প্রিয়। দেশের মাকে মুক্ত করতে হবে। লালচে মেটে রঙের সেই ছবি মনে পড়লেই আমার বুকটা হু হু করে। মনে পড়ে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ। একাত্তরের সেই টালমাটাল দিন। আকাশে শকুনের আনাগোনা। রাস্তায় টহলদার কনভয়। খাকী পোশাকের লোকজন। হঠাৎ করে জংগী প্লেনের চিৎকার। কুড়িয়ে পাওয়া গুলির খোলস। বাবা মা'র মুখে গাঢ় চিন্তার ছাপ।

সেই যুদ্ধ, যখন আমার বয়স দশ, টানা নয় মাস চললো। শহর ছেড়ে ভাগছে সবাই। বাবা অনড়। তিনি যাবেন না। রাতে ঘুমোতে পারতেন না। রাত গভীরে বারান্দায় পায়চারি করতেন। ফিসফিস করে কথা বলতেন মায়ের সঙ্গে। আমার ভাইয়া তখন কলেজে পড়ে। অসম্ভব জেদী আর একগুঁয়ে। স্বদেশীরা তার আদর্শ—পরে তা বুঝেছি। যে কোন মিছিলের আগে থাকত। রাত জেগে পোস্টার লিখতো। কখনো কখনো ঘাড় গুঁজে বই পড়তো। এক চিলতে উঠোনে একটা বাগান করেছিলো ভাইয়া। লালগোলাপ ভাইয়ার খুব প্রিয়। বাগান জুড়ে টকটকে লাল গোলাপ খুবই সুন্দর লাগতো!

এক বিকেলে বাবা মা' আর আপা বসে চা খাচ্ছিলো। তিন চাকার সাইকেল নিয়ে খেলা করেছিলাম আমি। আপার দিকে হাত বাড়িয়ে বাবা বললেন,

ঃ একটু টিপে দে'তো মা।

আপা বাবার খুব ভক্ত। হাত টিপতে টিপতে আমার সঙ্গে চোখে চোখে দুষ্টুমি করছিলো। ঝড়ের বেগে এমন সময় এলো ভাইয়া। উবু হয়ে সাত তাড়াতাড়ি বাবার পায়ে সালাম করলো। আপার বেণী ধরে টান দিলো। একছুটে চলে গেলো ভেতরবাগে। মাকে জাপটে ধরে আদর কুড়িয়ে নিলো। ব্যাপার কিরে, ব্যাপার কিরে—কেউ কিছুই জানতে পারলো না। ভাইয়া একটা হ্যাভারসাকে প্রয়োজনীয় জিনিশপত্তর ভরে নিলো। গোর্কীর 'মা' উপন্যাসটা ভাইয়া নিতে ভোলেনি। কারো মানা শুনলো না। ঝটিতে বেরিয়ে গেলো। কিছুদিন পরে আমি বুঝলাম—ভাইয়া যুদ্ধে গেছে। বাবা চোখের জল মুছলেন—

ঃ পাগলটা শেষ পর্যন্ত চলেই গেলো।

মা কিন্তু সেই বিকেলে খুব কেঁদেছিলেন। কান্না দেখলেই কান্না আসে। দেখাদেখি আমি আর আপাও খুব কেঁদেছিলাম।

এরপরই আমাদের বাসায় লুকিয়ে লুকিয়ে মানুষ আসতো। পরে শুনেছি, ওরা মুক্তিযোদ্ধা। ভাইয়ার খবর নিয়ে আসে। আমাব মন আনন্দে নাচতো। ভাইয়ার কী মজা! সেই ছবিতে দেখা লোকটার মতো ভাইয়া বনে জংগলে, পাহাড়ে যুদ্ধ করে। মা কিছুতেই কিছু বুঝতে পারে না। মায়ের চেয়ে যুদ্ধ বড়ো—কে বোঝাবে এই কথা। একদিন শুনলাম—ভাইয়া ওপার বাংলায় চলে গেছে। গোটা গোটা অক্ষরে আমাকে এক লাইন চিঠি লিখেছে—লালগোলাপের যত্ন নিস। আমি শিগগির ফিরবো।

দ্বিগুণ উৎসাহে বাগানের যত্ন নেই। আমার সেই শৈশব চপলতায় মুখর হয়ে ওঠে সারা বাড়ি। কিন্তু বাবার চোখে আষাঢ়ের কালো মেঘ। মায়ের মনে অশান্তির ঢেউ।

দিন গড়িয়ে চলে। স্বাধীনতা যুদ্ধ চলছে তোড়জোড়ে। খুব উন্মাতাল দিন। চারিদিকে বিপদের ঘনঘটা। বাবা জমানো পয়সা ভেঙে সংসার চালাচ্ছেন। অবসর সময়ে আপার সঙ্গে দাবা খেলেন। মনভরা চিন্তা। তাই অমনোযোগের কারণে প্রায় হেরে যান। আপা খুব খুশি হয়। জয়ী হয় বলে আমার গালে টুসকি মারে। কান মলে ফুসফুস করে কথা বলে—

ঃ তুই লক্ষ্মী সোনা ভাই! কত্তো ভালোবাসি তোকে।

মিথ্যে কথা। আপা কখনোই আইসক্রীমের ভাগ দেয় না আমাকে। কালিকলম নিয়ে ঘষাঘষি করলে রাগ করে। শখ করে নেলপালিশ মাখলে কান মলে দেয়।

ফুর্তিতে থাকলে দাদা ডাকে। আর বলে,

ঃ দাদা, আমাকে দিদি ডাকবি কিন্তু!

কিছুদিন পর আপা আর আমি মিলে নতুন একটা খেলা তৈরি করলাম। যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা। দুজনেই মুক্তিযোদ্ধা হতে চাই। তাহলে চলবে কী করে। বাধ্য হয়ে টস করি। বারবার হেরে যাই। পাকবাহিনী সাজতে আমার একটুও ইচ্ছে করে না। স্কুল বন্ধ। হাতে অফুরন্ত সময়। বাবা আমাকে দশটা করে ইংরাজিতে শব্দ শিখতে বলেছেন। সন্ধেরাতে নীরস ওয়ার্ডবুক নিয়ে বসি। বাবা তখন কানের কাছে রেডিও নিয়ে কী সব শোনেন। বাসা থেকে বেরুনো নিষেধ।

ঢিমে তেতালা ছন্দে আমার সময় কাটে। হঠাৎ করে ভাইয়ার খবর আসা বন্ধ হয়ে গেলো। সেই সময়েই বাবা মা জরীফ বুড়ো হয়ে গেলেন। কান্নাকাটি করতে করতে মা'য়ের চোখের

জ্যোতি কমে গেলো। বাবা কথা বলা কমিয়ে দিলেন। পাড়ার কাকুরা বাসায় এলেও বাবা মুখচোরা থাকেন। আমাদের সেই উজ্জ্বল বাড়িতে নেমে এলো থকথকে নীরবতা।

সেই আমি তখন এসবের কিছু কিছু বুঝেছিলাম। বাকিটা অনেক পরে।

নয়মাস যুদ্ধের পর স্বাধীনতা আসে। লাখো মানুষের রক্তস্রোত। সবুজ দেশে উঠছে লাল সূর্য। দিকে দিকে সবার বিজয় উল্লাস। বুকে বুক মেলাবার দিন। রাস্তায় রাস্তায় মানুষের ঢল। রাইফেলের গুলির শব্দে মুখর হচ্ছে স্বাধীনতার চেতনা।

আমার মন ভালো নেই। যুদ্ধ শেষে ভাইয়া আর ফেরেনি। আপাও আর যখন তখন সাজগোজ করে না। বেণী বাঁধে না এলোচুলে।



আমার বোধে স্বাধীনতা দীপ্ত নয়। তবু আমি বুঝতে পারি—সবাই আজ মুক্ত। আবার আমি কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে স্কুলে যাবো। বাবা অফিস থেকে ফিরবেন হাসিমুখে। সঙ্গে থাকবে ঠোঙাভর্তি মুখরোচক খাবার। ভাইয়ারা যুদ্ধ শেষে কেন ফিরবে? কোটি কোটি মানুষের জন্য ভাইয়ারা লড়াই করেছে। মৃত্যুর মধ্যেই সেই লড়াইয়ের আসল আনন্দ।

একদিন ভাইয়ার এক বন্ধু এসে হন্তদন্ত হয়ে খবর দেয়—ও নেই। ছদিন আগে মারা গেছে। তিনদিন আমাদের বাসায় হাঁড়ি চড়েনি। মা আর আপা কেঁদেকেটে কাঁপিয়ে তুলেছে পুরো বাড়ি। বাবা চুপচাপ, নিরুত্তর। আমি কেঁদেছিলাম। ডিসেম্বরের সেই দুই তারিখ আমাদের হৃদয়ে খচিত উজ্জ্বল দিন। বছরের সুরুতেই নতুন ক্যালেন্ডারে আমি দাগ দিয়ে রাখি।

সতেরো তারিখ ভাইয়ার বন্ধু পামেল আসে। কাঁধে স্টেনগান ঝুলিয়ে। যুদ্ধ ফেরত খাঁটি যোদ্ধা মনে হয় না পামেল ভাইয়াকে। যুদ্ধে গেলে আবার ফিরে আসা কী? পামেল ভাইয়া এসে একটা ডাইরি দিয়ে যায় বাবার হাতে। বারান্দার ওপর বসে তৃপ্তি ভরে ভাত খায়। পাড়ার সবাই এসে আমাদের উঠোনে ভীড় করে। একজন মুক্তিযোদ্ধার দিকে তাকিয়ে আশ মেটে না কারো।

পামেল ভাইয়ার হাতে সময় কম।আমি সুযোগ বুঝে স্টেনগানটা একটু নাড়াচাড়া কবে দেখি। পাশের ঘর থেকে আপা ডাক দেয়—

ঃ কপোত শুনে যা একটু, শিগগির—

আপা আমার কানে কানে বলে দেয়,

ঃ যন্ত্রটা একটু নিয়ে আয়।

তারপর দু'ভাইবোন মিলে সেটা উল্টাই পাল্টাই।

ভাইয়ার আরেকবন্ধু ইসমাইল আর্ট কলেজে পড়ত। ভাইয়ার একটা তেল রং-এ পোট্রেট এঁকে দেয় সে। সেটা আজো সযত্নে আমাদের ঘরে টাঙানো আছে। বাবা কখনো কখনো লাল মলাটের ডাইরি বের করে পড়েন। আর টপটপ করে চোখের পানি ফেলেন। ভাইয়ার মৃত্যুদিনে আমি ফুলের মালা দিয়ে ছবিটা সাজিয়ে দেই।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি অনেক কিছু জানতে পারি। একদিন লুকিয়ে পড়ে ফেলি ডাইরিটা। কিছুকিছু অংশ আমার হৃদয়ে চিরদিনের জন্য গেঁথে থাকে।

....আজকে আমরা বেনাপোল বর্ডারে পৌঁছেছি। পাকবাহিনীর ঘাঁটির ওপর কাল ভোরবেলা আক্রমণ চালাতে হবে। আমরা চৌদ্দজন। সঙ্গে ভারি অস্ত্রশস্ত্র নেই। তবু চালিয়ে যেতে হবে। বনগাঁ রেলস্টেশনে দাঁড়িয়ে হঠাৎ আমার মায়ের কথা মনে পড়লো। ইচ্ছে হলো, হাতে শান্তির রুমাল উড়িয়ে মার কাছে ফিরে যাই। দুহাত আঁকড়ে ধরে বলি মা, তোমার ছেলে ফিরে এসেছে। তোমাকে মুক্ত করেছে।

তুমি প্রাণ খুলে হাসো না।.....

...গত কদিন মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছে। অপারেশনে মারা পড়েছে পাঁচজন। মেরেছি সাতাশজন। বাবা যদি জানতেন—আমি মৃত্যুকে জড়িয়ে ধরার জন্য উন্মুখ! মুখ টিপে লাজুক হাসতেন। হয়তো বলতেন, ওগো, দেখো পাগল ছেলের কাণ্ড দেখো!

যারা মারা পড়েছে ওদের দায়সারাভাবে কবর দিতে হয়েছে। আশপাশের লোকদের সাহায্য কোনদিন ভুলবার নয়। ইসমাইল এক ঝোপের ভেতর লুকিয়ে থেকে তিনদিন উপোস করে কাটিয়েছে। ডান হাতে গুলি খেয়ে পুরো একদিন অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকে। পরে গ্রামের লোকেরাই উদ্ধার করে। বাঁচিয়ে তোলে।

আমি সূর্যসেনের জীবনী পড়তে বসেছি।

....বাড়ির কথা মনে পড়ছে খুব বেশী। আমার লক্ষ্মী বোনটাকে আদর করি না কতোদিন। ভাবুক ছেলে কপোতই বা কেমন আছে। ও নিশ্চয়ই এখনো খুব সকালে উঠতে চায় না। গল্প শোনার জন্য কার কাছে আবদার করে? বাড়ি ফিরে কপোতকে রাইফেল চালানো শিখিয়ে দেব। ও খুব খুশি হবে। বোনের জন্য আমার ভালোবাসার ঘাটতি নেই। কিছুদিন আগে টেনিদার

সিরিজ পড়তে চেয়েছে। আমি মার্ক টোয়েনের বইগুলো ওকে কিনে দেব। বোনটির ফ্রকের আঁচল চিবুনো অভ্যেস। এখনো কিসে অভ্যেস আছে তার। অনেকদিন বাসার খবর পাই না। চার মাস যুদ্ধে এসে মনে হচ্ছে, যুগ যুগান্তর ধরে এখানে পড়ে গেছি। যেন কোনদিন আমি বাবা-মায়ের কাছে থাকিনি। আমার কোন ভাইবোন নেই।

সেই আদিম যুগের মানুষের মতো শুধু যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা। আর কতদিন খেলতে হবে।

....খুব ভয়াবহ যুদ্ধ চলছে। আমরা যশোরে পৌঁছেছি। পাকবাহিনীর বুদ্ধি ভোঁতা। সেই সুযোগে আমরা বিজয়ের স্থির লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছি। গত বিকেলে পাপ্পু, তপন আর লিটু মারা গেছে। পাপ্পুর কপালের খুলি উড়ে গেছে। কী বীভৎস সে চেহারা। কিন্তু ঠোঁটের হাসিটুকু লেগে রয়েছে। আমাদের ক্যাম্পের সামনে কবর দিলাম। আমি কবরের ওপর একটা রক্তগোলাপ পুঁতে দিলাম। ফুলটা হাতে নিতেই বাড়ির কথা মনে পড়লো। একা থাকা পৃথিবীতে অনেক সুখেব। বাবা মা ভাইবোনদের নিয়ে যে অখণ্ড পরিবার তাতে আমরা লতায় পাতায় জড়িয়ে পড়ি। বাইরের বাতাসে বেরিয়ে এলেই হৃদয়ে টান লাগে।

আমি ফিরে যাব। এক বুক স্বাধীনতা নিয়ে আমার সেই চিলতে উঠোনে দাঁড়াব। সবাইকে বলবো, আমি এসেছি। কপোত কি বাগানের যত্ন নিচ্ছে? বাবা কি চেহারা ভার করে অনাগত দিনের কথা ভাবছেন? আদুরে বোনটা কি গলে গলে পড়ছে ভালোবাসায়? মা তার দুরন্ত, পাগল ছেলেটার জন্যে এখনো কি কান্নাকাটি করে? কে জানে কে বলতে পারে এখন কেমন আছে ১৯৮ জগন্নাথ সাহা রোডের সেই বাড়িটি?

....আমার বাগানে নিশ্চয়ই শীতের সুরুতে অনেক রক্তগোলাপ ধরেছে। লাল টকটকে রঙের মধ্যে এক ধরনের উগ্রতা আছে। জেদী, দামাল, সাহসীজনের প্রিয় রং লাল। সূর্যে লাল স্নিগ্ধতা থাকলেও কখনো কখনো তা ভয়ংকর। অনেকগুলো রক্তগোলাপের দরকার আমার। খুব তাড়াতাড়ি কাছের মানুষরা চলে যাচ্ছে। কাল যার সঙ্গে এক পাতে ভাত খেলাম আজ সে পৃথিবীর সব মায়া কাটিয়ে চলে গেছে। রিটন, হেলাল, বাচ্চু, পলু সবাই আছে শান্তিতে। যাদের ছাড়া এই বিরাট যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের অস্তিত্ব কল্পনা করতে পারি না তারাও হারিয়ে যায়। আসলে তাই-ই শুধু আসা যাওয়া।

এই আসা যাওয়ার মাঝখানে দুএকটি স্মৃতি, কিছু টুকরো ঘটনা। ছেঁড়া ছেঁড়া কথা। ওদের কবরে গুচ্ছ গুচ্ছ গোলাপের পাপড়ি ছড়িয়ে দেয়ার ইচ্ছে আমার। কিন্তু হাতের কাছে একটা রক্তগোলাপও পেলাম না। সময় ও সুযোগ পেলে সবাইকে রক্তগোলাপের ওপর শুইয়ে রাখতাম। কিছুদিন আগে কপোতকে তাই এক লাইনে লিখে দিয়েছি—বাগানের যত্ন নিস।

বাবা আমার জন্য দোয়া করো। মা, তোমার ছেলে নিরুদ্দেশ নয়, ফিরে আসবে। শুধু দোয়া করো।.....

আমি সেই কপোত। বারো বছর আগে আমার ভাইয়া যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে। আপা শ্বশুর বাড়ি থাকে। বাবা বুড়ো হয়ে গেছেন। মায়েরও বয়স হয়েছে অনেক।

ভাইয়ার ডাইরিটা পুরো অংশই আমার মুখস্থ। ভাইয়ার জন্য আমি গর্ব করি। ছাব্বিশে মার্চ

আমার চেতনা জুড়ে থাকে ভাইয়া। ষোলই ডিসেম্বর ঢাকা শহরময় ছড়িয়ে পড়ে ভাইয়ার অস্তিত্ব।

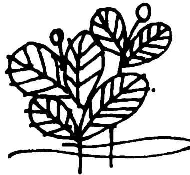
আজতক আমার উঠোনে বাগান রয়েছে। গুচ্ছ গুচ্ছ রক্তগোলাপের সমারোহ। বাবা মাঝে মাঝে আমার খেয়াল দেখে হাসেন—

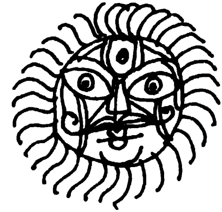
ঃ ও ফিরে আসবে না কোনদিন। অযথা বুকে কষ্ট বাড়াস ফুল লাগিয়ে।

আপা বাসায় এলেই ফুল ছিঁড়ে নিয়ে যায়। আর আমি অপেক্ষায় থাকি—ভাইয়া হয়তো আসবে। লাল রক্তগোলাপের পাপড়ি মাড়িয়ে বলবে—

ঃ কপোত, তুই ভালো আছিস। দেশতো এখন স্বাধীন। তোরা সবাই বড় হয়ে গেছিস। কতো সুখে আছিস। আমাকে কিছু রক্তগোলাপের পাপড়ি দে। একটা একটা করে আমি সব শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের দেব। কেন না—ওদের জন্যে কেউ কিছুই করেনি।

কিন্তু ভাইয়া ফিরে আসে না। কোনদিন আসবে না। আমি কপোত তবু অপেক্ষায় থাকি।





দখল

নসরত শাহ

কয়েকজন মানুষের ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে নতুন চর থেকে নেমে যায়। শেষ বিকেলের হলুদ রোদ ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। ভয় পেয়ে একটা ফড়িং ধানের শীষের ওপর থেকে ডানা কাঁপিয়ে উড়ে গেল। লম্বা কাশঘাস সাবধানে দুদিকে সরিয়ে বেরিয়ে আসে লালুর আতঙ্কিত মুখ। আশে পাশে দৃষ্টি মেলে দেখে নেয়, কেউ নেই। লুঙ্গিটায় মালকোচা দিয়ে নেয়। ফসল বাঁচিয়ে আলের ওপর দিয়ে দ্রুত এগিয়ে চলে। এ মুহূর্তে দৌড়াতে চাইলেও পারছে না। তাহলে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বোনা ফসল পায়ের আঘাতে ঝরে যাবে। বুকের মধ্যে টন টন করতে থাকে একটুকরো কষ্ট।

পদ্মা মরে জেগে উঠছে বিশাল বিশাল চর। সবই জোতদার ও মহাজনের দখলে চলে যাচ্ছে। জমির ন্যায্য মালিকদের বুকে ক্ষোভ কিন্তু মুখে বিদ্রোহের ভাষা এলেই, রাতের আঁধারে খুন হয়ে গাঙ্গের জলে ভেসে যাবে। ন্যায়-অন্যায় সবই তেনাদের হাতে। নদীর ভাঙনে বিলীন হয়ে যাওয়া পূর্বপুরুষদের কিংবা নিজের জমি নিয়ে নতুন চর জাগলেও, কেউ সাহস করে বলতে পারবে না, ওই জমিন আমার, এবার নতুন ফসল বুনবো ওই পলিমাটিতে।

লালু এবার দৌড়াচ্ছে। দ্রুত সরে যায় দুপাশের ফসলের ক্ষেত, কাশ বন ও খোলা চর। পায়ের তলায় পিষে যাচ্ছে ঘাস ফুল। ঘাসের তুলতুলে প্রলেপ উত্তেজনায় ম্লান। কিছুদিন আগে মহাজনের পাল থেকে ছুটে এসে এক পাগলা মোষ চরাঞ্চলের কৃষাণদের আক্রমণ করেছিল। লালুও তাড়া খেয়েছে। মুখোমুখি হয়ে আচমকা ল্যাসোর মত দড়ির ফাঁদে আটকে ফেলেছিল। সেই থেকে লালুর সাহসের কথা গ্রামের সকলে জানে।

সামনেই ছোট খাল। সাঁতরে পার হয়ে যায়। শীতে কাঁপুনি নেই। বরং দরদরিয়ে ঘামছে। কুয়াশার লম্বা টানা মিহি আবরণে গ্রামগুলো ঢেকে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নামে। দু'একটা

বাড়িতে ইতিমধ্যেই কেরসিনের কুপি জ্বলে উঠেছে। জোতদার ও মহাজনের ছেলেমেয়েরা এখন নিশ্চয় গৃহ শিক্ষকের কাছে পড়তে বসেছে। লালুর পড়ালেখা শেখার খুব ইচ্ছা। গ্রামে একটা স্কুল ছিল, কমিটি নিয়ে গোলমাল হওয়ায় তাও তেনারা উঠিয়ে দিয়েছেন। মাঝে মাঝে মনে হয়, এখানে এমন কেউ কি আসতে পারে না, যিনি ফসলের ক্ষেতে কাজ শেষে সন্ধ্যা রাতে ওদের পড়ালেখা শেখাবেন! আজ-কাল লালুর কাছে এসব স্বপ্ন মনে হয়। কদিন থেকে মনে তিরতির ফূর্তি বইছিল। ওদের জমির পাশে নতুন চর জাগছে, সেটা ওদেরই। এই জমি আর ওই চরের দুই ফসল উঠলে,ঘরে আর অভাব থাকবে না। তখন পড়া লেখা শেখার জন্য অন্য গ্রামেও যেতে পারবে।

ধবল জ্যোৎস্নায় সব কিছু ফকফক করছে। লালুর রক্তের মধ্যে এক ধরনের চঞ্চলতা। বাড়ি পৌঁছতে রাত হয়ে গেছে। কলা আর বাসক ঝোপে ঘেরা ছোট উঠোনের কোণে ছনের ঘর। শরীর থেকে কুল কুল ঘাম ঝরছে। হাঁপাতে হাঁপাতে কোন রকম উঠোনে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত গলায় ডাকে, বাজান গো, বাজান। দুয়ার খোল, খবর আছে ··· !

হোগলা পাতার ঝাঁপ সরিয়ে টিমটিমে কুপির আলো হাতে লালুর বাবা মধ্য বয়সী গদাই মিঞা বেরিয়ে আসে।

'কি হইছে লালু, ওমন করতাছস ক্যান ··· ?'

'জোতদারের লাঠিয়ালরা বেইন্যা রাইতে মোগো নয়া চর দখল নেবে। জমিনের পাহা ধানের উপরও নজর পড়ছে।' লালু আর কিছু বলতে পারে না। বাজানকে জড়িয়ে ধরে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলে। গদাইয়ের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে। হাতটা কেঁপে কুপিটা পড়ে গিয়ে ধূলোয় গড়াগড়ি খায়। বুকের মধ্যে একটা উত্তাল তরঙ্গ ছলকে ওঠে।

পাশের ঝোপ থেকে শেয়াল ডাকে। খোয়াড়ের হাঁস মুরগীগুলো সঙ্গে সঙ্গে ভয়ার্ত চিৎকার করে ডানা ঝাপটাতে থাকে। লালুর ছোটভাই ভুলু 'হাই-হুউস-হা-হা-' আওয়াজ করে শেয়াল তাড়াতে লাঠি নিয়ে বের হয়। দু'জনকে ঝুপসি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করে, 'কি হইছে স্যাভাই?'

'মোগো জমিনের পাহা ধান আর নয়া চর জোতদারের মাইষ্যেরা হাঝের কালে দেইক্যা গ্যাছে। ওইহানে খাড়াইয়া পরামিশ করছে, 'সব কাইররা নেবে।' মুই কাশ খ্যাতে পলাইয়া হুনছি।'

তিন জনে স্থির। জ্যোৎস্নায় গাছের ছায়া হাওয়ায় কাঁপে। এমনি এক রাতে সর্বনাশা পদ্মা ওদের বাড়ি-ঘর, জমি কেড়ে নিয়েছে সেই ভাঙন থেকেই ওরা প্রায় নিঃস্ব-সর্বহারা। এখন দিন ফিরছে, অথচ ওরা ধরে রাখতে পারছে না। এ দুঃখে বুক ফেটে যেতে চায়। এক সময় মনের মধ্যে জন্ম নেয় নতুন শিকড়। রক্ত চনমন করে ওঠে। হাতের মুঠি শক্ত হয়ে বুক ফুলে যায়। জীবন থাকতে কিছুতেই নয়াচর জোতদারকে ছেড়ে দেবে না।

নতুন চরে অন্যান্য যাদের জমি আছে তাদের খবর দিতে তিনজনে তিনদিকে ছুটে চলে।

সময় বয়ে যায়। চাঁদ পশ্চিমে হেলে পড়েছে। ম্লান হচ্ছে জ্যোৎস্নার মোলায়েমতা। বাজান, লালু ও ভুলু আবার এসে বাড়ির উঠোনে মিলিত হয়। বুকের মধ্যে কেমন এক ধরনের হিম-শীতলতা। কেউ ওদের ডাকে সাড়া দেয়নি। চরাঞ্চলের গ্রামে এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়ির দূরত্ব বেশ। গ্রাম ঘুরে সকলকে অনুরোধ করেছে। কারো কারো হাত পা ধরে কেঁদেও ফেলেছে। কিন্তু জমিতে অংশিদার থাকলেও ভয়ে কেউ প্রতিরোধ করতে সাহস পাচ্ছে না। দলীয় কারণে

প্রশাসনও জোতদারের পক্ষে। তাই গুম খুন ও ভিটেমাটি থেকে উৎখাতের আতঙ্কে সাধারণ মানুষের মন পাষাণ হয়ে গেছে।

গেল সন খরায় ভাতের অভাবে বোনটা মারা গেছে। বর্ষায় ভিজে কাজ করতে গিয়ে মা অসুখে ভুগে সারা বছর বিছানায়। সুদের টাকায় লাগানো বর্গা জমি, সময় মত তা পরিশোধ করতে না পারলে মহাজন ভিটে মাটি নিলামে উঠাবে। আধ পেটা খেয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করে



সল বুনেছে। গরু-মোষ পাখির অত্যাচারের জন্য তা পাহারা দিয়েছে।—এসব ভাবতে দারুণ ক্ষোভে লালুর কান্না পেয়ে যায়। ভুলুর বুকের মধ্যে কেমন এক ধরনের ধুকপুকানি। বাজান

চোয়াল শক্ত করে দৃঢ় কণ্ঠে বললো, 'পরানে রক্ত থাহা পর্যন্ত জোতদাররে জমিনে ঘিসতে দিমুনা। মোরা তিন বাপ বেটাই রুখমু ল দিহি তোরা!'

ভুলু দ্রুত গিয়ে ঘরের মাচায় লুকানো ট্যাডা, শড়কি ও ধারালো রামদা বের করে নিয়ে আসে। রুগ্ন মা হাতবাড়িয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে ওদের থামাতে চেষ্টা করে। কিন্তু তিনজনে ছায়া সঙ্গী করে আলের উপর দিয়ে এগিয়ে চলে। মধ্যরাতের শেষে দূরগ্রাম থেকে কুকুরের অশুভ কান্নাধ্বনি ভেসে আসে।

বুকের মধ্যে ঝড়। হাঁটু জল পেরিয়ে নতুন চরে পা রাখে। অনুভব করে, আহঃ কী আরাম। মাটিতে সোদা গন্ধ। পদ্মার পলি জমে নতুন চরের কাজল মাটি এখন সব জায়গায় শক্ত হয়নি। নরম ভেজা মাটির স্তরের নীচে কোথাও কোথাও লুকানো চোর কাদা থাকা অসম্ভবের কিছু নয়। তাই খুব সাবধানে পা ফেলে কাশবনের আড়ালে অপেক্ষায় থাকে। মাথার ওপর দক্ষিণা হাওয়ায় ঝির ঝির কাশ ফুল দোল খায়। পাশের জমি থেকে পাকা ধানের মৌ মৌ ঘ্রাণ ভেসে আসে। মোলায়েম হাওয়ায় উত্তেজিত ঘর্মাক্ত শরীর যেন জুড়িয়ে যেতে চায়। তবুও বুকের মধ্যে হাতুড়ি পেটানো থামেনা। বিস্তীর্ণ চরের সফেদ ফালু ফকফক করে। মুক্তোর দানার মত চাঁদের ছায়ায় ঢেউ ভেঙে বইছে পদ্মা। নতুন চর আর পদ্মার অদ্ভুত দ্যুতিময় ধূসর আভায় বিপদ আসছে যেন চুপি সাড়ে।

আচমকা সর সর পানি কাটার শব্দ উত্তর দিক থেকে ভেসে আসে। কানখাড়া করে উৎসুক দৃষ্টি মেলে তাকায়। দ্রুত নয়া চরের পানে ছুটে আসছে ছিপ নৌকো। ধল পহরের চাঁদের আলোয় ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হয়, দু'জনে খোল আর কাশ বাজাতে থাকায়, অদ্ভুত নৃত্যের তালে তালে দুলছে মাথার ঝাকড়া চুলে লাল ফেটি বাঁধা ও শক্ত হাতে লাঠি ধরা এক দঙ্গল লাঠিয়াল। মুখে তাদের উত্তেজিত রব, হেঃএ··· হেঃএ··· হেএ··· এ··· এ···! সকলের সামনে সাদা পোষাক ও টুপি মাথায় জোতদার উৎফুল্লে হাসছে। যেন প্রসন্ন পবিত্র মানব, এক্ষুনি নতুন চরে আবির্ভূত হয়ে হাতে ধরা দখলের লাল নিশান উড়াবেন।

ওরা তিনজন একটুও ভড়কায় না' কাশবন থেকে বেরিয়ে আসে। পাশাপাশি তিনটে ছায়া ছড়িয়ে সমগ্র চর জুড়ে যায়। হাতের চকচকে ধারালো অস্ত্রগুলো চাঁদের আলোয় ভয়ঙ্কর হাতছানিতে ঝল্কে ওঠে।

নৌকা ভিড়িয়ে হৈ হুল্লোড় করে লাঠিয়ালরা দৌড়ে আসতে থাকে। লালুব বাবা গদাই মিয়া মুখে বার বার হাতের তালু ঠেকিয়ে 'আঃ- আঃ-আঃ--আওয়াজ করে বজ্র কণ্ঠে গর্জে ওঠে, সামাল! সামাল! সা-ব-ধা-ন! আর এক পাও আউগাইবেন না জোতদার সাব। এই নয়া চর আমাগো। পাশের জমিনে ফসল বুনছি মোরা। আপনে ফিইরা যান। সামাল, সামাল, সা-ব-ধা-ন - - -!

ওদের প্রতিরোধ দেখে সকলে চমকে ওঠে। থমকে দাঁড়ায়। জোতদারের অট্টহাসি শোনা যায়। চিৎকার করে বলে, 'তোগো দুঃসাহস দেইখা অবাক হই আমি। পাগলামি করিস না গদাই, সইররা যা। নইলে খুন হইয়া যাবি।'

ভুলু ওর হাতের সড়কিখানা একটু নামিয়ে লাঠিয়াল সর্দারের সামনে গিয়ে চিৎকার করে বলে 'মোগো হক্কলের জমি জোতদার অন্যায়ভাবে কাইররা নিতাছে। তোমরা ক্যান তার হইয়া মোগো মারতে আইছো কালু চাচা!'

কেউ ভুলুর কথায় ভ্রূক্ষেপ করে না। ওকে উপেক্ষা করে দৌড়ে আরও এক ধাপ সামনে

এগোয়। মারাত্মক কিছু একটু এক্ষুনি ঘটে যেতে পারে। ওরা তিন বাপ বেটায় দুর্দান্ত বেগে রুখে দাঁড়ায়। ভয়ঙ্কর লড়াইয়ে ওরাও মেতে ওঠে। কেবল উভয় পক্ষের 'হু-হা-' আর দুর্ধর্ষ শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যায়।

জোতদার নরম কাদায় দখলের লাল নিশান পুঁততে গিয়ে খেয়াল হয়, আস্তে আস্তে নীচে তলিয়ে যাচ্ছে। উঠতে চেষ্টা করে পারেনা। বরং আরও দেবে যায়। প্রচণ্ড ভয় পেয়ে চিৎকার করে। ব্যাপারটা একজন লাঠিয়ালের চোখে পড়ে। গিয়ে টেনে তুলতে চেষ্টা করে, কিন্তু চোরকাদা তাকেও টেনে নেয়।

একজনকে দাবিয়ে অন্যজন বাঁচার জন্যে উঠতে চেষ্টা করায় চোরকাদা থেকে কেউই উঠতে পারছে না। তাদের ভয়ার্ত আর্ত চিৎকারে সকলের হাতের লাঠি যায় থেমে। অসহায় ব্যাপারটা দেখে লালু তাদের বাঁচাতে দৌড়ে যেতে চায়। মুহূর্তে কালু সর্দার ওকে টেনে ধরে। বললো, যাসনে লালু, সময় শেষ। এখন আর ওদের কারো বাঁচানোর সাধ্য নেই, যে যাবে সে নিজেই মরবে। দ্যাখ এরেই কয় সময়ের বিচার।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে চোরকাদার রাক্ষসী গ্রাসে জোতদার চির দিনের মত হারিয়ে যায়। নতুন চরের নরম বালু কাদার ওপর কেবল পড়ে থাকে তাঁর শাদা টুপিটা।

